মাও সে-তুঙ্-এর নির্বাচিত রচনাবলী

দ্বিতীয় খন্ড

নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ
১লা মে, ১৯৭৫
দ্বিতীয় প্রকাশ
১৫ই আগস্ট, ১৯৭৮
তৃতীয় প্রকাশ
১লা অক্টোবর, ২০০১

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক
শুভেন্দু রায়
ঊষা প্রেস
৩২/এ শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মূল্য ঃ ২০০ টাকা মাত্র

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

© নবজাতক প্রকাশন কর্তৃক এই অনূদিত গ্রন্থের সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে প্রকাশকের নিবেদন

১৯৯৩ সালে মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলীর ১ম খণ্ডের তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশের পর আমাদের প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ অসুবিধার কারণে দীর্ঘ আট বছর পর দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কারণে আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে বামপন্থী পাঠক/পাঠিকাদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। ফলে মার্কসবাদী সাহিত্য পঠন পাঠনে অনীহা দেখা দেয়। পৃথিবীর রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ায় নূতন প্রজন্ম নূতন করে অনুভব করছে মার্কসবাদ লেনীনবাদই সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র পথ। সেই পথের অনুসন্ধান করতে হলে মাও সে-তুঙ-এর রচনা অবশ্য পাঠ্য। পাঠক/পাঠিকাদের চাহিদায় তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হল।

প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণের মত তৃতীয় মুদ্রণও পাঠক/পাঠিকাদের নিকট আদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। অভিনন্দন সহ—

নবজাতক প্রকাশন — মজহারুল ইসলাম

১লা অক্টোবর ২০০১

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে প্রকাশকের নিবেদন

সুদীর্ঘ তিন বছর পর মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলীর ২য় খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল। বইটি কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগে ছাপাখানার কর্মীরা নিজ নিজ বন্যা উপদ্রুত জেলায় পুনর্বাসনের কাজে ব্যস্ত থাকায় কাজ অত্যন্ত মন্থর গতিতে এগিয়েছে। তদুপরি বৈদ্যুতিক সঙ্কট ছাপার কাজকে আরও বিলম্বিত করেছে। এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বন্যাবিধ্বস্ত প্রেস কর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতায় খণ্ডটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

প্রথম মুদ্রণের মত দ্বিতীয় মুদ্রণও পাঠক মহলে আদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব। অভিনন্দন সহ—

নবজাতক প্রকাশন — **মজহারুল ইসলাম**

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮

প্রকাশকের নিবেদন

আজ ১লা মে। শ্রমিকশ্রেণীর বহু সংগ্রামের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক মে দিবস। মে দিবসের এই শুভ মুহূর্তে মাও সে-তুঙ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডটি পাঠক/পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পারায় আমরা আনন্দিত। নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে পরিশেষে খণ্ডটি পাঠক/পাঠিকাদের হাতে দিতে পারায় আমরা প্রতিশ্রুতি পালনে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলাম।

পাঠক/পাঠিকাদের কাছে বইটি সমাদৃত হলে আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। পরিশেষে পাঠক/পাঠিকাদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

নবজাতক প্রকাশন — **মজহারুল ইসলাম**

১লা মে, ১৯৭৫

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ (১)

সূচীপত্র

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ (১)

বিষয়		পৃষ্ঠা
জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের কর্মনীতি, ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য (২৩শে জুলাই, ১৯৩৭)	...	১৭
১। দুটি কর্মনীতি	...	১৭
২। দু'রকম ব্যবস্থা	...	২০
৩। দুটি ভবিষ্যৎ	...	২৫
৪। সিদ্ধান্ত	...	২৫
প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতির শক্তির সমাবেশের জন্য (২৫শে আগস্ট, ১৯৩৭)	...	২৭
উদারতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)	...	৩৫
কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে আশু কর্তব্যসমূহ (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)	...	৩৮
ব্রিটিশ সাংবাদিক জেমস বার্ট্রামের সংগে সাক্ষাৎকার (২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৭)	...	৫০
চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রতিরোধ-যুদ্ধ	...	৫০
যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও তার শিক্ষা	...	৫১
প্রতিরোধ-যুদ্ধে অষ্টম রুট বাহিনী	...	৫৫
প্রতিরোধ-যুদ্ধের মধ্যে আত্মসমর্পণবাদ	...	৫৯
গণতন্ত্র এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধ	...	৬০
সাংহাই ও তাইয়ুয়ানের পতনের পর জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কর্তব্যসমূহ (১২ই নভেম্বর, ১৯৩৭)	...	৬৫
১। বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে আংশিক প্রতিরোধ-যুদ্ধ থেকে সর্বাত্মক প্রতিরোধ-যুদ্ধে উত্তরণের পরিস্থিতি	...	৬৫
২। আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে পার্টির মধ্যে এবং দেশের সর্বত্র সংগ্রাম করতে হবে	...	৬৯
পার্টির মধ্যে শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদের বিরোধিতা করা	...	৬৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
সামগ্রিকভাবে দেশে আত্মসমর্পণবাদের বিরোধিতা কর	...	৭৪
শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদ ও জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক	...	৭৫
শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকার এবং অষ্টম রুট বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগস্থ সদর দপ্তরের ঘোষণা (১৫ই মে, ১৯৩৮)	...	৮২
জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা (মে, ১৯৩৮)	...	৮৬
প্রথম অধ্যায় ঃ গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কেন?	...	৮৬
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ যুদ্ধের মৌলিক নীতি হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা	...	৮৮
তৃতীয় অধ্যায় ঃ জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের ছয়টি বিশেষ রণনীতিগত সমস্যা	...	৮৯
চতুর্থ অধ্যায় ঃ উদ্যোগ ও নমনীয়তার সংগে এবং সুপরিকল্পিত-ভাবে প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধে আক্রমণাত্মক লড়াই করা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা এবং অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই চালানো	...	৯০
পঞ্চম অধ্যায় ঃ নিয়মিত যুদ্ধের সংগে সমন্বয়সাধন	...	১০০
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ঘাঁটি এলাকা স্থাপন	...	১০৩
১। বিভিন্ন ধরনের ঘাঁটি এলাকা	...	১০৫
২। গেরিলা অঞ্চল ও ঘাঁটি এলাকা	...	১০৭
৩। ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের শর্ত	...	১০৯
৪। ঘাঁটি এলাকার সুদৃঢ়ীকরণ ও সম্প্রসারণ	...	১১২
৫। আমাদের ও শত্রুর পারস্পরিক পরিবেষ্টনের রূপ	...	১১৩
সপ্তম অধ্যায় ঃ গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণ	...	১১৪
১। গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা	...	১১৫
২। গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত আক্রমণ	...	১১৮
অষ্টম অধ্যায় ঃ গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকাশ সাধন	...	১২০
নবম অধ্যায় ঃ পরিচালনার সম্পর্ক	...	১২৩

বিষয়		পৃষ্ঠা

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে (মে, ১৯৩৮) ... ১২৯
সমস্যার সূত্রপাত ... ১২৯
সমস্যার ভিত্তি ... ১৩৯
জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের খণ্ডন ... ১৪৩
আপোষ, না প্রতিরোধ? দুর্নীতি, না প্রগতি? ... ১৪৭
জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব ভুল, দ্রুত বিজয়ের তত্ত্বও ভুল ... ১৫১
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন? ... ১৫৪
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের তিনটি পর্যায় ... ১৫৭
কলের করাতের ধরনের যুদ্ধ ... ১৬৭
চিরস্থায়ী শান্তির জন্য যুদ্ধ করা ... ১৭২
যুদ্ধে মানুষের কর্মতৎপরতা ... ১৭৫
যুদ্ধ ও রাজনীতি ... ১৭৭
জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক সমাবেশ ... ১৭৯
যুদ্ধের উদ্দেশ্য ... ১৮১
প্রতিরক্ষার মধ্যে আক্রমণ, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই, অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই ... ১৮৩
উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনা ... ১৮৭
চলমান যুদ্ধ, গেরিলাযুদ্ধ, অবস্থানগত যুদ্ধ ... ১৯৯
শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ এবং নির্মূলীকরণের যুদ্ধ ... ২০৪
শত্রুর ভুলত্রুটির সুযোগ নেওয়ার সম্ভাব্যতা ... ২০৮
জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নির্ধারণ লড়াইয়ের প্রশ্ন ... ২১১
সৈন্যবাহিনী ও জনগণ হচ্ছেন জয়ের ভিত্তি ... ২১৪
উপসংহার ... ২২০
জাতীয় যুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা (অক্টোবর, ১৯৩৮) ... ২৩১
দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ... ২৩২
জাতীয় যুদ্ধে কমিউনিস্টদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত ... ২৩৩
সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ কর ও তার মধ্যেকার শত্রুর চরদের মোকাবিলা কর ... ২৩৫
কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্প্রসারিত কর ও শত্রুর চরদের অনুপ্রবেশ রোধ কর ... ২৩৬

বিষয় পৃষ্ঠা

যুক্তফ্রন্ট ও পার্টির স্বাতন্ত্র্য দুই-ই বজায় রাখ ... ২৩৭
পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার কর, সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা কর, আর আমাদের মিত্রদের সাথে একযোগে কাজ কর ... ২৩৮
কর্মসংক্রান্ত নীতি ... ২৩৯
পার্টি শৃংখলা ... ২৪১
পার্টি গণতন্ত্র ... ২৪২
দুই ফ্রন্টে সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের পার্টি নিজেকে সংহত করেছে ও শক্তিশালী হয়েছে ... ২৪৩
দুই ফ্রন্টে বর্তমান সংগ্রাম ... ২৪৬
অধ্যয়ন ... ২৪৬
ঐক্য ও বিজয় ... ২৪৯
যুক্তফ্রন্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের প্রশ্ন (৫ই নভেম্বর, ১৯৩৮) ... ২৫১
সাহায্য ও সুবিধে ইতিবাচক হওয়া উচিত, নেতিবাচক নয়... ২৫১
জাতীয় ও শ্রেণী-সংগ্রামের অভিন্নতা ... ২৫৩
'সমস্ত কিছুই হবে যুক্তফ্রণ্টের মাধ্যমে'—এ ধারণা ভুল ... ২৫৩
যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা (৬ই নভেম্বর, ১৯৩৮) ... ২৫৬
১। চীনের বৈশিষ্ট্য ও বিপ্লবী যুদ্ধ ... ২৫৬
২। কুওমিনতাঙের যুদ্ধের ইতিহাস ... ২৬১
৩। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধের ইতিহাস ... ২৬৩
৪। গৃহযুদ্ধে ও জাতীয় যুদ্ধে পার্টির সামরিক রণনীতির পরিবর্তন ... ২৬৫
৫। জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত ভূমিকা ... ২৬৮
৬। সামরিক সমস্যার পর্যালোচনায় মনোযোগ দাও ... ২৭১
৪ঠা মে'র আন্দোলন (মে, ১৯৩৯) ... ২৭৮
যুব আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশ (৪ঠা মে, ১৯৩৯) ... ২৮১
আত্মসমর্পণবাদী কার্যকলাপের বিরোধিতা করুন (৩০শে জুন, ১৯৩৯) ... ২৯০
প্রতিক্রিয়াশীলদের শাস্তি দিতেই হবে (১লা আগস্ট, ১৯৩৯) ... ২৯৬

বিষয়		পৃষ্ঠা

নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 'নয়া চীন দৈনিক' পত্রিকার সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (১লা সেপ্টেম্বের, ১৯৩৯) ... ৩০১

কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থা, 'সাও তং পাও' এবং 'শিন মিন পাও' পত্রিকার তিনজন সাংবাদিকের সংগে সাক্ষাৎকার (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) ... ৩০৯

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মানবজাতির স্বার্থ অভিন্ন (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) ... ৩১৫

'দি কমিউনিস্ট' পত্রিকা প্রকাশের পটভূমি (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৯) ... ৩২৫

বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তব্যসমূহ (১০ই অক্টোবর, ১৯৩৯) ... ৩৪০

বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সংখ্যায় দলে টেনে আনুন (১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৯) ... ৩৪৩

চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (ডিসেম্বর, ১৯৩৯) ... ৩৪৬

প্রথম অধ্যায় ঃ চীনের সমাজ ... ৩৪৬

১। চীনা জাতি ... ৩৪৬

২। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ... ৩৪৮

৩। বর্তমান ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ... ৩৫০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ চীন বিপ্লব ... ৩৫৬

১। গত একশ বছরের বিপ্লবী আন্দোলন ... ৩৫৬

২। চীন বিপ্লবের লক্ষ্য ... ৩৫৭

৩। চীন বিপ্লবের করণীয় কাজ ... ৩৬০

৪। চীন বিপ্লবের চালিকাশক্তি ... ৩৬১

৫। চীন বিপ্লবের চরিত্র ... ৩৬৯

৬। চীন বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত ... ৩৭২

৭। চীন বিপ্লবের দ্বিবিধ কাজ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ... ৩৭৩

চীনা জনগণের বন্ধু স্তালিন (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯) ... ৩৮৩

নর্ম্যান বেথুনের স্মরণে (২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯) ... ৩৮৫

নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে (জানুয়ারি, ১৯৪০) ... ৩৮৮

১। চীন কোন্ পথে? ... ৩৮৮

২। আমরা এক নতুন চীন গড়ে তুলতে চাই ... ৩৮৯

বিষয় পৃষ্ঠা

৩। চীনের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ... ৩৮৯

৪। চীনের বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের অংশ ... ৩৯১

৫। নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি ... ৩৯৭

৬। নয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি ... ৪০৩

৭। বুর্জোয়া একনায়কত্বের তত্ত্ব খণ্ডন ... ৪০৪

৮। 'বামপন্থী' বুলি-কপচানির খণ্ডন ... ৪০৯

৯। গোঁড়া ব্যক্তিদের যুক্তি খণ্ডন ... ৪১১

১০। পুরানো ও নতুন তিন-গণনীতি ... ৪১৪

১১। নয়া গণতন্ত্রের সংস্কৃতি ... ৪২১

১২। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ... ৪২২

১৩। চার যুগ ... ৪২৫

১৪। সংস্কৃতির প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি ভুল ধারণা ... ৪৩০

১৫। জাতীয়, বিজ্ঞানসম্মত ও জনসাধারণের একটি সংস্কৃতি ... ৪৩২

আত্মসমর্পণের বিপদকে জয় কর, এবং ভালর দিকে মোড় ঘোরাবার চেষ্টা কর (২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪০) ... ৪৩৯

সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ কর এবং গোঁড়া কমিউনিস্ট-বিরোধীদের প্রতিহত কর (১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) ... ৪৪৩

কুওমিনতাঙের কাছে দশ দফা দাবি (১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) ... ৪৫০

'চীনের শ্রমিক' পত্রিকার পরিচয় প্রসঙ্গে (৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) ... ৪৫৮

আমাদের জোর দিতে হবে ঐক্য ও প্রগতির ওপর (১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) ... ৪৬০

নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০) ... ৪৬২

জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন সম্পর্কে (৬ই মার্চ, ১৯৪০) ... ৪৭৩

জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রণকৌশলগত সাম্প্রতিক সমস্যাবলী (১১ই মার্চ, ১৯৪০) ... ৪৭৭

জাপ-বিরোধী শক্তিগুলোকে অব্যাহতভাবে প্রসারিত করুন এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করুন (৪ঠা মে, ১৯৪০) ... ৪৮৮

বিষয় পৃষ্ঠা

একেবারে শেষ পর্যন্তই ঐক্য চাই (জুলাই, ১৯৪০) ... ৪৯৬

কর্মনীতি সম্পর্কে (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪০) ... ৫০০

দক্ষিণ আনহুই ঘটনা সম্পর্কে নির্দেশ ও বিবৃতি
(জানুয়ারি, ১৯৪১) ... ৫১০

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈপ্লবিক সামরিক
কমিশনের নির্দেশ (ইয়েনান, ২০শে জানুয়ারি, ১৯৪১) ... ৫১০

সিনহুয়া সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের জনৈক সংবাদদাতার কাছে
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈপ্লবিক
সামরিক কমিশনের জনৈক মুখপাত্রের প্রদত্ত বিবৃতি
(২২শে জানুয়ারি, ১৯৪১) ... ৫১১

দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিহত হওয়ার
পরবর্তী পরিস্থিতি (১৮ই মার্চ, ১৯৪১) ... ৫১৮

দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিরোধ প্রসঙ্গে
গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ (৮ই মে, ১৯৪১) ... ৫২২

জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের কর্মনীতি ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

২৩শে জুলাই, ১৯৩৭

১। দুটি কর্মনীতি

লুকৌচিয়াও ঘটনার[১] পরের দিন ৮ই জুলাই তারিখে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিরোধ-যুদ্ধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সমগ্র জাতির প্রতি একটা আবেদন প্রকাশ করে। আবেদনটির আংশিক উধৃতি দেওয়া হচ্ছে ঃ

বন্ধু দেশবাসিগণ! পিপিং ও তিয়েনসিন ধ্বংসের মুখে! ধ্বংসের মুখে উত্তর চীন! ধ্বংসের মুখে সমগ্র চীনা জাতি! সমগ্র জাতির প্রতিরোধ-যুদ্ধই হচ্ছে বাঁচার একমাত্র পথ! জাপানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃঢ় প্রতিরোধ আমরা দাবি করছি, দাবি করছি সমস্ত জরুরী অবস্থার উপযোগী দ্রুত প্রস্তুতি। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সমগ্র জাতিকে এই মুহূর্তে অবশ্যই জাপানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে বশ্যতামূলক শান্তিতে বার্স করার চিন্তা দূর করতে হবে। বন্ধু দেশবাসিগণ! ফেংচি-আন-এর বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধকে আমাদের অবশ্যই অভিনন্দন ও সমর্থন জানাতে হবে। আমাদের অভিনন্দন ও সমর্থন জানাতে হবে উত্তর চীনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এই ঘোষণাকে যে, তাঁরা আমৃত্যু দেশকে রক্ষা করবেন। আমরা দাবি করছি যে, জেনারেল সুং চে-য়ুয়ান দ্রুত সমগ্র ২৯ নং বাহিনীকে[২] জড়ো করুন এবং লড়াইয়ের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান। নানকিঙের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবি হচ্ছে ঃ ২৯ নং বাহিনীকে কার্যকরী সাহায্য দিন। জনগণের বিভিন্ন দেশপ্রেমিক আন্দোলনের

সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে সমগ্র চীন দখল করার উদ্দেশ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই লুকৌচিয়াও'র ঘটনা সংঘটিত করে। চীনা জনগণ সর্বসম্মতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দাবি জানায়। ধীরে-সুস্থে জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রকাশ্য ঘোষণা করতে চিয়াং কাই-শেকের দশ দিন লেগে যায়। সারা দেশব্যাপী জনগণের দাবিতে এবং জাপানী আক্রমণের ফলে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের এবং চিয়াং-কাই-শেক যাদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি সেই বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থের হানি ঘটার ফলেই চিয়াং এটা করেছিলেন। কিন্তু একই চিয়াং কাই-শেক সরকার জাপানী আক্রমণকারীদের সংগে বৈঠক চালাতে থাকে, এমনকি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সংগে জাপানীদের

ওপরকার বাধানিষেধ দ্রুত প্রত্যাহার করুন এবং প্রতিরোধযুদ্ধে জনগণের উদ্যোগের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দিন। অবিলম্বে দেশের সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীকে সমবেত করুন। অবিলম্বে চীনের মধ্যে ঘাপ্‌টি-মেরে-থাকা সমস্ত বিশ্বাসঘাতক ও জাপানী দালালকে খুঁজে বের করুন এবং এভাবে পশ্চাদ্ভাগ সুসংহত করে তুলুন। দেশের সমগ্র জনগণের কাছে আমরা জাপানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার এই পবিত্র যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের শ্লোগান হচ্ছে ঃ পিপিং, তিয়েনসিন ও উত্তর চীনে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোল! শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশকে রক্ষা কর! সমগ্র দেশের জনগণ, সরকার ও সশস্ত্রবাহিনী ঐক্যবদ্ধ হোন, গড়ে তুলুন আমাদের দৃঢ় বিশাল প্রাচীরের মতোই জাপানী আক্রমণ-বিরোধী এক জাতীয় যুক্তফ্রন্ট ! জাপানী আক্রমণকারীদের নতুন নতুন আক্রমণের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও প্রতিরোধ গড়ে তুলুক! জাপানী হানাদারদের দূর করে দেওয়া হোক চীনের বুক থেকে!

এই হচ্ছে আমাদের কর্মনীতি সম্পর্কিত ঘোষণা।

১৭ই জুলাই তারিখে চিয়াং কাই-শেক সুশানে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু করার কর্মনীতি হিসেবে দেখলে বলা যায়, বহু বছরের মধ্যে এটাই হচ্ছে পররাষ্ট্র বিষয়ে কুওমিনতাঙদের প্রথম সঠিক বিবৃতি, এবং সে কারণেই এই বিবৃতিটিকে সমগ্র দেশবাসী, এবং সংগে সংগে আমরাও, স্বাগত জানিয়েছি। বিবৃতিটিতে লুকৌচিয়াও ঘটনার মীমাংসার জন্য চারটি শর্তের কথা বলা হয়েছে ঃ

শান্তিপূর্ণ সমঝওতা পর্যন্ত মেনে নেয়। ১৯৩৭ সালের ১৩ই আগস্ট জাপানী হানাদাররা যখন সাংহাই-এর ওপর বিরাট এক আক্রমণ চালায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব চীনে চিয়াং কাই-শেকের শাসন চালানোটাই অসম্ভব করে তোলে, কেবলমাত্র তখনই চিয়াং সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৯৪৪ সাল পর্যন্তও চিয়াং জাপানের সংগে সন্ধি করার জন্য গোপনে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলাকালে চিয়াং কাই-শেক সমগ্র জনগণকে জড়ো করে সর্বাত্মক জনযুদ্ধ গড়ে তোলার বিরোধিতা করেছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের সক্রিয় বিরোধিতা করে জাপানের বিরুদ্ধে অনুসরণ করেছিলেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতি। 'একবার যুদ্ধ বেধে গেলে, যুবক বা বৃদ্ধ, উত্তরের বা দক্ষিণের প্রতিটি লোককে অবশ্যই জাপানকে রুখবার এবং স্বদেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে'—তাঁর নিজেরই এই লুশান বিবৃতির তিনি এভাবে বিরোধিতা করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে কমরেড মাও-সে-তুঙ কর্তৃক আলোচিত দুটি কর্মনীতি, দুটি ব্যবস্থা ও দুটি ভবিষ্যৎ লক্ষ্য প্রতিরোধ-যুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি ও চিয়াং কাই-শেকের দুই লাইনের মধ্যেকার সংগ্রামকেই প্রতিফলিত করছে ।

(১) কোন মীমাংসা চীনের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত সংহতিকে বিঘ্নিত করতে পারবে না; (২) হোপেই ও চাহার প্রদেশের প্রশাসনে কোন রকম বে-আইনী পরিবর্তন করা চলবে না; (৩) অন্য কারও দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত স্থানীয় অফিসারদের পদচ্যুত বা বদলি করা চলবে না; (৪) ২৯ নং বাহিনী বর্তমানে যেখানে অবস্থান করছে, সেখানেই তাকে আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না।

বিবৃতিটির উপসংহারে বলা হয়েছেঃ

লুকৌচিয়াও ঘটনা সম্পর্কে সরকার একটি কর্মনীতি ও অবস্থান গ্রহণ করেছে, এবং সর্বদাই সে তাতে অবিচল থাকবে। আমরা এ কথা বুঝতে পারি, যে সমগ্র দেশ যখন যুদ্ধে নেমেছে, তখন চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং এর থেকে বেরিয়ে আসার সহজ কোন পন্থা সম্পর্কে সামান্যতম আশাও আমরা পোষণ করি না। একবার যুদ্ধ বেধে গেলে, যুবক বা বৃদ্ধ, উত্তরের বা দক্ষিণের প্রতিটি লোককেই জাপানকে রুখবার এবং স্বদেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

এটিও একটি কর্মনীতি সম্পর্কিত ঘোষণা।

এখানে আমরা লুকৌচিয়াও ঘটনা সম্পর্কে দুটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘোষণা পাচ্ছি—একটি কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রদত্ত, অন্যটি প্রদত্ত কুওমিনতাঙ কর্তৃক। উভয়েই একটি বিষয়ে একমত ঃ উভয়েই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটি প্রতিরোধ-যুদ্ধের সপক্ষে এবং সমঝওতা ও সুবিধাদানের বিরোধী।

জাপানী আক্রমণ রুখবার জন্য এটি হচ্ছে এক ধরনের কর্মনীতি, একটি সঠিক কর্মনীতি।

কিন্তু আরেকটি ভিন্ন ধরনের কর্মনীতি গ্রহণেরই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক মাস ধরে পিপিং ও তিয়েনসিনে বিশ্বাসঘাতক ও জাপপন্থী লোকেরা খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে, তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দিয়ে জাপানের দাবিগুলি মেনে নেওয়াতে চাইছে, দৃঢ়সংকল্প সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতিকে বিসর্জন দিয়ে সমঝওতা ও সুবিধাদানের পক্ষে তারা ওকালতি করছে। এ সবই অত্যন্ত বিপজ্জনক ইংগিত।

সমঝওতা ও সুবিধাদানের কর্মনীতি হচ্ছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্থ প্রতিরোধের কর্মনীতির ঠিক উল্টো। খুব তাড়াতাড়ি এই কর্মনীতির পরিবর্তন না হলে পিপিং, তিয়েনসিন ও সমগ্র উত্তর চীন শত্রুদের হাতে চলে যাবে, সমগ্র দেশই এক চরম বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। প্রত্যেককে সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে।

২৯ নং বাহিনীর দেশপ্রেমিক অফিসাররা ও সৈন্যরা, ঐক্যবদ্ধ হোন! সমঝওতা ও সুবিধাদানের বিরোধিতা করুন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যান!

পিপিং, তিয়েনসিন ও উত্তর চীনের দেশপ্রেমিক বন্ধুগণ, ঐক্যবদ্ধ হোন! সমঝওতা ও সুবিধাদানের বিরোধিতা করুন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধকে সমর্থন করুন!

সমস্ত দেশের দেশপ্রেমিক বন্ধুগণ, ঐক্যবদ্ধ হোন! সমঝওতা ও সুবিধা-দানের বিরোধিতা করুন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধকে সমর্থন করুন!

মিঃ চিয়াং কাই-শেক এবং কুওমিনতাঙের অন্যান্য দেশপ্রেমিক সদস্যবৃন্দ! আমরা আশা করি যে, আপনারা আপনাদের কর্মনীতিতে অবিচল থাকবেন, আপনাদের শপথ রক্ষা করবেন, সমঝওতা ও সুবিধাদানের বিরোধিতা করবেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাবেন, এবং এভাবে কাজের মধ্য দিয়ে শত্রুর বর্বরতার জবাব দেবেন!

লালফৌজসহ দেশের সশস্ত্রবাহিনী মিঃ চিয়াং কাই-শেকের ঘোষণাকে সমর্থন জানাক, সমঝওতা ও সুবিধাদানের বিরোধিতা করুক, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাক!

আমরা কমিউনিস্টরা সর্বান্তঃকরণে ও বিশ্বস্তভাবে আমাদের নিজেদের ইস্তাহারকে অনুসরণ করার সংগে সংগে মিঃ চিয়াং কাই-শেকের ঘোষণাটির প্রতিও দৃঢ় সমর্থন জানাচ্ছি; কুওমিনতাঙের সদস্যগণ ও অন্যান্য দেশবাসী বন্ধুদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত দেশকে রক্ষা করতে প্রস্তুত আছি; যে-কোন ইতস্ততঃ ভাব, দোদুল্যমানতা, সমঝওতা বা সুবিধাদানের আমরা বিরোধিতা করছি; দৃঢ়তার সংগে আমরা সশস্ত্র প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

২। দু'রকম ব্যবস্থা

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতির লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সামগ্রিক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

সেগুলি কি কি? প্রধানগুলি হচ্ছে এরকম ঃ

১। **সমগ্র দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সমাবেশ ঘটাও**। স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী, কেন্দ্রীয় বাহিনী, স্থানীয় বাহিনী ও লালফৌজ—সব মিলিয়ে কুড়ি লক্ষেরও বেশি আমাদের স্থায়ী বাহিনীকে জড়ো কর, অবিলম্বে তাদের প্রধান বাহিনীগুলিকে জাতীয় রক্ষাব্যূহ রেখায় পাঠিয়ে দাও, এবং পশ্চাদ্ভাগে কিছু বাহিনীকে শৃংখলা রক্ষার জন্য নিয়োজিত কর। জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বস্ত জেনারেলদের ওপর বিভিন্ন ফ্রন্টের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ কর। রণনীতি নির্ধারণ করার জন্য এবং বিভিন্ন সামরিক অভিযানে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা সম্মেলন আহ্বান কর।

সৈন্যবাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে এবং সৈন্য ও জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক কাজকে ঢেলে সাজাও। রণনীতিগত দায়িত্বের একটা দিকের দায়িত্ব গেরিলা যুদ্ধের ওপর অর্পণ করার নীতি প্রতিষ্ঠা কর এবং গেরিলা যুদ্ধ ও নিয়মিত যুদ্ধের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন কর। সৈন্যবাহিনী থেকে বিশ্বাসঘাতকদের দূর করে দাও। যথেষ্ট সংখ্যক মজুত সৈন্য সংগ্রহ কর এবং তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার মতো উপযুক্ত ট্রেনিং দাও। সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সম্ভার পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ কর। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের সাধারণ কর্মনীতির সংগে সংগতি রেখে ওপরের চিন্তাগুলি অনুসারে সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কর। চীনের সৈন্যবাহিনী সংখ্যায় প্রচুর বটে, কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী না করা হলে তারা শত্রুদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। আর রাজনৈতিক ও বাস্তব বিষয়গুলির সমন্বয় ঘটাতে পারলে আমাদের সৈন্যবাহিনী হবে পূর্ব এশিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি।

২। **সমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটাও।** দেশপ্রেমিক আন্দোলনগুলির ওপর থেকে সমস্ত রকমের বাধা তুলে নাও, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও, 'প্রজাতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক কাজকর্মের ওপর জরুরী নির্দেশনামা'[৩] এবং 'সংবাদ নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশনামা'[৪] বাতিল কর, বর্তমান দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলিকে আইনী স্বীকৃতি দাও, এইসব সংগঠনকে শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে বিস্তৃত কর, জনগণকে আত্মরক্ষার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সশস্ত্র কর। এক কথায় জনগণকে তাদের দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটাবার জন্য স্বাধীনতা দাও। জনগণ ও সেনাবাহিনী তাদের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর মরণ-আঘাত হানতে পারবে। ব্যাপক জনতার ওপর নির্ভর না করলে জাতীয় যুদ্ধে যে জয়লাভ করা যাবে না, এতে কোন সন্দেহ নেই। আবিসিনিয়ার পতন[৫] থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আন্তরিকভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিরোধ-যুদ্ধ গড়ে তুলতে আগ্রহী কেউই এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে পারে না।

৩। **সরকারী কাঠামোর সংস্কার কর।** সরকার যাতে প্রকৃত জনগণের সরকার হয়ে উঠতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যৌথ পরিচালনার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গ্রুপের প্রতিনিধি এবং জননেতাদের সরকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর এবং সরকারের মধ্যে ঘাপ্‌টি-মেরে-থাকা সমস্ত বিশ্বাসঘাতক ও জাপপন্থী ব্যক্তিদের দূর করে দাও। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ একটি বিরাট কাজ, শুধু কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষ সে দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে না। সরকারকে যদি প্রকৃতই জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার হয়ে উঠতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই জনগণের ওপর নির্ভর

করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুশীলন করতে হবে। একই সঙ্গে তাকে হতে হবে গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত ; এ ধরনের সরকারই কেবল শক্তিশালী হতে পারে। জাতীয় পরিষদকে হতে হবে সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিমূলক। তা হবে কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ সংস্থা, রাষ্ট্রের প্রধান কর্মনীতিসমূহের নির্ধারক এবং জাপানকে রুখবার ও দেশকে বাঁচাবার কর্মনীতি ও পরিকল্পনাসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।

৪। **জাপান-বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ কর**। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কোনরকম সুযোগ-সুবিধে দিও না, বরং উল্টোদিকে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর, তাদের ঋণ অস্বীকার কর, তাদের দালালদের গোড়াশুদ্ধ উপড়ে ফেল এবং তাদের গুপ্তচরদের বিতাড়িত কর। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে অবিলম্বে একটি সামরিক ও রাজনৈতিক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন কর এবং তার সংগে ঘনিষ্ঠ ঐক্য গড়ে তোল। সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে সেই দেশ, যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং জাপানের বিরুদ্ধে চীনকে সাহায্য করতে সবচেয়ে বেশি সক্ষম। জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধের ব্যাপারে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের সমর্থন সংগ্রহ কর, তবে এই শর্তে যে, এতে আমাদের ভূখণ্ড বা সার্বভৌম অধিকারের কোন ক্ষতি হবে না। জাপানী হানাদারদের বিধ্বস্ত করতে গিয়ে আমাদের প্রধানতঃ নিজেদের শক্তির ওপরেই নির্ভর করতে হবে ; কিন্তু তাই বলে বৈদেশিক সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করারও কোন যুক্তি নেই, এবং একা একা চলার নীতি শত্রুদেরই সুবিধে করে দেবে।

৫। **জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতিমূলক কর্মসূচী ঘোষণা কর এবং অবিলম্বে তাকে কার্যকরী কর**। নিম্নলিখিত ন্যূনতম বিষয়গুলি দিয়ে শুরু করা হোক ঃ অত্যধিক হারে কর ও নানারকম লেভির অবসান ঘটাও, জমির খাজনা কমিয়ে দাও, মহাজনী কারবারকে সীমিত কর, শ্রমিকদের মজুরী বাড়াও, সৈন্য ও নিম্নপদস্থ অফিসারদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটাও, অফিসের কর্মচারীদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটাও, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য দাও। এই ব্যবস্থাগুলি, কেউ কেউ যেরকম বলছে মোটেই দেশের অর্থনীতিকে সেরকম বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলবে না, বরং এইসব নতুন ব্যবস্থা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে এবং তার ফলে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। এইসব ব্যবস্থা জাপানকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে আমাদের অপরিমেয় শক্তি জোগাবে এবং সরকারের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তুলবে।

৬। **জাতীয় প্রতিরক্ষার শিক্ষার প্রচলন কর**। বর্তমান শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাও। যেসব প্রকল্প খুব জরুরী নয় এবং যেসব ব্যবস্থা যুক্তিভিত্তিক

নয়, সেগুলিকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। সংবাদপত্র, বই ও পত্রপত্রিকা, ফিল্ম্, নাটক, সাহিত্য ও শিল্প—সব কিছুকেই জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থে কাজ করতে হবে। বিশ্বাসঘাতকতামূলক প্রচার নিষিদ্ধ করতে হবে।

৭। **জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য আর্থিক ও অর্থনৈতিক কর্মনীতিসমূহ গ্রহণ কর**। আর্থিক কর্মনীতি হবে এই যে যাদের টাকা আছে তাদের টাকা দিতে হবে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। আর অর্থনৈতিক কর্মনীতি হবে জাপানী পণ্য বয়কট ও স্বদেশী পণ্যের বিকাশের নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত—সব কিছুই জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য। আর্থিক সংকট হচ্ছে ভুল ব্যবস্থা গ্রহণেরই ফলশ্রুতি, জনগণের কল্যাণমূলক এইসব নতুন কর্মনীতি গ্রহণ করলে সুনিশ্চিতভাবেই তার সমাধান করা যায়। এমন কথা বলা নিতান্তই মূর্খতা যে, এত বিশাল ভূখণ্ড ও এত বিপুল জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশ আর্থিক ও অর্থনৈতিক ভাবে নিতান্তই অসহায়।

৮। **আমাদের দৃঢ় ও বিশাল প্রাচীরের মতো জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য সমগ্র চীনা জনগণ, সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করে তোল**। সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতি এবং উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োগ নির্ভর করছে এই যুক্তফ্রন্টের ওপর। এবং এর চাবিকাঠি হচ্ছে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। এই দুই পার্টির মধ্যেকার এই সহযোগিতার ওপরে ভিত্তি করে সরকার, সেনাবাহিনী, সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সমগ্র জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠুক। 'জাতীয় সংকটের মোকাবিলার জন্য শুভেচ্ছা-নির্ভর ঐক্য'-এর শ্লোগানটিকে শুধুমাত্র একটি চমৎকার কথার কথা করে রাখলেই চলবে না, তাকে রূপায়িত করতে হবে ভাল কাজের মধ্য দিয়ে। ঐক্যকে হতে হবে সাচ্চা, প্রতারণা করলে চলবে না। রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ক্ষেত্রে চাই উদার মনের ও ব্যাপকতর দৃঢ়তার পরিচয়। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যস্ততা, হীন প্রতারণা, আমলাতান্ত্রিকতা এবং আ কিউবাদ[৬]—এই সব কিছুই হবে অর্থহীন। শত্রুদের বিরুদ্ধে এগুলি কোন কাজেই লাগবে না, আর নিজের দেশের লোকের প্রতি এসবের ব্যবহার হবে নিতান্তই হাস্যকর। সবকিছুতেই প্রধান ও অপ্রধান নীতি আছে, এবং সমস্ত অপ্রধান নীতিই প্রধান নীতির অধীন। আমাদের স্বদেশবাসীদেরকে অবশ্যই প্রধান নীতিগুলির আলোকে সমস্ত কিছুকে সর্তকভাবে বিচার করে দেখতে হবে, কেননা একমাত্র এভাবেই তাঁরা নিজেদের ধ্যানধারণা ও কাজের ক্ষেত্রে যথাযথ দিক্‌নির্দেশ গড়ে তুলতে পারবেন। আজ যাদের মধ্যে এখনো ঐক্যের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়নি, তাদের রাতের অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যে নিজেদের বিবেককে একবার বিচার করে দেখা উচিত এবং লজ্জিত হওয়া উচিত, এমনকি কেউ তাদেরকে নিন্দা না করলেও।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলিকে বলা যেতে পারে একটি আট দফা কর্মসূচী।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতিকে অবশ্যই এই ব্যবস্থাগুলির সংগে যুক্ত হতে হবে, এবং অন্যথায় বিজয় কখনই অর্জিত হবে না, এবং চীনের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণেরও কখনো অবসান ঘটবে না, বরং জাপানের সামনে চীনই হয়ে পড়বে অসহায়, এবং আবিসিনিয়ার দশাতেই তাকে পড়তে হবে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মনীতির ব্যাপারে আন্তরিকতা থাকলে এইসব ব্যবস্থাকে অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে। এবং কেউ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধে আন্তরিক কিনা তার পরীক্ষা হবে এতেই যে তিনি এই দফাগুলি গ্রহণ করে তা কার্যকরী করেছেন কিনা তার মাধ্যমে।

অবশ্য সর্বক্ষেত্রে এইসব ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত আরেকরকম ব্যবস্থাবলীও হতে পারে।

সেনাবাহিনীকে সামগ্রিক সমাবেশ নয়, বরং, তাদের অচল করে রাখা এবং সরিয়ে আনা।

জনগণের স্বাধীনতা নয়, শুধু নিপীড়ন।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার নয়, বরং আমলা মুৎসুদ্দি ও বৃহৎ জমিদারদের এক স্বৈরাচারী সরকার।

জাপানকে রুখবার পররাষ্ট্র নীতি নয়, বরং তাকে তোষামোদ করার পররাষ্ট্র নীতি।

জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতি নয়, বরং ক্রমাগত দোহন, যাতে তারা দুঃখকষ্টের যাঁতাকলে গোঙাতে থাকে এবং জাপানকে রুখবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য শিক্ষা নয়, বরং জাতীয় আত্মসমর্পণের জন্য শিক্ষা।

জাপানকে রুখবার জন্য আর্থিক ও অর্থনৈতিক কর্মনীতি নয়, বরং সেই পুরানো, বা তার চেয়েও খারাপ আর্থিক ও অর্থনৈতিক কর্মনীতি, যা নিজের দেশের বদলে শত্রুদেরকেই সুবিধে করে দেয়।

আমাদের বিরাট প্রাচীরের মতো জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট নয়, বরং তাকে গুঁড়িয়ে ফেলা, বা ঐক্যের গালভরা বুলি আউড়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কোন কিছুই না করা।

বিভিন্ন ব্যবস্থা জন্ম নেয় কর্মনীতি থেকেই। কর্মনীতি যদি হয় প্রতিরোধ না করার, সমস্ত ব্যবস্থাই সেই প্রতিরোধ না করাকে প্রতিফলিত করবে। বিগত ছ'বছর ধরে এই শিক্ষাই আমরা পেয়ে এসেছি। আর কর্মনীতি যদি হয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধের, তবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাকে আট দফা কর্মসূচীকে—অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে।

৩। দুটি ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

ভবিষ্যৎ লক্ষ্যগুলি তাহলে কি কি ? সকলেই এ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

প্রথম কর্মনীতি অনুসরণ করলে প্রথম ধরনের ব্যবস্থাবলীকেও মানতে হয়, এবং তখন সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে যে, ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটা হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিতাড়ন ও চীনের মুক্তি অর্জন। এ সম্পর্কে এর পরেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি? আমার তা মনে হয় না।

দ্বিতীয় কর্মসূচী অনুসরণ কর এবং দ্বিতীয় ধরনের ব্যবস্থাবলী গ্রহণ কর, এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটা সুনিশ্চিতভাবেই হয়ে পড়বে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের চীন দখল, চীনা জনগণের ক্রীতদাসে ও ভারবাহী পশুতে রূপান্তরণ। এ ব্যাপারে এর পরেও কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? এ ক্ষেত্রেও আমার তা মনে হয় না।

৪। সিদ্ধান্ত

প্রথম কর্মনীতিটিকে কার্যকরী করা, প্রথম ধরনের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা এবং প্রথম ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালনোটা হচ্ছে একান্তভাবেই আবশ্যিক।

দ্বিতীয় কর্মনীতিটির বিরোধিতা করা, দ্বিতীয় ধরনের ব্যবস্থাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা এবং দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটিকে পরিহার করাটা হচ্ছে একান্তভাবেই আবশ্যিক।

কুওমিনতাঙের সমস্ত দেশপ্রেমিক সদস্যরা এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হোন এবং দৃঢ়ভাবে প্রথম কর্মনীতিটিকে কার্যকরী করুন, প্রথম ধরনের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করুন এবং প্রথম ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালান; দ্বিতীয় কর্মনীতিটিকে দৃঢ়তার সংগে তাঁরা বিরোধিতা করুন, দ্বিতীয় ধরনের ব্যবস্থাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটিকে পরিহার করুন।

সমস্ত দেশপ্রেমিক জনগণ, দেশপ্রেমিক সৈন্যবাহিনী এবং দেশপ্রেমিক পার্টি ও গ্রুপগুলি ঐক্যবদ্ধ হোন এবং দৃঢ়ভাবে প্রথম কর্মনীতিটিকে কার্যকরী করুন, প্রথম ধরনের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করুন এবং প্রথম ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালান; দ্বিতীয় কর্মনীতিটাকে দৃঢ়তার সংগে তাঁরা বিরোধিতা করুন, দ্বিতীয় ধরনের ব্যবস্থাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করুন, এবং দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ লক্ষ্যটাকে পরিহার করুন।

জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ দীর্ঘজীবী হোক!

চীন জাতির মুক্তি দীর্ঘজীবী হোক!

টীকা

১। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপানী হানাদার সৈন্যরা পিকিং থেকে মাইল দশেক দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লুকৌচিয়াও'র চীনা গ্যারিসন আক্রমণ করে। দেশজোড়া জাপান-বিরোধী ব্যাপক আন্দোলনে প্রভাবিত চীনা সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই ঘটনাই জাপানের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ-যুদ্ধের সূচনা করে, এবং আট বছর ধরে তা চলতে থাকে।

২। ২৯ নং বাহিনী আসলে ছিল কুওমিনতাঙদের উত্তর-পশ্চিম বাহিনীর অংশ এবং ফেং উ-সিয়াঙের অধীন। এই বাহিনী তখন হোপেই ও চাহার প্রদেশে অবস্থান করছিল। এর কম্যাণ্ডার ছিলেন সুং চে-য়ুয়ান এবং ফেং চি-আন ছিলেন এর অন্যতম ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার।

৩। ১৯৩১ সালের ৩১শে জানুয়ারি দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীদের নিপীড়ন ও হত্যা করার জন্য 'প্রজাতন্ত্রকে বিপদাপন্ন করার' মনগড়া মিথ্যা অভিযোগ তুলে কুওমিনতাঙ 'প্রজাতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক কাজকর্মের ওপর জরুরী নির্দেশনামা' জারী করে। এই নির্দেশনামার দ্বারা চূড়ান্ত বর্বরতার মাধ্যমে নির্যাতন চালানো হয়েছিল।

৪। ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে জনতার কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে কুওমিনতাঙ সরকারের জারী করা 'সংবাদ নিয়ন্ত্রণমূলক সাধারণ ব্যবস্থা'রই অপর নাম ছিল 'সংবাদ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশনামা'। তাতে বলা হয়েছিল যে, 'সমস্ত সংবাদের অনুলিপি সেন্সরশিপের জন্য জমা দিতে হবে।'

৫। দ্রষ্টব্য ঃ 'জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যসমূহ' ('মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী', ১ম খণ্ড, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, পৃঃ ২৫৪)।

৬। চীনের মহান লেখক লু শুনের সুবিখ্যাত উপন্যাস-এর সত্য কাহিনীর নায়ক ছিলেন আ কিউ। বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা ও বিজয়কে যাঁরা নৈতিক বা আত্মিক বিজয় বলে সান্ত্বনা পান, আ কিউ হচ্ছেন, তাঁদেরই প্রতিরূপ।

প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতির শক্তির সমাবেশের জন্য

২৫শে আগস্ট, ১৯৩৭

(ক) ৭ই জুলাই তারিখের লুকৌচিয়াও'র ঘটনা চীনের বিরাট প্রাচীরের দক্ষিণে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সর্বাত্মক আক্রমণের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। আর লুকৌচিয়াও'র চীনা সৈন্যবাহিনীর প্রতিরোধ সূত্রপাত ঘটিয়েছে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের দেশজোড়া প্রতিরোধ-যুদ্ধের। জাপানীদের ক্রমাগত আক্রমণ, জনগণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লড়াই, জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিরোধের প্রবণতা, একটি জাতীয় যুক্তফ্রন্টের কর্মনীতির পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দীপ্ত প্রচার ও এর দৃঢ় প্রয়োগ, এবং এই কর্মনীতির প্রতি দেশজোড়া সমর্থন—এ সবকিছুই লুকৌচিয়াও'র ঘটনার পর থেকে চীনা কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছে ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে তাদের অনুসৃত প্রতিরোধ না করার কর্মনীতিকে পাল্টে প্রতিরোধের কর্মনীতি গ্রহণ করতে। এর ফলে চীনা বিপ্লব ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলনের[১] পরে উপনীত স্তর ছাড়িয়ে, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে প্রতিরোধের প্রস্তুতির স্তর থেকে প্রকৃত প্রতিরোধে অবতীর্ণ হবার স্তরে, এগিয়ে গেছে। সিয়ান ঘটনা থেকে এবং কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন থেকে কুওমিনতাঙের কর্মনীতির যে প্রাথমিক পরিবর্তন শুরু হয়েছে, সেগুলি এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার বিষয়ে মিঃ চিয়াং কাইশেকের ১৭ই জুলাই তারিখের বিবৃতি এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে গৃহীত তাঁর বিভিন্ন ব্যবস্থা—এ সবই অভিনন্দন দাবি করে। যুদ্ধক্ষেত্রে স্থল ও বিমান বাহিনী বা স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীগুলি সবাই সাহসের সংগে লড়াই করেছে এবং চীনা জাতির বীরত্বপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। জাতীয় বিপ্লবের নামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র চীনের দেশপ্রেমিক সৈন্যবাহিনীকে এবং অন্যান্য সাথীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।

এই নিবন্ধটি হচ্ছে চীনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সংগঠনগুলির জন্য ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক রচিত প্রচার ও জনমত গঠনের রূপরেখা। উত্তর শেনসির লোচুয়ানে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় এটি অনুমোদিত হয়।

(খ) কিন্তু অন্যদিকে, এমনকি ৭ই জুলাই'র লুকৌচিয়াও ঘটনার পরেও কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ সেই ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের পর থেকে অনুসৃত ভ্রান্ত কর্মনীতিই অনুসরণ করে চলেছেন, সমঝওতা করছেন ও সুবিধে দিচ্ছেন,[২] দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর উৎসাহকে অবদমিত করছেন এবং জনগণের মুক্তিআন্দোলনকে চেপে দিচ্ছেন। এতে কোন সন্দেহই নেই যে, পিপিং ও তিয়েনসিন দখল করার পর জাপানী সাম্রাজ্যবাদ তার ব্যাপক অভিযানের কর্মনীতিকে কার্যকরী করতে এগিয়ে আসবে, তার পূর্ব-পরিকল্পিত যুদ্ধ পরিকল্পনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়টিকে রূপায়িত করবে এবং সমগ্র উত্তর চীনে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করবে। এ কাজে তারা নির্ভর করবে নিজেদের হিংস্র সামরিক শক্তির ওপরে, এবং একই সংগে তারা জার্মান ও ইতালীর সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন নেবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দোদুল্যমানতাকে ও ব্যাপক মেহনতী জনগণ থেকে কুওমিনতাঙের বিচ্ছিন্নতাকে কাজে লাগাবে। চাহার ও সাংহাইতে ইতিমধ্যেই যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে। আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে হলে, শক্তিশালী হানাদারদের আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে, উত্তর চীনকে ও সমুদ্র উপকূলকে রক্ষা করতে হলে, এবং পিপিং, তিয়েনসিন ও উত্তর পূর্ব চীন পুনরুদ্ধার করতে হলে কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ ও সমগ্র জনগণকে অবশ্যই গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে উত্তর-পূর্ব চীন, পিপিং ও তিয়েনসিন হারাবার শিক্ষা, শিক্ষা নিতে হবে ও সাবধানবাণী গ্রহণ করতে হবে আবিসিসিয়ার পতন থেকে, শিক্ষা নিতে হবে বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের অতীত বিজয় থেকে,[৩] শিক্ষা নিতে হবে মাদ্রিদকে রক্ষা করার ব্যাপারে স্পেনের বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে,[৪] এবং দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। কাজেই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ঃ 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য সমগ্র জাতির শক্তির সমাবেশ ঘটাও', এবং এ কাজে সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠি হচ্ছে কুওমিনতাঙের কর্মনীতির সম্পূর্ণ ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো। প্রতিরোধের প্রশ্নে কুওমিনতাঙ কর্তৃক গৃহীত অগ্রবর্তী পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানাতে হবে ; এর জন্যই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সমগ্র দেশের জনগণ বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করছিল এবং আমরা একে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপক জনগণের সমাবেশ ঘটানো, রাজনৈতিক সংস্কার সাধন প্রভৃতি বিষয়ে কুওমিনতাঙ তার কর্মনীতি পাল্টায়নি। এখনো তা জাপ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়নি, সরকারী কাঠামোর মৌলিক কোন পরিবর্তন করেনি, এখনো পর্যন্ত জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতিকল্পে কোন নীতিই গ্রহণ করেনি এবং এখনো পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতার ব্যাপারে কোনরকম আন্তরিকতার

পরিচয় দেয়নি। আমাদের জাতির জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে কুওমিনতাঙ যদি এখনো সেই পুরানো খাতেই চলতে চায়, যদি তার নীতির দ্রুত পরিবর্তন না করে, তবে তা প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিপর্যয়ই ডেকে আনবে। কিছু কিছু কুওমিনতাঙ সভ্য বলছেন ঃ 'বিজয় অর্জনের পর রাজনৈতিক সংস্কারের পালা শুরু করা যাবে।' এঁদের ধারণা, শুধু সরকারী উদ্যোগেই জাপ-আক্রমণ-কারীদের হারিয়ে দেওয়া সম্ভব, কিন্তু এঁরা ভুল করছেন। শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় গোটাকয়েক খণ্ডযুদ্ধে হয়তো বিজয়লাভ সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এভাবে জাপ-হানাদারদের সম্পূর্ণ উৎখাত করা সম্ভব নয়। সমগ্র জাতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধযুদ্ধে সামিল হলেই কেবল তা সম্ভব হতে পারে। এই ধরনের যুদ্ধের জন্য দরকার কুওমিনতাঙ কর্তৃক অনুসৃত নীতির আমূল পরিবর্তন এবং জাপ-প্রতিরোধের একটি সর্বাত্মক কর্মসূচীকে কার্যকরী করার জন্য উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত সমগ্র জাতির সমস্ত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, অর্থাৎ কুওমিনতাঙ—কমিউনিস্ট সহযোগিতার প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন যে বৈপ্লবিক তিন গণ-নীতি ও তিন মহান কৌশল[৫] রচনা করেছিলেন, তারই ভিত্তিতে প্রণীত জাতীয় মুক্তির একটি কর্মসূচী।

(গ) সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কুওমিনতাঙের কাছে, সমগ্র জনসাধারণের কাছে, সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিসমূহ, গ্রুপ ও বিভিন্ন জীবিকাশ্রয়ী ব্যক্তিবর্গের কাছে, এবং সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীর কাছে জাপ হানাদারদের সমূলে উৎখাতের জন্য একটি দশ দফা সম্বলিত কর্মসূচী গ্রহণ করার প্রস্তাব করছে। আমাদের পার্টি এই দৃঢ়মত পোষণ করে যে, এই কর্মসূচীটি সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে কার্যকরী করার মধ্য দিয়েই কেবল মাতৃভূমির রক্ষা ও জাপ-হানারদের পরাভূত করা সম্ভব। তা না করলে যাঁরা অযথা কাল হরণ করে এইভাবে পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছেন, দায়িত্ব এসে পড়বে তাদেরই ওপরে। দেশের সর্বনাশ ঘটে যাবার পর আক্ষেপ ও বিলাপে সময়ক্ষেপ করার সময় আর থাকবে না। দশটি দফা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১। জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত কর।

জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ কর, জাপানী কর্মচারীদের দূর করে দাও, জাপ এজেন্টদের গ্রেপ্তার কর, চীন দেশে অবস্থিত জাপ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর, জাপ ঋণ অস্বীকার কর, জাপানের সঙ্গে যেসব চুক্তিপত্র সই হয়েছে তা নাকচ কর এবং জাপানকে প্রদত্ত সব সুবিধে ফিরিয়ে নাও।

উত্তর চীন ও সমুদ্রোপকূল প্রতিরক্ষার জন্য শেষ অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাও।

পিপিং, তিয়েনসিন ও উত্তর চীন পুনরুদ্ধারের জন্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও।

চীন থেকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের দূর করে দাও।

সমস্ত ধরনের দোদুল্যমানতা ও সমঝোতার বিরোধিতা কর।

২। সমগ্র জাতির সামরিক শক্তির সমাবেশ ঘটাও।

সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিরোধ-যুদ্ধে সমস্ত পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনীর সমাবেশ ঘটাও।

নিষ্ক্রিয় ও শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক রণনীতির বিরোধিতা কর এবং গ্রহণ কর সক্রিয় স্বাধীন এক রণনীতি।

জাতীয় প্রতিরক্ষামূলক পরিকল্পনা ও রণনীতি বিষয়ে সুষ্ঠু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী একটি স্থায়ী জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠিত কর।

জনগণকে সশস্ত্র কর এবং প্রধান বাহিনীর অভিযানের সঙ্গে তাল রেখে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের বিকাশ ঘটাও।

সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মের সংস্কার সাধন কর, যাতে অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে একতা গড়ে ওঠে।

জনগণ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোল এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে জঙ্গী মানসিকতার উন্মেষ ঘটাও।

জাপ-বিরোধী উত্তর-পূর্ব যুক্ত সামরিক বাহিনীকে সমর্থন জানাও এবং শত্রুর পশ্চাদ্দেশে ভাঙন ধরাও।

প্রতিরোধ-যুদ্ধে ব্যাপৃত সমস্ত বাহিনীর প্রতি সমান ব্যবহার কর।

দেশের সর্বত্র সামরিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা কর। যুদ্ধে অংশ নেওয়াবার জন্য সমগ্র জাতির সমাবেশ ঘটাও এবং এইভাবে ধীরে ধীরে যুদ্ধের ভাড়াটে পদ্ধতির পরিবর্তে সাধারণ সামরিক কর্তব্য পালন করার মনোভাব গড়ে তোল।

৩। সমগ্র দেশের জনগণের সমাবেশ ঘটাও।

সমগ্র দেশের জনগণকে (বিশ্বাসঘাতকরা ছাড়া) জাপানকে প্রতিরোধ করার ও জাতিকে রক্ষার জন্য বাক্-স্বাধীনতা, পত্রপত্রিকার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা ও সমিতিবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা দাও, শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার দাও।

জনগণের দেশপ্রেমিক আন্দোলনের প্রতিবন্ধক সমস্ত পুরানো আইন ও হুকুমনামার অবসান ঘোষণা কর এবং নতুন বিপ্লবী আইন ও হুকুমনামা জারী কর।

সমস্ত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও এবং রাজনৈতিক পার্টিগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নাও।

সমগ্র দেশের জনগণের সমাবেশ ঘটাও, তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিক, প্রতিরোধ-যুদ্ধে সামিল হোক। যারা শক্তিমান তারা শক্তি জোগাক, যারা অর্থবান তারা অর্থ

দিক, যাদের বন্দুক আছে তারা দিক বন্দুক, যারা জ্ঞানী তারা এগিয়ে আসুক জ্ঞান নিয়ে।

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাধারণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের নীতির ভিত্তিতে মঙ্গোল, হুই ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিদের সমাবেশ ঘটাও।

৪। সরকারী কাঠামোর সংশোধন কর।

জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় পরিষদের আহ্বান কর। সেখানে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হবে, জাপানকে প্রতিরোধ ও জাতিকে রক্ষার কর্মনীতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার একটি সরকার নির্বাচিত হবে।

জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকারকে সমস্ত পার্টি ও গণসংগঠন থেকে বিপ্লবীদের গ্রহণ করতে হবে এবং জাপ সমর্থকদের বিতাড়িত করতে হবে।

জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকারকে কাজকর্মে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রয়োগ ঘটাতে হবে এবং একই সঙ্গে তাকে হতে হবে গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত।

জাপানকে প্রতিরোধ করার ও জাতিকে রক্ষার জন্য জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকারকে বিপ্লবী কর্মনীতি অনুসরণ করতে হবে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত কর, দুনীর্তিগ্রস্ত অফিসারদের তাড়াও, এবং প্রতিষ্ঠিত কর একটি নিষ্কলুষ সরকার।

৫। জাপ-বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ কর।

জাপ-আক্রমণের বিরোধী যেসব দেশ আছে তাদের সঙ্গে পারস্পারিক সামরিক সাহায্যের জন্য আক্রমণ-বিরোধী মৈত্রী ও জাপ-বিরোধী চুক্তি সম্পাদন কর, অবশ্য এই শর্ত সাপেক্ষে যে, এর ফলে আমাদের দেশের কোন অঞ্চলই আমাদের অধিকারচ্যুত হবে না বা আমাদের সার্বভৌম অধিকারে হস্তক্ষেপ আসবে না।

আন্তর্জাতিক শান্তি জোটের প্রতি সমর্থন জানাও, এবং জার্মান ও ইতালীর আগ্রাসী জোটের বিরোধিতা কর।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপানের ও কোরিয়ার শ্রমিক ও কৃষকজনতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হও।

৬। যুদ্ধকালীন আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলী গ্রহণ কর।

যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক নীতি নির্ধারণ করতে হবে এই নীতির ভিত্তিতে যে, অর্থবানদের অর্থ দিতে হবে এবং বিশ্বাসঘাতকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করতে হবে এমনভাবে যাতে দেশের

প্রতিরক্ষামূলক উৎপাদনের পুনর্বিন্যাস দ্রুত বৃদ্ধি হতে পারে, গ্রাম্য অর্থনীতির বিকাশ ঘটতে পারে এবং যুদ্ধকালীন পণ্যোৎপাদনে স্বাবলম্বী হবার নিশ্চিতি মেলে। স্থানীয় পণ্যের উন্নতি কর ও চীনা পণ্যের ব্যবহারে উৎসাহ দাও। জাপানী পণ্য সম্পূর্ণভাবে বর্জনের নির্দেশ দাও। মুনাফাখোর ব্যবসাদারদের শায়েস্তা কর এবং বাজারে ফাটকাবাজী ও বাটপাড়ি দমন কর।

৭। **জনগণের জীবিকার উন্নয়ন কর।**

শ্রমিক, অফিস কর্মচারী ও শিক্ষক, এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈন্যবাহিনীর লোকদের অবস্থার উন্নয়ন কর।

জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্যবাহিনীর লোকদের পরিবারের প্রতি সবিশেষ নজর দাও।

অত্যধিক কর ও বিভিন্ন ধরনের লেভি আদায় রহিত কর।

খাজনা ও সুদের হার হ্রাস কর।

বেকারদের সাহায্য দাও।

শস্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ কর।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য দাও।

৮। **জাপ-বিরোধী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলন কর।**

বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ও পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন কর এবং জাপ প্রতিরোধ ও জাতিরক্ষা বিষয়ে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কর ও নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন কর।

৯। **বিশ্বাসঘাতক ও জাপ-সমর্থকদের মুলোৎপাটন কর এবং দেশের পশ্চাদ্ভাগ সুসংবদ্ধ করে তোল।**

১০। **জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোল।**

কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট সমর্থনের ভিত্তিতে প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপ, জীবনের নানাক্ষেত্রে নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোল, প্রকৃত বিশ্বাস নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হও এবং জাতীয় সংকটের মোকাবিলা কর।

(ঘ) শুধুমাত্র সরকারই প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাবে—এই নীতি নিশ্চিতভাবে বাতিল করতে হবে, এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের নীতিকে কার্যকরী করতে হবে। জনগণের সঙ্গে সরকারকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী ধারার সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, পূর্বোল্লিখিত দশ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ

করতে হবে এবং পূর্ণ বিজয়ের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। নিজের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের সংগে ও জনগণের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই কর্মসূচীকে দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করবে, প্রতিরোধ-যুদ্ধের সামনের সারিতে থাকবে, শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তারা মাতৃভূমিকে রক্ষা করে যাবে। এই সুদৃঢ় নীতির ভিত্তিতেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙ, অন্যান্য পার্টি ও গ্রুপের পাশে দাঁড়িয়ে এবং তাঁদের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় যুক্তফ্রন্টের বিশাল দৃঢ়কঠিন প্রাচীর গড়ে তুলতে প্রস্তুত, যার মাধ্যমে ঘৃণ্য জাপ-হানাদারদের পরাজিত করে এক নতুন স্বাধীন, সুখী ও মুক্ত চীন গড়ে তোলা যাবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমাদের অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসঘাতকদের সমঝওতা ও পরাজয়ের তত্ত্বকে বর্জন করতে হবে, জাপ-আক্রমণকারীরা অপরাজেয়—এই ধরনের জাতীয় পরাজয়বাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। চীনে কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, উপরোক্ত দশ দফা কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ হলে জাপ-হানাদারদের নিশ্চিতভাবে পরাজিত করা সম্ভব হবে। আমাদের ৪৫ কোটি দেশবাসী যদি সবাই সচেষ্ট হন, চীনা জাতি তবে নিশ্চিতভাবেই বিজয় অর্জন করবে।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!

জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ দীর্ঘজীবী হোক!

স্বাধীন, সুখী ও মুক্ত নয়া চীন দীর্ঘজীবী হোক!

টীকা

১। ১৯৩৫ সালে সমগ্র দেশ জুড়ে দেশপ্রেমিক গণ-আন্দোলনের এক নতুন জোয়ার জেগে ওঠে। ৯ই ডিসেম্বর তারিখে পিকিং-এ ছাত্ররা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক দেশপ্রেমিক বিক্ষোভ-মিছিল বের করে ধ্বনি তোলে ঃ 'গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর, বিদেশী আগ্রাসন প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হও', 'জাপ-সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'। জাপানী হানাদারদের সহযোগিতায় কুওমিনতাঙ সরকার দীর্ঘদিন ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে আসছিল, এই আন্দোলন তা ভেঙে দেয় এবং দেশজুড়ে দ্রুত গণ-সমর্থন অর্জন করে। এই আন্দোলনই '৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন' নামে খ্যাত। এর ফলে যে নতুন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তা দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-সম্পর্কের প্রতিফলন হিসেবেই ফুটে ওঠে, এবং কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রদত্ত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের শ্লোগান খোলাখুলিই দেশপ্রেমিক জনগণ সমর্থন করতে থাকে। বিশ্বাসঘাতকের নীতির জন্য চিয়াং কাই-শেকের সরকার অত্যন্ত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে।

২। এই ২য় খণ্ডেরই প্রথম প্রবন্ধের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩। 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ', ইংরেজী সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৭-৮১, মস্কো, ১৯৫১ দ্রষ্টব্য।

৪। ১৯৩৬-এর অক্টোবরে শুরু হয়ে মাদ্রিদ-প্রতিরোধ ২৯ মাস ধরে চলে। ১৯৩৬-এ ফ্যাসিস্ত জার্মানি ও ইতালী স্পেনের ফ্যাসিস্ত যুদ্ধবাজ ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করার নামে স্পেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকারের নেতৃত্বে স্পেনের জনগণ বীরত্বের সঙ্গে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এই আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। রাজধানী মাদ্রিদ নগরী রক্ষার যুদ্ধ স্পেনের সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে তীব্রতম যুদ্ধ হয়ে আছে। শত্রুর হাতে মাদ্রিদের পতন ঘটে ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে, কারণ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের তথাকথিত 'হস্তক্ষেপ নয়' নামক প্রতারণামূলক নীতির দ্বারা ঐ আক্রমণকেই সাহায্য করে, এবং এই পতনের আরও একটি কারণ হচ্ছে এই যে, 'পপুলার ফ্রন্টের' মধ্যেও মতবিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে।

৫। 'তিন গণ-নীতি'—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনকল্যাণ—ছিল ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিঘোষিত নীতি। ১৯২৪-এই তিনি এই নীতির পুনঃব্যাখ্যা করে শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলনের প্রতি কার্যকরী সমর্থন জানান এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কথা বলেন। তাঁর এই পুনর্ঘোষিত নীতিকে বলা হয় 'নয়া গণ-নীতি'। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে মৈত্রী, কমিউনিস্টদের সংগে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সমর্থন ও সাহায্য—এই ছিল ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নয়া নীতি। এই নয়া নীতিকে ভিত্তি করেই কুওমিনতাঙ ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ পরিচালিত হয়।

উদারতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

আমরা সক্রিয় মতাদর্শগত সংগ্রামের সপক্ষে, কারণ এটাই হচ্ছে লড়াইয়ের স্বার্থে পার্টির মধ্যে ও বিপ্লবী সংগঠনগুলোর মধ্যে ঐক্যকে সুনিশ্চিত করার হাতিয়ার। প্রত্যেক কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীর এই হাতিয়ার গ্রহণ করা উচিত।

কিন্তু উদারতাবাদ মতাদর্শগত সংগ্রামকে বাতিল করে দেয় এবং নীতিহীন শান্তির পক্ষ নেয়, এর ফলে ক্ষয়িষ্ণু ও অশিষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি হয়, এবং কোন কোন পার্টি ইউনিটে এবং পার্টি ও বিপ্লবী সংগঠনগুলোর কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক অধঃপতন ঘটে।

উদারতাবাদের প্রকাশ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে।

যখন স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, কোন লোক ভুল পথে যাচ্ছেন, অথচ সে লোক একজন পুরানো পরিচিত লোক, একই জায়গার অধিবাসী, সহপাঠী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রিয়জন, পুরানো সহকর্মী বা পুরানো অধীন লোক বলে তাঁর সঙ্গে নীতিগতভাবে যুক্তিতর্ক না করা, তখন শান্তি ও সখ্য বজায় রাখার জন্য তাকে অবাধে চলতে দেওয়া। অথবা তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য চূড়ান্তভাবে মীমাংসার চেষ্টা না করে ওপর ওপরভাবে কিছু বলা। ফলে সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষ উভয়েরই ক্ষতি হয়। এটা হচ্ছে এক ধরনের উদারতাবাদ।

নিজের প্রস্তাব সংগঠনের সামনে সক্রিয়ভাবে উত্থাপন না করে আড়ালে দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচনা করা। সামনাসামনি কিছু না বলে পেছনে বাজে গুজব রটনা করা, সভায় কিছু না বলে পরে আজেবাজে কথা বলা। যৌথ জীবনযাত্রার নীতির প্রতি আদৌ কোনরকম মর্যাদা না দেখিয়ে নিজের ঝোঁকে চলা। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ধরনের উদারতাবাদ।

নিজের ব্যক্তিস্বার্থে ঘা না লাগলে সব যেমন চলছে তেমনি চলতে দেওয়া; কোন বিষয়কে স্পষ্টতঃই ভুল জেনেও সে বিষয় সম্পর্কে যথাসম্ভব মুখ বুঁজে থাকা; গা বাঁচানোর জন্য দোষ এড়িয়ে নির্বিবাদে ভালমানুষ সেজে থাকা। এটা হচ্ছে তৃতীয় ধরনের উদারতাবাদ।

নির্দেশ অমান্য করে ব্যক্তিগত মতামতকে সবার ওপরে স্থান দেওয়া। সংগঠনের কাছ থেকে শুধু বিশেষ সুবিধা দাবি করা কিন্তু সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলা অস্বীকার করা। এটা হচ্ছে চতুর্থ ধরনের উদারতাবাদ।

ঐক্য, অগ্রগতি বা সুষ্ঠভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য ভুল মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যুক্তিতর্ক না করা, বরং ব্যক্তিগত আক্রমণ চালানো, ঝগড়া বাধানো, ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করা বা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করা। এটা হচ্ছে পঞ্চম ধরনের উদারতাবাদ।

বিনা প্রতিবাদে ভুল মতামত শুনে যাওয়া এমনকি প্রতিবিপ্লবী মন্তব্য শুনেও সে সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট না করা, বরং যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে নিঃশব্দে সেগুলি হজম করে যাওয়া। এটা হচ্ছে ষষ্ঠ ধরনের উদারতাবাদ।

জনসাধারণের মধ্যে থেকেও তাদের মধ্যে প্রচার বা বিক্ষোভ সৃষ্টি না করা, বক্তৃতা না দেওয়া, তদন্ত ও অনুসন্ধান না করা, তাদের সুখদুঃখে মনোযোগ না দেওয়া, তাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকা এবং নিজে যে একজন কমিউনিস্ট সে-কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে একজন সাধারণ অ-কমিউনিস্ট লোকের মতো আচরণ করা। এটা হচ্ছে সপ্তম ধরনের উদারতাবাদ।

কাউকে জনসাধারণের স্বার্থের ক্ষতি করতে দেখেও মনে মনে বিক্ষুব্ধ না হওয়া, অথবা তাকে বারণ বা নিরস্ত না করা, যুক্তি দিয়ে তাকে না বোঝানো, বরং জেনেশুনেও তাকে সে কাজ করে যেতে দেওয়া। এটা হচ্ছে অষ্টম ধরনের উদারতাবাদ।

কাজকর্মে মনোযোগ না দেওয়া, কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা লক্ষ্য ছাড়াই কাজ করা, তাচ্ছিল্যভরে কাজ করা এবং কোনমতে চালিয়ে যাওয়া—'যতদিন মঠের সন্ন্যাসী থাকব ততদিন ঘন্টা বাজিয়ে গেলেই চলবে।' এটা হচ্ছে নবম ধরনের উদারতাবাদ।

বিপ্লবের জন্য নিজে বিরাট অবদান রেখেছি বলে মনে করা, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ বলে নিজেকে জাহির করা, বড় কাজে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ছোট কাজ করতে না চাওয়া, কাজে অমনোযোগী হওয়া এবং অধ্যয়নে ঢিলে দেওয়া। এটা হচ্ছে দশম ধরনের উদারতাবাদ।

নিজের ভুল জেনেও তা সংশোধনের চেষ্টা না করা, নিজের প্রতি উদারতাবাদ অবলম্বন করা। এটা হচ্ছে একাদশ রকমের উদারতাবাদ।

আরও অনেক ধরনের কথা বলা যায়। কিন্তু এই এগারোটিই হচ্ছে প্রধান। এই সবগুলিই হচ্ছে উদারতাবাদের অভিব্যক্তি।

বিপ্লবী যৌথ সংগঠনের ভেতরে উদারতাবাদ অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটা হচ্ছে একটা ক্ষয়কারক বস্তু, যা ঐক্য বিঘ্নিত করে, সংহতি নষ্ট করে, কাজে নিষ্ক্রিয়তা আনে এবং বিভেদ সৃষ্টি করে। এটা বিপ্লবী বাহিনীকে সুসংবদ্ধ সংগঠন ও শৃংখলা থেকে সরিয়ে আনে, কর্মনীতিগুলিকে কার্যকরী করা অসম্ভব করে তোলে এবং যে

জনগণকে পার্টি পরিচালিত করে তাদের থেকে পার্টি-সংগঠনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এটা একটা অত্যন্ত জঘন্য ঝোঁক।

উদারতাবাদ জন্ম নেয় পেটি-বুর্জোয়া স্বার্থপরতা থেকে, এটা ব্যক্তিস্বার্থকে প্রথম স্থান দেয় এবং বিপ্লবের স্বার্থকে দেয় দ্বিতীয় স্থান। এর ফলেই জন্ম নেয় মতাদর্শগত, রাজনীতিগত ও সংগঠনগত উদারতাবাদ।

উদারতাবাদীরা মার্কসবাদের নীতিগুলোকে বিমূর্ত মতবাদ হিসেবে দেখেন। মার্কসবাদকে তাঁরা স্বীকার করেন কিন্তু তাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত নন ; নিজেদের উদারতাবাদের পরিবর্তে মার্কসবাদকে স্থান দিতেও রাজী নন। এইসব লোকের মার্কসবাদ আছে, আবার একই সংগে আছে উদারতাবাদ—মুখে তাঁরা মার্কসবাদের কথা বলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন উদারতাবাদ ; অন্যদের প্রতি তাঁরা প্রয়োগ করেন মার্কসবাদ, কিন্তু নিজেদের বেলায় উদারতাবাদ। দুই ধরনের জিনিসই তাঁরা হাতে রাখেন, এবং প্রয়োজনমতো সেগুলিকে কাজে লাগান। এই হচ্ছে কিছু কিছু লোকের চিন্তাধারার পদ্ধতি।

উদারতাবাদ হচ্ছে সুবিধাবাদের অন্যতম প্রকাশ এবং মার্কসবাদের সঙ্গে এর মৌলিক বিরোধ রয়েছে। এটা হচ্ছে একটা নেতিবাচক জিনিস এবং বাস্তবক্ষেত্রে এটা শত্রুকেই সাহায্য করে, তাই শত্রুরা চায় আমাদের মধ্যে উদারতাবাদ বিরাজ করুক। এই যখন উদারতাবাদের প্রকৃতি তখন বিপ্লবী বাহিনীতে অবশ্যই একে কোন স্থান দেওয়া উচিত নয়।

মার্কসবাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নেতিবাচক উদারতাবাদকে আমাদের দূর করতে হবে। একজন কমিউনিস্টকে মুক্তমন হতে হবে, হতে হবে একনিষ্ঠ ও সক্রিয়, বিপ্লবের স্বার্থকে নিজের প্রাণের সমার্থক হিসেবে দেখতে হবে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিপ্লবের স্বার্থের অধীন করে রাখতে হবে ; তাঁকে সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রেই সঠিক নীতিতে দৃঢ় থাকতে হবে এবং সমস্ত ভুল চিন্তাধারা ও আচরণের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, যাতে করে পার্টির যৌথ জীবনকে সুসংবদ্ধ এবং পার্টি ও জনসাধারণের মধ্যেকার সংযোগকে সুদৃঢ় করা যায় ; ব্যক্তিবিশেষের চাইতে পার্টির ও জনসাধারণের সম্বন্ধে এবং নিজের চেয়ে অপরের সম্বন্ধে তাকে বেশি যত্নশীল হতে হবে। এবং তখনই কেবল তাঁকে একজন কমিউনিস্ট বলে ধরা যেতে পারে।

অনুগত, সৎ, সক্রিয় এবং ন্যায়পরায়ণ সমস্ত কমিউনিস্টকে অবশ্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে উদারতাবাদের যে ঝোঁক রয়েছে তার বিরোধিতা করতে হবে এবং তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে হবে। এইটাই হচ্ছে আমাদের মতাদর্শগত ফ্রন্টের অন্যতম কর্তব্য।

কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে আশু কর্তব্যসমূহ

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

সেই ১৯৩৩ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একটি ঘোষণাপত্রে বলেছিল যে, লালফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ করার, জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার নিশ্চিতিদানের এবং জনগণকে সশস্ত্র করে তোলার তিনটি শর্ত সাপেক্ষে সে কুওমিনতাঙের যে-কোন অংশের সংগে জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে রাজী আছে; এই ঘোষণাটি করা হয়েছিল এই কারণেই যে, ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করাই চীনা জনগণের প্রাথমিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি।

১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনের লালফৌজ জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ যুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য একটি জাপ-বিরোধী সম্মিলিত বাহিনী এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার একটি সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ এবং দেশের সমগ্র জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছিল।[১] সে বছরই ডিসেম্বর মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় বুর্জোয়াদের সংগে একটি জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত[২] গ্রহণ করেছিল। ১৯৩৬ সালের মে মাসে লালফৌজ একটি খোলা তারবার্তায়[৩] নানকিং সরকারের কাছে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার দাবি জানিয়েছিল। সে বছরই আগস্ট মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির কাছে প্রেরিত একটি চিঠিতে[৪] জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে দুই পার্টির একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের দাবি জানিয়েছিল। ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি চীনে একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রস্তাব[৫] গ্রহণ করে। এই ঘোষণা, খোলা তারবার্তা চিঠি ও প্রস্তাবগুলি ছাড়াও আমরা বহুবার কুওমিনতাঙদের প্রেরিত লোকদের সাথে আলোচনা চালাবার জন্য আমাদের প্রতিনিধিদেরকে পাঠিয়েছি, কিন্তু সে সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ১৯৩৬-এর শেষের দিকে সিয়ান ঘটনার পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি

এবং কুওমিনতাঙের দায়িত্বশীল অধিনায়কের পক্ষে একটি সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে চুক্তিতে আসা সম্ভব হয়, অর্থাৎ দুই দলের মধ্যেকার গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। চীনের ইতিহাসে এটি একটি বিরাট ঘটনা এবং দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি পূর্বশর্ত হিসেবে এটি কাজ করেছে।

বর্তমান বছরের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত সভার কাছে, অধিবেশনের প্রারম্ভ-মুহূর্তে, একটি তারবার্তা[৬] প্রেরণ করে দুই পার্টির মধ্যে সুনির্দিষ্ট সহযোগিতার ভিত্তি রচনার একটি সুষ্ঠু প্রস্তাব দেয়। ঐ তারবার্তায় আমরা কুওমিনতাঙের কাছে এই বলে দাবি জানাই যে, কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট পার্টিকে নিম্নলিখিত পাঁচটি গ্যারান্টি দিকঃ গৃহযুদ্ধ বন্ধ, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাসমূহের নিশ্চয়তা, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান, জাপ-প্রতিরোধ বিষয়ে দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ এবং জনগণের জীবিকা উন্নয়নের ব্যবস্থাবলী। একই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙকে নিম্নলিখিত চারটি গ্যারান্টি দিয়েছিল ঃ দুটি শাসন-ব্যবস্থার মধ্যেকার শত্রুতার অবসান, লালফৌজের নতুন নামকরণ, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলীর প্রবর্তন এবং জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ বন্ধ রাখা। একইভাবে এটিও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ, কারণ এটি ব্যতীত দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি ব্যাহত হচ্ছিল এবং যার ফলে জাপ-প্রতিরোধের দ্রুত প্রস্তুতিপর্বে প্রচণ্ড বাধা আসছিল।

তারপর থেকে আলোচনার ক্ষেত্রে দুই পার্টি পরস্পর আরও কাছাকাছি চলে আসে। দুই পার্টির পক্ষে গ্রহণযোগ্য সম্ভাব্য রাজনৈতিক কর্মসূচী, গণআন্দোলনের ওপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি ও লালফৌজের নতুন নামকরণ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি আরও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়। এখনো পর্যন্ত সম্মিলিত কর্মসূচী ঘোষিত হয়নি, গণআন্দোলনের ওপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহৃত হয়নি, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে নয়া ব্যবস্থা প্রচলনের প্রস্তাবটিও স্বীকৃতি পায়নি। তবে পিপিং ও তিয়েনসিনের পতনের একমাস পর একটি নির্দেশ এসেছে এই বলে যে, লালফৌজের নতুন নামকরণ হচ্ছে জাতীয় বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর অষ্টম রুট বাহিনী (জাপবিরোধী সামরিক নির্দেশনামায় অষ্টাদশ গ্রুপ বাহিনী হিসেবেও উল্লিখিত হয়েছিল)। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণা কুওমিনতাঙকে জানানো হয়েছিল সেই ১৫ই জুলাই তারিখে, এবং ঠিক হয়েছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আইনী অবস্থানের স্বীকৃতি দিয়ে চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি

প্রকাশিত হবে ঘোষণাটির সাথে একই সঙ্গে, কিন্তু (হায়, অনেক দেরীতে) তা অবশেষে জনসাধারণকে জানানোর জন্য কুওমিনতাঙের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পরিবেশন করল ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে, যখন যুক্তফ্রন্টের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা ও চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি দুটি পার্টির মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে জাতিকে বাঁচাবার জন্য দুই পার্টির মধ্যে মহান মৈত্রী গঠনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি রচনা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা দুই পার্টির মধ্যে শুধুমাত্র মৈত্রীর নীতির কথাই বলেনি, উপরন্তু তা সমস্ত দেশের জনসাধারণের মধ্যেকার মহান মৈত্রীর নীতিকেও প্রতিফলিত করেছে। চিয়াং কাই-শেক তাঁর বিবৃতিতে সমগ্র চীনে কমিউনিস্ট পার্টির আইনী অবস্থানকে যে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং জাতির রক্ষাকল্পে দুই পার্টির মধ্যে মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ যে করেছেন, তা ভাল সন্দেহ নেই; তবে, তিনি কিন্তু তাঁর কুওমিনতাঙ একগুঁয়েমি পরিত্যাগ করেননি, প্রয়োজনীয় আত্মসমালোচনাও করেননি, এবং আমরা তাতে মোটেই খুশি হতে পারি না। যা হোক, দুই পার্টির মধ্যে যুক্তফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। চীনা বিপ্লবের ইতিহাসে এটি এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এটি চীনা বিপ্লবের ওপর সুদূরবিস্তারী প্রভাব বিস্তার করবে এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ে একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করবে।

সেই ১৯২৪ থেকেই চীনা বিপ্লবে কুওমিনতাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কটি একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে আসছে। নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে দুই পার্টির সহযোগিতায় ১৯২৪-২৭-এর বিপ্লবটি সংঘটিত হয়েছিল। দু-তিন বছরের মধ্যেই জাতীয় বিপ্লবে বিপুল সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। এর জন্য ডঃ সান ইয়াৎ-সেন চল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেছিলেন এবং এটা তিনি অসমাপ্ত রেখে যান; কোয়াংতুঙে বিপ্লবী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা ও উত্তরাভিযানের বিজয়লাভ এই সাফল্যেরই ফলশ্রুতি। দুই পার্টির মধ্যে যুক্তফ্রন্টের গঠনই এই সাফল্যের কারণ। কিন্তু যে-মুহূর্তে বিপ্লব বিজয়ের মুখোমুখি এসে উপস্থিত হল, কিছু লোক বিপ্লবের লক্ষ্যকে আর আঁকড়ে ধরে রাখতে পারল না, তারা দুটো পার্টির যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙন নিয়ে এল এবং তার ফলে বিপ্লব পর্যবসিত হল পরাজয়ে, আর দেশের দুয়ার খুলে দেওয়া হল বৈদেশিক হানাদারদের সামনে। দুই পার্টির যুক্তফ্রন্টের ভাঙনের এই হল ফল। এখন দুই পার্টির মধ্যে নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট চীনের বিপ্লবে এক নতুন যুগের উন্মেষ ঘটাতে যাচ্ছে। কিছু কিছু ব্যক্তি এখনো আছে, যারা এই যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তার ভবিষ্যৎ সম্যক বুঝে উঠতে পারছে না, তারা মনে করছে যে, ঘটনার চাপে পড়ে এই সংগঠন সাময়িকভাবে তৈরী হয়েছে

মাত্র। যাই হোক, এই যুক্তফ্রন্টের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের চাকা চীনের বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সম্পূর্ণ এক নতুন স্তরে। যে তীব্র জাতীয় ও সামাজিক সঙ্কটের মধ্যে চীন বর্তমানে পড়েছে তার থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারবে কিনা, তা নির্ভর করছে কিভাবে এই যুক্তফ্রন্টের বিকাশলাভ ঘটে তার ওপর। ইতিমধ্যেই যেসব প্রমাণ চোখে পড়ছে, তাতে মনে হয় এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। প্রথমতঃ, যে-মুহূর্তে কমিউনিস্ট পার্টি এই যুক্তফ্রন্টের নীতিটি ঘোষণা করে, সেই মুহূর্ত থেকেই এটিকে সর্বত্রই জনসাধারণ স্বাগত জানিয়েছে। এটি জনগণের সদিচ্ছারই একটি মূর্ত প্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ, সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধান ও দুই পার্টির মধ্যেকার গৃহযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপগুলি, বিভিন্ন জীবিকার ব্যক্তিবর্গ ও দেশের সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা অভূতপূর্ব এক ঐক্য গড়ে তোলেন। অবশ্য এই ঐক্য জাপানকে প্রতিরোধের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না, বিশেষ করে সরকার ও জনগণের মধ্যেকার ঐক্যের সমস্যাটি তখনো পর্যন্ত মূলতঃ অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল। তৃতীয়তঃ, এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, সমগ্র দেশ জুড়ে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতিরোধ-যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় আমরা মোটেই খুশি নই, কারণ যদিও চরিত্রের দিক থেকে এটি জাতীয়, তবু এখনো পর্যন্ত এই যুদ্ধ সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে এই ধরনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করা যাবে না। যাই হোক, শত শত বছরের মধ্যে চীন এই প্রথম এক বিদেশী হানাদারের বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবে দেশজোড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলছে, যা দেশের অভ্যন্তরে শান্তি বজায় না থাকলে এবং দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা না থাকলে কখনই সম্ভব হতে পারত না। দুই পার্টির যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাবার সময়ে যখন জাপান বন্দুকের একটি গুলি না ছুঁড়েও চীনের উত্তর-পূর্বের চারটি প্রদেশ দখল করে বসতে পেরেছিল, তখন আজ দুই পার্টির যুক্তফ্রন্ট পুনঃসংগঠিত হবার সময়ে জাপানের পক্ষে রক্তাক্ত যুদ্ধ ব্যতীত চীনের এক টুকরো জমিও আর দখল করা সম্ভব হবে না। চতুর্থতঃ, চীনের বাইরেও এর একটা প্রতিফলন আছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রদত্ত জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রস্তাব দুনিয়ার শ্রমিক-কৃষক ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সমর্থন পেয়েছে। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সহযোগিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ, চীনকে আরও সক্রিয় সাহায্য দিতে এগিয়ে আসবে। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে রয়েছে একটি অনাক্রমণ চুক্তি[৭] এবং এখন এই দুই দেশের মধ্যেকার সম্পর্কের আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। এইসব থেকে

আমরা নিশ্চিতভাবে এ কথা বলতে পারি যে, যুক্তফ্রন্টের বিকাশ চীন দেশকে এক উজ্জ্বল ও মহান ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় এবং এক ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে।

যা হোক, বর্তমানে যে-অবস্থায় আছে সে-অবস্থায় থাকলে যুক্তফ্রন্ট এই মহান কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হবে। দুই পার্টির মধ্যে এই যুক্তফ্রন্টের আরও বিকাশ ঘটাতে হবে। কারণ, বর্তমানে তা ব্যাপক জনসমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সুসংবদ্ধও নয়।

জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট কি কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? না, একে হতে হবে সমগ্র জাতির যুক্তফ্রন্ট, দুটি পার্টি যার অংশ মাত্র। এই যুক্তফ্রন্টকে হতে হবে সমস্ত পার্টি ও গ্রুপ, বিভিন্ন জীবিকার লোক ও সশস্ত্র বাহিনীর যুক্তফ্রন্ট, সমস্ত দেশপ্রেমিক—শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসাদারদের যুক্তফ্রন্ট। এখনো পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট কার্যতঃ সীমাবদ্ধ রয়েছে দুটো পার্টির মধ্যে, এখনো পর্যন্ত শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও শহরের পেটি-বুর্জোয়া এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক দেশপ্রেমিকদের উদ্দীপ্ত করে তোলা সম্ভব হয়নি, তাদের কাজে নামানো হয়নি, সংগঠিত ও সশস্ত্র করা হয়নি। বর্তমানে এটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় অর্জনকে অসম্ভব করে তুলেছে বলেই এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-চীন ও কিয়াংসু এবং চেকিয়াং প্রদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে যে সংকটময় অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তা আর গোপন করে লাভ নেই, এবং তার প্রয়োজনও নেই ; প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করা যায়। সমাধানের একমাত্র পথ হল ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রটিকে কাজে পরিণত করা, 'জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করে তোলা।' মৃত্যুকালে প্রদত্ত ইচ্ছাপত্রে ডঃ সান ঘোষণা করেছিলেন, চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি স্থিরনিশ্চিত যে, কেবলমাত্র এইভাবেই বিপ্লবের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে। এই শেষ ইচ্ছাপত্রকে একগুয়েমিভাবে কাজে পরিণত না করার কি যুক্তি থাকতে পারে? সমগ্র জাতি যখন বিপদাপন্ন, তখন এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কি যুক্তি থকতে পারে? এ কথা সবাই জানেন যে, স্বৈরতন্ত্র ও দমননীতি হচ্ছে 'জনগণকে উদ্দীপ্ত করে তোলার' নীতির চরম বিরোধী। শুধুমাত্র সরকারী স্তরে ও সামরিক বাহিনী দিয়ে জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা কখনো সম্ভব নয়। এই বছরের মে মাসের প্রথম দিকে আমরা কুওমিনতাঙের শাসকগণকে সমস্ত রকম গুরুত্ব সহকারে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম যে, যদি জনসাধারণকে প্রতিরোধ করতে উদ্দীপ্ত করে তোলা না হয়, তবে চীনকে আবিসিনিয়ার মতো দুর্ভাগ্য বরণ করতে হবে। এই বিষয়টি সম্পর্কে বারবার শুধুমাত্র চীনের কমিউনিস্ট পার্টিই বলেনি, এ সম্পর্কে সমগ্র দেশের সমস্ত প্রগতিশীলরা এবং, এমনকি, কুওমিনতাঙের বুদ্ধিমান সভ্যরাও বলেছেন। তা সত্ত্বেও

স্বৈরাচারী শাসন অপরিবর্তনীয়ই থেকে যাচ্ছে। তার ফলে সরকার জনসাধারণ থেকে, সামরিক বাহিনী জনগণ থেকে, ও সামরিক নেতৃত্ব সাধারণ সৈনিকদের কাছ থেকে বহু দূরে সরে যাচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট যদি গণ-উদ্যোগে উদ্দীপ্ত না হয়ে ওঠে, তবে যুক্তফ্রন্টের সংকট কমবে না, বরং উত্তরোত্তর তা নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

উভয় পার্টি কর্তৃক গৃহীত এবং নিয়মানুযায়ী বিঘোষিত এমন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী বর্তমানের জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের নেই, যা কুওমিনতাঙের স্বৈরাচারী শাসনবিধির বদলে চালু হতে পারে। বিগত দশ বছর ধরে জনসাধারণ সম্পর্কে কুওমিনতাঙ যে শাসন চালিয়ে যাচ্ছে, এখনো তাই তারা অনুসরণ করছে; তার কোন পরিবর্তনই নেই, বিগত দশ বছর ধরে মোটামুটি সেই একই নীতি অনুসৃত হচ্ছে সরকারী শাসনযন্ত্রে, সামরিক বাহিনীর ব্যবস্থাবলীতে ও নাগরিকদের সম্পর্কে আর্থিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-পদ্ধতিতে। কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে এবং সে-পরিবর্তনও বিরাট ঃ তা হল গৃহযুদ্ধের অবসান ও জাপ-বিরোধী ঐক্য। দুই পার্টি গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র দেশব্যাপী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু করেছে, যা সিয়ান ঘটনার পর চীনা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক বিরাট পরিবর্তন সূচীত করছে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত কর্মধারার কোন পরিবর্তনই নেই, এবং তার ফলে পরিবর্তন ও অপরিবর্তনের মধ্যে এক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুরানো কর্মধারা বিদেশের সঙ্গে সমঝওতা স্থাপনের আর দেশের ভেতরে বিপ্লব দমনের সংগেই সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু জাপ-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মোকাবিলার প্রশ্নে তা সব দিক দিয়েই অসঙ্গতিপূর্ণ ও অপ্রতুল। জাপানকে প্রতিরোধ করতে যদি আমরা না চাইতাম, তাহলে ঘটনাটি হতো অন্যরকম, কিন্তু আমরা যখন প্রতিরোধ করতে চাই এবং তা আরম্ভও হয়েছে, এবং তীব্র সংকট যখন আত্মপ্রকাশ করেছে, তখন নতুন পথে পরিবর্তন না ঘটানোর অর্থই সম্ভাব্য প্রচণ্ডতম বিপদ। জাপানকে প্রতিরোধ করতে হলে চাই ব্যাপক ভিত্তিতে গঠিত এক যুক্তফ্রন্ট এবং তাতে যোগ দেওয়ার জন্য সমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটাতে হবে। জাপ-প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন সুসংবদ্ধ একটি যুক্তফ্রন্ট এবং তার জন্য চাই একটি সাধারণ কর্মসূচী। সেই সাধারণ কর্মসূচীটি হবে যুক্তফ্রন্টের কর্মের নিশানা, সেটা রজ্জুর মতো সব সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে একসঙ্গে যুক্তফ্রন্টে বেঁধে রাখবে, বেঁধে রাখবে সব রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপগুলিকে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিবর্গ ও সামরিক বাহিনীসমূহকে। একমাত্র এই পদ্ধতিকেই আমরা দৃঢ় ঐক্যের পদ্ধতি বলতে পারি। জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলেই আমরা পুরানো বিধিনিয়ম প্রচলনের বিরোধিতা করি। আমরা প্রত্যাশায় থাকছি পুরানো বিধিনিয়মের পরিবর্তে নতুন বিধিনিয়ম প্রচলনের, অর্থাৎ

আমরা চাইছি সাধারণ একটি কর্মসূচীর ঘোষণা, চাইছি বিপ্লবী বিধিনিয়মের প্রতিষ্ঠা। প্রতিরোধ-যুদ্ধের সংগে আর কোন কিছুই সঙ্গতিপূর্ণ হবে না।

সাধারণ কর্মসূচীটি কি রকম হওয়া উচিত? এটি হওয়া উচিত ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন গণ-নীতি এবং জাপ-প্রতিরোধ ও জাতির রক্ষাকল্পে জাপপ্রতিরোধের দশ দফা কর্মসূচী[৮] যা এ বছরের ২৪শে আগস্টে কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাব করেছে।

কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতার ঘোষণায় কমিউনিস্ট পার্টি এ কথা বলেছে যে, 'ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন গণ-নীতি আজকের চীনের প্রয়োজন, এবং সে-কারণেই আমাদের পার্টি তাকে সম্পূর্ণ কার্যকরী করার জন্য প্রস্তুত।' কমিউনিস্ট পার্টি যে তিন গণ-নীতি কার্যকরী করতে চাইছে, এটা কারুর কারুর কাছে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে; যেমন সাংহাইয়ের চু চিঙ-লাই[৯] একটি স্থানীয় পত্রিকায় এই সন্দেহই প্রকাশ করেছেন। এইসব লোকের ধারণা আমাদের কমিউনিজম্ ও তিন গণ-নীতি অসঙ্গতিপূর্ণ। এটি পুরোপুরি একটি আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিপ্লবের ভবিষ্যৎ বিকাশের স্তরেই কমিউনিজমের প্রয়োগ হবে; বর্তমান স্তরে এটি কার্যকরী হতে পারবে এমন মোহ কমিউনিস্টদের নেই, বরং ইতিহাসের প্রয়োজনেই তারা জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট ও ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাব কমিউনিস্ট পার্টি কেন দিয়েছে তার মূল কথা এখানেই নিহিত রয়েছে। তিন গণ-নীতি প্রসঙ্গে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, দশ বছর আগে কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙ যৌথভাবে প্রথম দুই পার্টির যুক্তফ্রন্টে এটিকে কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, এবং সমস্ত বিশ্বস্ত কমিউনিস্ট ও সমস্ত বিশ্বস্ত কুওমিনতাঙের সভ্যবৃন্দ বহু গ্রামাঞ্চলে ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত এটি কার্যকরী করতে শুরুও করেছিলেন। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে, সেই যুক্তফ্রন্টটি ১৯২৭এ ভেঙে যায় এবং তার পরবর্তী দশ বছর ধরে কুওমিনতাঙ এই তিন গণ-নীতির প্রয়োগের বিরোধিতা করতে থাকে। কিন্তু কমিউনিস্টদের অনুসৃত এই দশ বছরের কর্মনীতি মূলতঃ ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তিন গণ-নীতি ও তিন মহান কৌশলকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এমন একটি দিনও যায়নি যখন কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম করেনি, এবং এর অর্থই হচ্ছে জাতীয়তাবাদী নীতির পূর্ণ প্রয়োগ; শ্রমিক কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব গণতন্ত্রের নীতির পূর্ণ প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়; কৃষি-বিপ্লব হচ্ছে জনগণের জীবিকা বিষয়ক নীতিটির পূর্ণ প্রয়োগ। তাহলে কেন কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করছে? কিছুদিন আগে আমরা এ কথা ব্যাখ্যা করেছি যে এগুলোর মধ্যে কোন ভুল ছিল বলে কমিউনিস্ট

পার্টি এসব বন্ধ করে দিচ্ছে—এ কথা ঠিক নয়, তারা এগুলো বন্ধ করছে এই কারণে যে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র আক্রমণ দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণী-সম্পর্কের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে, যার ফলে জাপসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত শ্রেণীগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা শুধু প্রয়োজনই হয়ে পড়েনি, তার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের জন্য ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট শুধুমাত্র চীন দেশেই নয়, সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রয়োজন ও সম্ভব। আমরা সে কারণেই চীন দেশে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা চাই। এই কারণেই আমরা শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের বদলে সমস্ত শ্রেণীর মৈত্রীর ভিত্তিতে সংগঠিত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাব দিয়েছি। কৃষি-বিপ্লব—'কৃষকের হাতে জমি দাও' নীতিকেই কার্যকরী করেছে, এবং এই নীতিটি ডঃ সান ইয়াৎ-সেনেরই প্রস্তাবিত। এটিকে আমরা আপাততঃ বন্ধ রাখছি এইজন্য যে, জাপ-সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যাপকতর সংখ্যায় ঐক্যবদ্ধ জনসমাবেশ ঘটাতে চাই। কিন্তু তার মানে কখনই এই নয় যে, চীনে ভূমি-সমস্যার সমাধান দরকার নেই। আমাদের কৌশল ও তার সময়ের পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা আমাদের বক্তব্য বহুবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি। মার্কসবাদী নীতির ওপর ভিত্তি করে চলে বলেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সবসময়েই কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট যুক্তফ্রন্টে উদ্ভাবিত তিন গণ-নীতির সাধারণ কর্মসূচীর প্রয়োগ ও বিকাশের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, দেশ যখন শক্তিশালী হানাদার দ্বারা আক্রান্ত এবং জাতি যখন সংকটের আবর্তে পড়েছে, পার্টি তখন জাতীয় ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের সময়োপযোগী প্রস্তাব দিয়েছে, এবং এ প্রস্তাবটিই হচ্ছে একমাত্র কর্মনীতি যার সাহায্যে দেশ রক্ষা পেতে পারবে। কমিউনিস্ট পার্টি অব্যাহত প্রয়াসে এটিকে কার্যকরী করতে চাইছে। প্রশ্নটি আর এখন এই নয় যে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবী তিন গণ-নীতিকে আস্থাশীল কিনা, বা তারা এটিকে কার্যকরী করবে কিনা, প্রশ্নটি হচ্ছে কুওমিনতাঙ তা করছে কিনা। বর্তমানে কর্তব্য হচ্ছে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী তিন গণ-নীতির ভাবধারাটিকে সমগ্র দেশব্যাপী পুনরুজ্জীবিত করে তোলা, এবং তারই ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও কৌশল নির্ধারণ করে আন্তরিকতার সংগে—আধা খেঁচড়া ভাবে নয়, সম্পূর্ণ উপলব্ধির সংগে—অসাবধানতাবশতঃ নয়, এবং দ্রুত—ধীরে সুস্থে নয়—তাকে কার্যকরী করতে নেমে পড়া। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দিনরাত আন্তরিকভাবে ঠিক এটাই চাইছে। এই কারণেই তারা লুকৌচিয়াও ঘটনার পরেপরেই জাপ-প্রতিরোধ ও জাতিকে রক্ষার জন্য দশ দফা কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছে। এই দশ দফা কর্মসূচীটি মার্কসবাদ ও সাচ্চা বিপ্লবী তিন গণ-নীতির সংগে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। এটি হচ্ছে প্রারম্ভিক কর্মসূচী, চীনা বিপ্লবের বর্তমান স্তরের কর্মসূচী, যে

স্তরটি হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবের স্তর ; এই কর্মসূচীটি কার্যকরী করার মধ্য দিয়েই চীনকে রক্ষা করা সম্ভব। এই কর্মসূচীর বিরোধী কাজে যে ব্যাপৃত থাকতে চাইবে, তার ওপরেই নেমে আসবে ইতিহাসের অমোঘ দণ্ড।

কুওমিনতাঙের সম্মতি ছাড়া সমগ্র দেশব্যাপী এই কর্মসূচী রূপায়িত করা সম্ভব নয়, কারণ চীনে কুওমিনতাঙ এখনো সব থেকে বড় পার্টি ও শাসক পার্টি। আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, কুওমিনতাঙের বুদ্ধিমান সভ্যবৃন্দ এই কর্মসূচীটির সঙ্গে একদিন একমত হবেন। কারণ তাঁরা যদি তা না হন, তবে তিন গণ-নীতি শুধু কথার কথাই হয়ে থাকবে, ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী ভাবধারার পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে না, জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিতও করা যাবে না, বিদেশী শক্তির কাছে চীনা জনসাধারণের ক্রীতদাস হওয়া ছাড়া কোন পথ থাকবে না। কুওমিনতাঙের সত্যিকারের বুদ্ধিমান সভ্যবৃন্দ নিশ্চয়ই তা চাইবেন না, এবং আমাদের দেশবাসীরাও কখনই ক্রীতদাসে পরিণত হতে চাইবেন না। তা ছাড়া ২৩শে সেপ্টেম্বরের বিবৃতিতে মিঃ চিয়াং কাই-শেক ঘোষণা করেছেন ঃ

আমি বিশ্বাস করি যে, যিনিই বিপ্লবের সপক্ষে, তিনিই তাঁর ব্যক্তিগত ঈর্ষা-ঘৃণা ও সংস্কার সব দূরে সরিয়ে রেখে তিন গণ-নীতি কার্যকরী করার কাজে নেমে পড়বেন। জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে আমরা গতস্য শোচনা নাস্তি—এই বাক্য গ্রহণ করে সমস্ত জাতিকে একসঙ্গে নিয়ে পুরোপুরি নতুনভাবে শুরু করব, কঠিন পরিশ্রম সহকারে জীবন ও জাতির রক্ষার প্রয়োজনে একতার জন্য সংগ্রাম করব।

কথাটি খুবই সত্য! বর্তমানের জরুরী কর্তব্য হচ্ছে তিন গণ-নীতিকে কার্যকরী করে তোলার জন্য সচেষ্ট হওয়া, ব্যক্তিগত ও উপদলীয় খেয়োখেয়ি পরিহার করা, পূর্বতন কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন করা, অবিলম্বে তিন গণ-নীতির সঙ্গে সুসংবদ্ধ একটি বিপ্লবী কর্মসূচী কার্যকরী করা এবং সমস্ত জাতিকে নিয়ে পুরোপুরি নতুনভাবে শুরু করা। এ কাজে যত দেরী হবে, ততই সব অনুতাপ নিস্ফল হয়ে যাবে।

কিন্তু তিন গণ-নীতি ও দশ দফা কর্মসূচী কার্যকরী করার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছে তা সম্পন্ন করার জন্য যথোপযুক্ত হাতিয়ারের প্রশ্নটি, যা সরকার ও সামরিক বাহিনীর সংস্কার সাধনের প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িত। বর্তমান সরকার হচ্ছে কুওমিনতাঙের একক পার্টি-ভিত্তিক একনায়কত্বের সরকার, জাতীয় গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের সরকার নয়। জাতীয় গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট সরকার ছাড়া তিন গণ-নীতি ও দশ দফা কর্মসূচী কার্যকরী করা সম্ভব নয় । কুওমিনতাঙের সামরিক বাহিনীর পদ্ধতিও এখনো পর্যন্ত সেই পুরানো পদ্ধতিই রয়েছে, এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে ঐ পুরানো ব্যবস্থায় সংগঠিত বাহিনী দিয়ে হারানো সম্ভব নয়। এখন পদাতিক বাহিনী প্রতিরোধে ব্যাপৃত আছে এবং তাদের সকলের প্রতি আমাদের আছে বিপুল প্রশংসা ও শ্রদ্ধা, বিশেষ

করে তাদের প্রতি যারা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছে। কিন্তু বিগত তিন মাসের প্রতিরোধ-যুদ্ধের শিক্ষা এ কথাই প্রমাণ করছে যে, কুওমিনতাঙের সামরিক বাহিনীর পদ্ধতির পরিবর্তন আশু প্রয়োজন, কারণ তা জাপ-হানাদারদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করার কর্তব্যের পক্ষে এবং সাফল্যের সঙ্গে তিন গণ-নীতির বিপ্লবী কর্মসূচীর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অযোগ্য। সামরিক অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যের একতার নীতি এবং জনসাধারণ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যের একতার নীতিই হবে এই পরিবর্তনের ভিত্তি। কুওমিনতাঙের বর্তমান প্রচলিত সামরিক ব্যবস্থা উভয়েরই মূলতঃ বিরোধিতা করে থাকে। তাদের বিশ্বস্ততা ও সাহস সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা সামরিক অফিসার ও সৈনিকদের সর্বস্ব পণের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে এবং সেই কারণে এর সংস্কারসাধনে অনতিবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া নিশ্চিতভাবেই প্রয়োজন। এ কথার অর্থ এই নয় যে, সামরিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাক; যুদ্ধ চলাকালীনও এ ব্যবস্থার সংস্কার চলতে পারে। সামরিক বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক ভাবধারা ও রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনাটাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় কর্তব্য। এর চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যাবে উত্তরাভিযানের সময় জাতীয় বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর পরিবর্তন সাধনের পদ্ধতির মধ্যে, যখন সাধারণভাবে সামরিক বাহিনীর অফিসারবৃন্দ ও সৈনিকদের মধ্যে এবং জনসাধারণ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে এই একতা গড়ে উঠেছিল; সেদিনের সেই ভাবধারার পুনরুজ্জীবন সুনিশ্চিতভাবেই প্রয়োজন। স্পেনের যুদ্ধ থেকে চীনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যেখানে প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রজাতন্ত্রী বাহিনী সংগঠিত হয়েছে। স্পেন থেকে চীনের অবস্থা অনেক ভাল, কিন্তু তার ব্যাপকভিত্তিক ও সুসংগঠিত যুক্তফ্রন্ট নেই, তার নেই যুক্তফ্রন্ট সরকার যা দিয়ে সম্পূর্ণ বিপ্লবী কর্মসূচী রূপায়িত হতে পারে, তার নেই নতুন পদ্ধতিতে সুসংগঠিত সামরিক বাহিনীও। এইসব ত্রুটি সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। সমগ্র যুদ্ধের বিচারে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত লালফৌজ বর্তমানে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করতে পারে বটে, কিন্তু ব্যাপক জাতীয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে পৌছে যাবার মতো ভূমিকা এখনো পর্যন্ত পালন করতে সে সক্ষম হয়নি। তবু এর রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংগঠনিক গুণগুলি সারা দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ বাহিনীগুলির কাছে সাদরে গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সৃষ্টির সময়ে লালফৌজের অবস্থা এমন ছিল না; এর মধ্যেও বহু সংস্কার হয়েছে, প্রধানতঃ এর ভিতর থেকে সামন্ততান্ত্রিক কার্যকলাপগুলিকে সমূলে উপড়ে ফেলে দিতে হয়েছে এবং অফিসার ও সৈন্যবাহিনীর লোকদের মধ্যে একতা এবং সামরিক বাহিনী ও জনগণের মধ্যে একতার নীতি প্রয়োগ করার মাধ্যমে এগোতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সামরিক বাহিনীগুলো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

শাসক কুওমিনতাঙ পার্টির জাপ-বিরোধী কমরেডরা! আজ আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার হাত থেকে জাতিকে বাঁচানোর মহান দায়িত্বের অংশীদার। আপনারা ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট তৈরী করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। আপনারা জাপানের বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন। এটাও খুব ভাল। কিন্তু আমরা আপনাদের পুরানো কায়দায় পরিচালিত অন্যান্য কাজকর্ম পছন্দ করছি না। যুক্তফ্রন্টের বিকাশ ও বিস্তার ঘটাতে হবে সবাই মিলে, জনগণকে তার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। যুক্তফ্রন্টকে সুদৃঢ় করা এবং তার কর্মসূচীকে রূপায়িত করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংস্কারসাধন অত্যন্ত জরুরী। সুনিশ্চিতভাবে নতুন সরকারের প্রয়োজন, এবং কেবলমাত্র তারই সাহায্যেই বিপ্লবী কর্মসূচী কার্যকরী করা যাবে এবং সামরিক বাহিনীর সংস্কার শুরু করা যাবে। আমাদের এই প্রস্তাব সময়োপযোগী। আমাদের পার্টির অনেকেই এখন এটিকে কর্মে রূপায়িত করার উপযোগী মনে করছেন। তাঁর সময়ে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন মনস্থির করে রাজনৈতিক ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংস্কারসাধন করেছিলেন এবং এভাবে ১৯২৪-২৭-এর বিপ্লবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ঐ জাতীয় সংস্কারের দায়দায়িত্ব আজ আবার আপনাদের কাঁধে এসে পড়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, কুওমিনতাঙ পার্টির কোন সাচ্চা ও দেশপ্রেমিক সত্যই এ কথা কিছুতেই বলতে পারবেন না যে, আমাদের প্রস্তাব সময়োপযোগী নয়। আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের প্রস্তাব বাস্তবের দাবি মেটাচ্ছে। আমাদের দেশের ভাগ্য আজ বিপর্যয়ের মুখে— কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি আরও ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হোক! আমাদের দেশবাসিগণ যাঁরা গোলাম বনতে চান না, তাঁরা কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট একতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হোন! চীনের বিপ্লবের আশু কর্তব্য হচ্ছে সর্বরকম প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করে সবরকম অসুবিধা দূর করা। এই কর্তব্যটি পালিত হলে আমরা সুনিশ্চিতভাবেহ জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে পরাভূত করতে পারব। যদি আমরা কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই, তবে সুনিশ্চিতভাবেই আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

টীকা

১। 'জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যসমূহ' প্রবন্ধের ('মাও সে-তুঙের নির্বাচিত রচনাবলী', ১ম খণ্ড, ইংরেজী সংস্করণ) ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২। প্রস্তাবটির জন্য উপরোক্ত প্রবন্ধেরই ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। খোলা তারবার্তার জন্য ঐ, ৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৪। চিঠির বিষয়বস্তুর জন্য 'চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি সম্পর্কে বক্তব্য' প্রবন্ধের জন্য (ঐ, ১ম খণ্ড) ৭নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৫। প্রস্তাবটির জন্য 'জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যসমূহ' প্রবন্ধের (ঐ, ১ম খণ্ড) ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। তারবার্তাটির জন্য ঐ, ৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৭। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনা প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তিটি ১৯৩৭ সালের ২১শে আগস্ট সম্পাদিত হয়।

৮। দশ দফা কর্মসূচীর জন্য বর্তমান খণ্ডেরই 'প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতির শক্তির সমাবেশের জন্য' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৯। চু চিং-লাই ছিল ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট পার্টির (প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার, আমলা ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের দ্বারা গঠিত একটি ক্ষুদ্র চক্র) একজন নেতা। পরবর্তীকালে সে বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চিং-ওয়েই'র সরকারের একজন সদস্য হয়।

ব্রিটিশ সাংবাদিক জেমস বার্ট্রামের সংগে সাক্ষাৎকার

২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৭

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রতিরোধ-যুদ্ধ

জেমস বার্ট্রাম ঃ চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হবার আগে ও পরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কি কি সুনির্দিষ্ট ঘোষণা করেছে?

মাও সে-তুঙ ঃ যুদ্ধ শুরু হবার আগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বারংবার সমগ্র দেশকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছে যে, জাপানের সংগে যুদ্ধ অনিবার্য, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের 'শান্তিপূর্ণ সমাধানের' সমস্ত কথাবার্তা এবং জাপানী কূটনীতিকদের যাবতীয় মধুর বুলি আসলে তাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতিকে ঢেকে রাখার আবরণ মাত্র। আমরা বারংবার গুরুত্ব দিয়ে এ কথা বলেছি যে, যুক্তফ্রন্টকে জোরদার করে না তুলতে পারলে এবং একটি বিপ্লবী কর্মনীতি গৃহীত না হলে বিজয়সূচক জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। এবং এই বিপ্লবী কর্মনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই হচ্ছে এই যে, জাপান-বিরোধী ফ্রন্টে সমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটাতে হলে চীন সরকারকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক সংস্কারসমূহ প্রবর্তন করতে হবে। যারা জাপানের 'শান্তির জন্য প্রতিশ্রুতি'তে বিশ্বাস স্থাপন করে যুদ্ধকে এড়ানো যাবে বলে ভেবেছে, বা যারা ব্যাপক জনগণের সমাবেশ না ঘটিয়েই জাপানী হানাদারদের প্রতিরোধ করার সম্ভাবনায় আস্থা স্থাপন করেছে, আমরা বারংবার তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছি। যুদ্ধের সূচনা এবং তার গতিধারা----উভয়ই আমাদের বক্তব্যের সঠিকতাকেই প্রমাণ করেছে। লুকৌচিয়াও ঘটনার পরের দিনই কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র জাতির প্রতি প্রচারিত একটি ইস্তাহারে সমস্ত রাজনৈতিক দল, গ্রুপ ও সমস্ত সামাজিক স্তরের মানুষের কাছে জাপানী আগ্রাসনের প্রতিরোধ এবং জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সাধারণ স্বার্থে সামিল হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। তার পরে পরেই আমরা জাপানকে প্রতিরোধ ও দেশকে বাঁচাবার জন্য একটি দশ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলাম, এবং তাতে প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীন সরকারের যেসব কর্মনীতি গ্রহণ করা উচিত, সেগুলো তুলে ধরেছিলাম। কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা কার্যকরী হবার সংগে সংগে আমরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রচার করি। এ সবকিছুই যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করে এবং বিপ্লবী নীতিকে কার্যকরী করে প্রতিরোধ-যুদ্ধ

চালিয়ে যাওয়ার নীতিতে আমাদের সুদৃঢ় আনুগত্যের প্রমাণ বহন করেছে। বর্তমান পর্যায়ে আমাদের মূল শ্লোগান হচ্ছে ঃ 'সমস্ত জাতি কর্তৃক সর্বাত্মক প্রতিরোধ।'

যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও তার শিক্ষা

প্রশ্ন ঃ আপনাদের বিচারে এখন পর্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল কি?

উত্তর ঃ দুটি প্রধান দিক আছে। একদিকে আমাদের শহরগুলি দখল করে, আমাদের অঞ্চলগুলি অধিকার করে, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন করে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে এবং নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা চীনা জনগণকে নিঃসন্দেহে জাতীয় পরাধীনতার এক বিপদের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ চীনা জনগণ এর ফলে এ বিষয়ে খুবই সচেতন হয়ে উঠেছেন যে, ব্যাপকতর ঐক্য এবং সমগ্র জাতির প্রতিরোধ ছাড়া এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। একই সময়ে, বিশ্বের শান্তিকামী দেশগুলিও জাপানী বিপদকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে। এখনো পর্যন্ত এই হচ্ছে যুদ্ধের ফল।

প্রশ্ন ঃ জাপানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? এবং সে-বিষয়ে তারা কতটা সাফল্যলাভ করেছে?

উত্তর ঃ জাপানের পরিকল্পনা হচ্ছে সর্বপ্রথম উত্তর চীন ও সাংহাই দখল করা, এবং তারপর চীনের অন্যান্য অঞ্চল দখল করা। জাপ-হানাদাররা তাদের পরিকল্পনার কিছুটা কার্যকরী করতে পেরেছে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা হোপেই, চাহার ও সুইয়ুয়ান প্রদেশ তিনটি দখল করে বসেছে, আর এখন শানসীকে বিপদের মুখোমুখি এনে ফেলেছে; এর কারণ হচ্ছে এই যে, এখনো পর্যন্ত চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধ প্রচেষ্টা সীমিত রাখা হয়েছে শুধু সরকার ও সেনাবাহিনীর মধ্যে। এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে জনগণ ও সরকার কর্তৃক সম্মিলিত প্রতিরোধ কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন ঃ আপনার মতে প্রতিরোধ-যুদ্ধে কী চীন কোন বিজয় অর্জন করেছে? যদি তা থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার থাকে, তবে সেগুলো কি?

উত্তর ঃ আমি এই প্রশ্নটি নিয়ে আপনার সঙ্গে বেশ খানিকটা বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই। সর্বপ্রথমে, সাফল্য অর্জিত হয়েছে, এবং তা বেশ বড় রকমেরই। নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো থেকেই সেগুলো ধরা পড়বে ঃ (১) সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে জাপানের বিরুদ্ধে বর্তমান প্রতিরোধ-যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয় কোন পরিস্থিতি এর আগে আর দেখা যায়নি। ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করলে, এই যুদ্ধই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশকে জড়িয়ে ফেলেছে। এ যুদ্ধের

চরিত্র হচ্ছে বিপ্লবী। (২) এই যুদ্ধ একটি অনৈক্যে ভরা দেশকে তুলনামূলকভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করেছে। এবং এই ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা। (৩) বিশ্বের জনমতের সহানুভূতি রয়েছে এই যুদ্ধের প্রতি। প্রতিরোধ না করার জন্য যারা চীনকে এককালে তাচ্ছিল্য করত, প্রতিরোধ করছে বলে তারাই আজ চীনকে সম্মান জানাচ্ছে। (৪) এই যুদ্ধ জাপানী আগ্রাসীদের বিপুল ক্ষতিসাধন করছে। সংবাদে প্রকাশ, দৈনিক দু' কোটি ইয়েন করে তাদের ব্যয় হচ্ছে এবং তাদের হতাহতের সংখ্যা নিঃসন্দেহে খুবই বেশি, যদিও এ সম্বন্ধে এখনো কোন সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। জাপানী আগ্রাসীরা যদিও উত্তর-পূর্বের চারটি প্রদেশ অনায়াসে এবং প্রায় বিনা পরিশ্রমেই দখল করতে পেরেছিল, কিন্তু এখন আর তারা রক্তাক্ত যুদ্ধ ছাড়া চীনা ভূখণ্ড দখল করতে পারছে না। আগ্রাসীরা চীনের অভ্যন্তরে নিজেদের স্থান করে নিতে পারবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু চীনের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ জাপ-সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসই এনে দেবে। সুতরাং চীন শুধু তাকে রক্ষা করার জন্যই সংগ্রাম করছে না, উপরন্তু বিশ্ব-ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে তার মহান কর্তব্য পালনের জন্যও সংগ্রাম করছে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিপ্লবী চরিত্র খুবই সুস্পষ্ট। (৫) আমরা যুদ্ধ থেকে কিছু কিছু শিক্ষা পেয়েছি। তার জন্য দাম হিসেবে আমাদের দিতে হয়েছে জমি ও রক্ত।

যেসব শিক্ষা আমরা পেয়েছি, সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক মাসের যুদ্ধে চীনের অনেকগুলি দুর্বলতা ধরা পড়েছে। সর্বোপরি এগুলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট। যদিও ভৌগোলিকভাবে যুদ্ধ সমগ্র দেশকে জড়িয়ে ফেলেছে, কিন্তু সমগ্র জাতি যুদ্ধ করছে না। অতীতের মতো বর্তমানেও ব্যাপক জনতার যুদ্ধে অংশ নেবার ব্যাপারে সরকার বাধানিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়েছে, কাজেই যুদ্ধ এখনো গণ-চরিত্র গ্রহণ করেনি। যতদিন পর্যন্ত এ যুদ্ধ গণ-চরিত্র না পাবে, ততদিন পর্যন্ত জাপ-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন সম্ভব হবে না। কিছু কিছু লোক বলে ঃ 'এই যুদ্ধ এর মধ্যেই সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত হয়ে গেছে।' কিন্তু দেশের ব্যাপক অংশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে—এই অর্থেই কেবল কথাটি সত্য। অংশগ্রহণের বিচারে এটা এখনো আংশিক যুদ্ধ, কারণ কেবলমাত্র সরকার ও সেনাবাহিনীই যুদ্ধ করছে, জনগণ যুদ্ধ করছে না। বিশাল অঞ্চল যে হারাতে হচ্ছে এবং বিগত কয়েক মাসে যে বড় বড় সামরিক পরাজয় ঘটেছে তার প্রধান কারণ বিশেষ করে এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। সুতরাং যদিও বর্তমানের সশস্ত্র প্রতিরোধের চরিত্র বিপ্লবী, কিন্তু তবুও এর বিপ্লবী চরিত্রটি অসম্পূর্ণ, কারণ এ যুদ্ধ এখনো গণ-চরিত্রের রূপ গ্রহণ করেনি। এক্ষেত্রেও ঐক্যের সমস্যাটি রয়ে গেছে। যদিও, অতীতের তুলনায় রাজনৈতিক পার্টি এবং গ্রুপগুলি আপেক্ষিকভাবে

ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই ঐক্য এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছে। রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকাংশই এখনো ছাড়া পায়নি এবং রাজনৈতিক পার্টিগুলির ওপর থেকে এখনো পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়া হয়নি। এখনো পর্যন্ত সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে, সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে, অফিসার এবং সৈন্যদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই খারাপ এবং এ ক্ষেত্রে ঐক্যের বদলে বিচ্ছিন্নতাই দেখা যায়। এটা একটা মৌলিক সমস্যা। যদি এর সমাধান না করা হয় তবে বিজয় অর্জনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ ছাড়া, আমাদের হতাহতের ও ক্ষয়ক্ষতির একটি বড় কারণ হচ্ছে সামরিক ভুল-ভ্রান্তি। যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছে তার অধিকাংশই হয়েছে নিষ্ক্রিয় যুদ্ধ, অথবা সামরিক ভাষায় বলা যায়, 'বিশুদ্ধ আত্মরক্ষার' যুদ্ধ। এভাবে যুদ্ধ করে আমরা কোনদিনও জয়লাভ করতে পারি না। বিজয় অর্জনের জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক এই উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমানে প্রচলিত নীতির মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এই শিক্ষাগুলিই আমরা পেয়েছি।

প্রশ্ন ঃ তবে, রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে অবশ্যকরণীয় পূর্ব শর্তগুলি কি কি?

উত্তর ঃ রাজনৈতিক দিক দিয়ে, প্রথমতঃ, বর্তমান সরকারকে অবশ্যই যুক্তফ্রন্ট সরকারে পরিবর্তিত হতে হবে, যে সরকারে জনগণের প্রতিনিধিরা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারবে। এই সরকারকে একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত সরকার হতে হবে। এই সরকার প্রয়োজনীয় বিপ্লবী কর্মনীতিগুলি কার্যকরী করবে। দ্বিতীয়তঃ, জনগণকে মতামত প্রকাশের, পত্রপত্রিকা প্রকাশের ও সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা দিতে হবে এবং জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র গ্রহণের অধিকার দিতে হবে, যাতে করে এই যুদ্ধ গণ-চরিত্র অর্জন করতে পারে। তৃতীয়তঃ, অত্যধিক ট্যাক্স ও বিভিন্ন প্রকার লেভি আদায় বন্ধ করে, খাজনা ও সুদ কমিয়ে, শ্রমিক, নিম্নপদস্থ কর্মচারী এবং সৈন্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে জাপানীদের বিরুদ্ধে যেসব সৈন্যরা যুদ্ধ করছে তাদের পরিবারদের অবস্থার উন্নতিসাধন করে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও যুদ্ধে বিপর্যস্ত বাস্তুহারাদের সাহায্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করে অবশ্যই জনগণের জীবনধারণের মানোন্নয়ন করতে হবে। সরকারী রাজস্ব ব্যয়ের নীতির ভিত্তি হবে অর্থনৈতিক চাপের সমহারে বন্টননীতি, অর্থাৎ যার টাকা আছে তাকে টাকা দিতে হবে। চতুর্থতঃ, একটি ইতিবাচক বৈদেশিক নীতি থাকতে হবে। পঞ্চমতঃ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে নীতির পরিবর্তন করতে হবে। ষষ্ঠতঃ, বিশ্বাসঘাতকদের কঠোরভাবে দমন করতে হবে। এই সমস্যাটি খুবই গুরুতর হয়ে উঠেছে। বিশ্বাসঘাতকরা মরিয়া হয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। যুদ্ধক্ষেত্রে

তারা শত্রুদের সাহায্য করছে; পশ্চাদ্দেশে তারা গোলযোগের সৃষ্টি করছে, এবং এদের মধ্যে কিছু লোক আবার জাপ-বিরোধী সেজেছে এবং দেশপ্রেমিকদের বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করে গ্রেপ্তারও করিয়ে দিচ্ছে। যখন জনগণ সরকারের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সহযোগিতা করতে পারবে, একমাত্র তখনই কার্যকরীভাবে বিশ্বাসঘাতকদের দমন করা সম্ভব হবে। সামরিক দিকে সুষ্ঠু সংস্কার প্রয়োজন, এবং এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রণনীতি ও রণকৌশলকে বিশুদ্ধ আত্মরক্ষার নীতি থেকে সক্রিয় আক্রমণের নীতিতে পরিবর্তিত করা; পুরানো ধাঁচের সেনাবাহিনীকে নতুন ধাঁচের সেনাবাহিনীতে ঢেলে সাজানো; জোর করে সৈন্যদলে ভর্তি করানোর পদ্ধতির বদলে জনগণকে যুদ্ধে যাবার জন্য সচেতন করে তুলবার পদ্ধতি গ্রহণ করা; বিভক্ত সামরিক নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধন করে ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব প্রবর্তন করা; সেনাবাহিনীকে যা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সেই শৃংখলাহীনতার বদলে সচেতন শৃংখলার প্রবর্তন করা, যা সামান্যতম জনস্বার্থবিরোধী কাজও করতে দেবে না; বর্তমান অবস্থায় কেবলমাত্র নিয়মিত বাহিনীই যুদ্ধ করছে—এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে জনগণের দ্বারা ব্যাপক গেরিলাযুদ্ধের বিকাশ ঘটিয়ে নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই রাজনৈতিক ও সামরিক পূর্বশর্তগুলি আমাদের প্রকাশিত দশ দফা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর সবগুলিই ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের তিন গণ-নীতি, তিন মহান নীতি এবং তার শেষ ইচ্ছাপত্রের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সবগুলি কার্যকরী করেই কেবল যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ঃ এই কর্মসূচী কার্যকরী করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি কি করছে?

উত্তর ঃ আমরা অক্লান্তভাবে পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার কাজকে, এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে প্রসারিত ও সুসংহত করে তোলার, সমস্ত শক্তির সমাবেশ ঘটাবার এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে কুওমিনতাঙ ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক পার্টি ও গ্রুপের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে আমাদের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছি। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের পরিসর এখনো পর্যন্ত খুবই সীমাবদ্ধ, তাকে আরও ব্যাপকতর করে তোলা প্রয়োজন, অর্থাৎ ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রে যে 'জনগণকে সচেতন করে তোলার' কথা বলা হয়েছিল, সেটা করা দরকার, এবং একেবারে নীচুস্তর থেকে যুক্তফ্রন্টে যোগদানের জন্য জনগণের সমাবেশ ঘটানো দরকার। যুক্তফ্রন্টকে সুসংহত করে তোলার অর্থ হচ্ছে এমন একটি সাধারণ কর্মসূচীকে কার্যকরী করা, যা কাজের ক্ষেত্রে সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি এবং গ্রুপের কাছে বাধ্যতামূলক হবে। আমরা ডঃ সানের তিন গণ-নীতি, তিন মহান নীতি এবং তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রটি সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং

সমস্ত সামাজিক শ্রেণীর যুক্তফ্রন্টের সাধারণ কর্মসূচী হিসেবে মেনে নিতে রাজী আছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সব কয়টি রাজনৈতিক দল এটা মেনে নেয়নি, সর্বোপরি কুওমিনতাঙ দল, এই সর্বাত্মক কর্মসূচী সম্বন্ধে কোন ঘোষণা প্রকাশ করতে সম্মত হয়নি। ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের জাতীয়তাবাদের নীতি কুওমিনতাঙ কাজে প্রয়োগ করেছে কেবল আংশিকভাবে, যেমন, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর গণতন্ত্রের নীতি বা জনগণের জীবনযাত্রার নীতি মোটেই প্রয়োগ করা হয়নি, এবং তারই ফলে আজকের প্রতিরোধ-যুদ্ধে এই প্রচণ্ড সংকট দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন এরকম সংকটজনক হয়ে পড়েছে, তখন কুওমিনতাঙের উচিত পুরোপুরিভাবে জনগণের তিন গণ-নীতিকে কার্যকরী করা, না হলে পরে অনুতাপ করারও আর সময় থাকবে না। কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য হচ্ছে সোচ্চার হয়ে ওঠা এবং নিরলসভাবে ও ধৈর্যসহকারে যুক্তি দিয়ে এ সবকিছু কুওমিনতাঙ এবং সমগ্র জাতির কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝানো, যাতে করে সাচ্চা বিপ্লবী তিন গণ-নীতি, তিন মহান নীতি এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রটি সম্পূর্ণতঃ এবং পুংখানুপুংখভাবে দেশব্যাপী কার্যকরী করা হয় এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট সম্প্রসারিত ও সুসংহত হয়ে ওঠে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধে অষ্টম রুট বাহিনী

প্রশ্ন ঃ আমাকে অষ্টম রুট বাহিনী সম্পর্কে বলুন, বহুলোক এ বিষয়ে আগ্রহী— যেমন এর রণনীতি, রণকৌশল, রাজনৈতিক কাজ এবং অন্যান্য বহু বিষয় সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী।

উত্তর ঃ বস্তুতঃ যখন লালফৌজের নাম পাল্টে নতুন নাম হল অষ্টম রুট বাহিনী এবং যখন এই বাহিনী যুদ্ধে চলে গেল, তখন থেকেই বিপুল সংখ্যক লোক এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। আমি এখন আপনাকে একটা সাধারণ ধারণা দেব।

প্রথমে, এর রণক্ষেত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে। রণনীতিগতভাবে অষ্টম রুট বাহিনী শানসিকে কেন্দ্র করে আছে। আপনি জানেন, এ বাহিনী বহু বিজয় অর্জন করেছে। পিংসিংকুয়ানের খণ্ডযুদ্ধ, চিংপিং, পিংলু এবং নিংও পুনর্দখল, লেইয়ুয়ান এবং কুয়াংলিং পুনরধিকার, চিকুয়ান অধিকার, জাপানী সেনাবাহিনীর তিনটি প্রধান সরবরাহ পথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (তাতুং এবং ইয়েনমেনকুয়ান, ওয়েইসিয়েন এবং পিংসিংকুয়ান শৌসিয়েন ও নিংগুর মধ্যে), ইয়েনমেনকুয়ানের দক্ষিণে জাপ-বাহিনীর পশ্চাদ্দেশে আক্রমণ, পিংসিংকুয়ান এবং ইয়েনমেনকুয়ানকে দু'বার করে পুনরধিকার এবং সম্প্রতি আবার চুয়াং ও তাংসিয়েন অধিকার প্রভৃতি হচ্ছে এর

উদাহরণ। শানসিতে জাপ-সেনাবাহিনী অষ্টম রুট বাহিনী এবং অন্যান্য চীনা বাহিনী কর্তৃক রণনীতিগতভাবে পরিবেষ্টিত হচ্ছে। আমরা সুনিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, উত্তর চীনে জাপ-বাহিনী প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। শানসিকে তারা গায়ের জোরে দখল করতে গেলে সুনিশ্চিতভাবেই তারা অভূতপূর্ব অসুবিধার সম্মুখীন হবে।

এরপর রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে। অন্যান্য চীনা বাহিনী যা করেনি আমরা তাই করছি। অর্থাৎ প্রধানতঃ শত্রুর পার্শ্বদেশে এবং পশ্চাদ্দেশে আমরা যুদ্ধ করছি। যুদ্ধের এই পদ্ধতিটি বিশুদ্ধ মুখোমুখি প্রতিরক্ষার পদ্ধতি থেকে অনেক স্বতন্ত্র। আমরা আমাদের বাহিনীর একাংশকে মুখোমুখি যুদ্ধে নিয়োগ করার বিরোধী নই, কারণ তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাহিনীর প্রধান অংশকে অবশ্যই শত্রুর পার্শ্বদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে এবং নিজেদের হাতে উদ্যোগ রেখে স্বাধীনভাবে শত্রুকে আক্রমণ করতে হলে পরিবেষ্টন ও পার্শ্বদেশ অতিক্রম করার কৌশল গ্রহণ করাটা একান্তভাবেই প্রয়োজন। কারণ সেটাই হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি যা দিয়ে তার শক্তিকে ধ্বংস করা এবং আমাদের শক্তিকে রক্ষা করা যায়। উপরন্তু, আমাদের বাহিনীর কিছু সশস্ত্র শক্তিকে শত্রুর পশ্চাদ্দেশে নিয়োজিত করা বিশেষভাবে কার্যকরী, কারণ তারা শত্রুর সরবরাহ পথ এবং ঘাঁটি তছনছ করে দিতে পারে। এমনকি মুখোমুখি যুদ্ধের বাহিনীকেও প্রধানতঃ 'প্রতি-আক্রমণের' ওপর আস্থা স্থাপন করা উচিত, বিশুদ্ধ প্রতিরক্ষার কৌশলের ওপর নয়। বিগত কয়েক মাসে যেসব সামরিক বিপর্যয় হয়েছে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যুদ্ধের অনুপযোগী পদ্ধতির ব্যবহার, অষ্টম রুট বাহিনী যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে তাকে আমরা নিজ হাতে উদ্যোগ বজায় রেখে স্বাধীনভাবে গেরিলা এবং চলমান যুদ্ধের প্রয়োগ বলে থাকি। নীতির দিক থেকে গৃহযুদ্ধের সময়ে অনুসৃত পদ্ধতির সংগে এ পদ্ধতি মূলতঃ অভিন্ন, কিন্তু কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান স্তরে, ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগে এবং পার্শ্বদেশে আচমকা আক্রমণকে সহজতর করার জন্য আমরা আমাদের শক্তিকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করার বদলে বেশি বিভক্ত করে দিই। যেহেতু সামগ্রিকভাবে দেশের সশস্ত্র বাহিনী সংখ্যার দিক থেকে শক্তিশালী, তাই তার কিছু মুখোমুখি প্রতিরক্ষার জন্য, আর কিছু গেরিলাযুদ্ধের জন্য ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু প্রধান বাহিনীকে সব সময়ই শত্রুর পার্শ্বদেশে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। যুদ্ধের প্রথম মূল কথাই হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা, এবং শত্রুকে ধ্বংস করা, এবং এই উদ্দেশ্যেই আমাদের নিজ হাতে উদ্যোগ রেখে স্বাধীনভাবে গেরিলা এবং চলমান যুদ্ধ পরিচালনা করা প্রয়োজন এবং সর্বপ্রকারের নিষ্ক্রিয় ও অনমনীয় কৌশল বর্জন করা প্রয়োজন। যদি বিপুল সংখ্যক সৈন্য অষ্টম রুট বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে

চলমান যুদ্ধ চালায় এবং গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করে, তবে আমাদের জয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে।

এরপর রাজনৈতিক কাজ সম্পর্কে। অষ্টম রুট বাহিনীর আর একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্যের দিক হচ্ছে এর রাজনৈতিক কাজ, যা তিনটি মূল নীতি দ্বারা পরিচালিত। প্রথমতঃ, অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে ঐক্যের নীতি, যার অর্থ হচ্ছে সেনাবাহিনীর ভেতর থেকে সামন্তযুগীয় অভ্যাস আচরণগুলো নির্মূল করা, মারধোর এবং গালাগাল নিষিদ্ধ করা, সচেতন শৃংখলা গড়ে তোলা এবং সুখ-দুঃখ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া—যার ফলে গোটা সেনাবাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে ঐক্যের নীতি, যার অর্থ হচ্ছে এমন শৃংখলা রক্ষা করা, যাতে জনস্বার্থের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করা নিষিদ্ধ, জনগণের মধ্যে প্রচারকার্য চালানো, তাদের সংগঠিত করা ও সশস্ত্র করা, তাদের আর্থিক দুর্গতিকে কমিয়ে দেওয়া, এবং যেসব বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুদের সহযোগী সেনাবাহিনী ও জনগণের ক্ষতিসাধন করে, তাদের দমন করা। এসবের ফলে সেনাবাহিনী এবং জনগণ ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সর্বত্রই তাদের স্বাগত জানানো হয়। তৃতীয়তঃ, শত্রুবাহিনীকে তছনছ করে দেওয়া এবং যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণের নীতি। আমাদের বিজয় আমাদের সামরিক কার্যকলাপের ওপরই নির্ভর করে না, উপরন্তু শত্রুবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার ওপরও নির্ভর করে। যদিও শত্রুবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া এবং যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করার ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য কোন ফল এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, কিন্তু ভবিষ্যতে সুনিশ্চিতভাবেই তা পাওয়া যাবে। উপরন্তু অষ্টম রুট বাহিনী গায়ের জোরে তার শক্তি বৃদ্ধি করে না, বরং তিনটি নীতির দ্বিতীয়টির সঙ্গে সংগতি রেখে জনগণকে সচেতন করে তোলার অধিকতর কার্যকরী পদ্ধতির মধ্য দিয়েই যুদ্ধে স্বেচ্ছাসৈনিক পাঠাতে পারে।

যদিও হোপেই, চাহার, সুইয়ুয়ান এবং শানসির একাংশ আমরা হারিয়েছি, তাই বলে আমরা মোটেও হতাশ হইনি, বরং আমরা দৃঢ়ভাবে সমগ্র বাহিনীকে বন্ধুত্বপূর্ণ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তোলার আহ্বান দিয়েছি এবং সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে শানসি রক্ষা করা ও হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য আহ্বান জানিয়েছি। অষ্টম রুট বাহিনী শানসির প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যান্য চীনা সেনাবাহিনীর কাজের সঙ্গে তার কাজের সমন্বয় করবে। সামগ্রিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে উত্তর চীনের যুদ্ধের ক্ষেত্রে এর ফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

প্রশ্ন ঃ অষ্টম রুট বাহিনীর এইসব ভাল ভাল গুণগুলি কি চীনের অন্যান্য সেনাবাহিনী অর্জন করতে পারে? এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই তারা পারে। ১৯২৪-২৭সালে কুওমিনতাঙ বাহিনীর মনোভাব সাধারণভাবে আজকের অষ্টম রুট বাহিনীর মনোভাবেরই মতো ছিল। তখন কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙ নতুন ধাঁচের সশস্ত্র বাহিনী সংগঠিত করার কাজে সহযোগিতা করেছিল এবং মাত্র দুটি রেজিমেন্ট নিয়ে শুরু করে তাদের চারিপাশে অনেক সেনাবাহিনী জড়ো করেছিল এবং চেন চিউং-মিঙকে পরাজিত করে তাদের প্রথম বিজয় অর্জন করেছিল। পরবর্তীকালে এই বাহিনীগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হয় এবং আরও সৈন্য তাদের প্রভাবাধীনে আসে ; তার পরেই কেবল উত্তরের অভিযান শুরু হয়। এই বাহিনীগুলোর মধ্যে একটা তাজা মনোভাব বিরাজ করত, সামগ্রিকভাবে অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে এবং সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে ঐক্য ছিল এবং সেনাবাহিনী বিপ্লবী জঙ্গী মনোভাবে ভরপুর ছিল। পার্টি প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক বিভাগের প্রবর্তন চীনে সর্বপ্রথম গৃহীত হওয়ায় এইসব সশস্ত্র বাহিনীর গোটা চেহারাটাই পাল্‌টে গিয়েছিল। ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত লালফৌজের এই ব্যবস্থাকেই আজকের দিনের অষ্টম রুট বাহিনী উত্তরাধিকার রূপে পেয়েছে এবং তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী যুগের সশস্ত্র বাহিনী এই নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বভাবতঃই তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুদ্ধের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল. তারা নিষ্ক্রিয় এবং অনমনীয় পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেনি. উদ্যোগ নিয়ে সোৎসাহে আক্রমণ করার পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল এবং তারই ফলে তারা উত্তরের অভিযানে বিজয়ী হয়েছিল। আজকের দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন সেই ধরনের সেনাবাহিনীর। এরকম লাখ লাখ লোক থাকতেই হবে, এমন কোন কথা নেই ; এরকম কয়েক হাজার লোকের কেন্দ্রশক্তি নিয়েই আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পারি। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যে সাহসিক আত্মত্যাগ তারা করছে, তার জন্য সারা দেশের সেনাবাহিনীকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যেসব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়ে গেছে, তা থেকে অনেক শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ জাপানী সেনাবাহিনীর মধ্যে যেরকম শৃংখলা আছে, তাতে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আপনাদের ক্ষমাশীল ব্যবহারের নীতি কি অকার্যকরী বলে প্রমাণিত হবে না? যেমন ধরুন, বন্দীদেরকে আপনারা ছেড়ে দেবার পর জাপ-সামরিক আধিনায়কত্ব তাদের হত্যা করতে পারে, এবং সামগ্রিকভাবে জাপ-বাহিনী তখন আপনাদের নীতির অর্থ আর বুঝতেই পারবে না।

উত্তর ঃ তা অসম্ভব। যত বেশি তারা হত্যা করবে, ততই জাপানী সেনাবাহিনীর মধ্যে চীনা সেনাবাহিনীর প্রতি সহানুভূতি জেগে উঠবে। এ ঘটনা সাধারণ সৈন্যদের

কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। আমাদের এই নীতিতে আমরা তাই অবিচল থাকব। উদাহরণস্বরূপ, এমনকি যদি জাপ-সেনাবাহিনী অষ্টম রুট বাহিনীর বিরুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহারের ঘোষিত ইচ্ছাকে কার্যকরীও করে, তবুও আমরা আমাদের নীতির পরিবর্তন করব না। ধৃত জাপানী সৈন্যরা এবং জাপানী অধস্তন অফিসাররা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের প্রতি আমরা ভাল ব্যবহার করে যাব, আমরা তাদের অপমান বা গালাগাল করব না, বরং আমাদের দুই দেশের জনগণের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন—এ কথা বিশ্লেষণ করে তাদের বুঝিয়ে দেব, তারপর তাদের মুক্ত করে দেব। যারা ফিরে যেতে চাইব না, তারা অষ্টম রুট বাহিনীতে কাজ করতে পারে, যদি জাপ-বিরোধী যুদ্ধক্ষেত্রে কোন আন্তর্জাতিক বাহিনীর উদ্ভব হয় তারা তাতেও যোগদান করতে পারে এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধের মধ্যে আত্মসমর্পণবাদ

প্রশ্ন ঃ আমি শুনেছি, যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও জাপান সাংহাইতে শান্তির গুজব ছড়িয়ে চলেছে। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ তাদের পরিকল্পনার কিছুটা সাফল্যের পরেই তারা তিনটি উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আবার শান্তির বুলি আওড়াতে শুরু করেছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) যেসমস্ত জায়গা তারা দখল করেছে, সেগুলোকে ভবিষ্যতের আক্রমণাত্মক কাজে রণনীতিমূলক পা-রাখার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনে সেইসব অবস্থানকে সুসংহত করা ; (২) চীনের জাপ-বিরোধী ফ্রন্টে ভাঙন ধরানো ; এবং (৩) চীনের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থনের ফ্রন্টে ভাঙন সৃষ্টি করা। বর্তমান শান্তির গুজবটিকে বলা যেতে পারে ধোঁয়ার প্রথম বোমা। বিপদ হচ্ছে এই যে, চীনে কিছু দোদুল্যমান ব্যক্তি আছে যারা শত্রুর ছলাকলায় বিভ্রান্ত হবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে, এবং বিশ্বাসঘাতকরা ও শত্রুর সহযোগীরা এদের মধ্যেই কৌশলী অভিযান চালাচ্ছে এবং জাপানী আগ্রাসীদের কাছে চীনকে আত্মসমর্পণ করানোর চেষ্টায় সবরকমের গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ এই বিপদ, আপনার মতে, কোথায় নিয়ে যেতে পারে?

উত্তর ঃ এর বিকাশের কেবলমাত্র দুটি দিকই থাকতে পারে ঃ হয় চীনা জনগণ আত্মসমর্পণবাদকে জয় করবে, অথবা আত্মসমর্পণবাদ জয়ী হবে, এবং যার ফলে জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট ভেঙে যাবে এবং চীন এক বিশৃংখলার রাজ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ দুটির মধ্যে কোন্‌টির সম্ভাবনা বেশি?

উত্তর ঃ সমগ্র চীনা জনগণ চাইছেন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যেতে। শাসকশ্রেণীর একটি অংশ যদি আত্মসমর্পণের পথ গ্রহণ করে, তবে বাকি অংশ, যারা সুদৃঢ় থাকছে তারা নিশ্চয়ই এর বিরোধিতা করবে এবং জনগণের সঙ্গে এক হয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে। অবশ্য, চীনের জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের পক্ষে এটি হবে একটি খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আত্মসমর্পণবাদ গণ-সমর্থন লাভ করতে পারবে না, বরং জনগণ আত্মসমর্পণবাদকে জয় করবেন, যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন এবং বিজয় অর্জন করবেন।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু কিভাবে আত্মসমর্পণবাদকে জয় করা যাবে?

উত্তর ঃ প্রচারের মাধ্যমে, অর্থাৎ আত্মসমর্পণবাদের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করে, এবং কাজের মাধ্যমে, অর্থাৎ আত্মসমর্পণবাদী কার্যকলাপ থামাবার জন্য জনগণকে সংগঠিত করে। জাতীয় পরাজয়ের মনোভাবের বা জাতীয় নৈরাশ্যবাদের মনোভাবের মধ্যেই, অর্থাৎ যেহেতু কয়েকটি যুদ্ধে চীন পরাজিত হয়েছে সুতরাং চীনের আর প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই—এই মনোভাবের মধ্যেই আত্মসমর্পণবাদের মূল নিহিত আছে। এই নৈরাশ্যবাদীরা এ কথা উপলব্ধি করতে পারে না যে, পরাজয়ই সাফল্যের জন্ম দেয়, পরাজয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই ভবিষ্যৎ জয়ের ভিত্তি তৈরী হয়। তারা প্রতিরোধ-যুদ্ধে কেবল পরাজয়ই দেখে, কিন্তু সাফল্যগুলি দেখতে পায় না, এবং বিশেষ করে তারা এটা দেখতে পায় না যে আমাদের পরাজয়গুলির মধ্যেই সাফল্যের উপাদান রয়েছে, অথচ শত্রুর জয়ের মধ্যেই তাদের পরাজয়ের উপাদানগুলো আছে। আমরা জনগণকে যুদ্ধের বিজয়ের সম্ভাবনাগুলোকে দেখিয়ে দেব, তাদের এ কথা বুঝতে সাহায্য করব যে, আমাদের পরাজয় আর অসুবিধাগুলো হচ্ছে সাময়িক, সমস্ত বিপর্যয় সত্ত্বেও যত বেশি দিন ধরে আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারব চূড়ান্ত বিজয় ততই আমাদের করায়ত্ত হবে। গণভিত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে আত্মসমর্পণবাদীদের আর কোন ভাঁওতাবাজীর সুযোগই থাকবে না এবং জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট তাতে সুসংহতই হয়ে উঠবে ।

গণতন্ত্র এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধ

প্রশ্ন ঃ কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্মসূচীতে 'গণতন্ত্রের' কথা বলেছে। এই 'গণতন্ত্রের' অর্থ কি? 'যুদ্ধকালীন সরকারের' সংগে এটা কি বিরোধমূলক নয়?

উত্তর ঃ একেবারেই না। কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসেই 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের' শ্লোগান দিয়েছিল। রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিকভাবে এই শ্লোগানের অর্থ হচ্ছে ঃ (১) রাষ্ট্র ও সরকারের ক্ষমতা একটিমাত্র শ্রেণীর হাতে থাকবে না, বরং বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রু-সহযোগীদের বাদ দিয়ে সমস্ত জাপ-বিরোধী

শ্রেণীগুলির মৈত্রীর ভিত্তিতেই তা গঠিত হবে এবং তার মধ্যে শ্রমিক, কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের অন্যান্য অংশও অবশ্যই থাকবে। (২) এই সরকারের সাংগঠনিক রূপ হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, যা একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক এবং কেন্দ্রিকতা—এই দুই আপাতঃ বিপরীতের একটি সুনির্দিষ্ট রূপের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ। (৩) এই সরকার জনগণকে সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেবে, বিশেষ করে সংঘবদ্ধ হওয়ার ও শিক্ষা পাওয়ার স্বাধীনতা এবং আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র হওয়ার স্বাধীনতা। এই তিনটি দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কোনরকমেই যুদ্ধকালীন সরকারের সঙ্গে বিরোধমূলক নয়, বরং রাষ্ট্র ও সরকারের এই রূপটি প্রতিরোধ যুদ্ধের পক্ষে সহায়কই হবে।

প্রশ্ন ঃ 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' কি একটি স্ব-বিরোধী কথা নয়?

উত্তর ঃ আমরা কেবল কথাটিই দেখব না, বাস্তবতাকেও আমাদের দেখতে হবে। গণতন্ত্র আর কেন্দ্রিকতার মধ্যে কোন অনতিক্রম্য ব্যবধান নেই, চীনের জন্য এ দুটিই একান্ত প্রয়োজনীয়। একদিকে, আমরা যে সরকার চাই, তাকে জনগণের আশা-আকাঙ্খার সত্যিকারের প্রতিনিধি হতে হবে। দেশব্যাপী ব্যাপক জনগণের স্বাধীনতা থাকবে এবং এর নীতিকে প্রভাবান্বিত করার সমস্ত সুযোগ জনগণের থাকবে। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের অর্থ। অপরদিকে, প্রশাসন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণও প্রয়োজন এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার মাধ্যমে যখন নীতিসংক্রান্ত দাবিসমূহ তাদের নিজস্ব নির্বাচিত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, সরকারকে তখন তা কার্যকরী করতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে না যাচ্ছে, ততক্ষণ সাবলীলভাবেই এটা করা সম্ভবপর হবে। এই হচ্ছে কেন্দ্রিকতার অর্থ। কেবলমাত্র গণতান্ত্রিকতা গ্রহণ করেই একটি সরকার প্রকৃত শক্তিশালী হতে পারে এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধে চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারকে এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ এটা তো যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে, তাই না?

উত্তর ঃ বিগত দিনের কয়েকটি যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য নেই।

প্রশ্ন ঃ কোনওকালে এই ধরনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা কি ছিল?

উত্তর ঃ হাঁ, যুদ্ধকালীন সরকারের ব্যবস্থাকে সাধারণতঃ যুদ্ধের প্রকৃতি অনুসারে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি রূপ হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, আর অন্য রূপটি হচ্ছে চরম কেন্দ্রিকতা। প্রকৃতি অনুসারে ইতিহাসের সব যুদ্ধকেই দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ ন্যায় যুদ্ধ, আর অন্যায় যুদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, কম-বেশি বিশ বছর আগেকার ইউরোপের মহাযুদ্ধ ছিল অন্যায়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের সরকারগুলি সাম্রজ্যবাদের স্বার্থে যুদ্ধ করার জন্য জনগণকে

বাধ্য করেছে, সে কারণে সেগুলো জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছে এবং সেই অবস্থায় এক ধরনের সরকারের প্রয়োজন হয়েছে---যেমন ব্রিটেনের লয়েড জর্জ সরকার। লয়েড জর্জ ব্রিটিশ জনগণকে নিপীড়ন করেছে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে যেসব সংগঠন বা সমিতি জনমত ব্যক্ত করেছিল---সেগুলিকে বে-আইনী করে দিয়েছে। যদিও লোকসভা ছিল, সেটি ছিল বিশেষ একটি সাম্রাজ্যবাদী গ্রুপের যন্ত্র হয়ে, যে-লোকসভা যুদ্ধ বাজেটের ওপর শুধুমাত্র রবারস্ট্যাম্প দিত। যুদ্ধকালে জনগণ ও সরকারের মধ্যে ঐক্যের অনুপস্থিতিই চরম কেন্দ্রিকতার সরকারের---শুধুই কেন্দ্রিকতা এবং কোন গণতন্ত্র নয়—এরকম সরকারের উদ্ভব ঘটায়। কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে বিপ্লবী যুদ্ধও হয়েছে, যেমন ফরাসী দেশে, রাশিয়ায় এবং বর্তমানে স্পেনে। এ সমস্ত যুদ্ধে সরকার গণ-বিরোধিতার ভয় করে না, কারণ জনগণ নিজেই এই ধরনের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য উৎসুক ও আগ্রহী; জনগণকে ভয় করা দূরে থাক, এই সরকার তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলবারই চেষ্টা করে এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য উৎসাহিত করে তোলে, যাতে করে তারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করতে পারে। কারণ, এই সরকার জনগণের স্বেচ্ছামূলক সমর্থনের ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে। চীনের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জনগণের পূর্ণ সমর্থন আছে এবং তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া এ যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে না; সুতরাং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ১৯২৬-২৭ সালের উত্তরাভিমুখী অভিযানেও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মাধ্যমেই বিজয় অর্জিত হয়েছিল। সুতরাং এসব থেকে দেখা যাচ্ছে, যখন যুদ্ধের লক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবে জনগণের স্বার্থকেই প্রতিফলিত করে, তখন সরকার যত গণতান্ত্রিক হবে, ততই কার্যকরীভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। জনগণ যুদ্ধের বিরোধিতা করবে—এই ভয়ের কোন কারণ এরকম সরকারের নেই, বরং যুদ্ধে জনগণ যদি নিষ্ক্রিয় থাকে বা উদাসীন থাকে, তবেই এই সরকারের দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। যুদ্ধের প্রকৃতিই সরকার ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ককে নির্ধারিত করে দেয়—এবং এটাই হচ্ছে ইতিহাসের বিধান।

প্রশ্ন ঃ তাহলে এই ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপনারা কিভাবে অগ্রসর হতে চাইছেন?

উত্তর ঃ মূল প্রশ্ন হচ্ছে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সহযোগিতার প্রশ্ন।

প্রশ্ন ঃ কেন?

উত্তর ঃ বিগত পনের বছর পর্যন্ত কুওমিনতাঙ এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার সম্পর্কই চীনের রাজনীতিতে নির্ধারক বিষয় হয়ে আছে। দুই পার্টির সহযোগিতায়

১৯২৪-২৭ সালে প্রথম বিপ্লবের জয় হয়েছে। ১৯২৭ সালে দুই পার্টির মধ্যে ভাঙনের ফলেই বিগত দশ বছরের দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। ভাঙনের জন্য কিন্তু আমরা দায়ী ছিলাম না; আমরা কুওমিনতাঙের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে বাধ্য হয়েছিলাম এবং আমরা চীনের মুক্তির গৌরবজনক পতাকা উঁচুতে তুলে ধরেই রেখেছি। বর্তমানে তৃতীয় স্তর এসেছে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে দুই পার্টিকে পূর্ণভাবে সহযোগিতা করতে হবে। আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে অবশেষে একটি সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, উভয়পক্ষকে একটি সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। এবং এরকম কর্মসূচীর একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে সরকারের একটি নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

প্রশ্ন ঃ দুই পার্টির সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কিভাবে নতুন একটা সরকারী ব্যবস্থার প্রবর্তন হতে পারে?

উত্তর ঃ আমরা সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো এবং সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের প্রস্তাব করছি। বর্তমান জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য আমরা একটি অস্থায়ী জাতীয় পরিষদ আহ্বানের প্রস্তাব করি। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ১৯২৪ সালে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ঠিক সেরকমভাবে বিভিন্ন জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক পার্টিগুলি থেকে, জাপ-বিরোধী সেনাবাহিনী থেকে এবং জাপ-বিরোধী জনপ্রিয় এবং ব্যবসায়িক সংগঠনগুলি থেকে উপযুক্ত আনুপাতিক হারে পরিষদের প্রতিনিধি ঠিক করা হোক। এই পরিষদই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ সংগঠন হিসেবে কাজ করবে, জাতিকে রক্ষা করার নীতি নির্ধারণ করবে, একটি শাসনতান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করবে এবং একটি সরকার নির্বাচন করবে। আমরা মনে করি, প্রতিরোধ-যুদ্ধ একটি সংকটজনক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে এবং কর্তৃত্বসম্পন্ন জনগণের ইচ্ছায় প্রতিনিধিত্বকারী এরকম একটি জাতীয় পরিষদ অবিলম্বে আহ্বান করেই কেবল চীনের রাজনৈতিক জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে এবং বর্তমান সংকটকে জয় করা সম্ভব হবে। আমরা এই প্রস্তাব সম্পর্কে কুওমিনতাঙের সঙ্গে মত বিনিময় করছি এবং ঐক্যমত হতে পারব বলেই আশা করছি।

প্রশ্ন ঃ জাতীয় সরকার কি ঘোষণা করেনি যে, জাতীয় পরিষদ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ বাতিল করে ঠিক কাজই করা হয়েছে। যা বাতিল করা হয়েছে তা হচ্ছে সেই জাতীয় পরিষদ, কুওমিনতাঙরা যা আহ্বান করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল; কুওমিনতাঙের ঘোষণা অনুসারে, এর বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা থাকবে না এবং এর

নির্বাচনের পদ্ধতি জনমতের সম্পূর্ণ বিরোধী। সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের সংগে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা এই ধরনের জাতীয় পরিষদের বিরোধিতা করি। আমরা যে অস্থায়ী জাতীয় পরিষদের প্রস্তাব দিয়েছি, তা এই বাতিল হওয়া জাতীয় পরিষদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই ধরনের একটি অস্থায়ী জাতীয় পরিষদের আহ্বান নিঃসন্দেহে দেশব্যাপী এক নতুন উদ্যমের সঞ্চার করবে, সরকারী কাঠামো ও সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করবে, এবং সমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটাতে সাহায্য করবে। এর ওপরেই প্রতিরোধ-যুদ্ধের অনুকূলে অবস্থার দিক্‌পরিবর্তন নির্ভর করছে।

সাংহাই ও তাইয়ুয়ানের পতনের পর জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কর্তব্যসমূহ

১২ই নভেম্বর, ১৯৩৭

১। বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে আংশিক প্রতিরোধ-যুদ্ধ থেকে সর্বাত্মক প্রতিরোধ-যুদ্ধে উত্তরণের পরিস্থিতি

১। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে-কোন ধরনের প্রতিরোধ-যুদ্ধকেই, এমনকি আংশিক হলেও, আমরা সমর্থন করি। কারণ আংশিক প্রতিরোধ অ-প্রতিরোধ থেকে এক ধাপ অগ্রগতি, অন্ততঃ কিছু পরিমাণে এর চরিত্র বিপ্লবী এবং মাতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধ।

২। অবশ্য জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছাড়া শুধুমাত্র সরকারের আংশিক প্রতিরোধ অতি অবশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ কথা আমরা এর আগেই (এ বছর এপ্রিল মাসে ইয়েনানে পার্টি-কর্মীদের সভায়, মে মাসে পার্টির জাতীয় সম্মেলনে এবং আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর একটি প্রস্তাবে[১]) বলেছি। কারণ এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ অর্থে জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ নয়, জনযুদ্ধ নয়।

৩। আমরা সমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটে এমন এক যুদ্ধের, সম্পূর্ণ অর্থে জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের, অর্থাৎ সর্বাত্মক প্রতিরোধের সপক্ষে। কেননা, এরকম প্রতিরোধই হচ্ছে জনযুদ্ধ, যা মাতৃভূমি রক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

৪। যদিও কুওমিনতাঙ যার পক্ষে ওকালতি করছে সেই আংশিক প্রতিরোধ-যুদ্ধও জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ এবং অন্ততঃ কিছু পরিমাণে বিপ্লবী চরিত্রবিশিষ্ট, তবু এর বিপ্লবী চরিত্র মোটেই সম্পূর্ণ নয়। আংশিক প্রতিরোধ সুনিশ্চিতভাবেই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য, কখনই তা সাফল্যজনকভাবে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে পারে না।

এই রচনাটি ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে ইয়েনানে পার্টি-কর্মীদের এক সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ প্রদত্ত একটি রিপোর্টের রূপলেখা। পার্টির দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা সঙ্গে সঙ্গেই এর বিরোধিতা করে, এবং ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ বর্ধিত সভার আগে এই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে মূলগতভাবে দূর করে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

৫। এখানেই নিহিত রয়েছে প্রতিরোধ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান এবং কুওমিনতাঙের বর্তমান অবস্থানের মধ্যেকার নীতিগত পার্থক্য। যদি কমিউনিস্টরা এই নীতিগত পার্থক্য ভুলে যায়, তবে তারা প্রতিরোধ-যুদ্ধকে সঠিকভাবে পথ দেখাতে পারবে না, তারা কুওমিনতাঙের একদেশদর্শিতাকে জয় করতে সক্ষম হবে না, এবং তারা তাদের নীতি ত্যাগের দোষে অধঃপতিত হবে, তাদের পার্টিকে কুওমিনতাঙের পর্যায়ে নামিয়ে আনবে; এবং তা হবে জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের পবিত্র লক্ষ্যের বিরুদ্ধে এবং মাতৃভূমি রক্ষার বিরুদ্ধে অপরাধ।

৬। সম্পূর্ণ অর্থে জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধে—সর্বাত্মক প্রতিরোধ-যুদ্ধে—কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাপানকে প্রতিরোধ ও জাতিকে রক্ষা করার দশ দফা কর্মসূচীকে কার্যকরী করা একান্তভাবেই প্রয়োজন, এবং তার জন্য এমন একটি সরকার ও সেনাবাহিনী দরকার, যে সরকার এবং সেনাবাহিনী এই কর্মসূচীকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করবে।

৭। সাংহাই এবং তাইয়ুয়ানের পতনের পর পরিস্থিতিটি দাঁড়িয়েছে এরকম ঃ

(১) উত্তর চীনে যে নিয়মিত যুদ্ধের প্রধান ভূমিকা কুওমিনতাঙ নিয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং যে গেরিলাযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে, তাই এখন প্রধান হয়ে উঠেছে। কিয়াংসু এবং চেকিয়াং প্রদেশে জাপানী আগ্রাসীরা কুওমিনতাঙের যুদ্ধ-রেখা ভেদ করেছে এবং নানকিং ও ইয়াংসি উপত্যকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ কথা ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কুওমিনতাঙের এই আংশিক প্রতিরোধ বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

(২) তাদের নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের সরকার এই ইঙ্গিত দিয়েছে যে, তারা চীনকে সাহায্য করবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের মৌখিক সহানুভূতিই শুধু পাওয়া গেছে এবং কোনরকম বাস্তব সাহায্য পাওয়া যায়নি।

(৩) জার্মান ও ইতালীর ফ্যাসিস্টরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্যের জন্য সবকিছু করছে।

(৪) কুওমিনতাঙ তাদের এক-পার্টি একনায়কত্বের ও স্বৈরাচারী শাসনের যে-কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে এখনো পর্যন্ত অনিচ্ছুক, এবং এর মধ্য দিয়েই তারা আংশিক প্রতিরোধ করছে।

এই হচ্ছে অবস্থার একটি দিক।

অন্য দিকটি হচ্ছে এরকম ঃ

(১) কমিউনিস্ট পার্টির এবং অষ্টম রুট বাহিনীর রাজনৈতিক প্রভাব দ্রুত দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে এবং দেশব্যাপী তাদের 'জাতির রক্ষাকর্তা' বলে প্রশংসা করা হচ্ছে। সমগ্র দেশকে রক্ষার জন্য, জাপানী আগ্রাসীদের স্তব্ধ করে দেবার জন্য এবং কেন্দ্রীয় সমতল অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম দিকে তাদের আক্রমণে বাধা সৃষ্টির জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও অষ্টম রুট বাহিনী উত্তর চীনে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

(২) গণ-আন্দোলন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে।

(৩) জাতীয় বুর্জোয়ারা বামপন্থীদের দিকে ঝুঁকছে।

(৪) সংস্কারকামী শক্তিগুলি কুওমিনতাঙের মধ্যে জোরদার হচ্ছে।

(৫) জাপানের বিরোধিতা করা ও চীনকে সাহায্য করার আন্দোলন বিশ্বের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

(৬) সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে বাস্তব সাহায্য দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এই হচ্ছে অবস্থার আর একটি দিক।

৮। সুতরাং, বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে আংশিক প্রতিরোধ থেকে সর্বাত্মক প্রতিরোধে উত্তরণের পরিস্থিতি। আংশিক প্রতিরোধ যেখানে দীর্ঘ দিন টিকে থাকতে পারে না, সেখানে সর্বাত্মক প্রতিরোধ এখনো শুরুই হয়নি। একটি থেকে আর একটিতে উত্তরণ, এর মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান, তা বিপদের আশংকায় পূর্ণ।

৯। এই পর্যায়ে চীনের আংশিক প্রতিরোধ নীচের তিনটি দিকের মধ্যে যে-কোন একটি দিকে অগ্রসর হতে পারে ঃ

প্রথমটা, আংশিক প্রতিরোধের অবসান এবং সর্বাত্মক প্রতিরোধ কর্তৃক এর স্থান গ্রহণ। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এটার দাবি করে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কুওমিনতাঙ এখনো দ্বিধাগ্রস্ত।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে, সশস্ত্র প্রতিরোধের অবসান এবং আত্মসমর্পণ কর্তৃক-এর স্থান গ্রহণ। জাপানী আগ্রাসীরা, শত্রু-সহযোগীরা এবং জাপপন্থী লোকেরা এটাই চায়, কিন্তু চীনা জনগণের অধিকাংশই এর বিরোধিতা করে।

তৃতীয়টি হচ্ছে সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং আত্মসমর্পণের সহাবস্থান। জাপানী আগ্রাসী, তাদের সহযোগী এবং জাপপন্থী লোকদের দ্বারা চীনের জাপ-বিরোধী ফ্রন্টকে ভাঙার চক্রান্তের ফলে এটি হওয়া সম্ভব, দ্বিতীয় পথটি ব্যর্থ হলেই তারা এই পথটি গ্রহণ করবে। তারা এখন এই ধরনেরই কিছু একটা করার ষড়যন্ত্রে

লিপ্ত। বস্তুতঃ এই বিপদ খুবই বেশি।

১০। বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি আত্মসমর্পণবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধির পথে বাঁধার সৃষ্টি করছে এবং এগুলিই এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলি হচ্ছে ঃ চীনকে পদানত করার নীতিতে জাপানের অব্যাহত মনোভাব, যার ফলে যুদ্ধ করা ছাড়া চীনের আর কোন পথ থাকছে না ; কমিউনিস্ট পার্টি ও অষ্টম রুট বাহিনীর অস্তিত্ব ; চীনা জনগণের ইচ্ছা ; কুওমিনতাঙের অধিকাংশ সদস্যদের ইচ্ছা ; কুওমিনতাঙ আত্মসমর্পণ করলে তাদের স্বার্থের হানি হবে বলে ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের উদ্বেগ ; সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব এবং তার চীনকে সাহায্য করার নীতি; সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপরে চীনা জনগণের গভীর আস্থা (যার অবশ্যই ভিত্তি আছে)। এই সমস্ত ঘটনাবলীকে উপযুক্তভাবে এবং পারস্পরিক সমন্বয়সাধন করে প্রয়োগ করতে পারলে শুধুমাত্র আত্মসমর্পণবাদ এবং ভাঙনকেই যে জয় করা যাবে তা নয়, এমনকি আংশিক প্রতিরোধকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার পথের বাধাগুলোও দূর হয়ে যাবে।

১১। সুতরাং আংশিক প্রতিরোধ থেকে সর্বাত্মক প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার জন্য চেষ্টা করাটাই হচ্ছে সমস্ত চীনা কমিউনিস্টদের, কুওমিনতাঙের সমস্ত প্রগতিশীল সদস্যদের এবং সমগ্র চীনা জনগণের আশু সাধারণ কর্তব্য।

১২। চীনের জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ বর্তমানে এক প্রচণ্ড সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংকট দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, অথবা খুব তাড়াতাড়িই হয়তো এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা যেতে পারে। আভ্যন্তরীণভাবে, নির্ধারক বিষয়গুলি হচ্ছে কমিউনিস্ট-কুওমিনতাঙ সহযোগিতা, এবং এই সহযোগিতার ভিত্তিতে এবং শ্রমিক-কৃষক-জনগণের শক্তির ভিত্তিতে কুওমিনতাঙের নীতির পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নির্ধারক বিষয়টি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য।

১৩। কুওমিনতাঙের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক সংস্কার প্রয়োজন এবং সম্ভব।[২] তার প্রধান কারণ হচ্ছে জাপানী চাপ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তফ্রন্ট নীতি, চীনা জনগণের ইচ্ছা, এবং কুওমিনতাঙের মধ্যে নতুন শক্তির বিকাশ। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সরকার ও সেনাবাহিনীর সংস্কারের ভিত্তি হিসেবে কুওমিনতাঙের সংস্কারের জন্য কাজ করা। নিঃসন্দেহে এই সংস্কারসাধন কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সম্মতির ওপরেই নির্ভরশীল, আমরা শুধু পরামর্শই দিতে পারি।

১৪। সরকারের সংস্কারসাধন প্রয়োজন। আমরা একটি অস্থায়ী জাতীয় পরিষদ আহ্বানের প্রস্তাব দিয়েছি, যেটা এইভাবে প্রয়োজনীয় এবং সম্ভব। নিঃসন্দেহে এই সংস্কারও কুওমিনতাঙের সম্মতির ওপরেই নির্ভরশীল।

১৫। সেনাবাহিনীর সংস্কারের কাজের অর্থ হচ্ছে নতুন সেনাবাহিনী গঠন এবং পুরানো সেনাবাহিনীগুলির সংস্কারসাধন করা। যদি নতুন রাজনৈতিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ লোক নিয়ে আগামী ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলা যায়, তবে জাপ-বিরোধী যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে শুরু করবে। এ ধরনের সেনাবাহিনী সমস্ত পুরানো সেনাবাহিনীগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং তাদেরকে এরই চারিপাশে জড়ো করবে। এর ফলেই সৃষ্টি হবে প্রতিরোধ-যুদ্ধে রণনীতিগত প্রতি-আক্রমণের দিক্ পরিবর্তনের সামরিক ভিত্তি। এই সংস্কারের জন্যও কুওমিনতাঙের সম্মতির প্রয়োজন। এই সংস্কার চলাকালীন পরিস্থিতিতে অষ্টম রুট বাহিনীর কাজ হবে এক দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করা। এবং অষ্টম রুট বাহিনীকেও সম্প্রসারিত করতে হবে।

২। আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে পার্টির মধ্যে এবং দেশের সর্বত্র সংগ্রাম করতে হবে

পার্টির মধ্যে শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদের বিরোধিতা কর

১৬। ১৯২৭ সালে চেন তু-শিউ'র আত্মসমর্পণবাদের ফলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল। আমাদের পার্টির কোন সদস্যেরই এই রক্তে লেখা ঐতিহাসিক শিক্ষাকে কখনো ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।

১৭। পার্টির জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের লাইন সম্পর্কে লুকৌচিয়াও ঘটনার আগে পর্যন্ত পার্টির মধ্যে প্রধান বিপদ ছিল 'বাম' সুবিধাবাদ, অর্থাৎ, রুদ্ধদ্বারনীতি, এবং তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, কুওমিনতাঙ তখনো পর্যন্ত জাপানকে প্রতিরোধ করা শুরু করেনি।

১৮। লুকৌচিয়াও ঘটনার পর থেকে পার্টির মধ্যে 'বাম' রুদ্ধদ্বারনীতি আর প্রধান বিপদ নয়, বরং এখন তা হচ্ছে দক্ষিণ সুবিধাবাদ, অর্থাৎ আত্মসমর্পণবাদ, এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, কুওমিনতাঙ প্রতিরোধ করা শুরু করেছে।

১৯। ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসে ইয়েনানে পার্টি-কর্মীদের সভায়, তারপর মে মাসে পার্টির জাতীয় সম্মেলনে, এবং বিশেষ করে আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয়

কমিটির পলিটব্যুরোর সভায় (লোচুয়ান সভায়) আমরা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত করেছিলাম ঃ যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সর্বহারাশ্রেণী কি বুর্জোয়াদের পরিচালিত করবে, না বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বহারাদের পরিচালিত করবে ? কুওমিনতাঙকে কি কমিউনিস্ট পার্টির দিকে টেনে আনা হবে, না কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙের দিকে ঝুঁকবে? বর্তমান পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্তব্যের দিক থেকে এই প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে ঃ জাপানকে প্রতিরোধের জন্য এবং দেশকে বাঁচানোর জন্য কুওমিনতাঙকে কি কমিউনিস্ট পার্টি যার পক্ষে কথা বলছে সেই দশ দফা কর্মসূচীর পর্যায়ে, সর্বাত্মক প্রতিরোধের পর্যায়ে উন্নীত করা হবে? না কমিউনিস্ট পার্টি জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণীর কুওমিনতাঙ একনায়কত্বের পর্যায়ে, আংশিক প্রতিরোধের পর্যায়ে অধঃপতিত হবে?

২০। কেন আমরা এই প্রশ্নটিকে এমন সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করছি ? তার উত্তর হচ্ছে ঃ

একদিকে, আমরা দেখছি চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে আপোষের প্রবণতা আছে ; কুওমিনতাঙের বৈষয়িক শক্তির প্রাধান্য ; কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণাসমূহ, যে সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি কুৎসা ছড়িয়েছে ও অপমান করেছে এবং 'শ্রেণী-সংগ্রামের অবসান' ঘটাবার জন্য হৈ-চৈ করেছে ; 'কমিউনিস্ট পার্টির আত্মসমর্পণে' কুওমিনতাঙের আগ্রহ এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের ব্যাপক প্রচার; কমিউনিস্ট পার্টিকে তার অধীনে রাখার জন্য চিয়াং কাই-শেকের প্রচেষ্টা; লালফৌজের ও জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি অঞ্চলের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ও দুর্বল করার কুওমিনতাঙী নীতি ; জুলাই মাসে কুওমিনতাঙের লুশান প্রশিক্ষণ পাঠক্রম[৩] চলাকালীন 'প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিকে পাঁচ ভাগের দু'ভাগে কমিয়ে আনার' ষড়যন্ত্র ; কমিউনিস্ট কর্মীদেরকে খ্যাতি ও টাকা-পয়সা, মদ ও মেয়েমানুষ দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুওমিনতাঙের প্রচেষ্টা ; জনা কয়েক পেটি-বুর্জোয়া প্রগতিবাদীর (চ্যাঙ নাই-চি[৪] যার প্রতিনিধি) রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ ; ইত্যাদি।

অন্যদিকে, আমাদের কমিউনিস্টদের মধ্যে তাত্ত্বিক জ্ঞানের অসমতা ; উত্তরাভিমুখী অভিযানের সময় দুই পার্টির সহযোগিতার ফলে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের বহু পার্টি-সদস্য বঞ্চিত থাকার ঘটনা ; আমাদের পার্টি-সদস্যদের এক বিরাট সংখ্যকই পেটি-বুর্জোয়া বংশোদ্ভুত হবার ঘটনা ; কিছু কিছু পার্টি-সদস্যদের তিক্ত সংগ্রামের কঠিন জীবন চালিয়ে যাবার প্রতি বীতরাগ ; যুক্তফ্রন্টের মধ্যে কুওমিনতাঙের সঙ্গে নীতিহীন সামঞ্জস্য বিধানের ঝোঁক;

অষ্টম রুট বাহিনীর মধ্যে নতুন এক ধরনের যুদ্ধবাজ মনোভাবের ঝোঁকের উদ্ভব; কুওমিনতাঙ সরকারে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণে সমস্যার উদ্ভব; জাপবিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি অঞ্চলগুলিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত সামঞ্জস্য বিধানের ঝোঁকের উদ্ভব; ইত্যাদি।

আমরা অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করব যে, কে নেতৃত্ব দেবে এবং পূর্বোক্ত সংকটময় পরিস্থিতির কারণে আমরা অবশ্যই কঠোরভাবে আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

২১। বেশ কয়েক মাস ধরে, বিশেষ করে প্রতিরোধ-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সমস্ত পর্যায়ের পার্টি-সংগঠনগুলি প্রকৃত বা সম্ভাব্য আত্মসমর্পণবাদী ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, এ সবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেছে এবং সুফল অর্জন করেছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি কমিউনিস্টদের সরকারে অংশগ্রহণের সমস্যা সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তাব[৫] প্রচার করেছে।

অষ্টম রুট বাহিনীর মধ্যে নতুন যুদ্ধবাজ ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দেওয়া হয়েছে। লালফৌজের নতুন নামকরণের পর কিছু ব্যক্তির মধ্যে এই ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য প্রকাশ করতে তারা অনিচ্ছুক, ব্যক্তিগত বীরত্ববাদ তাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কুওমিনতাঙের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে (যেমন, অফিসার হিসেবে) তারা গর্ববোধ করছে এবং এরকম আরও অনেক কিছু। নতুন ধরনের যুদ্ধবাজ মনোভাবের প্রতি ঝোঁকের উৎস (কমিউনিস্ট পার্টিকে কুওমিনতাঙের পর্যায়ে নামিয়ে আনা) এবং ফলাফল (জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা) আর পুরানো ধরনের যুদ্ধবাজ মনোভাবের প্রতি ঝোঁক ও ফলাফল একই রকমের, জনগণকে প্রহার ও গালাগাল করা এবং শৃংখলা প্রভৃতি না মানার মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ ঘটছে। এই ঝোঁক কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট যুক্তফ্রন্টের যুগে আত্মপ্রকাশ করেছে, এবং সেই কারণেই এগুলি খুবই মারাত্মক এবং এর প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে ও দৃঢ়ভাবে এর বিরোধিতা করতে হবে। কুওমিনতাঙের হস্তক্ষেপের ফলে রাজনৈতিক কমিশারের ব্যবস্থা বিলোপ করে দেওয়া হয়েছিল এবং একই কারণে রাজনৈতিক বিভাগের নতুন নামকরণ করা হয়েছিল 'রাজনৈতিক শিক্ষার দপ্তর'। বর্তমানে এই দুটিকেই আবার পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। আমরা 'আমাদের নিজেদের হাতে উদ্যোগ রেখে পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীন গেরিলাযুদ্ধের' নীতি গ্রহণ করেছি, শক্ত হাতে তা চালিয়ে যাচ্ছি এবং এইভাবেই মূলতঃ যুদ্ধে এবং অন্যান্য

কাজে অষ্টম রুট বাহিনীর সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে তুলেছি। কুওমিনতাঙের সদস্যদের অষ্টম রুট বাহিনীর ইউনিটগুলিতে কর্মী পাঠাবার যে দাবী কুওমিনতাঙ রেখেছিল, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি এবং এইভাবে অষ্টম রুট বাহিনীর ওপর কমিউনিস্ট পার্টির নিরঙ্কুশ নেতৃত্বের নীতিতে অবিচল রয়েছি। একইভাবে আমরা বিপ্লবী জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলগুলিতে 'যুক্তফ্রন্টের মধ্যে স্বাধীনতা এবং উদ্যোগের' নীতির প্রবর্তন করেছি। আমরা 'পার্লামেন্টবাদের[৬] (অবশ্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্লামেন্টবাদ নয়, তা চীনের পার্টিতে নেই) দিকে আমাদের ঝোঁককে শুধরে নিয়েছি ; আমরা ডাকাত, শত্রুর গুপ্তচর এবং অন্তর্ঘাতীদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাচ্ছি।

সিয়ানে কুওমিনতাঙের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে নীতি-বিগর্হিত সমঝওতার ঝোঁক আমাদের মধ্যে উঠেছিল আমরা তা শুধরে নিয়েছি এবং নতুন করে গণ-সংগ্রাম গড়ে তুলেছি।

পূর্ব কানসুতেও আমরা মোটামুটিভাবে সিয়ানের মতোই কাজ করেছি।

সাংহাইতে আমরা চ্যাঙ নাই-চি'র 'সংগ্রামের কম আহ্বান, কিন্তু বেশি বেশি পরামর্শ দেওয়ার' লাইনের সমালোচনা করেছি এবং জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের কাজের সঙ্গে আমাদের অতিরিক্ত সামঞ্জস্য গড়ে তোলার যে ঝোঁক দেখা দিচ্ছিল, তার সংশোধন করেছি।

দক্ষিণের গেরিলা অঞ্চলগুলি হচ্ছে দশ বছর ধরে কুওমিনতাঙের সঙ্গে আমাদের রক্তাক্ত যুদ্ধের ফলে অর্জিত বিজয়ের একটি অংশ ; দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলি হচ্ছে আমাদের জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতিগত শক্ত ঘাঁটি ; এই অঞ্চলগুলি থেকেই কুওমিনতাঙ আমাদের বাহিনীগুলিকে, এমনকি সিয়ান ঘটনার পরেও, তার 'পরিবেষ্টন ও দমন'-এর মাধ্যমে শেষ করে দিতে চেয়েছিল, এবং এমনকি লুকৌচিয়াও ঘটনার পরেও 'বাঘকে পাহাড় থেকে লোভ দেখিয়ে সরিয়ে আনার' নতুন পদ্ধতিকে দুর্বল করে দেবার চেষ্টা করেছিল। এইসব অঞ্চলগুলিতে আমরা বিশেষ করে দৃষ্টি দিয়েছি ঃ (১) অবস্থা বিবেচনা না করে আমাদের বাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করার বিরুদ্ধে সতর্কতা নেবার ব্যাপারে (যা আমাদের শক্ত ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করার জন্য কুওমিনতাঙের প্রত্যাশাকেই পূর্ণ করবে), (২) কুওমিনতাঙের নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে, এবং (৩) আর একটি হো-মিং ঘটনা ঘটার[৭] আশংকার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার (অর্থাৎ কুওমিনতাঙ কর্তৃক পরিবেষ্টিত এবং নিরস্ত্র হওয়ার বিপদ) ব্যাপারে।

লিবারেশন উইকলির[৮] প্রতি আমাদের যুক্তিসঙ্গত ও গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

২২। সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার জন্য এবং আংশিক প্রতিরোধকে সর্বাত্মক প্রতিরোধে পরিবর্তিত করার জন্য জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের প্রতি অবিচল থাকা এবং এই ফ্রন্টকে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কুওমিনতাঙ কমিউনিস্ট যুক্তফ্রন্টে বিভেদ সৃষ্টিকারী কোন মনোভাবকেই সহ্য করা হবে না। আমাদের এখনো 'বাম' রুদ্ধদ্বারনীতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু একই সময়ে আমরা যুক্তফ্রন্টের যাবতীয় কাজে স্বাধীনতা ও উদ্যোগ গ্রহণের নীতির প্রতি একান্ত অবিচল থাকব। কুওমিনতাঙ এবং অন্যান্য পার্টিগুলির সঙ্গে আমাদের যুক্তফ্রন্ট একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীকে কাজে রূপায়িত করার ভিত্তিতে গঠিত। এই ভিত্তি ছাড়া কোন যুক্তফ্রন্টই হতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে সহযোগিতা হবে নীতি-বিগর্হিত এবং আত্মসমর্পণবাদেরই প্রকাশ। সুতরাং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুদ্ধকে বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চাবিকাঠি হচ্ছে 'যুক্তফ্রন্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের' নীতিকে ব্যাখ্যা করা, একে প্রয়োগ করা এবং উর্ধ্বে তুলে ধরা।

২৩। এ সবকিছুর পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য কি ? এক হিসেবে, যেসব জায়গা আমরা ইতিমধ্যেই দখল করেছি সেগুলি আমাদের দখলে রাখা, কারণ এই জায়গাগুলি হচ্ছে আমাদের রণনীতিগত পা-রাখার জায়গা, যেখান থেকে আমরা চলতে শুরু করব ; আর এগুলো হারানোর অর্থ হচ্ছে সবকিছুই হারানো। কিন্তু আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ইতিমধ্যেই আমরা যেসব জায়গা জয় করেছি তার বিস্তৃতি ঘটানো এবং 'জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের জন্য এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য লক্ষ লক্ষ জনগণকে দলে টানার' ইতিবাচক উদ্দেশ্যটিকে কার্যকরী করা। আমাদের স্থান দখলে রাখা এবং তার বিস্তৃতি ঘটানো—এই দুটোই অবিচ্ছিন্ন। বিগত কয়েক মাসে পেটি-বুর্জোয়াদের বহু বামপন্থী সদস্য আমাদের প্রস্তাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, কুওমিনতাঙ শিবিরে নতুন শক্তির বিকাশ ঘটেছে, শানসীতে গণ-সংগ্রাম গড়ে উঠেছে, এবং বহু জায়গায় আমাদের পার্টির সংগঠন বিস্তারলাভ করেছে।

২৪। কিন্তু এ কথা আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, সমস্ত দেশে আমাদের পার্টির সাংগঠনিক শক্তি এখনো খুবই সামান্য। সামগ্রিকভাবে দেশে ব্যাপক জনগণের শক্তিও অত্যন্ত কম, কারণ সমগ্র দেশের জনগণের শক্তির মূল অংশ শ্রমিক-কৃষক এখনো

পর্যন্ত সংগঠিত নয়। এসবের জন্য দায়ী একদিকে কুওমিনতাঙের দমন ও নিপীড়নের নীতি এবং অন্যদিকে আমাদের কাজের অপ্রতুলতা, বা এমনকি এর সম্পূর্ণ অভাবও। বর্তমান জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধে এটিই হচ্ছে আমাদের পার্টির মৌলিক দুর্বলতা। আমরা এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা যাবে না। এই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়েই আমরা 'যুক্তফ্রন্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের নীতি' প্রয়োগ করব এবং আত্মসমর্পণবাদ অথবা অতিরিক্ত সামঞ্জস্য সাধনের সমস্ত রকমের ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

সামগ্রিকভাবে দেশে আত্মসমর্পণবাদের বিরোধিতা কর

২৫। উপরের অংশে শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদ সম্পর্কে বলা হল। এই ঝোঁকগুলি সর্বহারাশ্রেণীকে বুর্জোয়া সংস্কারবাদ এবং শেষপর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে না যাওয়ার বুর্জোয়াসুলভ মনোভাবের সঙ্গে বোঝাপড়ার দিকে নিয়ে যাবে। যদি আমরা এটা কাটিয়ে উঠতে না পারি তবে আমরা জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না, আংশিক প্রতিরোধকে সর্বাত্মক প্রতিরোধে পরিণত করতে পারব না, এবং মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে পারব না।

কিন্তু আর একধরনের আত্মসমর্পণবাদ—জাতীয় আত্মসমপর্ণবাদ— আছে, যে আত্মসমপর্ণবাদ চীনকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে বোঝাপড়ার দিকে নিয়ে যাবে, চীনকে জাপানের উপনিবেশে পরিণত করবে, এবং চীনা জনগণকে ঔপনিবেশিক ক্রীতদাসে পরিণত করবে। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বর্তমানে এই ঝোঁক দেখা দিয়েছে।

২৬। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের বামপন্থীরা হচ্ছেন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণ, যার মধ্যে আছেন শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়ারা। আমাদের কাজ হচ্ছে এই অংশটিকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। এই কর্তব্য পালন করাটাই হবে কুওমিনতাঙের, সরকারের এবং সেনাবাহিনীর সংস্কারসাধনের জন্য, একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, আংশিক প্রতিরোধকে সর্বাত্মক প্রতিরোধে পরিণত করার জন্য এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদসাধনের জন্য একটি মৌলিক পূর্বশর্ত।

২৭। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যবর্তী অংশ গঠিত হয়েছে জাতীয় বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়াদের উচ্চস্তরকে নিয়ে। সাংহাই-এর প্রধান প্রধান

সংবাদপত্রগুলি যাদের মুখপত্র, তারা এখন বামদিকে ঝুঁকেছে,[৯] আবার ফু সিং সমিতির কিছু সদস্য দোদুল্যমান হতে শুরু করেছে এবং সি. সি. চক্রের কিছু কিছু সদস্যও দোদুল্যমানতা দেখাচ্ছে।[১০] যেসব সেনাবাহিনী জাপানকে প্রতিরোধ করছে, তারা কঠোর শিক্ষালাভ করেছে, কেউ কেউ সংস্কার প্রবর্তন শুরু করে দিয়েছে, কেউ-বা তার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের কাজ হচ্ছে মধ্যবর্তী অংশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং তার অবস্থান পরিবর্তনে সাহায্য করা।

২৮। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের দক্ষিণপন্থী অংশ হচ্ছে বড় বড় জমিদার এবং বৃহৎ বুর্জোয়ারা, এবং এরাই হচ্ছে জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের মূল স্নায়ুকেন্দ্র। এইসব লোকের আত্মসমর্পণবাদের দিকে ঝুঁকে পড়াটা অবধারিত, কারণ তারা যুদ্ধে তাদের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং জনগণ জেগে উঠবে—এই দুটোকেই ভয় করে। তাদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যেই শত্রুর সহযোগিতা করছে, অনেকেই ইতিমধ্যে জাপপন্থী হয়ে গেছে বা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, অনেকে দোদুল্যমান হয়ে পড়েছে, এবং কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তি, বিশেষ অবস্থার জন্য, দৃঢ় জাপ-বিরোধী হয়ে আছে। কিছু লোক বাধ্য হয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য একান্ত অনিচ্ছায় জাতীয় যুক্তফ্রন্টে যোগ দিয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এদের এ থেকে ভেঙে চলে যাবার খুব একটা দেরী নেই। বস্তুতঃ বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা ঠিক এই মুহূর্তেই জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙনের চক্রান্ত করছে। 'কমিউনিস্টরা অভ্যুত্থান করানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে', 'অষ্টম রুট বাহিনী পিছু হঠছে' ইত্যাদি নানারকম গালগল্প ও গুজব তারা তৈরী করছে এবং সুনিশ্চিতভাবেই প্রতিদিন এগুলি বহুগুণে বেড়েই চলবে। আমাদের কাজ হচ্ছে সুদৃঢ়ভাবে জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, এবং এই সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বামপন্থী অংশকে সুসংহত ও সম্প্রসারিত করা এবং এই মধ্যবর্তী অংশকে এগিয়ে যেতে ও তাদের অবস্থানের পরিবর্তনে সাহায্য করা।

শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদ ও জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

২৯। জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধে শ্রেণী-আত্মসমর্পণবাদ হচ্ছে আসলে জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের সংরক্ষিত শক্তি। এ হচ্ছে এমন একটা জঘন্য ঝোঁক, যা দক্ষিণপন্থী শিবিরকে সমর্থন জোগায় এবং যুদ্ধে পরাজয়কে ডেকে আনে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে

আমাদের অবশ্যই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, এবং জাতীয় আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্য, চীনা জাতির মুক্তি অর্জনের জন্য এবং শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির জন্য এই সংগ্রামকে আমাদের সকল রকম কাজের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে যেতে হবে।

টীকা

১। ১৯৩৭ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখে উত্তর শেনসির লোচুয়ানে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সভায় গৃহীত 'বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক প্রস্তাবের কথা এখানে বলা হচ্ছে। প্রস্তাবটির পূর্ণ বয়ান এরকম ঃ

(১) জাপানী আগ্রাসীদের লুকৌচিয়াওতে সামরিক উস্কানি এবং তাদের দ্বারা পিপিং ও তিয়েনসিন অধিকার হচ্ছে চীনা প্রাচীরের দক্ষিণে চীনের ওপর বিরাট আক্রমণ আরম্ভের সূচনা। তারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধের জন্য জাতীয় সমাবেশ শুরু করে দিয়েছে। 'পরিস্থিতি জটিল করার কোন ইচ্ছা নেই' বলে তাদের প্রচার আরও আক্রমণের জন্য ধূম্রজাল সৃষ্টি মাত্র।

(২) জাপানী আগ্রাসীদের আক্রমণের এবং চীনা জনগণের বিক্ষোভের চাপে নানকিং সরকার যুদ্ধ করার জন্য মনস্থির করতে শুরু করেছেন, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা এবং কোন কোন স্থানে প্রকৃত প্রতিরোধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। চীন এবং জাপানের মধ্যে সামগ্রিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ৭ই জুলাই তারিখে সংঘটিত লুকৌচিয়াও ঘটনা চীনের জাতীয় প্রতিরোধ-যুদ্ধের সূচনা করেছে।

(৩) সুতরাং চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রকৃত প্রতিরোধের এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে, প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতির স্তরের অবসান হয়েছে! বর্তমান স্তরে কেন্দ্রীয় কর্তব্য হচ্ছে জাতির সমস্ত শক্তিকে প্রতিরোধ-যুদ্ধে জয়ের জন্য সমাবিষ্ট করা। কুওমিনতাঙের অনিচ্ছার জন্য এবং জনগণকে যথেষ্ট সমাবিষ্ট না করার দরুণ আগের স্তরে যে গণতন্ত্রের বিজয়ের কাজটি সম্পন্ন করা হয়নি, প্রতিরোধ-যুদ্ধের জয়ের মধ্য দিয়ে সে কাজকে অতি অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) এই নতুন স্তরে জাপানকে প্রতিরোধ করতে হবে কিনা এ বিষয়টি নিয়ে কুওমিনতাঙ এবং অন্যান্য জাপ-বিরোধী গ্রুপগুলির সঙ্গে আমাদের এখন আর কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু কিভাবে বিজয়লাভ করতে হবে তা নিয়ে পার্থক্য ও মতবিরোধ আছে।

(৫) যে প্রতিরোধ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে তাকে সমগ্র জাতির সামগ্রিক প্রতিরোধে পরিণত করার মধ্যেই এখন নিহিত রয়েছে বিজয়ের চাবিকাঠি। কেবলমাত্র

সর্বাত্মক প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা যেতে পারে। আমাদের পার্টি-প্রস্তাবিত জাপানকে প্রতিরোধ ও জাতিকে বাঁচাবার যে দশ দফা সম্বলিত কর্মসূচীটি বর্তমানে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাই সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের পথ নির্দিষ্ট করছে।

(৬) প্রতিরোধের বর্তমান স্তরে প্রচণ্ড বিপদের আশংকা রয়েছে। এই বিপদের প্রধান কারণ হচ্ছে কুওমিনতাঙ এখনো পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য সমগ্র জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে ইচ্ছুক নয়। এর পরিবর্তে তারা মনে করে যে, যুদ্ধ হচ্ছে কেবলমাত্র সরকারেরই ব্যাপার, এবং প্রতিটি পর্যায়ে যুদ্ধে জনগণের অংশগ্রহণকে তারা ভয় করে ও তার পথে বাধা সৃষ্টি করে, সরকার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়, জাপ-প্রতিরোধে এবং জাতিকে বাঁচানোর জন্য জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে অস্বীকার করে, সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের সম্পূর্ণ সংস্কারসাধনে অস্বীকার করে এবং সরকারকে সমগ্র জাতির প্রতিরক্ষা-সরকারে পর্যবসিত করতে অস্বীকার করে। এই ধরনের প্রতিরোধ হয়তো আংশিকভাবে জয়লাভ করতে পারে, কিন্তু কখনই তা চূড়ান্ত জয়লাভ করতে পারে না। তা বরং মারাত্মক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

(৭) প্রতিরোধ-যুদ্ধে প্রচণ্ড দুর্বলতা থাকার জন্য অনেক বিপর্যয়, পশ্চাদপসরণ, আভ্যন্তরীণ ভাঙন, বিশ্বাসঘাতকতা, সাময়িক এবং আংশিক আপোষ এবং অন্যান্য বিপর্যয় হতে পারে। সুতরাং এ কথা বোঝা উচিত যে, এই যুদ্ধ একটি কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হবে। কিন্তু এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে যে, আমাদের পার্টি এবং সমগ্র জনগণের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে প্রতিরোধ শুরু হয়েছে তা সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে চূর্ণ করে দিয়ে বিকাশলাভ করবে ও এগিয়ে যেতে থাকবে। সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকেই আমাদের জয় করতে হবে এবং বিজয়লাভের জন্য আমাদের পার্টি প্রস্তাবিত দশ দফা কর্মসূচীকে রূপায়িত করার জন্য আমরা দৃঢ় সংগ্রাম চালিয়ে যাব। এই কর্মসূচীর বিরোধী সমস্ত ভুল নীতিগুলির আমরা দৃঢ়তা সহকারে বিরোধিতা করব এবং এর ফলে উদ্ভূত জাতীয় পরাজয়বাদ এবং নৈরাশ্যবাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

(৮) জনগণের এবং পার্টি-নেতৃত্বের অধীন সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে একত্র হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যবৃন্দ সংগ্রামের পুরোভাগে এসে সক্রিয়ভাবে দাঁড়াবেন, জাতির প্রতিরোধের মূলকেন্দ্র হয়ে উঠবেন এবং জাপ-বিরোধী গণ-আন্দোলন বিকাশের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও কাজে শিথিল হবেন না বা জনগণের মধ্যে প্রচার করতে, তাদের সংগঠিত করতে ও সশস্ত্র করতে কোন সুযোগই হারাবেন না। যদি জনগণ লাখে লাখে সত্যসত্যই জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হন, তবেই প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয়লাভ সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে।

২। প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে কুওমিনতাঙ এবং চিয়াং কাই-শেক জনগণের চাপে বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তনের অনেক বক্তৃতা দেন, কিন্তু অতি দ্রুত সেসব প্রতিজ্ঞা একটার পর একটা ভঙ্গ করেন। সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কুওমিনতাঙ যদি সংস্কারগুলি প্রবর্তন করত, তাহলে জাতির মধ্যে যে সম্ভাবনার সৃষ্টি হতো, তা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি। মাও সে-তুঙ পরবর্তী সময়ে 'কোয়ালিশন সরকার প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

> কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য গণতন্ত্রীসহ সমগ্র জনগণ একান্তভাবে আশা করেছিল যে, যে সময়ে সমস্ত জাতি একটা সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়েছে এবং যখন জনগণ উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর, তখন কুওমিনতাঙ সরকার এই সুযোগ গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক সংস্কারসমূহ প্রবর্তন করবে এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেন -এর বিপ্লবী তিন গণ-নীতিকে কার্যকরী করবে, কিন্তু তাদের আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে (মাও সে-তুঙের 'নির্বাচিত রচনাবলী', ৩য় খণ্ড, ইং সং)।

৩। চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক কিয়াংসি প্রদেশের লুসানে 'লুসান প্রশিক্ষণ শিক্ষাসূচী' স্থাপিত হয়। প্রশাসনে প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্র গঠন করার জন্য কুওমিনতাঙ পার্টি এবং সরকারের উচ্চ ও মধ্য পদস্থ অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্যই এটি করা হয়।

৪। চ্যাঙ নাই-চি ঐ সময় 'সংগ্রামের কম আহ্বান এবং বেশি পরামর্শ প্রদান'-এর পক্ষে ওকালতি করছিলেন। যখন কুওমিনতাঙ নিপীড়নের নীতি অনুসরণ করছিল, তখন তার কাছে কেবলমাত্র 'পরামর্শ' পাঠানো ছিল একেবারেই অর্থহীন। কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য সরাসরি জনগণকে আহ্বান জানানোই উচিত ছিল। অন্যথায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠতো বা কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধও অসম্ভব হতো। চ্যাঙ নাই-চি এই ব্যাপারে ভুল করেছিলেন এবং ক্রমশঃ তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন।

৫। 'কমিউনিস্ট পার্টির সরকারে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির খসড়া প্রস্তাবটি' প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে। ১৯৩৭-এর ২৫শে সেপ্টেম্বরে প্রস্তাবটি রচিত হয়েছিল। পূর্ণ বয়ানটি নিম্নরূপ ঃ

> (১) জাপ-বিরোধী যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বমূলক একটি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের জরুরী প্রয়োজন রয়েছে, কারণ কেবলমাত্র এরকম একটি সরকারই জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ সুচারুরূপে পরিচালনা করতে পারে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টি এরকম সরকারে অংশগ্রহণে প্রস্তুত অর্থাৎ সরাসরি ও আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণে এবং এর মধ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালনে প্রস্তুত। কিন্তু এরকম একটি সরকার এখনো গড়ে ওঠেনি। আজ যে সরকার আছে তা এখনো

কুওমিনতাঙের এক-পার্টি একনায়কত্বের সরকার।

(২) চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তখনই সরকারে অংশগ্রহণ করতে পারে, যখন সেই সরকার কুওমিনতাঙের এক-পার্টি একনায়কত্ব থেকে সমগ্র জাতির যুক্তফ্রন্ট সরকারে পরিণত হবে, অর্থাৎ যখন বর্তমান কুওমিনতাঙ সরকার (ক) আমাদের পার্টি-প্রস্তাবিত জাপ-প্রতিরোধ ও জাতিকে রক্ষার দশ দফা কর্মসূচীর মূল বিষয়গুলি গ্রহণ করবে এবং তদনুয়ায়ী প্রশাসনিক কর্মসূচী প্রণয়ন করবে; (খ) কাজের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দেখাতে শুরু করবে ও সুনির্দিষ্ট ফল অর্জন করবে; এবং (গ) কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগুলির আইনানুগ অস্তিত্বকে মেনে নেবে এবং জনগণকে সমাবিষ্ট, সংগঠিত ও শিক্ষিত করে তোলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেবে।

(৩) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণ সাধারণভাবে কোন স্থানীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সরকারের প্রশাসন-যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট কোন কাউন্সিল বা কমিটিতে অংশগ্রহণ করবেন না। কারণ এরকম অংশগ্রহণ করলে কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ বিশেষ পার্থক্যের দিকগুলির বিলুপ্তি ঘটবে, কুওমিনতাঙের একনায়কত্বকে টিকিয়ে রাখা হবে এবং সাহায্যের চাইতে বরং ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রচেষ্টাকেই তা ব্যাহত করবে।

(৪) তবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণ কোন কোন বিশেষ অঞ্চলের— যেমন যুদ্ধাঞ্চলের—আঞ্চলিক সরকারে অংশগ্রহণ করতে পারে, যেখানে পুরানো কর্তৃপক্ষ আগের মতো শাসন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে দেখে মোটামুটিভাবে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি কার্যকরী করতে ইচ্ছুক, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে পারে এবং যেখানে বর্তমান জরুরী পরিস্থিতির জন্য জনগণ এবং সরকার এই উভয়ের মতেই কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে এ কথা আরও বেশি প্রযোজ্য, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টিকেই জাপ-বিরোধী সরকার গঠনে খোলাখুলিভাবে এগিয়ে আসা উচিত হবে।

(৫) কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত সদস্যদের নীতিগতভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাসমূহে, যেমন নিখিল-চীন জাতীয় পরিষদে, একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং জাতিকে বাঁচানোর নীতি আলোচনার উদ্দেশ্যে যোগ দেওয়া চলবে। সুতরাং এইসব পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে চেষ্টা করতে হবে, এগুলিকে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের বক্তব্যস্থল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে এবং এইভাবে

জনগণকে সমাবিষ্ট করে পার্টির পতাকাতলে জড়ো করতে হবে ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(৬) একটি সুনির্দিষ্ট সাধারণ কর্মসূচী এবং নিরঙ্কুশ সমতার নীতিসমেত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বা তার স্থানীয় শাখাসমূহ কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সঙ্গে, বা তার স্থানীয় সদর দপ্তরের সঙ্গে, বিভিন্ন যুক্ত কমিটি (যেমন, জাতীয় বিপ্লবী লীগ, গণআন্দোলনের জন্য কমিটি, যুদ্ধাঞ্চলে সমাবেশের জন্য কমিটি ইত্যাদি) গঠনে যুক্তফ্রন্ট সংগঠন করতে পারে এবং এসব যুক্ত কাজের মধ্য দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির কুওমিনতাঙের সঙ্গে সহযোগিতা অর্জন করা উচিত হবে।

(৭) জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে লালফৌজের নতুন নামকরণের পর এবং লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার যন্ত্রগুলিকে বিশেষ অঞ্চলের সরকারে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে যে আইনানুগ অধিকার তারা অর্জন করেছে, তার শক্তিতেই তাদের প্রতিনিধিরা সমস্ত সামরিক এবং গণ-সংগঠনে যোগদান করতে পারে, যার ফলে জাপানকে প্রতিরোধ এবং জাতিকে বাঁচানোর কাজ আরও এগিয়ে যাবে।

(৮) যেসব স্থানে প্রথমে লালফৌজ এবং গেরিলা ইউনিট ছিল, সেসব স্থানে নিরঙ্কুশ স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি-নেতৃত্ব রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন, এবং এই নীতিগত ব্যাপারে কমিউনিস্টরা অবশ্যই এতটুকুও দোদুল্যমানতা দেখাবেন না।

৬। এখানে 'পার্লামেন্টবাদ' বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হলঃ কিছু পার্টি কমরেড বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবস্থার, জনগণের প্রতিনিধির সম্মেলনের ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন।

৭। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে হো মিং ঘটনাটি ঘটে। ১৯৩৪-এর অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় লালফৌজ যখন উত্তরদিকে সরে যায় তখন লালফৌজের গেরিলাবাহিনী পশ্চাদ্দেশে থেকে যায় এবং প্রচণ্ড অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে আটটি দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশের কিয়াংসি, ফুকিয়েন, কোয়াংতুং, হুনান, হুপে, হোনান, চেকিয়াং এবং আনহুই প্রভৃতি চোদ্দটি অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যায়। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশানুযায়ী এই ইউনিটগুলি গৃহযুদ্ধের অবসানের জন্য কুওমিনতাঙের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালায় এবং ইউনিটগুলিকে একটি বাহিনীতে (নয়া চতুর্থ সেনাবাহিনী, যারা পরবর্তীকালে ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ ও উত্তর তীরে জাপানীদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছিল) সংগঠিত করে, এবং জাপানকে প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। কিন্তু

চিয়াং কাই-শেক এই আলাপ-আলোচনার সুযোগ নিয়ে এই গেরিলা ইউনিটগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার এক চক্রান্ত করে। হো মিং ছিলেন ফুকিয়েন-কোয়াংতুং সীমান্ত অঞ্চলের একটি গেরিলা ইউনিটের নেতা, এবং এই অঞ্চলটি ছিল চোদ্দটি গেরিলা অঞ্চলের একটি। হো চিয়াং কাই-শেকের চক্রান্ত সম্বন্ধে সাবধান ছিলেন না এবং ফলে তাঁর অধীনস্থ এক হাজারেরও বেশি গেরিলা একস্থানে সমাবিষ্ট হওয়ার পর কুওমিনতাঙ বাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং তাদের নিরস্ত্র করা হয়।

৮। ইয়েনান-এ ১৯৩৭-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 'লিবারেশন উইকলি' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র। ১৯৪১-এ এই পত্রিকাটির পরিবর্তে 'লিবারেশন ডেইলী' দৈনিক প্রকাশিত হয়।

৯। এরা ছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের সেই অংশ, সাংহাইয়ের 'শেন পাও' জাতীয় পত্রিকা যাদের মতামত ব্যক্ত করার মাধ্যম হয়েছিল।

১০। ফু সিং সোসাইটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি চক্র—কুওমিনতাঙের মধ্যে এই ফ্যাসিস্ট সংগঠন দুটি যথাক্রমে চিয়াং কাই-শেক এবং চিন লি-ফুর নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। তারা বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের শাসন-ব্যবস্থার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। কিন্তু বহু পেটি-বুর্জোয়া তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল বা যোগদানের জন্য তাদের প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। প্রধানতঃ কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর নিম্ন ও মধ্য পদস্থ অফিসার যারা ফু সিং সোসাইটিতে ছিল, তাদের সম্বন্ধেই এখানে বলা হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় চক্রের যেসব সদস্যবৃন্দ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল না তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকার এবং অষ্টম রুট বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগস্থ সদর দপ্তরের ঘোষণা

১৫ই মে, ১৯৩৮

এতদ্দ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে ঃ লুকৌচিয়াও ঘটনার পর থেকে আমাদের সমস্ত স্বদেশপ্রেমিক দেশবাসিগণ দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অফিসার ও সৈন্যরা রক্ত ঝরাচ্ছেন, জীবন বিসর্জন দিচ্ছেন। সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গ্রুপগুলি সৎ বিশ্বাস নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। দেশ রক্ষার কাজে জনগণের সমস্ত অংশের লোকেরা হাতে হাত লাগিয়েছেন। এটা চীনা জাতির এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিক্‌নির্দেশ করছে এবং জাপানের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের দৃঢ় নিশ্চিতি তুলে ধরছে। আমাদের সমস্ত দেশবাসীকে অবশ্যই এই অগ্রগতির পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের[১] জনগণ ও সেনাবাহিনী সরকারের নেতৃত্ব অনুসরণ করেছেন এবং জাতীয় মুক্তির স্বার্থে সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা যা করেছেন তা সবই ন্যায়সংগত ও সন্মানজনক। কঠোর দুঃখকষ্টের মধ্যেও তাঁরা নিরলসভাবে ও বিনা প্রতিবাদে সংগ্রাম করেছেন। দেশব্যাপী সমস্ত জনগণ একবাক্যে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। সীমান্ত অঞ্চলের সরকার এবং পশ্চাদ্ভাগের সামরিক সদর-দপ্তর ঘোষণা করেছেন, তাঁরা সমগ্র অঞ্চলের জনগণকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। কর্তব্যে কাউকে অবহেলা করতে দেওয়া হবে না এবং জাতীয় মুক্তির উদ্দেশ্যকে

শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকার এবং অষ্টম রুট বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগস্থ সদর দপ্তরের জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ এই ঘোষণাটি লিখেছিলেন চিয়াং কাই-শেক চক্রের বিভেদমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিন পরেই চিয়াং কাই-শেক চক্র কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে বিভেদের চক্রান্ত শুরু করে। শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ভাঙন ধরানোটা ছিল এই চক্রান্তেরই একটি অংশ। বিপ্লবের স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা দরকার বলে কমরেড মাও-সে-তুঙ মত প্রকাশ করেছিলেন। এই ঘোষণা জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের মধ্যে চিয়াং চক্রের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছু পার্টি-সদস্যের সুবিধাবাদী অবস্থানকে আঘাত হেনেছিল।

ক্ষতিসাধন করার মতো কোন কিছুও কাউকে করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু সীমান্ত অঞ্চলে সাম্প্রতিক তদন্তে এ কথা ধরা পড়েছে যে জনস্বার্থের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে কিছু লোক যেসব ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল তা ফিরিয়ে দেবার জন্য বিভিন্নভাবে কৃষকদের ওপর জবরদস্তি করছে, পুরানো বাতিল ঋণ[২] শোধ দেওয়ার জন্য দেনাদারদের বাধ্য করা হচ্ছে, যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তার পরিবর্তন সাধন করার জন্য জনগণের ওপর বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে, বা সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং গণসংগঠনগুলি ভেঙে ফেলার জন্য জনগণকে বাধ্য করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কিছু কিছু লোক গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছে, ডাকাতদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে, আমাদের সৈন্যদেরকে বিদ্রোহ করার জন্য উত্তেজিত করছে, আমাদের অঞ্চলে জরিপ করছে ও মানচিত্র তৈরী করছে, গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করছে অথবা সীমান্ত অঞ্চলের সরকারের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবেই প্রচার করছে। স্পষ্টতঃই এ সমস্ত কার্যকলাপ জাপ-প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্যের মূল নীতির বিরোধী, সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের ইচ্ছার বিরোধী, এবং এসব করা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ উস্‌কিয়ে দেওয়ার জন্য, যুক্তফ্রন্টকে ভাঙার জন্য, জনগণের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য, সীমান্ত অঞ্চলের সরকারের মর্যাদাহানি করার জন্য এবং জাপানের বিরুদ্ধে লোক সংগ্রহে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। এর কারণ হচ্ছে মুষ্টিমেয় গোঁড়া লোক জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে জঘন্য আচার-আচরণ করছে। এমনকি কিছু লোক জাপানী আগ্রাসীদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে এবং তাদের চক্রান্তমূলক কার্যকলাপকে গোপন রাখার জন্য বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করছে। বেশ কয়েকমাস ধরে জেলাগুলি থেকে প্রতিদিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ক্রমাগত অসংখ্য রিপোর্ট আসছে, এবং এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। জাপ-বিরোধী শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য, জাপানের বিরুদ্ধে পশ্চাদ্ভাগকে সংহত করার জন্য এবং জনগণের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য পশ্চাদ্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তর এবং সরকার এইসব কার্যকলাপকে বে-আইনী ঘোষণা করা অপরিহার্য বলে মনে করে। তদনুযায়ী আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি ঃ

(১) জনগণ ইতিমধ্যেই যেসব অধিকার অর্জন করেছেন, তা রক্ষা করার জন্য সরকার এবং পশ্চাদ্ভাগের সামরিক সদর দপ্তর আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে সীমান্ত অঞ্চলের সরকারের অধীনস্থ ঘর-বাড়ি বা জমিজমা বিতরণের বা ঋণ বাতিলের ব্যাপারে যা করা হয়েছে, তার কোনওরকম বে-আইনী পরিবর্তন সাধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করছে।

(২) সরকার এবং পশ্চাদ্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তর যেসব সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং গণ-সংগঠন আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠার সময় বর্তমান ছিল এবং বর্তমানে যুক্তফ্রন্টের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে যেসব সংগঠন সম্প্রসারিত হয়েছে, সরকার এবং পশ্চাদ্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তর সেগুলির উন্নতিসাধন করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্ত এবং নাশকতামূলক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবে।

(৩) সরকার এবং পশ্চাদ্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তর সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং জাতীয় পুনর্গঠন সুদৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাবে এবং জাপানের প্রতিরোধে ও জাতীয় শক্তির লক্ষ্য সাধনে সানন্দে যে-কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ ও তাকে শক্তিশালী করবে। আমরা প্রতিটি স্থান থেকে জনগণের আন্তরিক সাহায্য আহ্বান করছি। কিন্তু প্রবঞ্চকদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য ও বিশ্বাসঘাতকদের দূরে রাখার জন্য যে-কোন কাজে যে-কোন লোকের সরকার এবং পশ্চাদ্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তরের অনুমতি ছাড়া এবং তাদের লিখিত অনুমোদনপত্র ছাড়া সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ এবং অবস্থানের ওপর আমরা নিষেধাজ্ঞা জারী করছি।

(৪) সশস্ত্র প্রতিরোধের এই উত্তেজনাময় সময়ে সীমান্ত অঞ্চলের সীমানার মধ্যে যারা নাশকতার চেষ্টা করবে, অন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত থেকে বিদ্রোহের উত্তেজনা সৃষ্টি করবে এবং সামরিক গুপ্ত তথ্য ফাঁস করবে, তাদের খবরাখবর সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার অধিকার জনগণের সঠিক ও সঙ্গতভাবেই থাকছে।

সীমান্ত অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত লোক ও সমস্ত নাগরিককেই এই চারটি বিঘোষিত নির্দেশ মেনে চলতে হবে এবং এর কোনরকম লঙ্ঘন বরদাস্ত করা হবে না। এখন থেকে যদি কোন বে-আইনী ব্যক্তি নাশকতামূলক কাজ করতে দুঃসাহসী হয়, তবে সীমান্ত অঞ্চলের সরকার ও পশ্চাদ্ভাগস্থ সামরিক সদর দপ্তর এই নির্দেশের প্রতিটি ধারা কার্যকরী করবে এবং এই নির্দেশ না জানার কোন অজুহাতই গ্রাহ্য হবে না।

আইনের সমস্ত শক্তি দিয়েই এই ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছে।

টীকা

১। শেনসী-কান্‌সু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ছিল বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা, ১৯৩১ সালের পর বিপ্লবী গেরিলাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে উত্তর শেনসীতে ক্রমান্বয়ে এটি গড়ে ওঠে। লং মার্চের পর কেন্দ্রীয় লালফৌজ উত্তর শেনসীতে এসে উপস্থিত হয়,

তখন এই অঞ্চল হয়ে দাঁড়ায় বিপ্লবের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি এলাকা এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অবস্থান-কেন্দ্র। ১৯৩৭ সালে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পরেই এর নাম হয় শেনসী-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল। এই তিনটি প্রদেশের সাধারণ সীমান্তের তেইশটি কাউন্টি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২। ১৯৩৬ সালের মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গাতেই জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে তা বিলি করে দেবার এবং কৃষকদের পুরানো ঋণ বাতিল করার নীতি কার্যকরী হয়ে যায়। ১৯৩৬ সালের পর ব্যাপক এক জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলবার স্বার্থে সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই নীতিকে খাজনা ও সুদ কমাবার নীতিতে পরিবর্তিত করে। একই সংগে সে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের অর্জিত ফলকে দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করে।

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা

মে, ১৯৩৮

প্রথম অধ্যায়

গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কেন?

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধই মুখ্য আর গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে অনুপূরক। এই বিষয়টির আমরা ইতিমধ্যেই সঠিকভাবে মীমাংসা করেছি। তাই এখন শুধু গেরিলাযুদ্ধের রণকৌশলগত সমস্যাগুলিই রয়ে গেছে। কেন তবে আর আমরা রণনীতিগত প্রশ্ন তুলছি ?

চীন যদি একটা ছোট দেশ হতো আর গেরিলাযুদ্ধের ভূমিকা যদি শুধুই অল্প দূরত্বের মধ্যে নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধাভিযানে প্রত্যক্ষ সাহায্য দেওয়া হতো তাহলে অবশ্য শুধু রণকৌশলগত সমস্যাই থাকত, কোন রণনীতিগত সমস্যা থাকত না। পক্ষান্তরে, চীনও যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো শক্তিশালী দেশ হতো, আক্রমণকারী শত্রুকে তাড়াতাড়ি বিতাড়িত করা যেত অথবা তাড়াতে কিছু সময় লাগলেও যদি তার অধিকৃত এলাকা বিস্তীর্ণ না হতো, তাহলেও গেরিলাযুদ্ধ যুদ্ধাভিযানে শুধুই সহযোগিতার ভূমিকা গ্রহণ করত, তখন স্বভাবতঃই শুধু রণকৌশলগত সমস্যাই জড়িত থাকত, কোন রণনীতিগত সমস্যা থাকত না।

চীনের ক্ষেত্রে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত সমস্যা এই অবস্থায় উদ্ভূত হয়ঃ চীন ছোটও নয়, আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোও নয়, সে হচ্ছে একটা বড় অথচ দুর্বল দেশ। এই বড় অথচ দুর্বল দেশটি আক্রান্ত হয়েছে একটি

জাপ বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোড়ার দিকে পার্টির ভেতরের ও বাইরের বহু লোক গেরিলাযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত ভূমিকাকে খর্ব করে দেখে শুধুমাত্র নিয়মিত যুদ্ধের, বিশেষ করে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর সামরিক কার্যকলাপের ওপরেই তাদের আশা-ভরসা নিবদ্ধ রেখেছিল। কমরেড মাও সে-তুঙ এই দৃষ্টিকোণকে খণ্ডন করেছিলেন এবং এই প্রবন্ধটি রচনা করে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের বিকাশসাধনের সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে, ১৯৩৭ সালে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার সময়ে যে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল কেবল চল্লিশ হাজারের সামান্যতম বেশি, ১৯৪৫ সালে জাপান যখন আত্মসমর্পণ করে

ছোট অথচ শক্তিশালী দেশের দ্বারা, কিন্তু এই বড় অথচ দুর্বল দেশটি এখনো রয়েছে উন্নয়নের যুগে, এটাই সমস্ত সমস্যার উৎস। ঠিক এই অবস্থায় বিরাট অঞ্চল শত্রুর দখলে চলে যায় এবং যুদ্ধও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে। শত্রু আমাদের এই বিরাট দেশের সুবিশাল এলাকা দখল করেছে, কিন্তু তাদের দেশ ছোট, যথেষ্ট সৈন্যশক্তি তার নেই, আর অধিকৃত এলাকায় তাকে বহু জায়গায় ফাঁক রেখে দিতে হয়েছে ; তাই আমাদের জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ মুখ্যতঃ অন্তর্লাইনে নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধাভিযানে সহযোগিতার লড়াই নয়, বরং বহির্লাইনে স্বতন্ত্রভাবে লড়াই করা ; উপরন্তু চীন হচ্ছে প্রগতিশীল, অর্থাৎ তার রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী আর ব্যাপক জনসাধারণ ; তাই আমাদের জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ মোটেই ছোট আকারের নয়, বরং তা হচ্ছে বিরাটাকারের ; তাই রণনীতিগত প্রতিরক্ষা রণনীতিগত আক্রমণ প্রভৃতির মতো গোটা এক গুচ্ছের সমস্যা দেখা দেয়। যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক নির্মমতার কারণে গেরিলাযুদ্ধ বহু অসাধারণ কাজ না করে পারে না। তাই ঘাঁটি এলাকার সমস্যা, গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকশিত করে তোলা প্রভৃতি সমস্যার উদ্ভব হয়। সুতরাং জাপানের বিরুদ্ধে চীনের গেরিলাযুদ্ধ রণকৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা হয়ে পড়ে রণনীতির সমস্যা, এবং প্রয়োজন হয়ে পড়ে রণনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে গেরিলাযুদ্ধের সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করা। যে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত, তা হচ্ছে যুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসে এ ধরনের ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধ একেবারেই নতুন। এ বিষয়টি এই ঘটনার সংগে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত যে, আমরা এখন বিংশ শতাব্দীর ৩০ ও ৪০-এর দশকে প্রবেশ করেছি, আর আমাদের রয়েছে একটি কমিউনিস্ট পার্টি ও লালফৌজ। এখানেই নিহিত রয়েছে সমস্যার প্রাণকেন্দ্র। ইউয়ান কর্তৃক সুং বংশের ধ্বংসসাধন, ছিং কর্তৃক মিং বংশের ধ্বংসসাধন, ইংরেজদের উত্তর আমেরিকা ও ভারত দখল, লাতিন দেশসমূহের মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকার প্রভৃতির মতো জয়ের সাধের

তখন তা বৃদ্ধি পেয়ে দশ লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী হয়ে ওঠে এবং স্থাপন করে বহু বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে তারা গ্রহণ করে মহান ভূমিকা; আর সেই কারণেই চিয়াং কাই-শেক জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সাহস করল না, সাহস করল না দেশজুড়ে গৃহযুদ্ধ বাধাতে। ১৯৪৬ সালে চিয়াং কাই-শেক যখন দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ শুরু করে, তখন তার আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী নিয়ে গড়ে ওঠা গণমুক্তি ফৌজ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

স্বপ্ন সম্ভবতঃ এখনো দেখে চলেছে আমাদের শত্রুপক্ষ। কিন্তু আজকের চীনদেশে এ ধরনের স্বপ্নের কোন বাস্তব মূল্যই আর নেই ; কারণ বর্তমানের চীনদেশে এমন কতকগুলি উপকরণ রয়েছে যা উপরোক্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তে ছিল না। আর সেগুলির একটি হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধ যা একেবারে একটা নতুন ব্যাপার। আমাদের শত্রু যদি এ ঘটনাকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই দুর্ভোগ ভুগতে হবে।

গোটা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ এখনো পর্যন্ত শুধু অনুপূরক স্থান পেলেও এইসব কারণে তাকে যাচাই করে দেখতে হবে রণনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে।

তাহলে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সাধারণ রণনীতিগত নীতিগুলি কেন জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না?

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যাটি আসলে গোটা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণনীতির সমস্যার সংগে নিবিড়ভাবে জড়িত এবং এ দুটির অনেক কিছুই অভিন্ন। কিন্তু গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে নিয়মিত যুদ্ধের থেকে ভিন্ন ধরনের, আর তার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তাই গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যায় বহু বিশেষ ধরনের উপাদান রয়েছে ; জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সাধারণ রণনীতিগত নীতিকে কিছুই অদলবদল না করে আপন বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত গেরিলাযুদ্ধের ক্ষেত্রে কোনমতেই প্রয়োগ করতে পারা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুদ্ধের মৌলিক নীতি হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা

গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা নির্দিষ্টভাবে বলার আগে যুদ্ধের মৌলিক সমস্যা সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলা দরকার।

সমস্ত সামরিক কার্যকলাপের পরিচালিকা-নীতিই এসেছে একটি মৌলিক নীতি থেকে, অর্থাৎ : যথাসম্ভব নিজের শক্তি সংরক্ষণ করা এবং শত্রুর শক্তি ধ্বংস করা। বিপ্লবী যুদ্ধে এই নীতিটি মৌলিক রাজনৈতিক নীতির সংগে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের মূল রাজনৈতিক নীতি অর্থাৎ তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে দেওয়া, এবং এক স্বাধীন, মুক্ত ও সুখী নতুন চীন গড়ে তোলা। সামরিক ব্যাপারে এর অর্থ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তির দ্বারা মাতৃভূমিকে রক্ষা করা, আর জাপানী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য

সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপ যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায় একদিকে নিজের শক্তি সংরক্ষণ করতে এবং অন্যদিকে শত্রুর শক্তি ধ্বংস করতে। যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগে উৎসাহ দেওয়াটা তাহলে কেমন করে ব্যাখ্যা করা যায় ? প্রত্যেকটি যুদ্ধেরই মূল্য দিতে হয়, কখনো কখনো অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতে হয়, 'নিজেকে রক্ষা করার' সংগে এর কি কোন দ্বন্দ্ব নেই ? বস্তুতঃ আদৌ কোন দ্বন্দ্ব নেই, আরও সঠিকভাবে বলা যায় যে, তারা হচ্ছে একই সঙ্গে পরস্পরের বিপরীত ও পরিপূরক। কারণ এই ধরনের আত্মত্যাগ কেবলমাত্র শত্রুকে ধ্বংস করার জন্যই যে প্রয়োজন তা নয়, বরং নিজেকে রক্ষা করার জন্যও তার দরকার—সামগ্রিক ও চিরকালীন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আংশিক ও সাময়িক 'অসংরক্ষণ' (আত্মত্যাগ বা মূল্যদান)। এই মৌলিক নীতি থেকেই উদ্ভূত হয় সমগ্র সামরিক কার্যকলাপের পরিচালিকা-নীতিগুলো—গুলি ছোঁড়ার নীতি (নিজেকে রক্ষা করার জন্য আড়ালে থাকা এবং শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য নিপুণভাবে গুলিচালনা করা) থেকে শুরু করে রণনীতিগত নীতি পর্যন্ত সবই এই মৌলিক নীতির ধারণার সংগে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সমস্ত প্রযুক্তিগত, রণকৌশলগত, যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত নীতিই হচ্ছে এই মৌলিক নীতি কার্যকরী করার শর্ত। নিজেকে রক্ষা করার ও শত্রুকে ধ্বংস করার নীতি হচ্ছে সমস্ত সামরিক নীতির ভিত্তি।

তৃতীয় অধ্যায়

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের ছয়টি বিশেষ রণনীতিগত সমস্যা

এখন বিচার-বিবেচনা করে দেখা যাক, নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের সামরিক কার্যকলাপে কোন্ কর্মপন্থা অথবা নীতি আমাদের গ্রহণ করা উচিত। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে (এবং অন্যান্য সমস্ত বিপ্লবী যুদ্ধে) গেরিলা বাহিনী সাধারণতঃ শূন্য থেকে গড়ে ওঠে এবং ক্ষুদ্র থেকে প্রসারিত হয়ে বিরাট বাহিনীতে পরিণত হয়, তাই তাদের নিজেকে রক্ষা করা ছাড়া নিজেকে বিস্তৃতও করতে হয়। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, নিজেকে রক্ষা বা বিস্তৃত করা ও শত্রুকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য কোন্ কর্মপন্থা অথবা নীতি গ্রহণ করা উচিত?

সাধারণভাবে বলা যায়, মুখ্য কর্মপন্থাগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ (১) উদ্যোগ ও নমনীয়তার সংগে এবং সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধে আক্রমণাত্মক লড়াই করা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা এবং অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই চালানো, (২) নিয়মিত যুদ্ধের সংগে সমন্বয়সাধন;

(৩) ঘাঁটি এলাকা স্থাপন ; (৪) রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণ ; (৫) গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধন ; এবং (৬) পরিচালনার সংগে সঠিক সম্পর্ক। এই ছয়টি ধারা হচ্ছে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের সামগ্রিক রণনীতিগত কর্মসূচী ; আর নিজেকে রক্ষা করা ও বিস্তৃত করার, শত্রুকে ধ্বংস ও বিতাড়িত করার, নিয়মিত যুদ্ধের সংগে সমন্বয়সাধন করার এবং চূড়ান্ত বিজয়লাভ করার জন্য এগুলোই হচ্ছে প্রয়োজনীয় পন্থা।

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্যোগ ও নমনীয়তার সংগে এবং সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধে আক্রমণাত্মক লড়াই করা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা এবং অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই চালানো

এখানে বিষয়টিকে আবার চারটি অংশে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ (১) প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের মধ্যেকার, দীর্ঘস্থায়িত্ব ও দ্রুত নিষ্পত্তির মধ্যেকার এবং অন্তর্লাইন ও বহির্লাইনের মধ্যেকার সম্পর্ক ; (২) সমস্ত কার্যকলাপে উদ্যোগক্ষমতা আয়ত্ত করা ; (৩) সৈন্যশক্তির নমনীয় ব্যবহার; এবং (৪) সমস্ত কার্যকলাপের পরিকল্পনা।

এবারে প্রথমটি ধরা যাক।

যেহেতু জাপান শক্তিশালী দেশ এবং সে-ই আক্রমণ চালাচ্ছে, আর চীন হচ্ছে দুর্বল দেশ এবং সে প্রতিরক্ষা করছে, তাই এটা নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে যে, সামগ্রিকভাবে আমাদের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে রণনীতিগত প্রতিরক্ষাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। যুদ্ধলাইনের বিষয়ে বলতে গেলে বলা যায়, শত্রুরা বহির্লাইনে লড়াই চালাচ্ছে আর আমরা অন্তর্লাইনে লড়াই চালাচ্ছি। পরিস্থিতির এটা একটা দিক। কিন্তু আর একটা দিকও আছে—সেটি হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। শত্রুবাহিনী যদিও শক্তিশালী (অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যদের কোন কোন গুণে ও কোন কোন উপকরণে), কিন্তু সংখ্যায় তারা কম; আর আমাদের বাহিনী যদিও দুর্বল (অনুরূপভাবে শুধু অস্ত্রশস্ত্র ও আমাদের সৈন্যদের কোন কোন গুণে ও কোন কোন উপকরণে), কিন্তু সংখ্যায় অত্যন্ত বিরাট। তাছাড়া শত্রু হচ্ছে একটা বিদেশী জাতি যারা আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে, আর আমরা স্বদেশের মাটির বুকে বিদেশী জাতির সেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করছি ; এ থেকে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে

নিম্নলিখিত রণনীতি ঃ রণনীতিগত প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধাভিযান ও লড়াই করা, রণনীতিগত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধাভিযান ও লড়াই করা এবং রণনীতিগত অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের যুদ্ধাভিযান ও লড়াই করা সম্ভব এবং তা দরকারও। গোটা প্রতিরোধ-যুদ্ধে এই রকমের রণনীতিই গ্রহণ করতে হবে। নিয়মিত যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ—উভয় ক্ষেত্রেই এটা খাটে। গেরিলাযুদ্ধ শুধু এই রণনীতি কার্যকরী করার মাত্রায় ও রূপেই ভিন্ন। গেরিলাযুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ সাধারণতঃ আকস্মিক আক্রমণের রূপ নিয়ে থাকে। যদিও নিয়মিত যুদ্ধের ক্ষেত্রেও আকস্মিক আক্রমণ চালানো উচিত আর তা চালানোও সম্ভব, তবুও আকস্মিকতার মাত্রাটি এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম। গেরিলাযুদ্ধ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি আর যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে শত্রুকে পরিবেষ্টিত করার জন্য আমাদের বহির্লাইনের ঘেরটি খুবই ছোট। এ সবেই দেখা যায় নিয়মিত যুদ্ধের সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধের পার্থক্য।

তাই এটা দেখা যাচ্ছে যে, লড়াই চালনায় গেরিলা বাহিনীগুলিকে যথাসম্ভব বেশি করে সৈন্যশক্তি সমাবেশ করতে হয়, গোপনে ও দ্রুতগতিতে কাজ করতে হয় ; শত্রুর ওপর আকস্মিক আক্রমণ করতে এবং লড়াইয়ের দ্রুত সমাপ্তি ঘটাতে হয়, আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরক্ষা করা, গড়িমসি করা এবং লড়াইয়ের আগে সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়াটাকে তাদের অবশ্যই কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। অবশ্য, গেরিলাযুদ্ধে শুধু যে রণনীতিগত প্রতিরক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে তা নয়, পরন্তু তাতে রণকৌশলগত প্রতিরক্ষাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। লড়াইয়ের সময়ে শত্রুকে আটকে রাখার ও বাহিরী-চৌকী সামরিক ক্রিয়াদি, শত্রুর শক্তি নষ্ট করার ও শত্রুকে হয়রান করে দেবার উদ্দেশ্যে সংকীর্ণ পথে, দুর্গম স্থানে, নদনদীতে অথবা গ্রামে প্রতিরোধের বিন্যাসব্যবস্থা এবং পশ্চাদপসরণের সময়ে ফৌজকে নিরাপদ করার ভারপ্রাপ্ত বাহিনীর কার্যকরণ ইত্যাদি—এ সবই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের রণকৌশলগত প্রতিরক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গেরিলাযুদ্ধের মৌলিক কর্মপন্থাকে অবশ্যই আক্রমণাত্মক হতে হবে, আর চরিত্রের দিক থেকে গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে নিয়মিত যুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। উপরন্তু এই ধরনের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপকে অবশ্যই আকস্মিক আক্রমণের রূপ নিতে হবে, আবার আমাদের শক্তিকে সাড়ম্বরে দেখিয়ে নিজেদের সবকিছু প্রকাশ করে দেওয়াটা নিয়মিত যুদ্ধের থেকে গেরিলাযুদ্ধে আরও বেশি অনুচিত। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে গেরিলা লড়াই কয়েকদিন পর্যন্ত চালু রাখা যেতে পারে, যেমন বিচ্ছিন্ন ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত কোন একটি ক্ষুদ্র শত্রুবাহিনীর ওপরে আক্রমণ কয়েকদিন চালু রাখতে পারা যায় । কিন্তু গেরিলাযুদ্ধে লড়াইয়ের দ্রুত নিষ্পত্তির

প্রয়োজনীয়তা সাধারণভাবে নিয়মিত যুদ্ধের তুলনায় আরও বেশি; শত্রু যে শক্তিশালী এবং আমরা দুর্বল—এ ঘটনা থেকেই তা নির্ধারিত হয়। নিজের বিক্ষিপ্ত চরিত্রের কারণেই গেরিলাযুদ্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে আর শত্রুর মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা, তাকে আটকে রাখা, ক্ষতিসাধন করা এবং জনসাধারণের মধ্যে কাজ চালানোর মতো বহু কাজে ও কর্তব্যে এর নীতি হচ্ছে সৈন্যশক্তিকে ছড়িয়ে রাখা, কিন্তু যখন কোন গেরিলাবাহিনী অথবা কোন গেরিলা সৈন্যসংস্থান শত্রুকে ধ্বংস করতে লেগে থাকে এবং বিশেষ করে তারা যখন শত্রুর আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে কঠোরভাবে চেষ্টা করছে, তখন তাদের প্রধান সৈন্যশক্তিকে অবশ্যই কেন্দ্রীভূত করতে হবে। 'বিরাট শক্তি কেন্দ্রীভূত করে শত্রুর একটা ক্ষুদ্র অংশের ওপরে আঘাত হানা'—এটা আজও গেরিলাযুদ্ধের রণক্ষেত্রে লড়াই চালনার অন্যতম নীতি হয়ে রয়েছে।

তাই এটাও দেখা যাচ্ছে যে, আমরা যদি জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে সামগ্রিকভাবে ধরি, তাহলে শুধু নিয়মিত ও গেরিলা এই উভয়বিধ যুদ্ধের আক্রমণাত্মক যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্রমপুঞ্জিত ফলাফলের মাধ্যমে অর্থাৎ আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের বহু বিজয়লাভের মাধ্যমেই আমরা আমাদের রণনীতিগত প্রতিরক্ষার লক্ষ্য অর্জন করতে পারি এবং চূড়ান্তভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পারি। শুধু দ্রুত নিষ্পত্তির বহু যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ক্রমপুঞ্জিত ফলাফলের মাধ্যমে অর্থাৎ আক্রমণাত্মক যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের দ্রুত নিষ্পত্তির কারণে বহু বিজয় অর্জন করার মাধ্যমেই আমরা আমাদের রণনীতিগত দীর্ঘস্থায়িত্বের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি; এর অর্থ, একদিকে প্রতিরোধ করার শক্তিসামর্থ্য আমাদের বাড়িয়ে নেবার জন্য সময় পাওয়া এবং একই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনকে ও শত্রুর আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করা ও তার প্রতীক্ষা করা, যাতে আমরা রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ শুরু করতে এবং চীন থেকে জাপানী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হই। আমাদের অবশ্যই প্রতিটি লড়াইয়ে উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং রণনীতিগত প্রতিরক্ষার পর্যায়েই হোক কিংবা রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়েই হোক, যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই চালাতে হবে, শত্রুকে ঘিরে ধরে ধ্বংস করতে হবে, তাকে পুরোপুরি ঘিরে ধরতে না পারলেও তার এক অংশকে ঘিরে ধরতে হবে, ঘেরা শত্রুকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে না পারলেও তার এক অংশকে ধ্বংস করতে হবে এবং ঘেরা শত্রুবাহিনীর বহু সংখ্যক সৈন্যকে বন্দী করতে না পারলেও তাদেরকে বিরাট সংখ্যায় হতাহত করতে হবে। এ ধরনের বহু নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের ক্রমপুঞ্জিত ফলাফলের ভেতর দিয়েই শুধু আমরা

শত্রুর ও আমাদের পারস্পরিক অবস্থাকে বদলে দিতে পারি—শত্রুর রণনীতিগত পরিবেষ্টনকে অর্থাৎ তার বহির্লাইনের লড়াই চালনার নীতিকে সম্পূর্ণভাবে চুরমার করে দিতে পারি, আর অবশেষে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সংগে ও জাপানী জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের সংগে সমন্বয়সাধন করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের চারিদিক থেকে ঘিরে ধরতে পারি এবং একেবারেই তাদের ধ্বংস করতে পারি। এইসব ফল অর্জন করতে হয় মুখ্যতঃ নিয়মিত যুদ্ধের মাধ্যমে, গেরিলাযুদ্ধ তাতে শুধু গৌণ অবদানই যোগায়। যাই হোক, উভয়ের ক্ষেত্রেই যা সাধারণ, তা হচ্ছে একটা বিরাট জয়লাভের জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট জয়কে জড়ো করা। এখানেই নিহিত রয়েছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধযুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত ভূমিকা।

এখন গেরিলাযুদ্ধে উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

গেরিলাযুদ্ধে উদ্যোগের অর্থ কি ?

যে-কোন যুদ্ধে যুদ্ধরত উভয় পক্ষই রণক্ষেত্রে, রণভূমিতে, যুদ্ধ-অঞ্চলে এমনকি সমগ্র যুদ্ধে উদ্যোগ নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে, কারণ সৈন্যবাহিনীর পক্ষে উদ্যোগের অর্থ হচ্ছে কার্যকলাপের স্বাধীনতা। উদ্যোগ হারিয়ে ফেললে সৈন্যবাহিনী নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়তে বাধ্য হয়, কার্যকলাপের স্বাধীনতা তার আর থাকে না এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস বা পরাজয়ের বিপদের মুখে সে পড়ে। স্বভাবতঃই, রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় ও অর্ন্তলাইনের লড়াই চালনায় উদ্যোগ হাতে নেওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন আর বর্হিলাইনে আক্রমণাত্মক লড়াই চালনায় সেটা অর্জন করা সহজতর। কিন্তু, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের দুটি মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে—যথা, তার সৈন্যশক্তি অপ্রচুর, আর অন্য দেশের মাটিতে সে লড়াই করছে। উপরন্তু, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনের শক্তিকে কম করে ধরেছে আর জাপানী যুদ্ধবাজদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে পরিচালনায় বহু ভুলত্রুটির উদ্ভব ঘটেছে, যথা শক্তিবৃদ্ধির জন্য নতুন সৈন্যবাহিনী অল্প অল্প করে আনা, রণনীতিগত সমন্বয় বিধানের অভাব, কোন কোন সময়ে আক্রমণের মুখ্য দিক্-নির্দেশের অভাব, কোন কোন লড়াই চালনার সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থতা এবং পরিবেষ্টিত সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে বিফলতা, ইত্যাদি। এইসব ভুলত্রুটিগুলিকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের তৃতীয় দুর্বলতা হিসেবে ধরতে পারা যায়। তাই আক্রমণাত্মক হওয়ার ও বহির্লাইনে লড়াই চালাবার সুবিধা সত্ত্বেও জাপানী যুদ্ধবাজরা ক্রমে ক্রমে উদ্যোগক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে; হারিয়ে ফেলছে তাদের সৈন্যশক্তির অপ্রাচুর্যের (তাদের দেশ ছোট, জনসংখ্যা অল্প, সম্পদসম্ভার

অপ্রতুল, সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতির) কারণে, তারা যে অন্য দেশের মাটিতে যুদ্ধ করছে (তাদের যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও নৃশংস বর্বর যুদ্ধ) এই ঘটনার কারণে এবং পরিচালনায় তাদের বোকামির কারণে। বর্তমানে যুদ্ধটি শেষ করতে জাপান ইচ্ছুক নয়, সমর্থও নয় ; তাছাড়া তার রণনীতিগত আক্রমণ এখনো শেষ হয়ে যায়নি, কিন্তু সাধারণ গতিধারায় যেমন দেখা যায়—তার আক্রমণ একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটা হচ্ছে তার তিনটি দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। জাপান গোটা চীনকে গ্রাস করতে পারে না। জাপান একদিন অবশ্যই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফেলবে, আর তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। পক্ষান্তরে, যুদ্ধের শুরুতে চীন বেশ একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল ; কিন্তু অভিজ্ঞতা লাভ করে এখন সে নয়া নীতি—চলমান যুদ্ধের নীতি, অর্থাৎ যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ, দ্রুত নিষ্পত্তির ও বহির্লাইনের লড়াই চালাবার নীতি গ্রহণ করেছে, আর গ্রহণ করেছে গেরিলাযুদ্ধকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার নীতি, তাই দিনে দিনে উদ্যোগের অবস্থা গড়ে উঠছে।

উদ্যোগের প্রশ্ন কিন্তু গেরিলাযুদ্ধের ক্ষেত্রে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গেরিলাবাহিনী অত্যন্ত কঠিন পরিবেশে সামরিক কার্যকলাপ চালায়—পশ্চাদ্ভাগবিহীন অবস্থায় যুদ্ধ করা, নিজেদের দুর্বল শক্তি নিয়ে শত্রুর শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করা, অভিজ্ঞতার অভাব (গেরিলাবাহিনী যখন নতুন তৈরী করা হয়) এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া প্রভৃতি। তৎসত্ত্বেও গেরিলাযুদ্ধে নিজের উদ্যোগ গড়ে তোলা সম্ভব, আর তার মুখ্য শর্ত হচ্ছে উপরে উল্লিখিত শত্রুর তিনটি দুর্বলতাকে কাজে লাগানো। শত্রুর সৈন্যশক্তির অপ্রাচুর্যের সুযোগ নিয়ে (সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে), গেরিলাবাহিনীগুলি বিরাট বিরাট এলাকাগুলিকে তাদের সামরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র হিসেবে সাহসের সংগে ব্যবহার করতে পারে ; শত্রু যে বিদেশী আক্রমণকারী, সে যে চরমতম বর্বর নীতি অনুসরণ করছে, এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে গেরিলা বাহিনীগুলি অকুতোভয়ে কোটি কোটি জনগণের সমর্থনলাভ করতে পারে ; শত্রুর পরিচালনার বোকামির সুযোগ নিয়ে গেরিলা বাহিনীগুলি সাহসের সংগে তাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে। নিয়মিত বাহিনীর পক্ষে শত্রুর এই সমস্ত দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা ও তাকে পরাজিত করার জন্য এই সুযোগকে কাজে লাগানো অবশ্য কর্তব্য, গেরিলাবাহিনীর পক্ষে এইরকম করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গেরিলাবাহিনীর নিজের দুর্বলতাকে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে কমিয়ে আনতে পারা যায়। উপরন্তু, কোন কোন সময়ে এই

দুর্বলতাগুলিই আবার উদ্যোগলাভের অনুকূল শর্ত হয়ে ওঠে। যেমন ধরা যাক ঃ গেরিলাবাহিনীগুলি ছোট ; ঠিক সেই কারণেই তারা শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে রহস্যজনকভাবে আবির্ভূত ও অদৃশ্য হতে পারে, শত্রু তাদের কিছুই করতে পারে না। তারা কার্যকলাপে এত বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে, যা বিরাটাকার নিয়মিত বাহিনী কখনো করতে পারে না।

কয়েকদিক থেকে শত্রু যখন সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণ চালায়, তখন গেরিলাবাহিনীর পক্ষে উদ্যোগ হাতে রাখা কঠিন আর উদ্যোগ হারিয়ে ফেলা খুবই সহজ। এ অবস্থায় সঠিকভাবে তার মূল্যায়ন ও বিন্যাসব্যবস্থা না করা হলে গেরিলাবাহিনীর সহজেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ার সম্ভবনা দেখা দেয়, আর তার ফলে শত্রুর সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে তা ব্যর্থ হয়। শত্রু যখন প্রতিরক্ষাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আর আমরা যখন আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ চালাই, তখনো এটা ঘটতে পারে। তাই উদ্যোগ উদ্ভূত হয় পরিস্থিতির (আমাদের নিজেদের ও শত্রুর) সঠিক মূল্যায়ন থেকে এবং সঠিক সামরিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসব্যবস্থা থেকে। বাস্তব অবস্থার সংগে সংগতিবিহীন এক হতাশাপূর্ণ মূল্যায়ন এবং তার থেকে উদ্ভূত নিষ্ক্রিয় বিন্যাসব্যবস্থার ফলে আমরা নিঃসন্দেহে উদ্যোগ হারিয়ে ফেলব আর নিজেদেরকে একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নিক্ষেপ করব। পক্ষান্তরে, বাস্তব অবস্থার সংগে সংগতিবিহীন অতি-আশাবাদী মূল্যায়ন ও তার থেকে উদ্ভূত দুঃসাহসিক (অপ্রয়োজনীয় দুঃসাহসিকতা) বিন্যাসব্যবস্থাও উদ্যোগের হানি ঘটাবে এবং আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত হতাশাবাদীদের অনুরূপ অবস্থায় নিয়ে যাবে। উদ্যোগ কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তির কোন সহজাত গুণ নয়, পরন্তু সেটা হচ্ছে এমন একটা কিছু, যা বুদ্ধিমান নেতা বাস্তব অবস্থার সংস্কারমুক্ত পর্যালোচনা ও সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এবং সঠিক সামরিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। সুতরাং, উদ্যোগ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যাকে সচেতন প্রয়াসের দ্বারা লাভ করতে হয়, এটা তৈরী মাল হিসেবে হাতে পাওয়া যায় না।

কোন ভুল মূল্যায়ন ও বিন্যাসব্যবস্থার কারণে অথবা শত্রুর অত্যন্ত প্রবল চাপের ফলে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়তে বাধ্য হলে গেরিলাবাহিনীর অবশ্য কর্তব্য হবে সেই অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য কঠোর চেষ্টা চালানো। কেমন করে তা করা যাবে, সেটা নির্ভর করে অবস্থার ওপরে। বহু ক্ষেত্রে দরকার 'সরে যাওয়া'। সরে যাওয়ার সামর্থ্য হচ্ছে গেরিলাবাহিনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে বেরোবার ও উদ্যোগকে পুনরায় অর্জন করার মুখ্য পদ্ধতি হচ্ছে সরে যাওয়া। কিন্তু এটাই একমাত্র পদ্ধতি নয়। শত্রু যখন পুরোদমে ক্ষমতাশালী

আর আমরা যখন চরম অসুবিধায়, প্রায়শঃই ঠিক সেই সময়টাই হচ্ছে এমন একটি মুহূর্ত, যখন অবস্থাটা ঘুরতে শুরু করে শত্রুর প্রতিকূলে এবং আমাদের অনুকূলে। 'আর একটু বেশি সময় ধরে সহ্য করার' প্রয়াসে প্রায়শঃই একটা অনুকূল পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটে ও উদ্যোগ পুনরায় অর্জিত হয়।

এবারে নমনীয়তার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

নমনীয়তা হচ্ছে উদ্যোগের একটি মূর্ত অভিব্যক্তি। নিয়মিত যুদ্ধের তুলনায় গেরিলাযুদ্ধেই সৈন্যশক্তির নমনীয় ব্যবহার অধিকতর আবশ্যক।

গেরিলাযুদ্ধের পরিচালককে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, শত্রু ও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান পরিস্থিতিটিকে পরিবর্তন করার ও উদ্যোগক্ষমতা লাভ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে সৈন্যশক্তির নমনীয় ব্যবহার। গেরিলাযুদ্ধের প্রকৃতিই এমন যে, সৈন্যশক্তিকে অবশ্যই হাতের কর্তব্যভার অনুসারে এবং শত্রুর অবস্থা, ভৌগোলিক পরিবেশ ও স্থানীয় অধিবাসীদের মনোভাব প্রভৃতি অবস্থা অনুসারে নমনীয়ভাবে ব্যবহার করতে হবে; তার মুখ্য পদ্ধতি হচ্ছে সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ব্যবহার করা, সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে ব্যবহার করা এবং সৈন্যশক্তির অবস্থান পরিবর্তন করা। গেরিলাবাহিনীগুলির ব্যবহারের ব্যাপারে, গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকের অবস্থাটা হচ্ছে জালক্ষেপণকারী মৎস্যজীবীর মতো, জালটাকে তার খুব ছড়িয়ে ফেলতে হবে আর দৃঢ়ভাবে চেপে গুটিয়ে আনতে হবে। জাল ছড়িয়ে ফেলবার সময়ে জলের গভীরতা, স্রোতের গতি এবং কোন বাধাবিপত্তি রয়েছে কিনা, এ সবকিছুই মৎস্যজীবীকে অবশ্যই ভাল করে দেখে নিতে হবে; অনুরূপভাবেই, গেরিলাবাহিনীগুলিকে বিক্ষিপ্ত করে ব্যবহার করার সময়ে গেরিলাযুদ্ধের পরিচালককেও সযত্নে অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, পরিস্থিতির অজ্ঞানতা ও ভুল কার্যকলাপের কারণে যেন ক্ষতি ভোগ করতে না হয়। জালটিকে দৃঢ়ভাবে চেপে গুটিয়ে আনার জন্য মৎস্যজীবী যেমন জালের দড়িটাকে শক্ত হাতে অবশ্যই ধরে রাখে, তেমনি গেরিলাযুদ্ধের পরিচালককেও তার সমস্ত বাহিনীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ অবশ্যই বজায় রাখতে হবে এবং তার মুখ্য শক্তির পর্যাপ্ত পরিমাণ অংশকে সব সময়েই নিজের হাতের কাছে তৈরী রাখতে হবে। মাছ ধরার ব্যাপারে যেমন ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করা দরকার, ঠিক তেমনি গেরিলাবাহিনীর পক্ষেও ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তন করা দরকার। সৈন্যশক্তি বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়া, সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা এবং সৈন্যশক্তির অবস্থান পরিবর্তন করা গেরিলাযুদ্ধে নমনীয়ভাবে সৈন্যশক্তির ব্যবহারের তিনটি পদ্ধতি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, গেরিলাবাহিনীর সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়াকে, অর্থাৎ 'সমগ্রকে অংশে অংশে ভেঙে দেওয়াকে'— মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত এই কয়েকটি ধরনের অবস্থায় কাজে লাগানো হয় ঃ (১) শত্রু আত্মরক্ষামূলক কার্যকলাপে রত থাকে এবং আমাদের সৈন্যশক্তিকে জড়ো করে লড়াই করার সুযোগ সাময়িকভাবে থাকে না বলে আমরা যখন ব্যাপক ফ্রন্টে শত্রুকে বিপদগ্রস্ত করতে চাই, তখন; (২) যে এলাকায় শত্রুর সৈন্যশক্তি দুর্বল সেখানে আমরা যখন ব্যাপকভাবে তাকে হয়রান ও ক্ষতিসাধন করতে চাই, তখন; (৩) শত্রুর সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণকে আমরা যখন ভাঙতে পারি না এবং নিজেদের আমরা যখন অপেক্ষাকৃত কম প্রকট করে সরে পড়তে চেষ্টা করি, তখন; (৪) ভৌগলিক পরিবেশ বা রসদাদি সরবরাহের দ্বারা আমরা যখন সীমাবদ্ধ ; অথবা (৫) একটা ব্যাপক এলাকা জুড়ে আমরা যখন জনসাধারণের মধ্যে কাজ চালাই। কিন্তু পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেবার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত ঃ (১) একেবারে সমানভাবে যেন সৈন্যশক্তিকেআমরা কোনদিনই বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে না দিই; পরন্তু কৌশলী অভিযানের জন্য সুবিধাজনক এলাকায় সৈন্যশক্তির একটা অপেক্ষাকৃত বিরাট অংশকে আমাদের রেখে দেওয়া উচিত, যাতে করে সম্ভাব্য জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করা যায় এবং ছড়িয়ে দেওয়ার ভেতরে যে কর্তব্যটি সম্পাদিত করা হচ্ছে, তার একটা ভারকেন্দ্র থাকে; আর (২) বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়া প্রত্যেকটি বাহিনীর জন্য সুস্পষ্ট কর্তব্যভার, কার্যকলাপের ক্ষেত্র, কার্যকলাপের মেয়াদ, একত্র মিলবার স্থান ও যোগাযোগের পদ্ধতি প্রভৃতি আমাদের ধার্য করে দেওয়া উচিত।

সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে ব্যবহার করার পদ্ধতিটি অর্থাৎ 'অংশগুলিকে সমগ্রে সম্মিলিত করার' পদ্ধতিটি শত্রু যখন আক্রমণ চালায় তখন তাকে ধ্বংস করার জন্য প্রায়শঃ প্রয়োগ করা হয়; কখনো কখনো একে প্রয়োগ করা হয় শত্রু যখন আত্মরক্ষামূলক কার্যকলাপে রত তখন তার কিছু কিছু অ-চলমান সৈন্যদলকে ধ্বংস করার জন্য। সৈন্যশক্তির কেন্দ্রীভূতকরণ বলতে চরম কেন্দ্রীভূতকরণ বোঝায় না, পরন্তু বোঝায় একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকে ব্যবহারের জন্য মুখ্য সৈন্যশক্তি জড়ো করা, এবং শত্রুকে আটকে রাখার, তাকে হয়রান ও তার ক্ষতিসাধন করার অথবা জনসাধারণের মধ্যে কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে অন্যান্য দিকে ব্যবহার করার জন্য সৈন্যশক্তির অংশ বিশেষ রাখা বা পাঠিয়ে দেওয়া।

পরিস্থিতি অনুযায়ী নমনীয়ভাবে সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়া বা তাকে কেন্দ্রীভূত করা গেরিলাযুদ্ধের প্রধান পদ্ধতি হলেও আমাদের সৈন্যশক্তিকে কেমন করে নমনীয়ভাবে সরিয়ে নেওয়া (অবস্থান পরিবর্তন করা) যায়, তাও আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। যখন শত্রু বুঝবে যে গেরিলাবাহিনী সাংঘাতিকভাবে তাকে বিপদগ্রস্ত করছে, তখনই সে গেরিলাদের দমন করার জন্য সৈন্য পাঠাবে অথবা আক্রমণ করবে। অতএব গেরিলাবাহিনীগুলিকে পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। লড়াই করা সম্ভব হলে যেখানে তারা আছে সেখানেই তাদের লড়াই করা উচিত ; আর সম্ভব না হলে অন্যত্র সরে যেতে তাদের দেরী করা উচিত নয়। কখনো কখনো শত্রু সৈন্যবাহিনীগুলোকে একে একে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে গেরিলাবাহিনীগুলো এক জায়গায় শত্রুকে ধ্বংস করে অবিলম্বে অন্য জায়গায় শত্রুকে শেষ করে ফেলবার জন্য সরে যেতে পারে ; এমনও হয় যে, কোন বিশেষ স্থানে অবস্থা যুদ্ধের অনুকূল না হলে অবিলম্বে সেখানকার শত্রুদলকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র শত্রুর সংগে লড়াই করতে তাদের যেতে হতে পারে। কোন বিশেষ স্থানে শত্রুবাহিনীর প্রবলতার দরুন পরিস্থিতি বিশেষ গুরুতর হয়ে উঠলে গেরিলাবাহিনীর গড়িমসি করে সেখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়, পরন্তু বিদ্যুৎগতিতে তাদের অন্যত্রে সরে পড়া উচিত। সাধারণতঃ সৈন্যশক্তিকে গোপনে ও ত্বরিৎগতিতে স্থানান্তরিত করতে হয়। শত্রুকে ফাঁকি দেবার, তাকে ফাঁদে ফেলবার ও বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে তাদের সর্বদা কলাকৌশল ব্যবহার করা উচিত, ধরা যাক, পূবের দিকে আক্রমণের ভান করে পশ্চিম দিকে আক্রমণ চালানো, এই মুহূর্তে দক্ষিণে আবার পর মুহূর্তেই উত্তরে এসে হাজির হওয়া, আঘাত হেনেই সরে পড়া ও রাতে কার্যকলাপ চালানো, প্রভৃতি।

সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়ার, কেন্দ্রীভূত করার এবং স্থানান্তরিত করার নমনীয়তা হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধে উদ্যোগের মূর্ত অভিব্যক্তি; অপরপক্ষে, অনমনীয়তা ও গতিহীনতা অবশ্যই আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফেলবে ও অপ্রয়োজনীয় লোকসান ঘটাবে। কিন্তু কোন নেতা বিচক্ষণ কিনা, তা নমনীয়ভাবে সৈন্যশক্তির ব্যবহার করার গুরুত্ব বোঝার মধ্যেই শুধু নিহিত নয়, বরং বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে যথাসময়ে সৈন্যশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়ার, কেন্দ্রীভূত করার ও স্থানান্তরিত করার নিপুণতার মধ্যেও তা নিহিত। পরিবর্তন আন্দাজ করার ও ঝোপ বুঝে কোপ মারার উপযুক্ত সময় নির্বাচনের এই বিচক্ষণতা

সহজে অর্জন করা যায় না; খোলা মনে যারা পর্যালোচনা করে এবং অধ্যবসায়ীভাবে অনুসন্ধান ও চিন্তা করে, শুধু তারাই তা অর্জন করতে পারে। নমনীয়তা যাতে হঠকারী কার্যকলাপে পরিণত না হয়, তার জন্য সাবধানে পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনা অপরিহার্য।

পরিশেষে, পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রশ্নটির আলোচনায় আসা যাক। পরিকল্পনা ছাড়া গেরিলাযুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব। গেরিলাযুদ্ধ এলোমেলোভাবে চালানো যেতে পারে—এই ধারণার অর্থ হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধ নিয়ে খেলা করা অথবা গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ দেওয়া। কোন গোটা গেরিলা এলাকার কার্যকলাপ, অথবা একটি গেরিলাবাহিনী বা গেরিলা সৈন্যসংস্থানের কার্যকলাপ আরম্ভ করার আগে যথাসম্ভব পুংখানুপুংখ পরিকল্পনা অবশ্যই করে নিতে হবে, এটাই হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের আগাম প্রস্তুতি। অবস্থাকে উপলব্ধি করা, কর্তব্য স্থির করা, সৈন্যশক্তির বিন্যাস ব্যবস্থা করা, সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া, রসদাদির সরবরাহের ব্যবস্থা করা, সাজসরঞ্জামগুলিকে সাজিয়ে রাখা, জনসাধারণের সাহায্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার করা প্রভৃতি—এ সবই হচ্ছে গেরিলা নেতাদের কাজের অঙ্গ; এইসব কাজকে তাঁদের অবশ্যই যত্ন সহকারে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে, কার্যকরীভাবে এগুলিকে সম্পাদন করতে হবে এবং কিভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে তা পরখ করে দেখতে হবে। অন্যথায় কোন উদ্যোগ, নমনীয়তা ও আক্রমণই সম্ভব হবে না। এটা ঠিক যে নিয়মিত যুদ্ধে যে উচ্চ মানের পরিকল্পনার অবকাশ থাকে, গেরিলাযুদ্ধের অবস্থায় তা থাকে না, এবং গেরিলাযুদ্ধে উচ্চ মানের পুংখানুপুংখ পরিকল্পনা করার চেষ্টা করা হলে সেটা ভুল হবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা অনুসারে যতটা সম্ভব পুংখানুপুংখভাবে পরিকল্পনা করা দরকার, কারণ এটা বোঝা উচিত যে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করাটা তামাশা নয়।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলিতে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত নীতির প্রথম সমস্যা—উদ্যোগের সংগে, নমনীয় ও সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে আক্রমণাত্মক লড়াই করা, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা এবং অন্তর্লাইনে যুদ্ধ চালনার মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই চালিয়ে যাবার নীতিটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিতে এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান হলেই সামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গেরিলাযুদ্ধের জয়লাভের গুরুত্বপূর্ণ গ্যারান্টি পাওয়া যায়।

এখানে বহু বিষয়ের আলোচনা করা হলেও সেগুলির সবই ঘুরপাক খাচ্ছে যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে আক্রমণ চালানোকে কেন্দ্র করে। আক্রমণে বিজয়লাভ করার পরেই শুধু উদ্যোগকে চূড়ান্তভাবে করায়ত্ত করতে পারা যায়। সব আক্রমণাত্মক লড়াইকে আমাদের নিজেদের উদ্যোগে সংগঠিত করতে হবে, বাধ্যবাধকতার চাপে পড়ে আক্রমণ শুরু করা অবশ্যই চলবে না। আক্রমণাত্মক লড়াই চালনার প্রয়াসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় সৈন্যশক্তি ব্যবহারের নমনীয়তা ; আর পরিকল্পনাও অনুরূপভাবে দরকার মুখ্যতঃ আক্রমণের জয়লাভকে সুনিশ্চিত করার জন্য। রণকৌশলগত প্রতিরক্ষা যদি আক্রমণ চালাবার কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য না করে, তবে তা অর্থহীন। দ্রুত নিষ্পত্তি বলতে একটা আক্রমণের গতিমাত্রা বোঝায় ; আর বহির্লাইন বলতে বোঝায় আক্রমণের কর্মপরিধি এলাকা। শত্রুকে ধ্বংস করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আক্রমণ এবং সেটাই হচ্ছে আবার নিজেকে রক্ষা করারও মুখ্য উপায়। নিছক প্রতিরক্ষা ও পশ্চাদপসরণ কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে শুধুমাত্র একটি সাময়িক ও আংশিক ভূমিকাই গ্রহণ করতে পারে, শত্রুকে ধ্বংস করার কাজে তা একেবারেই অকেজো।

উপরোক্ত নীতি নিয়মিত যুদ্ধে ও গেরিলাযুদ্ধে—উভয়ক্ষেত্রেই মূলতঃ একরকম ; শুধুমাত্র অভিব্যক্তির রীতিতেই কিছুটা পার্থক্য ঘটে। কিন্তু গেরিলাযুদ্ধের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজন। অভিব্যক্তির রীতিতে এই পার্থক্য থাকার জন্যই নিয়মিত যুদ্ধের লড়াই চালনার পদ্ধতিগুলির থেকে গেরিলাযুদ্ধের লড়াই চালনার পদ্ধতিগুলি ভিন্ন হয়; আর দুই রীতির এই পার্থক্যকে গুলিয়ে ফেললে গেরিলাযুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব হয়ে উঠবে।

পঞ্চম অধ্যায়

নিয়মিত যুদ্ধের সংগে সমন্বয়সাধন

গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে নিয়মিত যুদ্ধের সংগে তার সমন্বয়সাধন। এটা হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের বাস্তব কার্যকলাপের প্রকৃতি অনুসারে লড়াই চালানোর ব্যাপারে গেরিলাযুদ্ধের ও নিয়মিত যুদ্ধের মধ্যেকার সম্পর্কটাকে ব্যাখ্যা করার বিষয়। শত্রুকে কার্যকরীভাবে পরাজিত করার কাজে এই সম্পর্কের উপলব্ধিটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়মিত যুদ্ধের সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমন্বয় তিন রকমের : রণনীতির যুদ্ধাভিযানের ও লড়াইয়ের সমন্বয়।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, গেরিলাযুদ্ধে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে শত্রুকে পঙ্গু করার, তাকে আটকে রাখার ও তার সরবরাহ পথ নষ্ট করে দেবার ভূমিকা পালন করছে এবং সারা দেশের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে মানসিকভাবে অনুপ্রাণিত করছে—এবং এ সবই হচ্ছে রণনীতিগতভাবে নিয়মিত যুদ্ধের সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমন্বয়সাধন। তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের গেরিলাযুদ্ধের কথাই ধরা যাক। অবশ্য, দেশব্যাপী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার আগে, সেখানে সমন্বয়ের প্রশ্নটিই ওঠেনি, কিন্তু এই যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে এ ধরনের সমন্বয়ের তাৎপর্যটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। সেখানকার গেরিলারা শত্রুর যে সৈনিকটিকে নিহত করে, তাদের ওপরে যে গুলিটি ব্যয় করতে তারা শত্রুকে বাধ্য করে, এবং তারা শত্রুর যে সৈনিকটিকে মহাপ্রাচীরের দক্ষিণে অগ্রসর হতে বাধা দেয়, প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোটা শক্তিতে সেগুলির প্রত্যেকটিকে অবদান হিসেবে ধরা যেতে পারে। উপরন্তু, এটাও স্পষ্ট যে, মানসিক দিক থেকে সেগুলি গোটা শত্রুবাহিনী ও সমগ্র জাপানের ওপর হতাশাকারী প্রভাব ফেলছে এবং আমাদের গোটা সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ওপর ফেলছে উৎসাহজনক প্রভাব। পিপিং-সুইয়ুয়ান, পিপিং-হানখৌ, তিয়েনসিন-পুখৌ, তাতুং-পুচৌ, চেংতিং-তাইয়ুয়ান, আর শাংহাই-হাংচৌ রেলপথের দুই পাশে চালিত গেরিলাযুদ্ধ যে রণনীতিগত সমন্বয়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা আরও স্পষ্ট। বর্তমানে শত্রু যখন রণনীতিগত আক্রমণ করছে, তখনই নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সংগে সমন্বয়সাধন করে গেরিলাবাহিনী যে শুধু রণনীতিগত প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকাই গ্রহণ করছে তাই নয়; শত্রু যখন রণনীতিগত আক্রমণ শেষ করে তার অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে সুরক্ষিত করার কাজে লিপ্ত হবে, তখন নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সংগে শুধুমাত্র সমন্বয়সাধন করে শত্রুর রক্ষাত্মক কার্যকলাপে সে যে বাধা দেবে তাই নয়; উপরন্তু যখন নিয়মিত সৈন্যবাহিনী রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ শুরু করবে, তখন নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সংগে সমন্বয়সাধন করে শত্রুকে তাড়িয়ে দেবে এবং সমস্ত হৃত ভূমিকে পুনরুদ্ধার করবে গেরিলাবাহিনী। রণনীতিগত সমন্বয়সাধনে গেরিলাযুদ্ধের মহান ভূমিকাটিকে উপেক্ষা করা অবশ্যই চলবে না। গেরিলাবাহিনীর এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর পরিচালকদের এই ভূমিকাটিকে অবশ্যই স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।

এ ছাড়া, গেরিলাযুদ্ধ যুদ্ধাভিযানে নিয়মিত যুদ্ধকর্মের সংগে সমন্বয়সাধনের ভূমিকাও গ্রহণ করে। উদাহরণ, ইয়ানমেনকুয়ানের উত্তর ও দক্ষিণে গেরিলাবাহিনী তাতুং-পুচৌ রেলপথটিকে এবং পিংসিংকুয়ান ও ইয়াংকাংখৌ-এর দুই মোটরগামী পথটিকে ধ্বংস করে তাইয়ুয়ানের উত্তরস্থ সিনখৌ যুদ্ধাভিযানে সমন্বয়সাধনের

যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা খুবই উল্লেখযোগ্য। আর একটি উদাহরণ, শত্রুর দ্বারা ফেংলিংতু দখলের পর গোটা শানসী প্রদেশের এধার থেকে ওধার অবধি ব্যাপকভাবে চালিত গেরিলাযুদ্ধ (যা প্রধানতঃ নিয়মিত সৈন্যবাহিনী চালাচ্ছে) শেনসী প্রদেশে হোয়াংহো নদীর পশ্চিমের ও হোনান প্রদেশে হোয়াংহো নদীর দক্ষিণের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের সংগে যে যুদ্ধাভিযানগত সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করেছে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আবার শত্রু যখন দক্ষিণ শানতুং আক্রমণ করেছিল, তখন গোটা উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশে চালিত গেরিলাযুদ্ধ আমাদের সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ শানতুংয়ের যুদ্ধাভিযানের সংগে সমন্বয়সাধনে বিরাট অবদান জুগিয়েছিল। এ ধরনের কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগস্থ সমস্ত গেরিলা ঘাঁটি এলাকার পরিচালকদেরকে অথবা সাময়িকভাবে সেখানে প্রেরিত গেরিলা সৈন্যসংস্থানের পরিচালকদেরকে অবশ্যই নিজেদের সৈন্যশক্তিকে ভালভাবে বিন্যাস করতে হবে, সময় ও স্থানীয় অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে শত্রুকে পঙ্গু করে ফেলার, তাকে আটকে রাখার, তার সরবরাহ পথ নষ্ট করে দেবার এবং অন্তর্লাইনে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে রত আমাদের সৈন্যবাহিনীকে মানসিক দিক থেকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে এবং এইভাবে যুদ্ধাভিযানে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব বহন করার জন্য শত্রুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে দুর্বল স্থানে সক্রিয়ভাবে কার্যকলাপ চালাতে হবে। নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সংগে যুদ্ধাভিযানে সমন্বয়সাধন করার দিকে মনোযোগ না দিয়ে প্রত্যেকটি গেরিলা এলাকা অথবা প্রত্যেকটি গেরিলাবাহিনী যদি শুধু নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী চলে, তাহলে, যদিও সাধারণ রণনীতিগত সামরিক কার্যকলাপে তারা সমন্বয়সাধনের কিছু ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকবে, তবুও যুদ্ধাভিযানে সমন্বয়সাধন না করার কারণে, তাদের এই রণনীতিগত সমন্বয়সাধনের তাৎপর্য কমে যাবে। এই বিষয়ে গেরিলাযুদ্ধের সমস্ত পরিচালকদের গভীরভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে পৌঁছাবার জন্য ব্যাপকভাবে বেতার যোগাযোগ স্থাপন করা সমস্ত অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর গেরিলাবাহিনী ও গেরিলা সৈন্যসংস্থানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে লড়াইয়ের সমন্বয়সাধন, অর্থাৎ রণক্ষেত্রে লড়াই করার সমন্বয়সাধনই হচ্ছে অন্তর্লাইনে রণক্ষেত্রের নিকটবর্তী সমস্ত গেরিলাবাহিনীর কর্তব্য। অবশ্য এটা শুধু নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর কাছাকাছি গেরিলাবাহিনী অথবা নিয়মিত সৈন্যবাহিনী থেকে সাময়িকভাবে প্রেরিত গেরিলাবাহিনীর বেলায়ই খাটে। এইরকম অবস্থায় গেরিলাবাহিনীকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর পরিচালকদের নির্দেশানুসারে তার ওপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। সাধারণতঃ এ কাজ হচ্ছে শত্রুবাহিনীর কোন অংশকে আটকে রাখা, শত্রুর সরবরাহ পথ

নষ্ট করে দেওয়া, শত্রুর অবস্থার পর্যবেক্ষণ করা এবং পথপ্রদর্শক হওয়া, ইত্যাদি। নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর পরিচালকদের নির্দেশ না থাকলেও, গেরিলাবাহিনীকে নিজের উদ্যোগে এইসব কাজ করা উচিত। হাত গুটিয়ে বসে থাকার, নড়াচড়া ও লড়াই না করার অথবা লড়াই না করে নড়াচড়া করার মনোভাব গেরিলাবাহিনীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসহনীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঘাঁটি এলাকা স্থাপন

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন সম্পর্কিত সমস্যা, যে সমস্যার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বটা যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র ও নির্মমতা থেকে আসে। কারণ আমাদের হৃত ভূখণ্ডের পুনরুদ্ধারটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব হবে, যখন দেশজোড়া রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ শুরু হবে ; ততদিনে শত্রুর ফ্রন্ট চীনের মধ্যভাগের গভীর অবধি বিস্তৃত হয়ে পড়বে এবং দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করে ফেলবে, আর আমাদের মাতৃভূমির একটা ছোট ভাগ, এমনকি হয়তো-বা তার বড় ভাগটাই, শত্রুর কবলে পড়ে তার পশ্চাদ্ভাগে পরিণত হবে। শত্রু-কবলিত এই বিরাট এলাকায় সর্বত্রই আমাদের ছড়িয়ে দিতে হবে গেরিলাযুদ্ধ, শত্রুর পশ্চাদ্ভাগকে তার ফ্রন্টে পরিণত করতে হবে, আর তার দখলীকৃত গোটা ভূখণ্ডে অবিরামভাবে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতে হবে তাকে। যতদিন অবধি আমাদের রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ শুরু না হয় এবং যতদিন অবধি আমাদের হৃত ভূখণ্ডের পুনরুদ্ধার না হয়, ততদিন পর্যন্ত শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অটলভাবে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া দরকার ; কতদিন অবধি চালিয়ে যাওয়া দরকার যদিও তা সঠিক করে নির্ধারণ করা অসম্ভব, কিন্তু, নিঃসন্দেহে সেজন্য বেশ দীর্ঘ সময় লাগবে। এই কারণেই যুদ্ধটা হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। একই সময়ে অধিকৃত এলাকায় নিজের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে শত্রু অবশ্যই গেরিলাযুদ্ধের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামকে দিন দিন তীব্রতর করবে, বিশেষ করে তার রণনীতিগত আক্রমণ বন্ধ করার পরে, অবশ্যই গেরিলাবাহিনীকে নিষ্ঠুরভাবে দমন-পীড়ন শুরু করবে। এইভাবে দীর্ঘস্থায়িত্বের সাথে নির্মমভাবে যোগ হওয়ায় শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে ঘাঁটি এলাকা ব্যতিরেকে গেরিলাযুদ্ধকে জীইয়ে রাখাটা অসম্ভব।

তাহলে, গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকাগুলো কি ? এগুলো হচ্ছে রণনীতিগত ঘাঁটি, যার ওপর নির্ভর করেই গেরিলাবাহিনী নিজেদের রণনীতিগত কর্তব্য

পালন করে এবং নিজেদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার, শত্রুকে ধ্বংস করার ও হটিয়ে দেবার লক্ষ্য অর্জন করে। এরকম রণনীতিগত ঘাঁটি না থাকলে আমাদের সকল রণনীতিগত কর্তব্য পালন করার এবং যুদ্ধের লক্ষ্য হাসিল করার জন্য নির্ভর করার মতো কিছুই থাকবে না। পশ্চাদ্ভাগবিহীন লড়াই হচ্ছে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে গেরিলাযুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য। কারণ গেরিলাবাহিনী দেশের সাধারণ পশ্চাদ্ভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন। তবু, ঘাঁটি এলাকা বাদ দিয়ে গেরিলাযুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকতে এবং বিকাশলাভ করতে পারে না। বস্তুতঃ ঘাঁটি এলাকাগুলোই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের পশ্চাদ্ভাগ।

ইতিহাসে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহী ধরনের বহু কৃষক-যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সেগুলির কোনটাই সফল হয়নি। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিবিদ্যার বর্তমান যুগে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীর পদ্ধতি ব্যবহার করে বিজয়লাভ করার প্রচেষ্টাটা এখন একেবারেই অমূলক কল্পনা। তবু, আজকের নিঃস্ব কৃষকদের মধ্যে এই ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীর ভাবটা এখনো রয়ে গেছে, আর তাদের এই ভাবটা গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকদের মস্তিষ্কে দানা বেঁধে ওঠে যে, ঘাঁটি এলাকার না আছে কোন দরকার, না আছে তার কোন গুরুত্ব। তাই, গেরিলাযুদ্ধে পরিচালকদের মস্তিস্ক থেকে এই ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীর ভাবকে দূর করে দেওয়াটা হচ্ছে ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের নীতি নির্ধারণ করার পূর্বশর্ত। ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা উচিত কিনা এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা উচিত কিনা—এই সমস্যাটা, অন্য কথায়, ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের মতাদর্শ এবং ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীর মতাদর্শের মধ্যেকার সংগ্রামের সমস্যাটা যে-কোন গেরিলাযুদ্ধেই উঠে থাকে, এবং কিছুটা পরিমাণে আমাদের জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই, ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদের ধারণার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম হবে একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া। ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহীবাদকে পুরোপুরি ভাবে পরাভূত করা হলে এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার নীতিকে চালু করা ও কাজে প্রয়োগ করা হলেই কেবল দীর্ঘকাল ধরে গেরিলাযুদ্ধ বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল অবস্থা দেখা দেয়।

ঘাঁটি এলাকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার পর ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের সময়ে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি অবশ্যই উপলব্ধি করা ও সমাধান করা উচিত। এই সমস্যাগুলি হচ্ছে ঃ বিভিন্ন ধরনের ঘাঁটি এলাকা, গেরিলা অঞ্চল ও ঘাঁটি এলাকা, ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের শর্ত, ঘাঁটি এলাকার সুদৃঢ়ীকরণ ও সম্প্রসারণ এবং আমাদের ও শত্রুর দ্বারা ব্যবহৃত কয়েক প্রকারের পরিবেষ্টন।

১। বিভিন্ন ধরনের ঘাঁটি এলাকা

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকাগুলি প্রধানতঃ তিন ধরনের ঃ পার্বত্য অঞ্চলের ঘাঁটি এলাকা, সমতলভূমির ঘাঁটি এলাকা ও নদী-হ্রদ মোহনা অঞ্চলের ঘাঁটি এলাকা।

পার্বত্য অঞ্চলে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার সুবিধাটি সুস্পষ্ট, ছাংপাই[১], উতাই[২], তাইহাং[৩], তাইশান[৪], ইয়ানশান[৫], মাওশান[৬] পর্বতে যেসব ঘাঁটি এলাকা স্থাপিত হয়েছে বা হচ্ছে অথবা হবে, তার সবগুলিই এই ধরনের। এইসব ঘাঁটি এলাকা হচ্ছে এমন স্থান, যেখানে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাওয়া সবচেয়ে বেশি সম্ভব, সেগুলি হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দূর্গ। শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধকে আমাদের পরিপুষ্ট করে তুলতেই হবে এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করতেই হবে।

অবশ্য, পর্বতের তুলনায় সমতলভূমি কিছুটা কম উপযোগী, কিন্তু সমতলভূমিতেও গেরিলাযুদ্ধের বিকাশসাধন করা বা কোন ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা কোনরকমেই অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ, হোপেই সমতলভূমিতে এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম শানতুংয়ের সমতলভূমিতে ব্যাপকবিস্তৃত গেরিলাযুদ্ধ এ কথাই প্রমাণ করে যে, সমতলভূমিতেও গেরিলাযুদ্ধের বিকাশসাধন করা সম্ভব। সমতলভূমি এলাকাগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে এখনো কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কিন্তু এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাময়িক ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা সম্ভব, আর বলা যায় যে, ছোট ছোট বাহিনীর অথবা মরশুমী চরিত্রের ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা সম্ভব। কারণ একদিকে সমস্ত ভূখণ্ডে সৈন্যশক্তি বন্টনের জন্য শত্রুর হাতে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্যশক্তি নেই, আর সে এক তুলনাবিহীন বর্বরতার নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে চীনের রয়েছে সুবিশাল ভূখণ্ড ও বিরাট সংখ্যক জনগণ যাঁরা জাপানকে রুখেছেন, এইসব অবস্থাই সমতলভূমিতে গেরিলাযুদ্ধকে বিকশিত করার ও সাময়িক ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার অনুকূল বাস্তবমুখী শর্ত যুগিয়েছে। অধিকন্তু, যদি যথার্থ সামরিক পরিচালনা করা হয়, তাহলে অবশ্য বলা উচিত যে, ছোট ছোট বাহিনীর অস্থায়ী কিন্তু দীর্ঘকালীন ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা সম্ভব[৭]। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, শত্রু যখন তার রণনীতিগত আক্রমণ শেষ করে নিজের অধিকৃত অঞ্চলকে সুরক্ষিত করার পর্যায়ে প্রবেশ করে, তখন সে যে গেরিলাযুদ্ধের সমস্ত ঘাঁটি এলাকার ওপর বর্বর আক্রমণ শুরু করবেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর সে আক্রমণের সবচেয়ে প্রথম ধাক্কাটা স্বভাবতঃই এসে পড়বে

সমতলভূমির গেরিলা ঘাঁটি এলাকাগুলির ওপরে। তখন সমতলভূমিতে কার্যকলাপে রত বড় বড় গেরিলা সৈন্যসংস্থান সেখানে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না এবং পরিস্থিতি অনুসারে ধীরে ধীরে পার্বত্য অঞ্চলে সরে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, হোপেই সমতলভূমি থেকে উতাই ও তাইহাং পাহাড়ে সরে যাওয়া এবং শানতুং সমতলভূমি থেকে তাইশান পাহাড়ে ও শানতুং উপদ্বীপে সরে যাওয়া। কিন্তু, জাতীয় যুদ্ধের অবস্থায় বহু ছোট ছোট গেরিলাবাহিনী বজায় রাখা, সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমির বিভিন্ন জেলাগুলিতে সেগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং লড়াইয়ের একটা পরিবর্তনশীল পদ্ধতি গ্রহণ করা, অর্থাৎ ঘাঁটি এলাকাগুলিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করার লড়াইয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করাটা যে অসম্ভব তা বলা যায় না। গ্রীষ্মকালে উঁচু শস্যচারার 'সবুজ যবনিকা' এবং শীতকালে জমে যাওয়া নদীর সুযোগ নিয়ে মরশুমী চরিত্রের গেরিলাযুদ্ধ চালানো নিশ্চয়ই সম্ভব। বর্তমানে শত্রুর পক্ষে গেরিলাদের ওপর আক্রমণ করার মতো বাড়তি শক্তি নেই এবং ভবিষ্যতেও তার পক্ষে এর জন্য যথেষ্ট শক্তি থাকবে না, এই অবস্থায় বর্তমানে সমতলভূমিতে গেরিলাযুদ্ধকে ব্যাপকভাবে পরিপুষ্ট করার ও সাময়িক ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার নীতি এবং ভবিষ্যতের জন্য ছোট ছোট বাহিনীর গেরিলাযুদ্ধকে, কমপক্ষে মরশুমী চরিত্রের গেরিলাযুদ্ধকে অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার এবং অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের নীতি নির্ধারণ করাটা একান্ত প্রয়োজন।

নদী-হ্রদ-মোহনা অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধকে পরিপুষ্ট করার এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার সম্ভাবনা বাস্তবতঃ সমতলভূমির চেয়ে বেশি, যদিও পার্বত্য অঞ্চলের তুলনায় তা কিছুটা কম। ইতিহাসে তথাকথিত 'সামুদ্রিক বোম্বেটে' 'জল-দস্যুরা' অসংখ্য নাটকীয় যুদ্ধ চালিয়েছিল, চীনা লালফৌজের যুগে হোংহু হ্রদের এলাকায় গেরিলাযুদ্ধ কয়েক বছর ধরে টিকে ছিল। এসবই প্রমাণ করে যে, নদী-হ্রদ-মোহনা অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধ গড়ে তোলা ও ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু এইদিকে বিভিন্ন জাপ-বিরোধী পার্টি ও দল এবং জাপ-বিরোধী জনগণ এখনো যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়নি। যদিও এই ধরনের অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধ গড়ে তোলার জন্য বিষয়ীগত অবস্থা এখনো পাকা হয়নি, তবুও নিঃসন্দেহে আমাদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং কাজ শুরু করা উচিত। দেশব্যাপী গেরিলাযুদ্ধের বিকাশসাধনের একটা দিক হিসেবে ইয়াংসি নদীর উত্তরের হোংজে হ্রদ অঞ্চলে, ইয়াংসি নদীর দক্ষিণের তাইহু হ্রদ অঞ্চলে, এবং নদী বরাবর ও সমুদ্রোপকূলে শত্রু-অধিকৃত সমস্ত নদী-মোহনা-খাড়ি অঞ্চলে ভালভাবে গেরিলাযুদ্ধ সংঘটিত করা এবং এই নদী-হ্রদ-মোহনা অঞ্চলে ও তার কাছাকাছি দীর্ঘস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা উচিত। যদি তা না করা হয় তবে নিঃসন্দেহে

জলপথে পরিবহনের সুবিধা শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হবে; জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণনীতিগত পরিকল্পনায় এটা একটা ফাঁক, এই ফাঁককে যথাসময়ে ভরে নেওয়া উচিত।

২। গেরিলা অঞ্চল ও ঘাঁটি এলাকা

শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে চালিত গেরিলাযুদ্ধের পক্ষে গেরিলা অঞ্চল ও ঘাঁটি এলাকার মধ্যে তফাৎ আছে। যেসব এলাকার চারিদিকে শত্রুর দখল রয়েছে কিন্তু যার মধ্যভাগ শত্রুর অধিকৃত নয়, অথবা শত্রুর দ্বারা দখল করা হয়েছিল কিন্তু ইতিমধ্যেই পুনরুদ্ধার করা হয়েছে—যেমন, উতাই পার্বত্য এলাকার (অর্থাৎ শানসী-চাহার-হোপেই সীমান্ত এলাকার) কোন কোন জেলা এবং তাইহাং ও তাইশান পাহাড়ী এলাকার কোন কোন জায়গা—সেইসব এলাকা হচ্ছে তৈরী ঘাঁটি এলাকা, গেরিলাবাহিনীর পক্ষে এগুলোর ওপর নির্ভর করে গেরিলাযুদ্ধ প্রসারিত করা খুবই সুবিধাজনক। কিন্তু এইসব ঘাঁটি এলাকার অন্যান্য জায়গার অবস্থাটা ভিন্ন, যেমন উতাই পার্বত্য এলাকার পূর্ব ও উত্তরভাগে—অর্থাৎ পশ্চিম হোপেই ও দক্ষিণ চাহারের কোন কোন অংশে এবং পাওতিংয়ের পূর্বস্থ ও ছ্যাংচৌ'র পশ্চিমস্থ অনেক জায়গায়; গেরিলাযুদ্ধের গোড়ার দিকে গেরিলারা এই জায়গাগুলিকে পুরোপুরি অধিকার করে নিতে সক্ষম হয়নি, তখন তারা শুধু সেখানে ঘন ঘন গেরিলা-হানাই দিতে পেরেছিল। গেরিলাবাহিনী যখন আসে তখন এই জায়গাগুলি থাকে গেরিলাবাহিনীর দখলে, আর তারা সরে গেলেই জাপানের পুতুল সরকারের অধীনে পড়ে। এই ধরনের এলাকা এখনো গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকা হয়ে ওঠেনি, বরং এগুলি হচ্ছে এমন স্থান যাকে বলতে পারা যায় গেরিলা অঞ্চল। এই রকমের গেরিলা অঞ্চল যখন গেরিলাযুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাবে, অর্থাৎ বিরাট সংখ্যক শত্রুসৈন্যকে যখন সেখানে নিশ্চিহ্ন বা পরাজিত করা হবে, পুতুল সরকারকে যখন ধ্বংস করা হবে, জনসাধারণের সক্রিয়তাকে যখন জাগিয়ে তোলা হবে, জাপ-বিরোধী গণ-সংগঠনগুলি যখন গড়ে উঠবে, জনসাধারণের স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী যখন বিকশিত হয়ে উঠবে এই জাপ-বিরোধী শাসনব্যবস্থাকে যখন সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তখন এইরকমের গেরিলা অঞ্চলগুলি ঘাঁটি এলাকায় রূপান্তরিত হবে। এই ঘাঁটি এলাকাগুলোকে আমাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ঘাঁটি এলাকার সঙ্গে জুড়ে দেওয়াটাকেই আমরা ঘাঁটি এলাকার প্রসার বলছি।

কোন কোন জায়গায়, গেরিলাযুদ্ধের কার্যকলাপের গোটা অঞ্চলই শুরুতে গেরিলা অঞ্চল ছিল। এর উদাহরণ হল হোপেইর গেরিলাযুদ্ধ। সেখানে দীর্ঘকাল ধরে পুতুল শাসনব্যবস্থা চলে আসছে; স্থানীয় বিদ্রোহী জনসাধারণের সশস্ত্র

বাহিনী ও উতাই পর্বত থেকে প্রেরিত গেরিলা শাখাবাহিনীর কার্যকলাপের শুরুতে তারা এই অঞ্চলে কেবলমাত্র কতকগুলো ভাল জায়গা বেছে নিয়ে নিজেদের সাময়িক পশ্চাদ্ভাগ হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছিল; সেটাকে সাময়িক ঘাঁটি এলাকা বলা যায়। যখন এই এলাকার শত্রুকে ধ্বংস করা হবে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ প্রসারিত হবে, শুধু তখনই এই এলাকাটা গেরিলা অঞ্চল থেকে রূপান্তরিত হয়ে একটা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্থায়ী ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হবে।

সুতরাং দেখা যায় যে, গেরিলা অঞ্চলকে ঘাঁটি এলাকায় পরিণত করাটা হচ্ছে একটি কষ্টসাধ্য সৃজনশীল প্রক্রিয়া। গেরিলা অঞ্চলটা ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হল কিনা তা এই অঞ্চলে কি পরিমাণে শত্রুকে ধ্বংস করা হয় এবং জনসাধারণকে কি মাত্রায় উদ্বুদ্ধ করা হয়, তার ওপরে নির্ভর করে নির্ধারণ করা যায়।

বহু অঞ্চলই দীর্ঘকাল পর্যন্ত গেরিলা অঞ্চল হিসেবে থেকে যাবে। এইসব অঞ্চলকে নিজের কর্তৃত্বে রাখার জন্য শত্রু সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে, কিন্তু সেখানে কোন দৃঢ়স্থায়ী পুতুল সরকার স্থাপন করতে সে সক্ষম হবে না; আমরাও সর্বশক্তি দিয়ে গেরিলাযুদ্ধ প্রসারিত করার চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা সেখানে জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপনের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব না। শত্রুর দখল করা রেলপথ বরাবর ও বড় বড় শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং সমতলভূমির কোন কোন এলাকায় এ ধরনের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

শত্রুর প্রবল সৈন্যশক্তির দ্বারা সংরক্ষিত বড় বড় শহর রেলস্টেশন ও কোন কোন সমতলভূমির এলাকাগুলির ক্ষেত্রে গেরিলাযুদ্ধটা শুধু তাদের নিকটবর্তী জায়গা পর্যন্তই ছড়িয়ে পড়তে পারে, গেরিলা অঞ্চলে শত্রুর অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্থায়ী দখলীকৃত এলাকায় রূপান্তরিত হতে পারে। তাদের ভেতর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না, সেখানে পুতুল সরকারের অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্থায়ী শাসনব্যবস্থা থাকে। এটা হচ্ছে আবার আর এক ধরনের অবস্থা।

আমাদের নেতৃত্বের ভুলে অথবা শত্রুর প্রচণ্ড চাপে ওপরে বর্ণিত অবস্থা তার বিপরীতে পরিবর্তিত হতেও পারে, অর্থাৎ আমাদের ঘাঁটি এলাকা একটা গেরিলা অঞ্চলে পরিণত হতে পারে। এ ধরনের অবস্থা দেখা দেওয়া সম্ভব এবং তার জন্য গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকদের বিশেষভাবে সজাগ থাকতে হবে।

তাই, গেরিলাযুদ্ধ ও শত্রুর সংগে আমাদের সংগ্রামের ফলে, শত্রু-অধিকৃত গোটা অঞ্চলে নিম্নলিখিত তিন ধরনের জায়গায় ভাগ করা যায়ঃ প্রথম, আমাদের গেরিলাবাহিনী ও আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার কর্তৃত্বাধীন জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা; দ্বিতীয়, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার পুতুল সরকারের অধিকৃত এলাকা;

আর তৃতীয়টা হচ্ছে মধ্যবর্তী এলাকা যাকে দখলে নেবার জন্য দু'পক্ষের মধ্যে সংগ্রাম চলছে, অর্থাৎ গেরিলা অঞ্চল। গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকদের কর্তব্য হচ্ছে প্রথম ও তৃতীয় ধরনের এলাকাকে যত বেশি সম্ভব বিস্তৃত করা, এবং দ্বিতীয় ধরনের এলাকাকে যথাসম্ভব সংকুচিত করা। এটাই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত কর্তব্য।

৩। ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের শর্ত

ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার মৌলিক শর্ত হচ্ছে—একটি জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী থাকা চাই এবং তার দ্বারা শত্রুকে পরাজিত করা ও জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা চাই। সুতরাং, ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের সর্বপ্রথম সমস্যা হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার সমস্যা। গেরিলাযুদ্ধের নেতাদের অবশ্যই সর্বশক্তি দিয়ে এক বা একাধিক গেরিলাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে, আর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সেগুলিকে বিকশিত করে ক্রমে ক্রমে গেরিলা সৈন্যসংস্থানে পরিণত করতে হবে এবং কালক্রমে তাদেরকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে ও নিয়মিত সৈন্যসংস্থানে বিকশিত করে তুলতে হবে। ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার জন্য মূল চাবিকাঠি হল একটা সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলা ; সশস্ত্র বাহিনী যদি না থাকে অথবা সেটা যদি দুর্বল হয়, তাহলে কিছুই করতে পারা যাবে না। এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত।

ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের দ্বিতীয় অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে জনসাধারণের সহযোগিতায় সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা শত্রুকে পরাজিত করা। শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীন সব জায়গাই হচ্ছে শত্রুর ঘাঁটি এলাকা, গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকা নয়; এবং স্বভাবতঃই শত্রুকে পরাজিত না করে তার ঘাঁটি এলাকাকে আমাদের গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকায় রূপান্তরিত করা অসম্ভব। গেরিলাযুদ্ধের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায়, শত্রুর আক্রমণকে যদি প্রতিহত করা না হয় এবং শত্রুকে যদি পরাজিত করা না হয় তাহলে আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন জায়গাগুলিও শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাবে, ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের জন্য কোন সম্ভাবনাই আর থাকবে না।

ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের তৃতীয় অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিসহ সমস্ত শক্তিসামর্থ্য প্রয়োগ করে জাপ-বিরোধী গণ-সংগ্রাম গড়ে তোলা। এই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জনগণকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে তুলতে হবে, অর্থাৎ আত্মরক্ষাবাহিনী ও গেরিলাবাহিনী সংগঠিত করতে হবে। আবার এই সংগ্রামের ভেতর দিয়েই বিভিন্ন গণ-সংগঠনকে গড়ে তুলতে হবে ; শ্রমিক, কৃষক, যুব, নারী, কিশোর, ব্যবসায়ী ও স্বাধীন পেশাদারী মানুষ—সবাইকে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার ও সংগ্রামী মনোভাবের উন্নতির মাত্রা অনুসারে

বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জাপ-বিরোধী সংগঠনে সংগঠিত করতে হবে আর এইসব সংগঠনকে অবশ্যই ধাপে ধাপে প্রসারিত ও উন্নত করে তুলতে হবে। জনসাধারণের সংগঠন না থাকলে তারা নিজেদের জাপ-বিরোধী শক্তিকে কার্যকরী করতে পারে না। এই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আমাদের অবশ্যই প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন দেশদ্রোহীদের শক্তিকে নির্মূল করে ফেলতে হবে; এটা শুধু জনসাধারণের শক্তির ওপরে নির্ভর করেই সম্পন্ন করতে পারা যায়। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এ ধরনের সংগ্রামের ভেতর দিয়েই স্থানীয় জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার অথবা তাকে সুদৃঢ় করার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা। যেখানে পূর্বের চীনা শাসনব্যবস্থা শত্রুর দ্বারা বিধ্বস্ত হয়নি, সেখানে ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থনের ভিত্তিতে আমাদের অবশ্যই সেই শাসনব্যবস্থাটাকে পুনর্গঠিত ও সুদৃঢ় করে তুলতে হবে; আর যেখানে সেটা শত্রুর দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছে সেখানে আমাদের উচিত ব্যাপক জনসাধারণের প্রচেষ্টায় সেটাকে আবার গড়ে তোলা। সেটা হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতিকে কার্যকরী করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা, আর এই সংস্থাকে অবশ্যই আমাদের একমাত্র শত্রু—জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুর অর্থাৎ দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য জনগণের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা উচিত।

জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা, শত্রুকে পরাজিত করা ও জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা—এই তিনটি মৌলিক শর্তের ক্রমপরিপূরণের ভেতর দিয়েই শুধু সমস্ত গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকা সত্যিকারভাবে স্থাপন করতে পারা যায়।

এগুলো ছাড়া আমাদের অবশ্যই ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক শর্তেরও উল্লেখ করতে হবে। ইতিপূর্বে 'বিভিন্ন ধরনের ঘাঁটি এলাকা' নামক পরিচ্ছেদে আমরা ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে তিনটি ভিন্ন ধরনের অবস্থা উল্লেখ করেছিলাম; এখানে শুধুমাত্র একটি প্রধান চাহিদার কথা বলা হবে, আর সে চাহিদা হচ্ছে যে, এলাকাটিকে সুবিস্তীর্ণ হতে হবে। চারিদিকে অথবা তিন দিক থেকে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত জায়গায় পার্বত্য অঞ্চলই দীর্ঘস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গা; কিন্তু প্রধান বিষয় হচ্ছে যে, গেরিলাবাহিনীর কৌশলী অভিযান চালাবার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকা দরকার অর্থাৎ এলাকাটিকে হতে হবে সুবিস্তীর্ণ। এই শর্ত, অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ এলাকা পেলে গেরিলাযুদ্ধকে সমতল অঞ্চলেও প্রসারিত করতে ও তাকে টিকিয়ে রাখতে পারা যায়, নদী-হ্রদ-মোহনা অঞ্চলের তো কথাই নেই। চীন দেশের সুবিশালতা ও শত্রুর সৈন্যশক্তির অপর্যাপ্ততা ইতিমধ্যেই মোটামুটিভাবে চীনের গেরিলাযুদ্ধকে এই

শর্তটি জুগিয়েছে। গেরিলাযুদ্ধ চালানোর সম্ভাবনার দিক থেকে এইটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ; কারণ বেলজিয়ামের মতো ছোট দেশে এই শর্ত নেই, তাই সেখানে গেরিলাযুদ্ধের সম্ভাবনাও খুবই কম, এমনকি মোটেই থাকে না।[৮] কিন্তু চীনদেশে এই শর্ত লাভ করার জন্য কোন চেষ্টারই দরকার হয় না, আবার এটা কোন অমীমাংসিত সমস্যাও নয়, এই শর্তটি প্রকৃতির দান হিসেবেই এখন শুধু মানুষের ব্যবহারের অপেক্ষাতেই রয়েছে।

প্রাকৃতিক চরিত্রের দিক থেকে দেখতে গেলে অর্থনৈতিক শর্তের চরিত্র ভৌগোলিক শর্তটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ আমরা এখন মরুভূমির ভেতরে ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের কথা আলোচনা করছি না, সেখানে কোন শত্রু নেই। আমরা শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করছি। শত্রু যেসব জায়গায় ঢুকে পড়তে পারে তার প্রত্যেকটিতেই নিশ্চয় বহু আগে থেকেই চীনা বাসিন্দারা বসবাস করে আসছে, আর জীবিকার অর্থনৈতিক ভিত্তিও অনেক পূর্ব থেকেই রয়েছে, তাই ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের ব্যাপারে সেখানে অর্থনৈতিক শর্তাদি বাছাই করার প্রশ্ন আদৌ ওঠে না। যেখানেই চীনা বাসিন্দা ও শত্রুসৈন্যদের দেখতে পাওয়া যায়, তা অর্থনৈতিক অবস্থা যাই হোক না কেন, সেখানে সর্বত্রই গেরিলাযুদ্ধকে প্রসারিত করার জন্য এবং স্থায়ী বা অস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে এই প্রশ্ন বিচার করলে ব্যাপারটা হয় অন্যরকম ঃ এদিক থেকে যে সমস্যা দেখা দেবে, তা হচ্ছে অর্থনৈতিক নীতির সমস্যা, এটা ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকার অর্থনৈতিক নীতি অবশ্যই জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের মূল নীতিকে অনুসরণ করে চলবে, অর্থাৎ আর্থিক বোঝাটিকে যুক্তিসংগতভাবে বন্টন করে দিতে হবে এবং বাণিজ্যকে রক্ষা করতে হবে। কি রাজনৈতিক ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাগুলি, কি গেরিলাবাহিনী, কারুই এই মূল নীতিকে লংঘন করা উচিত নয়, অন্যথায় ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার ও গেরিলাযুদ্ধকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে প্রতিকূল প্রভাব পড়বে। আর্থিক বোঝার যুক্তিসংগত বন্টনের অর্থ হল 'যাদের টাকা আছে তারা টাকা দান করবে', আর গেরিলাবাহিনীর জন্য কৃষকদেরও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে হবে। বাণিজ্যের সংরক্ষণ বলতে বোঝায় যে, গেরিলাবাহিনীগুলিকে খুবই নিয়ম-শৃংখলানিষ্ঠ হতে হবে; আর প্রমাণিত দেশদ্রোহীদের দোকানগুলি ছাড়া কোন ব্যবসায়ীর দোকান বাজেয়াপ্ত করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। এটা সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু এই নীতি নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

৪। ঘাঁটি এলাকার সুদৃঢ়ীকরণ ও সম্প্রসারণ -

চীনে আক্রমণকারী শত্রুদেরকে কয়েকটি ঘাঁটিতে অর্থাৎ বড় বড় শহরে ও প্রধান যোগাযোগ পথ বরাবর এলাকায় আবদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্যে গেরিলাদের অবশ্যই নিজেদের ঘাঁটি এলাকাগুলি থেকে গেরিলাযুদ্ধকে চারিদিকে যথাসম্ভব প্রসারিত করতে হবে, আর শত্রুর প্রত্যেকটা ঘাঁটির একেবারে নিকটে গিয়ে তার ওপরে চাপ দিতে হবে ; এইভাবে শত্রুর অস্তিত্বকেই বিপদসংকুল করে তুলতে হবে, তার সৈন্যদের মনোবলকে ভেঙে নড়বড়ে করে দিতে হবে; এর সংগে সংগেই গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকা সম্প্রসারিত করা হবে, এটা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অবশ্যই গেরিলাযুদ্ধে রক্ষণশীলতাবাদের বিরোধিতা করতে হবে। তা আরামপ্রিয়তা থেকেই উদ্ভূত হোক কিংবা শত্রুর শক্তিকে খুব বড় করে দেখার ফলেই আসুক, উভয় অবস্থায়ই রক্ষণশীলতাবাদ জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে লোকসান টেনে আনবে ; এটা গেরিলাযুদ্ধের পক্ষে এবং মূল ঘাঁটি এলাকাগুলির পক্ষেও ক্ষতিকর। অন্যদিকে ঘাঁটি এলাকা সুদৃঢ় করার কাজটিকে ভোলা উচিত নয়। এই ব্যাপারে মুখ্য কাজ হবে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা আর গেরিলাবাহিনী ও স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়া। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য এবং ঘাঁটি এলাকাকে আরও প্রসারিত করার জন্য এ ধরনের সুদৃঢ়ীকরণের দরকার। সুদৃঢ়ীকরণের অভাবে সোৎসাহ সম্প্রসারণ অসম্ভব। গেরিলাযুদ্ধে আমরা যদি সুদৃঢ়ীকরণের কাজটিকে ভুলে গিয়ে শুধুই সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে আমরা অসমর্থ হব ; আর ফলে শুধু যে সম্প্রসারণের সম্ভাবনাই হারাব তা-ই নয়, পরন্তু ঘাঁটি এলাকাগুলির মূল অস্তিত্বটাকেও বিপদাপন্ন করে ফেলব। সঠিক নীতি হচ্ছে সুদৃঢ়ীকরণের সংগে সংগে সম্প্রসারণ করা। এটা হচ্ছে এমন ভাল পদ্ধতি, যার ফলে যখন আমাদের আক্রমণের ইচ্ছা থাকে তখন তা করতে পারি, আর যখন আমাদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন তখন তাও করতে পারি। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে, প্রতিটি গেরিলাবাহিনীর ক্ষেত্রে ঘাঁটি এলাকাকে সুদৃঢ় করার ও সম্প্রসারিত করার সমস্যাটি অবিরতই ওঠে। অবশ্য অবস্থা অনুযায়ী এ সমস্যার বাস্তব সমাধান করা উচিত। এক সময়ে সম্প্রসারণের ওপরে জোর দিতে হয়, অর্থাৎ গেরিলা অঞ্চলকে সম্প্রসারিত করার ও গেরিলাবাহিনী বাড়ানোর কাজের ওপরে জোর দিতে হয়। আবার অন্য এক সময়ে সুদৃঢ়ীকরণের ওপরে জোর দিতে হয়, অর্থাৎ জোর দিতে হয় জনসাধারণকে সংগঠিত করার ও সশস্ত্র বাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়ার কাজের ওপরে। যেহেতু প্রকৃতিতে সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ়ীকরণ ভিন্ন সামরিক

বিন্যাসব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতিও তদনুসারে ভিন্ন হবে; তাই অবস্থা অনুসারেই এক একটার ওপর এক এক সময়ে গুরুত্ব আরোপ করার দরকার হয়, শুধু তাহলেই এ সমস্যার একটা কার্যকরী সমাধান সম্ভব।

৫। আমাদের ও শত্রুর পারস্পরিক পরিবেষ্টনের রূপ

সামগ্রিকভাবে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে বিচার করলে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, রণনীতিগতভাবে আমরা শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত, কারণ শত্রু রণনীতিগত আক্রমণ চালাচ্ছে আর লড়াই চালাচ্ছে বহির্লাইনে এবং আমরা রয়েছি রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় ও লড়াই চালাচ্ছি অন্তর্লাইনে। শত্রুর দ্বারা আমাদেরকে পরিবেষ্টিত করার এটা হচ্ছে প্রথম রূপ। কারণ বহির্লাইন থেকে বিভিন্ন পথ ধরে আমাদের দিকে অগ্রসরমান শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সংখ্যাগত বিপুলতর সৈন্যশক্তি ব্যবহার করে আমরা যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত আক্রমণ করার এবং বহির্লাইনের লড়াই চালানোর নীতি প্রয়োগ করি, তাই বিভিন্ন পথ দিয়ে অগ্রসরমান শত্রুর প্রত্যেকটি অংশ আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। আমাদের দ্বারা শত্রুকে পরিবেষ্টনের এটা হচ্ছে প্রথম রূপ। শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকাগুলির কথা আমরা যদি বিবেচনা করি—প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন ঘাঁটি এলাকাকে পৃথক পৃথক করে ধরলে সেগুলি উতাই পার্বত্য অঞ্চলের মতো চারিদিক থেকে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত অথবা উত্তর-পশ্চিম শানসী এলাকার মতো তিনদিক থেকে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। শত্রুর পরিবেষ্টনের এটা হচ্ছে দ্বিতীয় রূপ। কিন্তু, যদি সবগুলি ঘাঁটি এলাকাকে একসংগে ধরা হয় এবং যদি নিয়মিত বাহিনীর যুক্তফ্রন্টের সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমস্ত ঘাঁটি এলাকাকে একসংগে মিলিয়ে তার সম্পর্কাদি বিচার করা হয়, তাহলে দেখা যায় যে, আমরাও বহুল পরিমাণে শত্রুকে পরিবেষ্টিত করেছি। যেমন, শানসী প্রদেশে তাতুং-পুচৌ রেলপথটিকে তিনদিক দিয়ে (পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বদেশ ও দক্ষিণ প্রান্ত) এবং তাইয়ুয়ান শহরটিকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছি আমরা; হোপেই ও শানতুং প্রভৃতি প্রদেশে এরকম পরিবেষ্টনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এটি হচ্ছে শত্রুকে ঘিরে ধরার আমাদের দ্বিতীয় রূপ। তাই দেখা যাচ্ছে যে, শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টনের দুটি রূপ এবং আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টনেরও দুটি রূপ এ যেন ওয়েইছী দাবা খেলার[১] মতো। শত্রু ও আমাদের দুই পক্ষের চালিত যুদ্ধাভিযান ও লড়াইগুলি যেন ওয়েইছী দাবা খেলায় পরস্পরের 'ঘুঁটিগুলি দখল করে নেবার' মতো, আর শত্রু কর্তৃক সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন ও আমাদের দ্বারা গেরিলা ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা যেন ওয়েইছী দাবা খেলায় 'ফাঁকা ঘর স্থাপন করার' মতো। 'ফাঁকা ঘর স্থাপন করার' ব্যাপারেই শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে গেরিলাযুদ্ধের

ঘাটি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত ভূমিকাটি প্রকাশ পায়। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধযুদ্ধের এই সমস্যাটিকে আমরা তুলে ধরেছি এ-কারণেই যে, একদিকে গোটা রাষ্ট্রের সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং অন্যদিকে বিভিন্ন এলাকার গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকরা উভয়েই যেন শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে গেরিলাযুদ্ধের বিকাশসাধন করাকে ও সমস্ত সম্ভবপর স্থানে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করাকে নিজেদের আলোচ্য বিষয়ে স্থান দেন এবং এই সমস্যাকে রণনীতিগত কর্তব্য হিসেবে সম্পাদন করেন। আমরা যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনকে একটা রণনীতিগত ইউনিট, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সম্ভাব্য দেশ—প্রত্যেককে একটি রণনীতিগত ইউনিট করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমরা তখন শত্রুর চাইতে আর একটা বেশি পরিবেষ্টনের পদ্ধতি হাতে পাব, এবং এইভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বহির্লাইনের লড়াই চালিয়ে ফ্যাসিবাদী জাপানের বিরুদ্ধে পরিবেষ্টনী আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারব। অবশ্য, বর্তমানে এর কার্যকরী তাৎপর্য না থাকলেও এ ধরনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অসম্ভব নয়।

সপ্তম অধ্যায়

গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণ

গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির চতুর্থ সমস্যা হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণের সমস্যা। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা যে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের নীতির কথা উল্লেখ করেছি, জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধে যখন আমরা প্রতিরক্ষাত্মক অবস্থায় রত এবং যখন আমরা আক্রমণাত্মক অবস্থায় রত, তখন বাস্তবে কিভাবে সেই আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের নীতি কার্যকরী করা যায়, এটা তারই সমস্যা।

দেশজোড়া রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণের (সঠিক করে বলতে গেলে বলা উচিত রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের) মধ্যে গেরিলাযুদ্ধের প্রতিটি ঘাঁটি এলাকার ভেতরে ও তার চারিদিকে ছোট ছোট আকারের রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত আক্রমণ ঘটতে থাকে। রণনীতিগত প্রতিরক্ষা বলতে আমরা বোঝাই সেই সময়কার রণনীতিগত পরিস্থিতি ও রণনীতিগত নীতিকে, যখন শত্রু আক্রমণাত্মক অবস্থায় রত আর আমরা প্রতিরক্ষাত্মক অবস্থায় লিপ্ত; রণনীতিগত আক্রমণ বলতে আমরা বোঝাই সেই সময়কার রণনীতিগত পরিস্থিতি ও রণনীতিগত নীতিকে, যখন শত্রু প্রতিরক্ষায় রত আর আমরা আক্রমণে লিপ্ত।

১। গেরিলাযুদ্ধে রণনীতিগত প্রতিরক্ষা

গেরিলাযুদ্ধ বেধে উঠবার এবং সেটা যথেষ্ট মাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠবার পর শত্রু অবশ্যম্ভাবিরূপেই গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকাগুলিকে আক্রমণ করবে, আক্রমণ করবে বিশেষ করে সেই সময়ে যখন গোটা দেশটির বিরুদ্ধে তার রণনীতিগত আক্রমণ বন্ধ করে সে তার দখল-করা এলাকাগুলিকে সংরক্ষিত করার নীতি গ্রহণ করে। এ ধরনের আক্রমণের অবশ্যম্ভাবিতাকে বোঝা একান্ত দরকার, কারণ অন্যথায় গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকরা একেবারেই প্রস্তুতিহীন অবস্থায় ধরা পড়ে যাবে আর শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পড়ে তারা নিঃসন্দেহে আতংকগ্রস্ত ও হতভম্ব হয়ে পড়বে এবং তাদের বাহিনী শত্রুর দ্বারা পরাজিত হবে।

গেরিলাদের ও তাদের ঘাঁটি এলাকাগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার উদ্দেশ্যে শত্রু প্রায়শঃই সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের পদ্ধতি অবলম্বন করতে থাকবে; যেমন, উতাই পার্বত্য অঞ্চলে ইতিমধ্যে যে চার-পাঁচটি তথাকথিত 'শান্তিমূলক অভিযান' হয়েছে, তার প্রত্যেকটাতেই শত্রুরা একই সময়ে তিন, চার, এমনকি ছয় বা সাতটি দিক থেকে সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়েছিল। গেরিলাযুদ্ধ প্রসারিত হয়ে উঠবার মাত্রাটা যত বাড়বে, তার ঘাঁটি এলাকার অবস্থান যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে, এবং শত্রুর রণনীতিগত ঘাঁটির ও মুখ্য যোগাযোগপথের পক্ষে বিপদের আশংকাটা যত বেশি বাড়বে, গেরিলাবাহিনী ও তার ঘাঁটি এলাকার ওপর শত্রুর আক্রমণও ততই তীব্রতর ও হিংস্রতর হবে। তাই কোন গেরিলা এলাকার ওপরে শত্রুর আক্রমণ যত বেশি হিংস্রতর ও তীব্রতর হয়, তাতে প্রমাণিত হয় যে, সেখানকার গেরিলাযুদ্ধের সফলতা ততই বেশি আর নিয়মিত যুদ্ধের সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমন্বয়সাধনও ততই বেশি কার্যকরী হয়েছে।

যখন শত্রু কয়েকটি পথ দিয়ে সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণ চালাতে থাকে, তখন গেরিলাযুদ্ধের নীতি হচ্ছে সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করে শত্রুর সেই আক্রমণটাকে চুরমার করে দেওয়া। যদি শত্রু কয়েকটি পথ দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে, কিন্তু প্রতিটি পথে শুধুমাত্র একটি বড় অথবা ছোট বাহিনী থাকে, তার যদি কোন অনুগমনকারী বাহিনী না থাকে এবং অগ্রগমনের পথে সে সৈন্যশক্তি মোতায়েন করতে অসমর্থ হয়, দুর্গাদি গড়ে তুলতে ও মোটরগাড়ী চলার উপযোগী রাস্তা তৈরী করতে না পারে, তাহলে শত্রুর এই ধরনের সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণকে সহজেই চুরমার করতে পারা যায়। এই সময়ে, শত্রু আক্রমণে রত, সে বহির্লাইনে লড়াই চালাতে থাকে; আমরা তখন প্রতিরক্ষায় রত এবং অন্তর্লাইনে লড়াই চালাতে থাকি। আমাদের সৈন্য বিন্যাস-

ব্যবস্থার ব্যাপারে আমাদের উচিত শত্রুর কয়েকটি কলামকে আটকে রাখার জন্য আমাদের গৌণ সৈন্যশক্তিকে ব্যবহার করা, আর শত্রুর একটি কলামের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রধান সৈন্যশক্তিকে ব্যবহার করা, এই ব্যাপারে যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের আকস্মিক আক্রমণের পদ্ধতি (মুখ্যতঃ ওৎ পেতে থেকে আক্রমণ করার পদ্ধতি) গ্রহণ করা, শত্রুবাহিনী যখন চলমান তখন তার ওপরে আঘাত হানা। শত্রু শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও, তার ওপরে বারংবার আকস্মিক আক্রমণ করার ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং প্রায়শঃই মাঝপথে পশ্চাদপসরণ করবে ; তখন গেরিলাবাহিনীগুলি পশ্চাদ্ধাবনের সময়ে অব্যাহতভাবে শত্রুর ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাকে আরও বেশি দুর্বল করে ফেলতে পারবে। আক্রমণ থামাবার বা পশ্চাদপসরণ শুরু করার আগে শত্রু সাধারণতঃ আমাদের ঘাঁটি এলাকার ভেতরকার জেলা-শহরগুলি অথবা অন্যান্য শহরগুলি দখল করে নিয়ে থাকে। আমাদের উচিত এইসব জেলা-শহরগুলি অথবা অন্যান্য শহরগুলিকে ঘিরে ধরা, তার খাদ্য সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কেটে দেওয়া ; এবং যখন সে আর টিকতে না পেরে পিছু হটতে শুরু করে, তখন আমাদের উচিত সেই সুযোগ নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে আক্রমণ করা। শত্রুর একটি কলামকে পরাজিত করার পরে অন্য একটি শত্রু কলামকে চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য আমাদের সৈন্যশক্তি সরিয়ে নেওয়া উচিত, আর এইভাবে শত্রুর সৈন্যবাহিনীগুলিকে একে একে চুরমার করেই শত্রুর সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া উচিত।

উতাই পার্বত্য অঞ্চলের মতো একটি বিরাট ঘাঁটি এলাকায় গড়ে ওঠে একটি 'সামরিক অঞ্চল', যা চারটি বা পাঁচটি কিংবা তারও বেশি সংখ্যক 'সামরিক উপ-অঞ্চলে' বিভক্ত থাকে আর প্রত্যেকটি সামরিক উপ-অঞ্চলের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী থাকে যা স্বাধীনভাবে লড়াই চালাতে পারে। উপরে বর্ণিত রণপদ্ধতিগুলিকে ব্যবহার করে এই সশস্ত্র বাহিনীগুলি প্রায়শঃই একই সময়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শত্রুর আক্রমণগুলিকে চুরমার করে দিয়েছে।

শত্রুর সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালনার পরিকল্পনায় সাধারণভাবে আমরা আমাদের প্রধান সৈন্যশক্তিকে অন্তর্লাইনে মোতায়েন করে রাখি। কিন্তু হাতে যখন প্রচুর সৈন্যশক্তি থাকে তখন শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বানচাল করার ও শত্রুর সাহায্যকারী অতিরিক্ত বাহিনীগুলিকে আটকে রাখার জন্য আমাদের গৌণ শক্তিগুলিকে (যেমন, জেলা বা মহকুমার গেরিলাবাহিনী, এমনকি প্রধান শক্তি থেকে পৃথক করে নেওয়া তার একাংশকে)

বহির্লাইনে সামরিক কার্যকলাপে ব্যবহার করা উচিত। শত্রু যদি আমাদের ঘাঁটি এলাকায় ঢুকে দীর্ঘকাল ধরে বসে থাকে, তাহলে আমাদের উপরে বর্ণিত রণপদ্ধতিটিকে পাল্টে নিয়ে প্রয়োগ করতে পারি, অর্থাৎ শত্রুকে আবদ্ধ রাখার জন্য আমাদের বাহিনীর একাংশকে ঘাঁটি এলাকার ভেতরে রেখে শত্রু যে অঞ্চল থেকে এসেছে সেই অঞ্চলটিকে আক্রমণ করার কাজে আমাদের প্রধান শক্তিকে নিয়োগ করতে পারি, আর সেখানে সক্রিয়ভাবে আমাদের কর্মতৎপরতা চালাতে পারি। এইভাবে আমরা দীর্ঘকাল ধরে বসে থাকা সেই শত্রুকে সরে এসে আমাদের প্রধান শক্তিকে আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ করতে পারি ; এ হচ্ছে 'ওয়েই রাজ্যকে অবরোধ করে চাও রাজ্যকে বাঁচানোর'[১০] পদ্ধতি।

সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে স্থানীয় জনগণের জাপ-বিরোধী আত্মরক্ষাবাহিনী ও সমস্ত গণ-সংগঠনগুলির উচিত যুদ্ধে যোগদানের জন্য সামগ্রিকভাবে সমাবিষ্ট হওয়া আর সর্বপ্রকারে ও সর্ব উপায়ে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করা ও শত্রুর বিরোধিতা করা। শত্রুর বিরোধিতা করার ব্যাপারে, স্থানীয় সামরিক আইন জারি করা এবং যতটা সম্ভব 'আমাদের প্রতিরক্ষার কাজ জোরদার করা ও ক্ষেতগুলিকে পরিষ্কার করা'—এ দুটিই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটির উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশদ্রোহীদের দমন করা ও শত্রুকে খবরাখবর পেতে না দেওয়া; আর পরবর্তীটির লক্ষ্য হচ্ছে লড়াই চালাতে সাহায্য করা (আমাদের প্রতিরক্ষার কাজ জোরদার করা) ও শত্রুকে খাদ্যশস্য পেতে না দেওয়া (ক্ষেতগুলিকে পরিষ্কার করা)। এখানে 'ক্ষেতগুলিকে পরিষ্কার করার' অর্থ হচ্ছে ফসল পাকা মাত্রই তাড়াতাড়ি কেটে নেওয়া।

শত্রু যখন পিছু হটে প্রায়শঃই সে তখন দখলীকৃত শহরগুলোর বাড়ীঘর আর তার পালাবার পথের ধারের গ্রামগুলিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকাগুলির ক্ষতিসাধন করা। কিন্তু এটা করতে গিয়ে নিজেকে সে তার পরবর্তী আক্রমণের সময়ে থাকার বাড়ীঘর ও খাদ্যশস্য থেকে বঞ্চিত করে ফেলে যার ফলে নিজেরই ক্ষতি হয়। একটি বিষয়ের দুটি পরস্পরবিরোধী দিক বলতে যা বোঝায় এটি হচ্ছে তারই এক মূর্ত দৃষ্টান্ত।

শত্রুর প্রচণ্ড সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে বারবার সামরিক কার্যকলাপের পরও সেই আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করাটা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হওয়ার আগে গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকের পক্ষে তাঁর নিজের ঘাঁটি এলাকা পরিত্যাগ করে অন্য ঘাঁটি এলাকায় সরে যাবার প্রচেষ্টা করা উচিত হবে না। এই অবস্থায়,

হতাশাব্যঞ্জক মনোভাবের উদ্ভবকে ঠেকানোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। যদি পরিচালকেরা কোন নীতিগত ভুল না করে বসে, তবে সাধারণভাবে পার্বত্য অঞ্চলে শত্রুর সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে আর ঘাঁটি এলাকাকে অধ্যবসায় সহকারে বজায় রাখতে পারা যায়। শুধুমাত্র সমতলভূমির অঞ্চলে, প্রচণ্ড সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের মুখোমুখি হলে, বাস্তব অবস্থার আলোকে নিম্নলিখিত সমস্যার বিবেচনা করা উচিতঃ উক্ত অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত কার্যকলাপ চালাবার জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট গেরিলাবাহিনীকে রেখে বড় গেরিলা সৈন্যসংস্থানগুলিকে সাময়িকভাবে পার্বত্য অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে শত্রুর প্রধান বাহিনী অন্যত্র সরে গেলে তারা আবার ফিরে এসে সমতলভূমিতে তাদের কার্যকলাপ আবার শুরু করতে পারে।

চীনদেশের বিরাট আয়তন ও শত্রুর সৈন্যশক্তি অপর্যাপ্ত—এই দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থার কারণে, সাধারণভাবে বলতে গেলে গৃহযুদ্ধের সময়ে কুওমিনতাঙ যে দুর্গ-নীতি প্রয়োগ করেছিল, সেই নীতিকে জাপানীরা অবলম্বন করতে পারে না। কিন্তু, তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানাদির পক্ষে যেসব গেরিলা ঘাঁটি এলাকা বিশেষ বিপদের কারণ সৃষ্টি করে, সেগুলির বিরুদ্ধে তারা এই দুর্গ-নীতিটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কাজে লাগাতে পারে এমন সম্ভাবনাকে আমাদের হিসেবে ধরা উচিত। তবুও এ ধরনের অবস্থাতেও ঐসব এলাকায় অধ্যবসায় সহকারে গেরিলাযুদ্ধকে চালিয়ে যাবার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে। গৃহযুদ্ধের সময়েও আমরা গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম—এই অভিজ্ঞতা অনুসারে জাতীয় যুদ্ধে তেমন গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যেতে আমরা আরও বেশি সক্ষম, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সৈন্যশক্তির তুলনায়, আমাদের কোন কোন ঘাঁটি এলাকার বিরুদ্ধে শত্রু তার গুণগতভাবে ও পরিমাণগতভাবে প্রভূত উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তিকে নিয়োগ করতে পারলেও শত্রুর ও আমাদের মধ্যেকার জাতীয় দ্বন্দ্বটির মীমাংসার উপায় নেই, আর শত্রুর পরিচালনার দুর্বলতাগুলিও অপরিহার্য। জনসাধারণের ভেতরে গভীর কাজকর্ম আমাদের লড়াই চালনার নমনীয় পদ্ধতির ওপরেই আমাদের বিজয় প্রতিষ্ঠিত।

২। গেরিলাযুদ্ধে রণনীতিগত আক্রমণ

শত্রুর একটি আক্রমণকে আমরা চূর্ণবিচূর্ণ করার পর এবং শত্রু আর একটি নতুন আক্রমণ শুরু করার আগে শত্রু রত থাকে রণনীতিগত প্রতিরক্ষায়, আর আমরা রত থাকি রণনীতিগত আক্রমণে।

এ সময়ে, যে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করার ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত নই এবং যা নিজের প্রতিরক্ষাত্মক অবস্থানে সুরক্ষিত হয়ে বসেছে, তাকে আক্রমণ করা আমাদের লড়াইয়ের নীতি নয়; পরন্তু আমাদের নীতি হচ্ছে নির্দিষ্ট এলাকায় শত্রুর যেসব ছোট ছোট সৈন্যদল ও চীনা দেশদ্রোহীদের সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা করতে আমাদের গেরিলাবাহিনী সক্ষম, সে সবগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা ও বিতাড়িত করা, আমাদের অধিকৃত এলাকাকে সম্প্রসারিত করা, জাপ-বিরোধী সংগ্রামের জন্য জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে আবার পূর্ণ করে নেওয়া ও তাদের ট্রেনিং দেওয়া এবং নতুন গেরিলাবাহিনী সংগঠিত করা। এইসব কর্তব্যগুলি বেশ কিছুটা সুসম্পন্ন করার পরেও যদি শত্রু প্রতিরক্ষায় রত থাকে তাহলে আমরা আমাদের নতুন করে দখল করা এলাকাগুলিকে আরও বেশি সম্প্রসারিত করে নিতে পারি, আর যেখানে শত্রুর শক্তি দুর্বল সেইসব শহর ও যোগাযোগ লাইনগুলোকে আক্রমণ করে অবস্থা অনুসারে দীর্ঘকাল ধরে বা সাময়িকভাবে তা দখল করে রাখতে হবে। এসবই হচ্ছে রণনীতিগত আক্রমণের কর্তব্য আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুর প্রতিরক্ষায় রত থাকার সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের নিজেদের সামরিক শক্তি ও জনসাধারণের শক্তিকে কার্যকরীভাবে বিকশিত করা, শত্রুর শক্তিকে কার্যকরীভাবে হ্রাস করা এবং প্রস্তুতি চালানো, যাতে করে শত্রু যখন আবার আমাদের ওপর আক্রমণ করবে, তখন আমরা তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ও প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারি।

আমাদের বাহিনীর বিশ্রাম ও ট্রেনিং একান্ত দরকার, আর তা করার সবচেয়ে ভাল সুযোগ হচ্ছে সেই সময়টা, যখন শত্রু প্রতিরক্ষাত্মক কার্যকলাপ নিয়ে ব্যস্ত। এর অর্থ যে অন্য সবকিছু থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে কেবলমাত্র বিশ্রাম করা ও ট্রেনিং দেওয়া তা নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে আমাদের অধিকৃত এলাকাগুলিকে সম্প্রসারিত করার, শত্রুর ছোট ছোট সৈন্যদলগুলিকে ধ্বংস করার ও জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার কাজ চালানোর সংগে সংগে বিশ্রাম ও ট্রেনিংয়ের জন্য সময় খুঁজে বের করা। সাধারণতঃ এই সময়ে খাদ্য ও বিছানাপত্তর-পোশাকপরিচ্ছদ জোগাড় করা ইত্যাদির কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্যও প্রয়াস করা হয়।

আবার এই হচ্ছে সেই সময়, যখন ব্যাপকমাত্রায় শত্রুর যোগাযোগ পথগুলিকে ধ্বংস করা, তার পরিবহণব্যবস্থাকে ব্যাহত করা, এবং আমাদের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধাভিযানে প্রত্যক্ষ সাহায্য দেওয়া হয়।

এই সময়েই গোটা গেরিলা ঘাঁটি এলাকা, গেরিলা অঞ্চল ও গেরিলাবাহিনী উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আর শত্রুর দ্বারা বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত এলাকাগুলি ক্রমে ক্রমে সুশৃংখল অবস্থায় ফিরে আসে ও পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। শত্রুদখলীকৃত এলাকায় জনসাধারণও আনন্দে মেতে ওঠেন, আর গেরিলাদের যশঃকীর্তনে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, শত্রুর ও তার পদলেহী কুকুর চীনা দেশদ্রোহীদের ভেতরে একদিকে বাড়তে থাকে উদ্বেগ-আতংক ও বিভেদ, অন্যদিকে তেমনি বাড়তে থাকে গেরিলাবাহিনী ও ঘাঁটি এলাকার প্রতি তাদের ঘৃণা, আর গেরিলাযুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতিও হয়ে ওঠে তীব্রতর। সুতরাং, রণনীতিগত আক্রমণ চালানোর সময়ে গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকদের উল্লাসে আত্মহারা হয়ে শত্রুকে তুচ্ছ করে দেখা উচিত নয়, আর আমাদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং ঘাঁটি এলাকাকে ও নিজেদের সৈন্যবাহিনীকে সুদৃঢ় করার কাজ ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই সময়ে, শত্রুর কার্যকলাপকে অবশ্যই নৈপুণ্যের সংগে লক্ষ্য করতে হবে, আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুরা আবার আক্রমণের চেষ্টা করছে কিনা তার ইঙ্গিত-আভাস লক্ষ্য করতে হবে, যাতে করে শত্রুর আক্রমণ শুরু হওয়া মাত্রই যথাযথভাবে আমাদের রণনীতিগত আক্রমণ শেষ করে রণনীতিগত প্রতিরক্ষার পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারি এবং সেই প্রতিরক্ষার মধ্য দিয়ে শত্রুর আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারি।

অষ্টম অধ্যায়

গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধন

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির পঞ্চম সমস্যাটি হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধন। এ বিকাশসাধন প্রয়োজন ও সম্ভব, কারণ যুদ্ধটি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম। চীন যদি দ্রুতগতিতে জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত করে নিজের হারানো জমি পুনরুদ্ধার করে নিতে পারত, এবং যুদ্ধটি যদি দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম না হতো, তাহলে গেরিলাযুদ্ধের চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধনের দরকার হতো না। কিন্তু অবস্থাটা সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের, এ যুদ্ধটি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী আর নির্মম, তাই চলমান যুদ্ধে বিকাশলাভ করেই কেবল গেরিলাযুদ্ধ নিজেকে এ ধরনের যুদ্ধের সংগে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যুদ্ধটি দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম বলেই গেরিলাবাহিনী প্রয়োজনীয় অগ্নিপরীক্ষার

মধ্যে পোড় খেয়ে ক্রমে ক্রমে নিজেদেরকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে পরিবর্তিত করতে পারে, এই ক্রমপরিবর্তনের ভেতর দিয়ে তাদের লড়াই চালনার পদ্ধতিটিও ক্রমশঃ নিয়মাবদ্ধ হয়ে ওঠে আর গেরিলাযুদ্ধটা চলমান যুদ্ধে পরিণত হয়। গেরিলাযুদ্ধের পরিচালকদের অবশ্যই এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতাকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হবে, শুধু তাহলেই তারা গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধনের নীতিতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকতে এবং এই নীতিকে সুপরিকল্পিতভাবে পালন করতে পারে।

এখন বহু জায়গাতেই, যেমন উতাই পার্বত্য অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে, নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর দ্বারা প্রেরিত শক্তিশালী শাখাবাহিনীই গেরিলাযুদ্ধের বিকাশসাধন করছে। সেখানকার লড়াই সাধারণতঃ গেরিলা ধরনের হলেও শুরু থেকেই তাতে চলমান যুদ্ধের উপাদানও ছিল। যুদ্ধ যতদিন ধরে চলবে ততই এই উপাদানও দিন দিনই বেড়ে চলবে। এটাই হচ্ছে আজকের জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব, এটা শুধু যে গেরিলাযুদ্ধকে দ্রুতভাবে প্রসারিত করে তা নয়, উপরন্তু তাকে দ্রুতভাবে উন্নত করে তোলে, সুতরাং তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের গেরিলাযুদ্ধের তুলনায় এখানে গেরিলাযুদ্ধ চালাবার পক্ষে অবস্থা অনেক বেশি উন্নত।

গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এমন গেরিলাবাহিনীগুলিকে চলমান যুদ্ধের চালনাকারী নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তরের জন্য দুটি শর্তের প্রয়োজন— সংখ্যাগত বৃদ্ধি ও গুণগত উন্নতি। সংখ্যাগত বৃদ্ধির ব্যাপারে, জনগণকে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সমাবেশ করা ছাড়াও, ছোট ছোট বাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে নেবার পদ্ধতিও অবলম্বন করা যায়; গুণগত উন্নতি নির্ভর করে যুদ্ধে যোদ্ধাদের পোড় খাইয়ে দৃঢ় করার ও অস্ত্র-শস্ত্রের গুণের উন্নতিসাধনের ওপরে।

ছোট ছোট বাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে নেবার ব্যাপারে; একদিকে স্থানীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে, যা শুধু স্থানীয় স্বার্থের ওপরেই মনোযোগ দেয় এবং ফলে কেন্দ্রীয়করণ ব্যাহত হয়; আর অন্যদিকে সতর্ক থাকতে হবে বিশুদ্ধ সামরিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেও, যা স্থানীয় স্বার্থের ওপরে দৃষ্টি দেয় না।

স্থানীয় গেরিলাবাহিনী ও স্থানীয় সরকারের ভেতরে স্থানীয়তাবাদের অস্তিত্ব রয়েছে; তারা প্রায়শঃই শুধু স্থানীয় স্বার্থেরই যত্ন নেয়, সামগ্রিক স্বার্থকে ভুলে যায়; অথবা তারা আলাদা আলাদা কার্যকলাপ চালাতে পছন্দ করে, সমষ্টিগত কাজকর্মে অভ্যস্ত নয়। প্রধান গেরিলাবাহিনীর অথবা গেরিলা

সৈন্যসংস্থানের পরিচালকদের অবশ্যই এই অবস্থাকে বিবেচনা করতে হবে এবং ক্রমে ক্রমে ও আংশিকভাবে কেন্দ্রীভূত করার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে অব্যাহতভাবে গেরিলাযুদ্ধ প্রসারিত করার জন্য স্থানীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তি থাকে ; পরিচালকদের অবশ্যই সর্বপ্রথমে ছোট ছোট বাহিনীগুলিকে যুক্ত কার্যকলাপে লাগিয়ে দেওয়া আর তারপরে সেগুলির সাংগঠনিক কাঠামোকে না ভেঙে ও কর্মীদের অদলবদল না করে সেগুলিকে নিজেদের বাহিনীর সংগে মিলিয়ে এক করে নেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে সেই ছোট বাহিনীগুলি বড় দলের সংগে সহজে মিলে যেতে পারে।

স্থানীয়তাবাদের উল্টোদিকে, বিশুদ্ধ সামরিক মনোবৃত্তি হচ্ছে প্রধান বাহিনীগুলির সেইসব পরিচালকদের ভুল দৃষ্টিকোণ, যারা কেবল নিজেদের বাহিনীগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর আর স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে সাহায্য করতে অবহেলা করে। এ কথা তারা জানে না যে, গেরিলাযুদ্ধের চলমান যুদ্ধে বিকাশসাধনের অর্থ গেরিলাযুদ্ধকে বর্জন করা নয়, বরং তার অর্থ হচ্ছে ব্যাপকবিস্তৃত গেরিলাযুদ্ধের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এমন একটি প্রধান শক্তির সৃষ্টি করা যা চলমান যুদ্ধ চালাতে সক্ষম, এবং এই প্রধান শক্তির আশেপাশে এমন বহুসংখ্যক গেরিলাবাহিনী অবশ্যই থাকবে যেগুলি ব্যাপক গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এই বহুসংখ্যক গেরিলাবাহিনী হচ্ছে প্রধান শক্তির প্রবল সহায়ক বাহিনী, এগুলি আবার প্রধান শক্তির অব্যাহত সম্প্রসারণের অফুরন্ত উৎস। তাই, কোন প্রধান বাহিনীর পরিচালক যদি বিশুদ্ধ সামরিক মনোবৃত্তির ফলে স্থানীয় জনসাধারণ ও স্থানীয় সরকারের স্বার্থের ওপরে দৃষ্টি না দেওয়ার ভুল করে বসেন, তাহলে এই ভুলটিকে অবশ্যই শুধরে নিতে হবে, সংশোধন করে নিতে হবে প্রধান শক্তির সম্প্রসারণ ও স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি— এ দুটিই যাতে যথাযোগ্য স্থান পেতে পারে তার জন্য।

গেরিলাবাহিনীর গুণকে উন্নত করার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হচ্ছে রাজনীতি, সংগঠন, সাজসরঞ্জাম, সামরিক প্রয়োগকৌশল, রণকৌশল ও শৃংখলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করা, আর ক্রমে ক্রমে নিজেদেরকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর আকারে গড়ে তোলা এবং গেরিলা রীতি পরিহার করা। গেরিলাবাহিনীগুলিকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর স্তরে উন্নীত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কম্যাণ্ডার ও যোদ্ধাদের উভয়কেই উপলব্ধি করানো, ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়া এবং রাজনৈতিক কাজকর্মের মাধ্যমে ঐ লক্ষ্যের অর্জনকে সুনিশ্চিত করাটা হচ্ছে রাজনীতিগতভাবে একান্ত আবশ্যক। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক হল ক্রমে ক্রমে নিয়মিত সৈন্যসংস্থানের জন্য

প্রয়োজনীয় সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মসংস্থা গড়ে তোলা, সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রস্তুত করা, সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতিকে গ্রহণ করা এবং নিয়মিত সরবরাহ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করা। সাজসরঞ্জামের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্রের গুণকে উন্নত করা ও আরও বিভিন্ন রকমের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা এবং প্রয়োজনীয় যোগাযোগব্যবস্থা সম্পর্কিত সরঞ্জামের সরবরাহ বৃদ্ধি করা। সামরিক প্রয়োগকৌশল ও রণকৌশলের ক্ষেত্রে, গেরিলাবাহিনীকে নিয়মিত সৈন্যসংস্থানের প্রয়োজনীয় স্তরে উন্নীত করা দরকার। শৃংখলার ক্ষেত্রে, এমন স্তরে উন্নীত হওয়া দরকার যাতে করে সর্বত্রই একই মানদণ্ড মেনে চলা হয়, প্রতিটি আদেশ দৃঢ়ভাবে পালন করা হয় ব্যতিক্রমহীনভাবে, এবং সমস্ত রকমের ঢিলেঢালা ভাব নির্মূল হয়। এইসব কর্তব্যগুলি সম্পাদনের জন্য দরকার একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রয়াস-প্রক্রিয়া, রাতারাতি তা করতে পারা যায় না; কিন্তু সেইদিকে আমাদের অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। শুধুমাত্র এইভাবেই গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকায় প্রধান সৈন্যসংস্থান গড়ে উঠতে পারে এবং উদ্ভূত হয়ে উঠতে পারে চলমান যুদ্ধ, যা শত্রুর ওপরে আঘাত হানার ব্যাপারে আরও বেশি কার্যকর। যেখানে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী থেকে প্রেরিত শাখাবাহিনী অথবা কর্মীরা থাকে, সেখানে অপেক্ষাকৃত সহজভাবেই এই ধরনের লক্ষ্যটা অর্জন করতে পারা যায়। অতএব গেরিলাবাহিনীকে নিয়মিত বাহিনীর দিকে বিকাশলাভ করতে সাহায্য করার দায়িত্ব সব নিয়মিত সৈন্যবাহিনীরই রয়েছে।

নবম অধ্যায়

পরিচালনার সম্পর্ক

জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির শেষ সমস্যাটি হচ্ছে পরিচালনার সম্পর্কের সমস্যা। এই সমস্যার সঠিক সমাধানই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের অবাধ বিকাশের অন্যতম শর্ত।

যেহেতু গেরিলাবাহিনী হচ্ছে নিম্নস্তরের সশস্ত্র সংগঠন, আর তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে কার্যকলাপ চালানো, তাই গেরিলাযুদ্ধের পরিচালনার পদ্ধতিটি নিয়মিত যুদ্ধের পরিচালনার পদ্ধতির মতো উচ্চমাত্রার কেন্দ্রীয়করণের অনুমতি দেয় না। নিয়মিত যুদ্ধের পরিচালিত পদ্ধতিতে যদি গেরিলাযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করা হয়, তাহলে গেরিলাযুদ্ধের উচ্চমাত্রার নমনীয়তা অপরিহার্যভাবেই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়বে, আর গেরিলাযুদ্ধের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। উচ্চমাত্রার কেন্দ্রীভূত পরিচালনা হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের উচ্চমাত্রার নমনীয়তার সরাসরি বিপরীত এবং তাই এক্ষেত্রে তা অবশ্যই প্রয়োগ করা উচিত

নয় এবং করতে পারাও যায় না ।

তবু এর অর্থ এই নয় যে, কোন কেন্দ্রীভূত পরিচালনা ছাড়াই গেরিলাযুদ্ধ সাফল্যজনকভাবে বিকাশলাভ করতে পারে। একই সময়ে যখন ব্যাপক নিয়মিত যুদ্ধ ও ব্যাপক গেরিলাযুদ্ধ চলে তখন উভয়ের যথাযোগ্যভাবে সমন্বিত কার্যকলাপ চালানো দরকার; তাই এখানে এই দুইয়ের সমন্বিত কার্যকলাপের জন্য একটি পরিচালনার প্রয়োজন, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সেনাপতিমণ্ডলী ও যুদ্ধাঞ্চলগুলির সেনাপতিদের দ্বারা রণনীতিগত সামরিক কার্যকলাপের একীভূত পরিচালনার প্রয়োজন। একটা গেরিলা অঞ্চলে বা গেরিলা ঘাঁটি এলাকায় বহু গেরিলাবাহিনী থাকে, যাদের মধ্যে প্রধান শক্তি হিসেবে সাধারণতঃ একটা বা কয়েকটা গেরিলা সৈন্যসংস্থান থাকে (কখনো কখনো নিয়মিত সৈন্যসংস্থানও থাকে), আর সহায়ক শক্তি হিসেবে ছোট-বড় অনেকগুলি গেরিলাবাহিনী থাকে, তা ছাড়া উৎপাদনের কাজ থেকে অবিচ্ছিন্ন এমন ব্যাপক জনগণের সশস্ত্র শক্তিও থাকে—তখন সেখানকার শত্রুরাও সাধারণতঃ নিজেদেরকে একটা একীভূত ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলে একসংগে গেরিলাযুদ্ধের মোকাবিলা করে। সেইজন্য, এই ধরনের গেরিলা অঞ্চলে বা ঘাঁটি এলাকায় একটা একীভূত পরিচালনা অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত পরিচালনার সমস্যা দেখা দেয় ।

তাই, চরম কেন্দ্রীয়করণ ও নিরঙ্কুশ বিকেন্দ্রীকরণ—উভয়েরই বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের পরিচালনার নীতি হওয়া উচিত রণনীতিগত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত পরিচালনা আর যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে বিকেন্দ্রীভূত পরিচালনা।

রণনীতিগত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত পরিচালনার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র কর্তৃক সমগ্র গেরিলাযুদ্ধের পরিকল্পনাকরণ, প্রতিটি যুদ্ধাঞ্চলে নিয়মিত যুদ্ধের সংগে গেরিলাযুদ্ধের সমন্বয়সাধন এবং প্রত্যেকটি গেরিলা অঞ্চলে বা ঘাঁটি এলাকায় সেখানকার সমস্ত জাপ-বিরোধী সশস্ত্র শক্তির জন্য একীভূত পরিচালনা। এসব ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য, একত্ব ও কেন্দ্রীয়করণের অভাব ক্ষতিকর, আর সামঞ্জস্য একত্ব ও কেন্দ্রীয়করণকে অর্জন করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে। সাধারণ ব্যাপারে, অর্থাৎ রণনীতির চরিত্রবিশিষ্ট ব্যাপারে নিম্নতর স্তরগুলিকে অবশ্যই উচ্চতর স্তরের কাছে রিপোর্ট করতে হবে এবং উচ্চতর স্তরগুলির নির্দেশ মেনে চলতে হবে, যাতে করে মিলিত কার্যকলাপের সফলতা সুনিশ্চিত করা যায়। তবু এখানেই কেন্দ্রীয়করণকে থামতে হয়; এই সীমা অতিক্রম করা, নিম্নতর স্তরগুলির বিশিষ্ট ব্যাপারে—ধরা যাক যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের জন্য বিশিষ্ট সৈন্যবিন্যাসব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে, হস্তক্ষেপ করা অনুরূপভাবেই ক্ষতিকর হবে। কারণ এইসব বিশিষ্ট ব্যাপারকে অবশ্যই সাধন করতে

হবে বিশিষ্ট অবস্থা অনুসারে, যা এক সময় থেকে অন্য সময়ে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলে যায়, আর এইসব বিশিষ্ট অবস্থা অতি দূরবর্তী উচ্চতর স্তরের সংস্থার জ্ঞানের একেবারে বাইরে। এটাই হচ্ছে যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে বিকেন্দ্রীভূত পরিচালনার নীতি। এই নীতিটা সাধারণভাবে নিয়মিত যুদ্ধের লড়াই চালনায়ও খাটে, বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন পর্যাপ্ত নয় তখন তো খাটেই। এক কথায়, এটা হচ্ছে একটা একীভূত রণনীতিগত পরিচালনার অধীন ও স্বতন্ত্র গেরিলাযুদ্ধ।

গেরিলা ঘাঁটি এলাকায়, যেখানে একটি সামরিক অঞ্চল গড়ে তোলা হয়, যা কতকগুলি সামরিক উপ-অঞ্চলে বিভক্ত, প্রতিটি সামরিক উপ-অঞ্চল কয়েকটি জেলায় বিভক্ত, আর প্রতিটি জেলা আবার কতকগুলি মহকুমায় বিভক্ত, সেখানে নিম্নরূপের অধীনতার ব্যবস্থা চালু হয়ঃ মহকুমা সরকার জেলা সরকারের অধীন, জেলা সরকার সামরিক উপ-অঞ্চলের সদর দপ্তরের অধীন, সামরিক উপ-অঞ্চলের সদর দপ্তর সামরিক অঞ্চলের সদর দপ্তরের অধীন, আর প্রত্যেকটি সশস্ত্র বাহিনীকে অবশ্যই তার চরিত্র অনুসারে এইগুলির একটার-না-একটার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের অধীনে থাকতেই হয়। উপরে উল্লিখিত মূল নীতি অনুসারে এই সবগুলির মধ্যেকার পরিচালনার সম্পর্ক নিম্নরূপঃ সাধারণ নীতির বিষয়গুলি উচ্চতর স্তরে কেন্দ্রীভূত হয় ; আর বাস্তব অবস্থা অনুসারে বাস্তব কার্যকলাপ সম্পাদিত হয়, নিম্নতর স্তরগুলির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কার্য চালনার অধিকার থাকে । কোন উচ্চতর স্তরের নিম্নতর স্তরে গৃহীত কোন বাস্তব কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু মতামত থাকলে, উচ্চতর স্তর তার অভিমতকে 'নির্দেশ' হিসেবে পেশ করতে পারে এবং তাই করা উচিত, কিন্তু সে অভিমতকে অবশ্যই অপরিবর্তনীয় 'আদেশ' হিসেবে জারী করা উচিত নয়। এলাকা যত বিস্তীর্ণ হবে, পরিস্থিতি যত জটিল হবে, আর উচ্চতর স্তর ও নিম্নতর স্তরের মধ্যে দূরত্বটা যত বেশি হবে, ততই আরও বেশি প্রয়োজন হবে এই ধরনের বাস্তব কার্যকলাপে নিম্নতর স্তরগুলিকে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকার দেওয়া, এবং এই কার্যকলাপকে আরও বেশি স্থানীয় চরিত্র দেওয়া, তাকে স্থানীয় অবস্থার প্রয়োজনের সংগে আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে খাপ খাওয়ানো, যাতে করে নিম্নতর স্তরগুলির ও স্থানীয় কর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সামর্থ্য পরিপুষ্ট করে তুলতে, জটিল পরিবেশের মোকাবিলা করতে এবং জয়যুক্তভাবে গেরিলাযুদ্ধকে প্রসারিত করতে পারা যায়। কেন্দ্রীভূত কার্যকলাপে রত কোন বাহিনী বা সৈন্যসংস্থার আভ্যন্তরীণ পরিচালনা সম্পর্কে কেন্দ্রীভূত পরিচালনার নীতি প্রয়োগ করা উচিত, কারণ এখানে অবস্থাটা পরিষ্কার; কিন্তু এই বাহিনী বা

সৈন্যসংস্থা যদি একবার বিক্ষিপ্ত কার্যকলাপ শুরু করে দেয়, তখন সাধারণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয়করণের ও বিশিষ্ট ব্যাপারে বিকেন্দ্রীকরণ নীতিটি প্রয়োগ করা উচিত, কারণ উচ্চতর নেতৃত্বের কাছে তখন বিশিষ্ট অবস্থাটি পরিষ্কার হতে পারে না।

যা কেন্দ্রীভূত করা উচিত, তা কেন্দ্রীভূত না করার অর্থ হচ্ছে উচ্চতর স্তরগুলি কর্তৃক কর্তব্যে অবহেলা, এবং নিম্নতর স্তরগুলি কর্তৃক স্বেচ্ছাচারীভাবে কর্তৃত্ব করা। এটাকে যে-কোন উচ্চতর ও নিম্নতর স্তরগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহ্য করতে পারা যায় না। যেখানে বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত, সেখানে যদি তা করা না হয়, তাহলে তার অর্থ হয় উচ্চতর স্তরগুলির দ্বারা ক্ষমতাকে একচেটিয়া করে নেওয়া আর নিম্নতর স্তরগুলির উদ্যোগের অভাব। এটাকেও যে-কোন উচ্চতর ও নিম্নতর স্তরগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গেরিলাযুদ্ধের পরিচালনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় না। উপরে যেসব নীতি বর্ণনা করা হল, শুধু সেগুলিই হচ্ছে পরিচালনার সম্পর্কের সমস্যার সঠিক সমাধানের কর্মপন্থা।

টীকা

১। ছাংপাই পর্বত হচ্ছে চীনের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত একটি পর্বতমালা। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ঘটনার পর ছাংপাই পার্বত্য অঞ্চলটি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত জাপ-বিরোধী গেরিলা ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হয়েছিল।

২। উতাই পর্বত হচ্ছে শানসী, চাহার ও হোপেই প্রদেশ তিনটির সীমান্তে অবস্থিত পর্বতমালা। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত অষ্টম রুট বাহিনী উতাই পার্বত্য অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শানসী-চাহার-হোপেই জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে শুরু করে।

৩। তাইহাং পর্বত হচ্ছে শানসী, হোপেই ও হোনান প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত একটি পর্বতমালা। ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে অষ্টম রুট বাহিনী তাইহাং পার্বত্য অঞ্চলকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পূর্ব শানসী জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে শুরু করে।

৪। তাইশান পর্বত শানতুং প্রদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত, এটা হচ্ছে তাই-ই পর্বতমালার অন্যতম প্রধান শৃঙ্গ। ১৯৩৭ সালের শীতকালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত গেরিলাবাহিনী তাই-ই পার্বত্য অঞ্চলকে কেন্দ্র করে মধ্য শানতুং ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে শুরু করে।

৫। ইয়ানশান পর্বত হচ্ছে হোপেই ও রেহো প্রদেশের সীমান্তের পর্বতমালা।

১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে ইয়ানশান পার্বত্য অঞ্চলকে কেন্দ্র করে অষ্টম রুট বাহিনী পূর্ব হোপেই জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে শুরু করে।

৬। মাওশান পর্বত দক্ষিণ কিয়াংসুতে অবস্থিত। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত নতুন চতুর্থ বাহিনী মাওশান পার্বত্য অঞ্চলকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ কিয়াংসু জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে শুরু করে।

৭। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিকাশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছিল যে, সমতলভূমি অঞ্চলেও দীর্ঘস্থায়ী ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা সম্ভব, এবং বহু জায়গায় এইরূপ ঘাঁটি এলাকা স্থায়ী ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হতেও পারে। অঞ্চলের সুবিশালতা, সেখানকার বিরাট জনসংখ্যা, কমিউনিস্ট পার্টির নীতির সঠিকতা, জনসাধারণের ব্যাপক সমাবেশকরণ ও শত্রুর সৈন্যশক্তির স্বল্পতা ইত্যাদি ইত্যাদি—এটাকে সম্ভব করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে কমরেড মাও সে-তুঙ বিশেষ বিশেষ নির্দেশগুলিতে এই কথাটিকে আরও স্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন।

৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। অনেক দেশে জনগণ তাঁদের নিজস্ব বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলের তমসাচ্ছন্ন শাসনের উচ্ছেদ ঘটাবার জন্য লাগাতর সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন। এদ্দ্বারা প্রতীয়মান যে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে—যখন সমাজতান্ত্রিক শিবির, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জনগণের বিপ্লবী শক্তিসমূহ এবং সারা দুনিয়ায় গণতন্ত্র ও প্রগতির জন্য কঠোর প্রচেষ্টারত জনগণের শক্তিসমূহ যখন সামনের দিকে বিরাট বিরাট পদক্ষেপ ফেলছে, যখন বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আরও দুর্বল হচ্ছে, এবং যখন সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শাসন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে—এমন অবস্থায় আজ যে সমস্ত দেশ গেরিলা যুদ্ধকৌশল অনুসরণ করছে তা জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের তখন যে ধরনের গেরিলাযুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল সেরকম হবে না। অন্য কথায়, গেরিলাযুদ্ধ সফলভাবে সেইসব দেশেই পরিচালনা করা যেতে পারে যে দেশের ভূখণ্ড বিরাটাকার নয়, যেমন কিউবা, আলজেরিয়া, লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম।

৯। ওয়েইছী দাবা হচ্ছে চীনের একটা অত্যন্ত প্রাচীন ধরনের খেলা। এ খেলায় ছকের ওপরে পরস্পরের ঘুঁটিগুলিকে ঘিরে ধরার চেষ্টা করে দুজন খেলুড়ে। কোন খেলুড়ের কোন একটা বা কতকগুলি ঘুঁটি প্রতিপক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ঘুঁটিগুলির মধ্যে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে ফাঁকা ঘর থাকে তাহলে ঘুঁটিগুলি তখনো 'জ্যান্ত' বলে ধরা হয়।

১০। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫৩ সালে চাও রাজ্যের রাজধানী হানতানকে অবরোধ করেছিল ওয়েই রাজ্য। ছী রাজ্যের রাজা তার দুই সেনাপতি—থিয়ান চী আর সুন পিনকে সৈন্য নিয়ে চাও-এর সাহায্যের জন্য যেতে আদেশ দিল। সুন পিন মনে করল যে, ওয়েই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনী চাও রাজ্যের ভেতরে ঢুকে পড়েছে আর তাদের

নিজেদের রাজ্যে শুধু সামান্য সৈন্যশক্তি রেখেছে। অতএব, সুন পিন ওয়েই রাজ্যকে আক্রমণ করল, আর নিজেদের দেশকে রক্ষা করার জন্য ওয়েই বাহিনী তখন চাও রাজ্য থেকে সরে এল। ওয়েই বাহিনীর নিদারুণ শ্রান্তির সুযোগ নিয়ে ছী সৈন্যবাহিনী কুইলিংয়ের (আজকের শানতুং প্রদেশের হোজে জেলার উত্তর-পূর্ব) লড়াইয়ে তাদেরকে ভীষণভাবে পরাজিত করল। এইভাবে হানতানের অবরোধ উত্তোলিত হল। সেই থেকে চীনা রণবিশারদরা অনুরূপ রণপদ্ধতিকে 'ওয়েই রাজ্যকে অবরোধ করে চাও রাজ্যকে বাঁচানো' বলে বর্ণনা করতে থাকে।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে

মে, ১৯৩৮

সমস্যার সূত্রপাত

(১) জাপ-বিরোধী মহান প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম বার্ষিকী—৭ই জুলাই ঘনিয়ে আসছে। প্রায় এক বছর হল গোটা জাতির শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অটল থেকে এবং দৃঢ়তার সংগে যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করে শত্রুর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাচ্যের ইতিহাসে এই যুদ্ধের কোন পূর্ব-নজির নেই ; পৃথিবীর ইতিহাসেও এ যুদ্ধ এক মহান যুদ্ধ হিসেবে স্থান লাভ করবে। সারা দুনিয়ার জনগণ মনোযোগের সংগে এই যুদ্ধের গতিধারা লক্ষ্য করছেন। যুদ্ধের দুর্দশায় জর্জরিত ও আপন জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামরত প্রতিটি চীনা প্রতিদিনই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য আকুল আকাঙ্খা প্রকাশ করছেন। কিন্তু আসলে যুদ্ধের গতি কি হবে ? আমরা কি জিততে পারব ? শীঘ্রই কি আমরা জিততে পারব ? অনেকেই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কথা বলছেন ; কিন্তু এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে কেন ? দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কিভাবে চালাতে হয় ? অনেকেই চূড়ান্ত বিজয়ের কথা বলছেন, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয়ই-বা কেন আমাদের হবে? চূড়ান্ত বিজয় কিভাবে অর্জন করা যায় ? —এইসব প্রশ্নের উত্তর যে প্রত্যেকেই খুঁজে পেয়েছেন, তা নয়। এমনকি আজও অধিকাংশ লোকই তা পাননি। সুতরাং জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের পরাজয়বাদী প্রবক্তারা আগ বাড়িয়ে জনসাধারণকে বলছে, চীন পদানত হবে এবং চূড়ান্ত বিজয় চীনের হবে না। পক্ষান্তরে, কিছু সংখ্যক ধৈর্যহীন বন্ধু এগিয়ে এসে জনসাধারণকে বলছে যে, চীন অচিরেই বিজয় অর্জন করবে, এর জন্য কোনরকমের বিরাট প্রয়াসের দরকার নেই। এইসব অভিমত কি সঠিক? আগাগোড়াই আমরা বলে আসছি, এগুলি ঠিক নয়। যাই হোক, আমরা যা বলে আসছি, অধিকাংশ লোকই এখনো তা উপলব্ধি করেননি। এটা কিছুটা এই কারণে যে, আমরা যথেষ্ট প্রচার ও ব্যাখ্যামূলক কাজ করিনি, আর কিছুটা এই কারণে যে, বাস্তব ঘটনাদির বিকাশ

১৯৩৮ সালের ২৬শে মে থেকে ৩রা জুন অবধি ইয়েনানে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পর্যালোচনা-সমিতিতে কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতামালা প্রদান করেছিলেন।

এখনো ততটা হয়নি যে তাদের সহজাত প্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশ পাবে এবং স্পষ্টভাবে তার চেহারা মানুষের চোখে ধরা পড়বে। তাই জনসাধারণ তার সামগ্রিক গতি ও পরিণতিকে দূরদর্শিতার সংগে দেখার অবস্থায় ছিলেন না এবং সেই কারণে তাঁরা নিজেদের সামগ্রিক কর্মনীতি ও কৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অবস্থায়ও ছিলেন না। এখন অবস্থা ভাল হয়েছে। দশ মাসের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা জাতীয় পরাধীনতার সম্পূর্ণ অমূলক তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দেবার পক্ষে এবং দ্রুত বিজয়ের তত্ত্ব থেকে আমাদের ধৈর্যহীন বন্ধুদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই সারসংকলনগত বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করছে। তারা বিশেষভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ব্যাখ্যা চাইছে। তা চাওয়ার কারণ, একদিকে তার বিরুদ্ধে রয়েছে জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব ও দ্রুত বিজয়ের তত্ত্ব, এবং অন্যদিকে রয়েছে এই যুদ্ধ সম্পর্কে ভাসাভাসা উপলব্ধি। 'লুকৌছিয়াও ঘটনা[১] থেকে শুরু করে আমাদের চল্লিশ কোটি মানুষ একসাথে প্রয়াস চালিয়ে আসছে, এবং চূড়ান্ত বিজয় চীনেরই হবে।' —এই সূত্রটি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এটা একটা সঠিক সূত্র, কিন্তু বাস্তব সারমর্ম দিয়ে তাকে পূর্ণতা দান করা দরকার। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও যুক্তফ্রন্ট টিকে থাকতে পারে বহু উপাদানের কারণে। সে উপাদানগুলো হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শুরু করে কুওমিনতাঙ পর্যন্ত দেশের সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি, শ্রমিক ও কৃষক থেকে শুরু করে বুর্জোয়াশ্রেণী পর্যন্ত সারা দেশের জনগণ এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনী থেকে শুরু করে গেরিলাবাহিনী পর্যন্ত দেশের যাবতীয় সশস্ত্র সৈন্যশক্তি ; আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এগুলির ব্যাপ্তি—সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে শুরু করে সকল দেশের ন্যায়পরায়ণ জনগণ পর্যন্ত ; শত্রু শিবিরের ক্ষেত্রেও এগুলির প্রসার হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে আছে জাপানে যারা যুদ্ধের বিরোধিতা করে তাদের থেকে শুরু করে ফ্রন্টে যেসব জাপানী সৈন্য যুদ্ধের বিরোধিতা করে তারা পর্যন্ত। এক কথায়, এইসব শক্তির সবাই কম বা বেশি মাত্রায় অবদান জুগিয়েছে আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধে। বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের উচিত তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। আমরা কমিউনিস্টরা জাপ-বিরোধী অন্যান্য পার্টি ও দলের সংগে এবং সমগ্র জনগণের সংগে মিলে একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছি—সে উদ্দেশ্য হচ্ছে সুদৃঢ় প্রচেষ্টায় সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে হিংস্র জাপানী আক্রমণকারীদের পরাজিত

করা। এ বছরের পয়লা জুলাই তারিখে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার ১৭তম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হবে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে আরও ভালভাবে এবং আরও ব্যাপকভাবে নিজের শক্তি প্রয়োগ করতে প্রতিটি কমিউনিস্টকে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকে গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করা। তাই আমার এই আলোচনাগুলো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর্যালোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রাসঙ্গিক যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কেই আমি বলার চেষ্টা করব, কিন্তু সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারব না, কারণ একটি বক্তৃতামালাতেই প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে পুরোপুরিভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

(২) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের দশ মাসের সমগ্র অভিজ্ঞতা চীনের অনিবার্য পরাধীনতার তত্ত্ব ও চীনের দ্রুত বিজয়ের তত্ত্ব যে ভুল—সেকথাই প্রমাণ করে। প্রথমোক্ত তত্ত্বটি আপোষ করার ঝোঁক সৃষ্টি করে আর শেষোক্তটি শত্রুর শক্তিকে কম করে দেখার ঝোঁক সৃষ্টি করে। সমস্যা সম্পর্কে এই উভয় বিচার পদ্ধতিই হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক ও একতরফা, কিংবা এক কথায় অবৈজ্ঞানিক।

(৩) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের আগে জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের বিষয়ে অনেক কথা শোনা যেত। কেউ কেউ বলত ঃ 'অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে শত্রুর চেয়ে চীন নিকৃষ্ট, আর যুদ্ধ করলেই সে হারতে বাধ্য।' অন্যেরা বলত, 'চীন যদি সশস্ত্র প্রতিরোধে অগ্রসর হয়, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে আর একটি আবিসিনিয়ায় পরিণত হবে।' প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব সম্পর্কে খোলাখুলি কথাবার্তা শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু সে সম্পর্কে গোপনে কথা চলছেই, আর তা চলছে ব্যাপক মাত্রায়ই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপোষের আবহাওয়া মাঝে মাঝেই ঘনীভূত হয়ে ওঠে, আর আপোষের প্রবক্তারা যুক্তি দেখায় ঃ 'যুদ্ধ অব্যাহত রাখলে, অনিবার্যভাবেই পদানত হব'[২]। হুনান থেকে একজন ছাত্র চিঠিতে লিখেছে ঃ

> গ্রামে সব কিছুতেই কষ্ট অনুভব করি। আমি একা প্রচার করতে গিয়ে যখন যেখানে লোকদের পাই, তখনই সেখানে তাদের সংগে আমাকে কথা বলতে হয়। যেসব লোকের সংগে 'আমি কথা বলেছি, তারা কিন্তু অজ্ঞ বা নির্বোধ নয়। কি ঘটছে তার কিছুটা উপলব্ধি তাদের সবারই আছে। আমার বক্তব্য সম্পর্কেও তারা খুবই কৌতূহলী। কিন্তু যখন আমার নিজের আত্মীয়স্বজনের সংগে দেখা হয়, তখন সবসময়ই তারা বলে ঃ 'চীন জিততে পারে না, 'সে পদানত হবেই'। এটা খুবই বিরক্তিকর লাগে। সৌভাগ্যক্রমে তারা তাদের মতামতকে চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়ায় না। না হলে তো অবস্থাটি

সত্যসত্যই খারাপ হতো। তারা যা বলত, কৃষকরা স্বভাবতঃই তা বেশি বিশ্বাস করত।

এ ধরনের চীনের অনিবার্য পরাধীনতার মতবাদীরাই আপোষকামী ঝোঁকের সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে তোলে। চীনে সর্বত্রই এ ধরনের লোককে দেখতে পাওয়া যায়, আর তাই জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যে যে-কোন সময়ে আপোষের সমস্যাটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং এ সমস্যাটি সম্ভবতঃ যুদ্ধের শেষ পর্যায় পর্যন্তই থাকবে। এখন স্যুচৌ-এর পতন ঘটেছে আর উহান বিপদাপন্ন। তাই আমি মনে করি এ ধরনের জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বকে তীব্রভাবে খণ্ডন করাটা অলাভজনক হবে না।

(৪) প্রতিরোধ যুদ্ধের এই দশ মাসের মধ্যে তাড়াহুড়ো-ব্যাধিসূচক সব রকমের মতামতও দেখা দিয়েছে। যেমন, প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোড়াতে অনেকেই অমূলকভাবে আশাবাদী ছিল। তারা জাপানের শক্তিকে কম করে ধরেছিল, এমনকি মনে করেছিল যে জাপানীরা শানসীর কাছাকাছিও আসতে পারবে না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত ভূমিকাটিকে কেউ কেউ অবহেলা করেছিল, 'সামগ্রিক বিচারে চলমান যুদ্ধ প্রধান আর গেরিলাযুদ্ধ সহায়ক ; আংশিক বিচারে গেরিলাযুদ্ধ প্রধান, চলমান যুদ্ধ সহায়ক'—এই বক্তব্যটিকে তারা সন্দেহ করেছিল। 'গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে মৌলিক, কিন্তু অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের সুযোগ নষ্ট করো না'—অষ্টম রুট বাহিনীর এই রণনীতিকে তারা সমর্থন করে না। এই রণনীতিকে তারা মনে করত 'যান্ত্রিক' বিচারদৃষ্টি[৩] বলে। শাংহাইয়ের লড়াইয়ের সময়ে কেউ কেউ বলত ঃ 'আমরা যদি তিন মাস পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে পারি, তাহলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে বাধ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্যই সৈন্য পাঠাবে, আর যুদ্ধও শেষ হয়ে যাবে।' প্রতিরোধ-যুদ্ধের ভবিষ্যতের জন্য তারা তাদের আশাকে মুখ্যতঃ নিবদ্ধ করে রেখেছিল বৈদেশিক সাহায্যের ওপরে।[৪] তাই-এরচুয়াং বিজয়ের[৫] পর কেউ কেউ এ অভিমত পোষণ করত যে, স্যুচৌ-এর যুদ্ধাভিযানকে 'আধা-নির্ধারক লড়াই' হিসেবে লড়তে হবে, এবং বলত যে, আগেকার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের নীতিটি বদলে দিতে হবে। 'এই লড়াইটি হচ্ছে শত্রুর সর্বশেষ মরণ-কামড়', 'আমরা যদি জিতি তাহলে জাপানী যুদ্ধবাজদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল ভেঙে পড়বে, আর তখন তারা শুধু নিজেদের শেষ বিচারের দিনের জন্যই প্রতীক্ষা করতে পারবে।'[৬] এইরকমের কথা তারা বলত। পিংসিংকুয়ান-এর বিজয়[৭] কারও কারও মাথা ঘুরিয়ে দিল ; তাই এরচুয়াং-এর বিজয় আরও অনেকের মাথা ঘুরিয়ে দিল। সুতরাং শত্রু উহান আক্রমণ করবে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা

দিল। অনেকে ভাবে 'সম্ভবতঃ না' ; আবার অন্যান্য অনেকে ভাবে 'নিশ্চয়ই না'। এই ধরনের সন্দেহ যাবতীয় প্রধান প্রধান সমস্যাকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে। যেমনঃ আমাদের জাপ-বিরোধী শক্তি কি যথেষ্ট ? এর উত্তর হ্যাঁ-সূচক হতে পারে, কারণ শত্রুর আক্রমণ রোধ করার জন্য আমাদের বর্তমান শক্তিই যথেষ্ট, তাহলে আর শক্তি বাড়ানোটা কিসের জন্য ? অথবা যেমনঃ জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টটিকে সুদৃঢ় করার ও সম্প্রসারিত করার শ্লোগানটি কি এখনো সঠিক ? এর জবাব না -সূচক হতে পারে, কারণ যুক্তফ্রন্ট তার বর্তমান অবস্থাতেই শত্রুকে হটিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী, সুতরাং আর তাকে সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করা কেন ? অথবা যেমনঃ কূটনীতিতে ও আন্তর্জাতিক প্রচারে আমাদের প্রচেষ্টাকে কি জোরদার করতে হবে ? এখানেও জবাবটি না-সূচক হতে পারে। অথবা যেমনঃ সৈন্যব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা, গণ-আন্দোলন পরিপুষ্ট করে তোলা, জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য শিক্ষা চালু করা, দেশদ্রোহী ও ট্রট্স্কিপন্থীদের দমন করা, সামরিক শিল্পের বিকাশ-ঘটানো এবং জনগণের জীবিকার উন্নতিসাধন—এইসব কাজ আমাদের গুরুত্বসহকারে করা উচিত কিনা ? অথবা যেমনঃ উহান, কুয়াংচৌ ও উত্তর-পশ্চিমের প্রতিরক্ষা এবং শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে গেরিলাযুদ্ধের প্রচণ্ড পুরিপুষ্টির শ্লোগানগুলি কি এখনো সঠিক ? উত্তরগুলো সবই না-সূচক হতে পারে। এমন লোকও আছে যারা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিন্দুমাত্র অনুকূল ঝোঁক দেখা দেওয়ার মুহূর্তেই কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার সংঘর্ষকে তীব্রতর করে তুলতে তৈরী এবং এইভাবে তারা বহির্দেশীয় থেকে অন্তর্দেশীয় ব্যাপারে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। অপেক্ষাকৃত কোন বড় লড়াইয়ে যখনই জয় হয়, অথবা শত্রুর আক্রমণ যখনই সাময়িককালের জন্য থেমে যায়, তখনই প্রায়শঃ এটা ঘটে। উপরোল্লিখিত এই সবগুলিকেই আমরা রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রের অদূরদর্শিতা বলি। এইসব কথা শুনতে গেলে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে এগুলো একেবারেই অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন কথা মাত্র। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে বিজয়ের সংগে চালিয়ে যাবার জন্য এইসব অন্তঃসারশূন্য কথাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করাটা নিশ্চয়ই উপকারে আসবে।

(৫) এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ চীন কি পদানত হবে ? এর উত্তর হচ্ছে ঃ হবে না, চূড়ান্ত বিজয় চীনেরই হবে। চীন কি সত্বরই বিজয় অর্জন করতে পারে ? জবাব হচ্ছে ঃ না, চীন সত্বর বিজয় অর্জন করতে পারে না, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ।

(৬) এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে মুখ্য যুক্তিগুলিকে আমরা দুই বছর আগেই

সাধারণভাবে দেখিয়েছিলাম। ১৯৬৩ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে—সীআন ঘটনার [৮] পাঁচ মাস আগে এবং লুকৌচিয়াও ঘটনার বার মাস আগে মার্কিন সাংবাদিক মিঃ এডগার স্নো'র সংগে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে চীন-জাপান যুদ্ধের পরিস্থিতির একটা সাধারণ মূল্যায়ন আমি করেছিলাম এবং জয়লাভের জন্য বিভিন্ন নীতির উল্লেখও আমি করেছিলাম। পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি ঃ

প্রশ্ন ঃ চীন কোন্ অবস্থায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে পরাভূত ও ধ্বংস করতে পারে ?

উত্তর ঃ তিনটি শর্তের প্রয়োজন ঃ প্রথম, চীনে একটি জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা ; দ্বিতীয়, জাপ-বিরোধী একটি আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা ; তৃতীয়, জাপানী জনগণের ও জাপানী উপনিবেশগুলিতে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্ভব। চীনা জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে, এই তিনটি শর্তের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চীনা জনগণের বিরাট ঐক্য।

প্রশ্ন ঃ এই যুদ্ধ কতদিন চলবে বলে আপনি মনে করেন।

উত্তর ঃ সেটা নির্ভর করে চীনের জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের শক্তির ওপরে এবং চীন ও জাপান—দুই দেশের অন্যান্য বহু নির্ণায়ক উপাদানের ওপর। অর্থাৎ চীনের নিজস্ব শক্তি হচ্ছে মুখ্য বস্তু, তাছাড়াও, চীনের প্রতি আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং জাপানের বিপ্লবের দ্বারা প্রদত্ত সাহায্যও গুরুত্বপূর্ণ। চীনের জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট যদি প্রবলভাবে বিকাশলাভ করে আর কার্যকরীরূপে তাকে যদি অনুভূমিকভাবে ও উল্লম্বভাবে সংগঠিত করা হয়, যারা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে তাদের নিজস্ব বিপদের কারণ বলে উপলব্ধি করে সেই সরকারগুলি ও সেইসব দেশের জনগণ যদি চীনকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয় এবং জাপানে যদি সত্বর বিপ্লব ঘটে, তাহলে যুদ্ধটি তাড়াতাড়ি শেষ হবে, আর চীনও তাড়াতাড়ি বিজয় অর্জন করবে। এইসব শর্তগুলি যদি দ্রুতগতিকে বাস্তবে পরিণত না হয়, তাহলে যুদ্ধ বিলম্বিত হবে। কিন্তু পরিণতি হবে একই—জাপান নিশ্চিতভাবেই পরাজিত হবে আর চীন নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবে। শুধু আত্মত্যাগই হবে বৃহত্তর, আর অত্যন্ত কষ্টকর একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে হবে আমাদের।

প্রশ্ন ঃ রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিতে এই যুদ্ধের বিকাশের গতিধারা সম্পর্কে আপনার মত কি ?

উত্তর ঃ জাপানের মহাদেশীয় নীতি ইতিমধ্যেই স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। যারা মনে করে, জাপানের সংগে আপোষ করে চীনের ভূখণ্ডের ও সার্বভৌম

অধিকারের আরও খানিকটা জাপানের হাতে তুলে দিয়ে জাপানী আক্রমণকে রুখতে পারবে, তারা কেবল নিছক উদ্ভট কল্পনারই প্রশ্রয় দিচ্ছে। আমরা নিশ্চিত জানি যে, নিম্ন ইয়াংসি উপত্যকা ও আমাদের দক্ষিণের বন্দরগুলি ইতিমধ্যেই জাপান সাম্রাজ্যবাদের মহাদেশীয় কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপরন্তু, জাপান চায় ফিলিপাইন, শ্যাম, ভিয়েতনাম, মালয় উপদ্বীপ ও ওলন্দাজাধিকৃত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিতে, যাতে করে অন্যান্য দেশ থেকে চীনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করা যায়। এই হচ্ছে জাপানের সামুদ্রিক নীতি। এমন সময়ে চীন সন্দেহাতীতভাবে একটা অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় এসে পড়বে। কিন্তু চীনা জনগণের অধিকাংশই বিশ্বাস করে যে, এ ধরণের অসুবিধাকে কাটিয়ে ওঠা যাবে; শুধু বড় বড় বাণিজ্যিক বন্দর-শহরের ধনীরাই হচ্ছে পরাজয়বাদী, কারণ তারা তাদের বিষয়সম্পত্তি হারানোর ভয়ে ভীত। অনেকেই মনে করে যে, একবার চীনের উপকূলসীমা জাপান কর্তৃক অবরুদ্ধ হলে চীনের পক্ষে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হবে। এটা বাজে কথা। একে খণ্ডন করার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে লালফৌজের যুদ্ধের ইতিহাসটি তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গৃহযুদ্ধে লালফৌজের অবস্থাটি যা ছিল, তার থেকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীনের অবস্থা অনেক বেশি ভাল। চীন একটা বিরাট দেশ, দশ থেকে বিশ কোটি নরনারী অধ্যুষিত চীনের একটা অঞ্চল জাপান দখল করে নিতে সমর্থ হলেও আমরা কিন্তু তখনো পরাজিত হওয়া থেকে অনেক দূরেই থেকে যাব। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রভূত শক্তি তখনো আমাদের থাকবে, আর জাপানকে সমগ্র যুদ্ধে অবিরত নিজের পশ্চাদ্ভাগে আত্মরক্ষাত্মক লড়াই চালাতে হবে। চীনের অর্থব্যবস্থার বিভিন্নতা ও অসমতা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে বরং সুবিধাজনক। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবশিষ্টাংশ থেকে নিউইয়র্ককে বিচ্ছিন্ন করলে যতটা ক্ষতি হবে, শাংহাইকে চীনের অবশিষ্টাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে নিশ্চয়ই চীনের ততটা গুরুতর ক্ষতি হবে না। চীনের সামুদ্রিক উপকূলসীমাকে জাপান অবরোধ করে রাখলেও তার পক্ষে চীনের উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম অঞ্চলকে অবরোধ করা অসম্ভব। তাই, আবার বলছি, সমস্যাটির মর্মকেন্দ্র হচ্ছে সমগ্র চীনা জনগণের ঐক্য ও একটি দেশজোড়া জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তোলা। বহুদিন থেকেই আমরা তা বলে আসছি।

প্রশ্ন : যুদ্ধটি যদি দীর্ঘকাল ধরে চলে এবং জাপান যদি সম্পূর্ণভাবে পরাভূত না হয়, তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি কি জাপানের সংগে একটা শান্তি

আলোচনা করতে রাজী হবে, এবং চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে জাপানের শাসন স্বীকার করে নেবে ?

উত্তর ঃ না। গোটা দেশের জনগণের মতো চীনা কমিউনিস্ট পার্টিও চীনের মাটির এক ইঞ্চি জমিও জাপানকে দখল করে রাখতে দেবে না।

প্রশ্ন ঃ আপনার মতে এই মুক্তিযুদ্ধে অনুসরণীয় মুখ্য রণনীতি কি হওয়া উচিত ?

উত্তর ঃ আমাদের রণনীতি হওয়া উচিত একটা অত্যন্ত সম্প্রসারিত ও পরিবর্তনশীল যুক্তফ্রন্টে লড়াই চালাবার জন্য আমাদের প্রধান শক্তিকে নিয়োগ করা। বিজয় অর্জনের জন্য চীনা সৈন্যবাহিনীর অবশ্যই বিস্তৃত রণক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রার চলমান যুদ্ধ চালাতে হবে, দ্রুত অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ, দ্রুত সমাবিষ্ট ও বিক্ষিপ্তকরণ করতে হবে। এটা হচ্ছে বিরাটাকারের চলমান যুদ্ধ, এবং অবস্থানগত যুদ্ধ নয়; অবস্থানগত যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে প্রতিরক্ষাত্মক অবস্থা, গভীর পরিখা, উঁচু উঁচু দুর্গ ও প্রতিরক্ষাত্মক অবস্থানস্থিতির ধারাবাহিক সারির ওপরে নির্ভরশীল। এতে কিন্তু যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থানগুলোকে ছেড়ে দেওয়া বোঝায় না। এইসব জায়গায় যদি সুবিধে হয়, তাহলে অবশ্যই অবস্থানগত যুদ্ধ চালাতে হবে। কিন্তু গোটা পরিস্থিতিকে বদলাবার জন্য যে রণনীতি অবশ্যই প্রয়োজন, তা হচ্ছে চলমান যুদ্ধের নীতি। অবস্থানগত যুদ্ধও দরকার, কিন্তু সেটি সহায়ক এবং গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে রণক্ষেত্রটি এত বিস্তৃত যে, আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি কার্যকরীভাবে চলমান যুদ্ধ চালানো সম্ভব। আমাদের বাহিনীর প্রচণ্ড প্রাণশক্তিসম্পন্ন কার্যকলাপের মুখে জাপানী বাহিনী সতর্ক হতে বাধ্য। তার যুদ্ধযন্ত্রটি হচ্ছে গুরুভার ও মন্থরগতি আর তার কার্যক্ষমতা হচ্ছে সীমিত। আমরা যদি আমাদের সৈন্যশক্তিকে একটা সঙ্কীর্ণ রণক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করে এবং শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে শত্রুকে প্রতিরোধ করি, তাহলে আমাদের বাহিনী ভৌগোলিক অবস্থার ও অর্থনৈতিক সংগঠনের সুবিধাদির সুযোগ খোয়াবে এবং আবিসিনিয়া যে ভুল করেছিল আমরাও সেই ভুল করে বসব। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে কোনরকমের বিরাটাকারের নির্ধারক লড়াই আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে এবং প্রথমে চলমান লড়াইকে কাজে লাগিয়ে শত্রুসৈন্যদের মনোবল ও যুদ্ধক্ষমতাকে ক্রমে ক্রমে ভেঙে দিতে হবে।

চলমান যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা ছাড়াও কৃষকদের মধ্যে বহুসংখ্যক গেরিলা ইউনিট সংগঠিত করতে হবে। এটা জানা উচিত যে, গোটা দেশের কৃষকদের থেকে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাবার জন্য যে অন্তর্নিহিত শক্তিকে সমাবেশ করা যায়, তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের

জাপ-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলি হচ্ছে শুধু তার ছোট একটা অংশেরই প্রকাশ মাত্র। চীনা কৃষকদের প্রভূত অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। উপযুক্তভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হলে তারা জাপানী বাহিনীকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টাই উদ্‌ব্যস্ত করে রাখতে পারে এবং হয়রান ও বিপর্যস্ত করে দিয়ে মরার সামিল করতে পারে। এ কথাটি স্মরণ রাখতে হবে যে, যুদ্ধটি লড়া হবে চীনদেশের বুকে, অর্থাৎ জাপানী বাহিনী শত্রুভাবাপন্ন চীনা জনগণের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত হতে বাধ্য; সে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধসামগ্রী বাইরে থেকে আনতে এবং সেগুলিকে নিজে পাহারা দিয়ে রক্ষা করতে বাধ্য হবে; তার যোগাযোগ পথকে রক্ষা করার জন্য তাকে প্রবল সৈন্যশক্তি অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে এবং আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিয়তই সতর্কভাবে পাহারা দিতে হবে; তাছাড়া, মাঞ্চুরিয়ায় ও জাপানের অভ্যন্তরেও বিরাট সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করতে হবে।

যুদ্ধের গতিপথে চীন বহুসংখ্যক জাপানী সৈন্যকে বন্দী করতে এবং বহুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করে নিজেকে অস্ত্রসজ্জিত করে নিতে পারবে; একই সময়ে চীন আবার বৈদেশিক সাহায্যও লাভ করবে, যাতে করে ধীরে ধীরে চীনের সৈন্যবাহিনীর সাজসরঞ্জাম উন্নত হয়ে উঠবে। তাই, যুদ্ধের শেষের পর্যায়ে চীন অবস্থানগত যুদ্ধ চালাতে সমর্থ হবে এবং সমর্থ হবে জাপানের অধিকৃত এলাকাগুলির ওপর অবস্থানগত আক্রমণ চালাতে। এইভাবে চীনের দীর্ঘ প্রতিরোধ-যুদ্ধের চাপে জাপানের অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়বে; এবং অসংখ্য লড়াইয়ের কষ্টভোগের ফলে চুরমার হয়ে যাবে জাপানী সৈন্যদের মনোবল। আর চীনের ক্ষেত্রে, তার প্রতিরোধ-যুদ্ধের অন্তর্নিহিত শক্তি দিন দিন প্রস্ফুটিত ও বর্ধিত হয়ে উঠবে আর বিরাট সংখ্যক বিপ্লবী জনসাধারণ নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে অবিরামভাবে যুক্তফ্রন্টে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এইসব উপাদানকে অপরাপর উপাদানের সংগে সংযুক্ত করে আমরা জাপানের অধিকৃত অঞ্চলের দুর্গ ও ঘাঁটিগুলির ওপর চূড়ান্ত ও মারাত্মক আঘাত হানতে এবং চীনের মাটি থেকে আগ্রাসী জাপানী সৈন্যবাহিনীকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হব।

(এডগার স্নো ঃ 'উত্তর-পশ্চিম চীনের রূপরেখা')

দশ মাসের প্রতিরোধ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে উপরোল্লিখিত অভিমতগুলি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সেগুলি সঠিক বলে প্রমাণিত হবে।

(৭) ১৯৩৭ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখে—লুকৌচিয়াও ঘটনার পরে দুই মাস পূর্ণ হবার আগেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার 'বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তব্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে' স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল ঃ

লুকৌচিয়াওয়ে জাপানী আক্রমণকারীদের সামরিক প্ররোচনা ও তাদের পিপিং ও তিয়েনসিন দখল করে নেওয়াটা হচ্ছে চীনের মূল অংশের ওপরে তাদের ব্যাপক আক্রমণের সূচনা মাত্র। যুদ্ধের উদ্দেশ্য ইতিমধ্যেই জাপানী আক্রমণকারীরা তাদের জাতীয় শক্তিসমাবেশ করতে শুরু করেছে। তাদের তথাকথিত 'পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করে তোলার কোন ইচ্ছা নেই'—এই প্রচারটি হচ্ছে তাদের আক্রমণকে আড়াল করে রাখার নিছক ধূম্রজাল।

৭ই জুলাইয়ে লুকৌচিয়াওয়ের প্রতিরোধ হচ্ছে চীনের দেশব্যাপী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সূত্রপাত মাত্র।

চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তখন থেকে সূত্রপাত হয়েছে একটা নতুন পর্যায়ের—প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালানোর পর্যায়ের। প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির পর্যায়টি শেষ হয়ে গেছে। এই নতুন পর্যায়ের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করা।

প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে ইতিমধ্যেই সূচিত প্রতিরোধ-যুদ্ধকে গোটা জাতির সামগ্রিক প্রতিরোধ-যুদ্ধে পরিণত করা। শুধুমাত্র এই ধরনের গোটা জাতির সামগ্রিক প্রতিরোধ-যুদ্ধের মাধ্যমেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হতে পারে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধের বর্তমান গুরুতর দুর্বলতাসমূহ ভবিষ্যতে প্রতিরোধযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় বহু বিপত্তি, পশ্চাদপসরণ, আভ্যন্তরীণ, বিভক্তি ও বিশ্বাসঘাতকতা, সাময়িক ও আংশিক আপোষাদি এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা ঘটাতে পারে। তাই এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, যুদ্ধটি হবে কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইতিমধ্যেই সূচিত প্রতিরোধ-যুদ্ধ আমাদের পার্টি ও সারা দেশের জনগণের প্রয়াস-প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে যাবতীয় বাধাবিপত্তিকে দূর করে দেবে আর অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাবে ও বিকাশলাভ করবে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধের দশ মাসের অভিজ্ঞতার আলোকে উপরোল্লিখিত অভিমতগুলিও সঠিক প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা সঠিক বলে প্রমাণিত হবে।

(৮) যুদ্ধের প্রশ্নে ভাববাদী ও যান্ত্রিক প্রবণতা হচ্ছে যাবতীয় ভ্রমাত্মক অভিমতের জ্ঞানতত্ত্বগত উৎস। সমস্যার প্রতি বিচার-দৃষ্টির ব্যাপারে এ ধরনের

প্রবণতাযুক্ত লোকদের পদ্ধতি হচ্ছে আত্মমুখী ও একতরফা। হয় তারা একেবারেই অমূলক ও নিছক আত্মমুখী কথাবার্তায় মেতে ওঠে, আর না হয়, সমস্যার কোন একটা দিক অথবা একটা সময়ের অভিব্যক্তির ওপরে ভিত্তি করে তাকে অনুরূপ মনের রং লাগিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে একটা গোটা সমস্যায় অতিরঞ্জিত করে তোলে। কিন্তু মানুষের ভ্রমাত্মক অভিমতগুলো দুইভাগে বিভক্ত হতে পারেঃ এক ধরনের অভিমত হচ্ছে মৌলিক এবং পারম্পর্যশীল—এগুলো শোধরানো কঠিন; অন্য ধরনের অভিমত হচ্ছে আকস্মিক ও সাময়িক, এগুলো শোধরানো সহজ। যেহেতু দুই-ই ভুল, তাই উভয়কেই শুধরে নেওয়া দরকার। সুতরাং যুদ্ধের প্রশ্নে ভাববাদী ও যান্ত্রিক প্রবণতাগুলোর বিরোধিতা করে এবং যুদ্ধের পর্যালোচনা করার সময়ে একটা বাস্তব ও সর্বতোমুখী বিচারদৃষ্টি গ্রহণ করেই শুধু আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত টানতে পারি।

সমস্যার ভিত্তি

(৯) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন ? আর চূড়ান্ত বিজয় কেনই-বা চীনের হবে ? এইসব উক্তির ভিত্তি কি ?

চীন-জাপানের যুদ্ধটি যে-কোন প্রকারের একটি যুদ্ধ মাত্র নয়, এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর দশকে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীন আর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মধ্যে জীবন-মরণের যুদ্ধ। গোটা সমস্যার ভিত্তি নিহিত রয়েছে এইখানেই। এই যুদ্ধের দুটি পক্ষের বহু বৈসাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সেগুলির আলোচনা নীচে করা হবে।

(১০) জাপানী পক্ষ। প্রথমতঃ, জাপান হচ্ছে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ। সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তিতে প্রাচ্যে তার স্থান প্রথমে এবং দুনিয়ার পাঁচ বা ছয়টি প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে জাপান হচ্ছে অন্যতম। এটা হচ্ছে জাপানের আগ্রাসী যুদ্ধের বুনিয়াদী শর্ত। যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা ও চীনের পক্ষে দ্রুত জয়লাভের অসম্ভাব্যতা উদ্ভূত হয় জাপানের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা থেকে এবং তার বিরাট সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তি থেকে। যাই হোক, দ্বিতীয়তঃ, জাপানের সামাজিক অর্থব্যবস্থার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রটি থেকে উদ্ভূত হয় তার যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র—তার এ যুদ্ধ অধঃপতনমুখী ও বর্বরোচিত। বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর দশকের জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় দ্বন্দ্বগুলি তাকে যে শুধু তুলনাহীন মাত্রার দুঃসাহসিক যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য করেছে তাই নয়, পরন্তু চরম পতনের

মুখে তাকে ঠেলে দিয়েছে। সামাজিক বিকাশের দিক থেকে বলতে গেলে, জাপান এখন আর বর্ধিষ্ণু দেশ নয়; জাপানের শাসকশ্রেণী যা চায় সেই সমৃদ্ধির পথে এ যুদ্ধ জাপানকে নিয়ে যাবে না, বরং তাকে নিয়ে যাবে ঠিক তার বিপরীত পথে—জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সর্বনাশের পথে। জাপানের যুদ্ধের অধঃপতনমুখী চরিত্র বলতে আমরা যা বোঝাই তা-হচ্ছে এই। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ। এর এই বৈশিষ্ট্যের সংগে যুদ্ধের অধঃপতনমুখী চরিত্রটি মিলে জাপানের যুদ্ধের বিশেষ বর্বরতার উদ্ভব ঘটায়। আর এ সবের ফলে চরমমাত্রায় জাপানের অভ্যন্তরে শ্রেণী-বিরোধ, জাপানী ও চীনা জাতির মধ্যে বৈরিতা এবং জাপান ও দুনিয়ার অপরাপর অধিকাংশ দেশের মধ্যে বৈরিতা জেগে উঠবে। জাপানের যুদ্ধের অধঃপতনমুখী ও বর্বরোচিত চরিত্রই হবে তার অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের মুখ্য কারণ। এ-টুকুতেই শেষ নয়। তৃতীয়তঃ, জাপানের যুদ্ধ যদিও চালিত হচ্ছে তার বিরাট সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তির ভিত্তিতে, তবুও সেই একই সময়ে সেটি আবার চালিত হচ্ছে তার সহজাত দুর্বলতার ভিত্তিতেও। যদিও জাপানের সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তি বিরাট, তবুও এ শক্তি পরিমাণগতভাবে অপর্যাপ্ত। জাপান হচ্ছে তুলনামূলকভাবে একটি ছোট দেশ। জনবলে এবং সামরিক, আর্থিক ও বস্তুগত শক্তিতে হীন বলেই সে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সহ্য করতে পারে না। জাপানের শাসকরা যুদ্ধের মাধ্যমে এই অসুবিধাটির সমাধান করতে চাইছে, কিন্তু অনুরূপভাবেই তারা যা চাইছে তারও উল্টোটিই তারা পাবে। অর্থাৎ এই অসুবিধা মেটাবার জন্য তারা যুদ্ধ বাধিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের ফলে তাদের অসুবিধা আরও গুরুতর হয়ে উঠবে, এমনকি আগে জাপানের যা ছিল তাও ফুরিয়ে যাবে। চতুর্থতঃ, এবং শেষতঃ, দুনিয়ার ফ্যাসিবাদী দেশগুলির কাছ থেকে জাপান যে আন্তর্জাতিক সাহায্যলাভ করতে পারে, কিন্তু একই সময়ে জাপান আন্তর্জাতিক বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করতে বাধ্য, সেটি তার পাওয়া আন্তর্জাতিক সাহায্যের থেকে অনেক বেশি গুরুতর। এই ধরনের বিরোধী শক্তি ক্রমশঃ বাড়বে এবং অবশেষে তা যে শুধু ফ্যাসিবাদী দেশগুলোর সাহায্যকে অতিক্রম করে যাবে তা-ই নয়, পরন্তু খোদ জাপানের ওপরও চাপ দেবে। এই হচ্ছে বিধি যে, অন্যায় কাজ সামান্যই সমর্থনলাভ করে এবং এই ফলশ্রুতি উদ্ভূত হয় জাপানের যুদ্ধের নিজস্ব প্রকৃতি থেকেই। সংক্ষেপে বলা যায়, জাপানের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তার যুদ্ধ চালাবার বিরাট সামর্থ্যে আর তার দুর্বলতা রয়েছে তার যুদ্ধের অধঃপতনমুখী ও বর্বরোচিত চরিত্রে, তার

জনবল ও বস্তুগত সম্পদসম্ভারের অপ্রতুলতায় এবং তার নগণ্য আন্তর্জাতিক সাহায্যে। এ সবই হচ্ছে জাপানী পক্ষের বৈশিষ্ট্য।

(১১) চীনা পক্ষ। প্রথমতঃ, আমাদের দেশ হচ্ছে একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ। আফিম যুদ্ধ[৯], তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের যুদ্ধ[১০], ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন[১১], ১৯১১ সালের বিপ্লব[১২] এবং উত্তর অভিযান[১৩]—এ সবই ছিল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে চীনকে মুক্ত করার জন্য বিপ্লবী বা সংস্কার আন্দোলন, কিন্তু এ সবগুলিকেই গুরুতর বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাই চীন এখনো রয়েছে একটি আধা-ঔপবেনিশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ। আমরা এখনো দুর্বল দেশ এবং সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তিতে শত্রুর থেকে দুর্বল। যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা ও চীনের পক্ষে দ্রুত জয়লাভের অসম্ভাব্যতার ভিত্তি এখানেও দেখতে পাওয়া যায়। তবুও, দ্বিতীয়তঃ, আজ চীনের মুক্তি-আন্দোলন তার বিগত একশ বছরের ক্রমঃবর্ধমান পরিপুষ্টির ফলে ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী যে-কোন ঐতিহাসিক পর্যায়ের থেকে ভিন্ন। অন্তর্দেশীয় ও বর্হির্দেশীয় বিরোধী শক্তিগুলি এই মুক্তি-আন্দোলনে গুরুতর বিপত্তির সৃষ্টি করে থাকলেও, সেই একই সময়ে সেগুলি আবার চীনা জনগণকে পোড় খাইয়ে বজ্রকঠোর করে তুলেছে। আজ চীন সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে জাপানের মতো ততটা শক্তিশালী না হলেও তার ইতিহাসের যে-কোন সময়ের তুলনায় চীনে এখন অধিকতর প্রগতিশীল উপাদান রয়েছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতৃত্বাধীন সৈন্যবাহিনী হচ্ছে এইসব প্রগতিশীল উপাদানের প্রতিনিধি। এই প্রগতির ভিত্তিতেই চীনের বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ পতনোন্মুখ—তার ঠিক বিপরীতে চীন হচ্ছে ভোরের সূর্যের মতো একটি উদীয়মান দেশ। চীনের যুদ্ধ হচ্ছে প্রগতিশীল আর এই ধরনের প্রগতিশীলতার কারণ থেকেই উদ্ভূত হয় তার যুদ্ধের ন্যায়সঙ্গত চরিত্র। এটা ন্যায়যুদ্ধ বলেই তা চীনের সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, শত্রুদেশের জনগণের মধ্যে সহানুভূতি জাগাতে পারে এবং দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের সমর্থনলাভ করতে পারে। তৃতীয়তঃ, আবার জাপানের বিপরীতে চীন হচ্ছে একটা অত্যন্ত বিরাট দেশ, সুবিশাল তার ভূখণ্ড, সমৃদ্ধ তার সম্পদসম্ভার, বিরাট তার জনসংখ্যা এবং প্রচুর তার সৈন্য, তাই একটি দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চীন সইতে পারে। চতুর্থতঃ এবং শেষতঃ, চীনের যুদ্ধের প্রগতিশীল ও ন্যায়সঙ্গত চরিত্রের কারণে সে পেয়েছে একটা ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থন। এটাও জাপানের তুলনায়

ধ্বংসের প্রাক্কালে, ঠিক এই কারণেই শত্রু বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসেবে এই হঠকারী যুদ্ধ বাধিয়েছে। তাই, এই যুদ্ধের ফলে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, সে চীন নয়—বরং সে হবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের শাসকচক্র, এটা হচ্ছে অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। উপরন্তু, জাপান এমন একটা সময়ে এ যুদ্ধ বাধিয়েছে, যখন দুনিয়ার বহু দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে অথবা পড়ার মুখে, যখন বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা সবাই লড়ছে বা লড়াই করার জন্য তৈরী হচ্ছে, আর চীনের স্বার্থ দুনিয়ার অধিকাংশ দেশ ও জনগণের স্বার্থের সংগে গ্রথিত হয়ে গেছে। দুনিয়ার অধিকাংশ দেশ ও জনগণের মধ্যে জাপান যে বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করেছে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে যে বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করবে, তার মূল কারণ এটাই।

(১৬) চীনের ব্যাপার কি ? অন্য যে-কোন ঐতিহাসিক যুগের চীনের সংগে আজকের চীনের তুলনা চলে না। আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ—এটা হচ্ছে চীনের বৈশিষ্ট্য, তাই তাকে দুর্বল দেশ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু সেই একই সময়ে ঐতিহাসিকভাবে চীন এখন তার প্রগতির যুগে, আর এটাই হচ্ছে তার জাপানকে হারিয়ে দিতে সক্ষম হবার মুখ্য কারণ। আমরা যখন বলি যে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে প্রগতিশীল, তখন আমরা সাধারণ বা সার্বজনীন অর্থে প্রগতিকে বোঝাই না; এবং যে অর্থে ইতালীর বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ কিংবা তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের যুদ্ধ অথবা সিনহাই বিপ্লব প্রগতিশীল ছিল, সেই অর্থেও প্রগতিকে আমরা বোঝাই না; চীন আজ যে অর্থে প্রগতিশীল, সেই অর্থেই প্রগতিকে আমরা বোঝাই। কোন্ দিক থেকে আজকের চীন প্রগতিশীল? সে প্রগতিশীল, কারণ আজ সে আর পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক দেশ নয়, ইতিমধ্যেই চীনে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়েছে, উদ্ভব হয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর ও সর্বহারাশ্রেণীর, এবং এখানে রয়েছেন ব্যাপক জনগণ যাঁরা ইতিমধ্যেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন বা উঠছেন, আমাদের একটি কমিউনিস্ট পার্টি আছে, আমাদের আছে একটি রাজনৈতিকভাবে প্রগতিশীল ফৌজ অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন চীনা লালফৌজ, আছে বহু দশকের বিপ্লবের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হবার পরবর্তী সতের বছরের অভিজ্ঞতা। এইসব অভিজ্ঞতাই চীনা জনগণকে ও চীনের রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে শিক্ষা দান করেছে আর এগুলিই আজ গড়ে তুলেছে জাপ-বিরোধী ঐক্যের বুনিয়াদ। যদি এ কথা বলা হয় যে, রাশিয়ায় ১৯০৫ সালের অভিজ্ঞতাকে বাদ দিলে ১৯১৭ সালের জয়লাভ অসম্ভব হতো, তাহলে আমরাও বলতে পারি যে, বিগত সতের বছরের অভিজ্ঞতাকে বাদ দিলে আমাদের এই জাপ-

বিরোধী যুদ্ধটি জেতাও অসম্ভব হবে। এটাই হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে চীন এ যুদ্ধে নিঃসঙ্গ নয়, আর এই ঘটনাটিও ইতিহাসে নজিরবিহীন। অতীতে চীনের যুদ্ধগুলোই হোক অথবা ভারতবর্ষের যুদ্ধগুলোই হোক, সবই লড়া হয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে। দুনিয়াজোড়া যে অভূতপূর্ব ব্যাপক ও গভীর গণ-আন্দোলন জেগে উঠেছে অথবা উঠছে এবং চীনকে সাহায্য করছে, তা আমরা শুধু বর্তমানেই দেখতে পাই। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবও আন্তর্জাতিক সমর্থনলাভ করেছিল এবং তার ফলে রুশ শ্রমিক ও কৃষকরা জয়লাভ করেছিল। কিন্তু আজ আমরা যে সমর্থনলাভ করছি, সেই সমর্থন তার মতো মাত্রায় ব্যাপক ও প্রকৃতিতে গভীর নয়। আজকের বিশ্বে গণআন্দোলন ব্যাপকতায় ও গভীরতায় অভূতপূর্বভাবে বিকশিত হয়ে উঠছে। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব আজকের দিনের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন নিশ্চয়ই চরম উৎসাহের সংগে চীনকে সাহায্য করবে; বিশ বছর আগে এ ধরনের কিছুই ছিল না। এই সবই চীনের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য সৃষ্টি করেছে বা করছে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহের। যদিও বিরাট পরিমাণের প্রত্যক্ষ সাহায্যের এখনো অভাব এবং সেটা শুধু ভবিষ্যতেই আসবে, তবুও চীন বিরাট দেশ বলেই সে তার যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সমর্থ হবে, আর সমর্থ হবে প্রগতিশীল ও আন্তর্জাতিক সাহায্যকে ত্বরান্বিত করতে এবং তার প্রতীক্ষা করতে।

(১৭) তদুপরি জাপান হচ্ছে একটা ছোট দেশ, ভূ-আয়তন তার ছোট, সম্পদসম্ভার তার স্বল্প, জনসংখ্যা তার কম, আর সৈন্যসংখ্যা তার সীমিত। কিন্তু চীন হচ্ছে বিরাট এক দেশ, ভূ-আয়তন তার সুবিশাল, সম্পদসম্ভারে সে সমৃদ্ধ, জনসংখ্যা তার বিরাট, আর সৈন্যও তার প্রচুর। তাই প্রবলতা ও দুর্বলতার বৈসাদৃশ্য ছাড়াও, একটি ছোট দেশ, অধঃপতনমুখিতা ও নগণ্য সমর্থন—বনাম একটি বিরাট দেশ, প্রগতি ও প্রচুর সমর্থনের বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। চীন যে কোনদিনই পদানত হবে না—এটাই হচ্ছে তার ভিত্তি। যদিও প্রবলতা ও দুর্বলতার বৈসাদৃশ্য থেকে স্থির হয়েছে যে, কিছুদিনের জন্য ও কিছুটা পরিমাণে জাপান চীনে যথেচ্ছাচার করতে পারে, চীনকে অনিবার্যভাবেই দুর্গম পথে এগুতে হবে, আর জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধ নয়; তবুও ছোট দেশ, অধঃপতনমুখিতা ও নগণ্য সমর্থন—বনাম বিরাট দেশ, প্রগতি ও প্রচুর সমর্থনের এই বৈসাদৃশ্য থেকেই আবার স্থির হয়েছে যে, জাপান চীনে চিরকাল ধরে যথেচ্ছাচার করে যেতে পারবে

না এবং চরম পরাজয় তাকে অবশ্যই ভোগ করতেই হবে, পক্ষান্তরে চীন কোনমতেই পদানত হবে না, পরন্তু চূড়ান্ত বিজয় সে অর্জন করবেই।

(১৮) আবিসিনিয়া পদানত হয়েছিল কেন ? প্রথমতঃ, সে যে শুধু দুর্বল দেশই ছিল তাই নয়, পরন্তু সে ছোটও ছিল। দ্বিতীয়তঃ, সে চীনের মতো অতটা প্রগতিশীল ছিল না, সে ছিল প্রাচীন দেশ—ক্রীতদাস ব্যবস্থা থেকে সে তখন ভূমিদাস ব্যবস্থায় উন্নীত হচ্ছিল। সে দেশে না ছিল পুঁজিবাদ, না ছিল বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির তো কথাই ওঠে না। চীনা বাহিনীর মতো তার কোন সৈন্যবাহিনীও ছিল না, অষ্টম রুট বাহিনীর মতো বাহিনী তো অনেক দুরের কথা। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সমর্থনের প্রতীক্ষা করার সামর্থ্য তার ছিল না এবং নিঃসঙ্গভাবে তাকে লড়তে হয়েছিল। চতুর্থতঃ, এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, ইতালীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধের পরিচালনায় ভুল ছিল। তাই আবিসিনিয়া পদানত হয়েছিল। কিন্তু, এখনো আবিসিনিয়ায় বেশ ব্যাপক গেরিলাযুদ্ধ চলছে এবং যদি হাবসীরা অটলভাবে এই যুদ্ধ চালিয়ে যান, তাহলে পরবর্তীকালের বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তনে তাঁরা তাঁদের মাতৃভূমিকে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হবেন।

(১৯) 'প্রতিরোধ করলে অনিবার্যভাবেই পদানত হব' এবং 'যুদ্ধ অব্যাহত রাখলে অনিবার্যভাবেই পদানত হব'—এই বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীরা যদি আধুনিক চীনের মুক্তি-আন্দোলনের ব্যর্থতার ইতিহাসের নজির দেখায়, তাহলে সে ক্ষেত্রেও পুনরায় আমাদের জবাব হচ্ছে ঃ 'যুগটা ভিন্ন'। চীনের নিজস্ব অবস্থা, জাপানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ—সবই আগের চেয়ে ভিন্ন। জাপান এখন আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, আর চীন এখনো অপরিবর্তিত আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় রয়েছে, এবং এখনো খুব দুর্বল। এটা খুবই গুরুতর অবস্থা। জাপান এখনো তার দেশের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং চীনের ওপর আক্রমণ করার জন্য আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বগুলোকে অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে পারে, এ সবই হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় এই পরিস্থিতি বিপরীত দিকে মোড় ফিরতে বাধ্য। এখনো এটা ঘটেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে এটা অবশ্যই ঘটবে। কিন্তু জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীরা এই বিষয়টিকে অবহেলা করেছে। আর চীনের ক্ষেত্রে ? চীনে ইতিমধ্যেই নতুন মানুষ, নতুন রাজনৈতিক পার্টি, নতুন সৈন্যবাহিনী এবং নতুন নীতি—জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নীতি—গড়ে উঠেছে, দশাধিক বছর আগে যা ছিল আজ পরিস্থিতিটি তার থেকে অনেক ভিন্নতর হয়েছে, শুধু তা-ই নয়,

অধিকন্তু এগুলির অবশ্যম্ভাবীরূপে আরও বেশি অগ্রগতি ঘটবে। চীনের ইতিহাসে মুক্তি-আন্দোলনগুলি বারংবার বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিল, এবং তার ফলে বর্তমানের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য চীন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়নি। —এটি হচ্ছে অত্যন্ত বেদনাকর ঐতিহাসিক শিক্ষা— আজ থেকে আর আমাদের নিজেদের কোন বিপ্লবী শক্তিকে নষ্ট করা চলবে না। বর্তমান অবস্থাতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করলে আমরা নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যেতে পারব এবং আমাদের প্রতিরোধের শক্তিকেও বাড়িয়ে নিতে পারব। মহান জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টই হচ্ছে এইসব প্রয়াসের মুখ্য দিক। আন্তর্জাতিক সমর্থনের ব্যাপারে বলা যায়, প্রভূত ও প্রত্যক্ষ সাহায্য এখনো নজরে না পড়লেও, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আগের থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন হয়ে উঠেছে এবং এখন প্রভূত ও প্রত্যক্ষ সাহায্যের শর্ত তৈরী হতে চলছে। আধুনিক চীনের মুক্তি-আন্দোলনের অসংখ্য ব্যর্থতার বাস্তব এবং অন্তর্নিহিত কারণ ছিল, কিন্তু আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। যদিও আজ আমাদের অনেক বাধা-বিপত্তি রয়েছে যা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে দুঃসাধ্য করে তুলেছে—যেমন শত্রুর প্রবলতা ও আমাদের দুর্বলতা, শত্রুর অসুবিধা সবেমাত্র শুরু হয়েছে, আমাদের প্রগতি আদৌ যথেষ্ট নয়, ইত্যাদি—তবুও শত্রুকে পরাভূত করার জন্য বহু অনুকূল শর্তও আছে। আমাদের শুধু দরকার আত্মগত প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে সেগুলির সংগে জুড়ে নেওয়া, তাহলেই আমরা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জয়লাভ করতে সমর্থ হব। এই ধরনের অনুকূল শর্তাদি আমাদের ইতিহাসে আগে আর কোনদিনই ছিল না। আর ঠিক সেই কারণেই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ—যুদ্ধটি অতীতের মুক্তি- আন্দোলনের মতো ব্যর্থতায় শেষ হবে না।

আপোষ, না প্রতিরোধ?
দুর্নীতি, না প্রগতি?

(২০) ওপরে এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বটি হচ্ছে অমূলক। কিন্তু এমন অনেক লোক আছে; যারা জাতীয় পরাধীনতার মতবাদী নয়, তারা সৎ স্বদেশপ্রেমিক। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা কিন্তু তবুও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। দুটি বিষয় তাদের উদ্বিগ্ন করছে—জাপানের সংগে আপোষের ভয়, আর রাজনৈতিক প্রগতির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয়। এই দুটি উদ্বেগজনক প্রশ্ন লোকজনের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত

হচ্ছে এবং তাদের সমাধানের ভিত্তি এখনো পাওয়া যায়নি। এই দুটি প্রশ্ন সম্পর্কে একবার পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

(২১) আগে যেমন বলা হয়েছে, আপোষের প্রশ্নটির একটি নিজস্ব সামাজিক উৎস আছে, এবং যতদিন পর্যন্ত এই উৎস থাকবে ততদিন আপোষের প্রশ্নটিও উঠতে বাধ্য। কিন্তু আপোষ সফল হবে না। এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য আবারও আমাদের দরকার শুধু জাপান, চীন ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করা। প্রথমতঃ, জাপানকে দেখা যাক। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের একেবারে শুরুতে আমরা অনুমান করেছিলাম যে, এমন একটা সময় আসবে যখন আপোষের অনুকূল একটা আবহাওয়া দেখা দেবে, অর্থাৎ উত্তর চীন, কিয়াংসু ও চেকিয়াং প্রদেশগুলো দখল করে নেবার পরে জাপান সম্ভবতঃ চীনকে আত্মসমর্পণ করাবার জন্য কোন ফন্দি আঁটবে। সত্য বটে, ফন্দি সে এঁটেছিল; কিন্তু সঙ্কটজনক সময়টি তাড়াতাড়ি কেটে গিয়েছিল, এবং তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, শত্রু সর্বত্রই একটা বর্বর নীতি অনুসরণ করছিল এবং প্রকাশ্যভাবে লুন্ঠন চালাচ্ছিল। চীন আত্মসমর্পণ করলে প্রতিটি চীনা স্বদেশহীন ক্রীতদাস হয়ে পড়ত। শত্রুর এই লুন্ঠনাত্মক নীতির অর্থাৎ চীনকে পদানত করার নীতির দুটি দিক আছেঃ বৈষয়িক এবং মানসিক। এগুলোর উভয়টিই ব্যাতিক্রমহীনভাবে সকল চীনা লোকের ওপরে প্রয়োগ করা হয়; শুধু যে নিচু স্তরের লোকজনের ওপরে প্রয়োগ করা হয় তাই নয়, এমনকি উঁচু স্তরের লোকজনের ওপরেও তা প্রয়োগ করা হয়—অবশ্য শেষোক্তদের সংগে কিছুটা ভদ্রভাবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তফাৎ শুধু মাত্রার, নীতির নয়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশে শত্রু যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সেই পুরানো ব্যবস্থাই এখন আবার সে চীনের অভ্যন্তরভাগে কাজে লাগাচ্ছে। বৈষয়িকভাবে, সাধারণ মানুষের খাদ্য ও বস্ত্র সে কেড়ে নিচ্ছে, এইভাবে ব্যাপক জনসাধারণকে সে ক্ষুধায় ও শীতে কাঁদাচ্ছে; উৎপাদনের হাতিয়ার সে লুঠ করছে, এইভাবে ধ্বংস করছে ও গোলাম বানাচ্ছে চীনের জাতীয় শিল্পকে। মানসিক দিক থেকে সে কাজ করে চলেছে চীনা জনগণের জাতীয় সচেতনতাকে ধ্বংস করার জন্য। 'উদীয়মান সূর্য' মার্কা পতাকাতলে প্রত্যেক চীনাই বাধ্য হচ্ছে সহজবশ্য প্রজা হতে ও ভারবাহী জানোয়ার বনতে—চীনা জাতীয় ভাবধারার অণুমাত্র রেশও দেখানো তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই বর্বর নীতিকে চীনের অভ্যন্তরে গভীর পর্যন্ত শত্রু নিয়ে যাবে। তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে জাপান যুদ্ধ থামাতে অনিচ্ছুক। ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের জাপানী ক্যাবিনেটের বিবৃতিটিতে ঘোষিত নীতিটি[১৪]

এখনো একগুঁয়েভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং তা না চালিয়ে পারে না, আর এতে চীনা জনগণের সর্বস্তরকে রাগিয়ে তুলেছে। জাপানের যুদ্ধের অধঃপতনমুখী ও বর্বর চরিত্রের জন্য এই রাগের সৃষ্টি হয়েছে। 'দুর্যোগের হাত থেকে রেহাই নেই', আর তাই জাপানের বিরুদ্ধে চরম বৈরিতা দানা বেঁধে উঠেছে। এই অনুমান করা যায় যে, ভবিষ্যতে কোন সময় শত্রু আবার চীনকে আত্মসমর্পণ করাবার ফন্দি আঁটবে এবং কোন কোন জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীরা আবার আঁটসাঁট বেঁধে বেরিয়ে আসবে, আর খুব সম্ভব কোন কোন বৈদেশিক উপাদানের (ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে ব্রিটেনের উচ্চতর স্তরের মধ্যে এ ধরনের লোককে দেখতে পাওয়া যায়) সংগে ষড়যন্ত্রের অংশীদার হিসেবে যোগসাজস করবে। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের অবশ্যম্ভাবী গতিধারা আত্মসমর্পণ করতে দেবে না। জাপানের যুদ্ধের একগুঁয়ে ও বিশেষ ধরনের বর্বর চরিত্র প্রশ্নের এই একটি দিককে স্থির করে দিয়েছে।

(২২) দ্বিতীয়তঃ, চীনের কথা ধরা যাক। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার চীনের তিনটি উপাদান আছে। প্রথম হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, যা হল জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্য জনগণকে পরিচালনা করার নির্ভরযোগ্য শক্তি। তার পরে আসছে কুওমিনতাঙ। ব্রিটেন ও আমেরিকার ওপরে নির্ভরশীল সে। তাই ব্রিটেন ও আমেরিকা না বললে কুওমিনতাঙ জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। সর্বশেষে হচ্ছে অন্যান্য পার্টি ও দলগুলো, এদের অধিকাংশই আপোষের বিরোধী এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের সমর্থক। এই তিনের ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে-কেউ আপোষ করবে, সে দেশদ্রোহীর পর্যায়ভুক্ত হবে এবং তাকে শাস্তি দেবার অধিকার প্রত্যেকেরই থাকবে। যারা দেশদ্রোহীর পর্যায়ভুক্ত হতে চায় না, তাদের সকলেরই ঐক্যবদ্ধ জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে শেষ অবধি চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই, সুতরাং আপোষ কদাচিত সাফল্যলাভ করতে পারে।

(২৩) তৃতীয়তঃ, এবারে আন্তর্জাতিক দিকটি দেখা যাক। জাপানের মিত্রশক্তিগুলি এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের উচ্চস্তরের কিছু কিছু লোক ছাড়া গোটা দুনিয়া চীনের দ্বারা প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে, চীন কর্তৃক আপোষ করার বিপক্ষে। এই উপাদান চীনের আশাকে বলীয়ান করে তোলে। আজ গোটা দেশের জনগণ এই আশা পোষণ করে যে, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ চীনকে ক্রমবর্ধমান সাহায্য দেবে। এই আশা মিথ্যা নয়। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব চীনকে তার প্রতিরোধ-যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করবে। অভূতপূর্বভাবে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বদাই চীনের সুখ-দুঃখের

অংশভাগী হয়েছে। যারা কেবল মুনাফা চায়, সেই সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের উচ্চস্তরের লোকদের থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ বিপরীত, সোভিয়েত ইউনিয়ন সকল দুর্বল ও ক্ষুদ্র জাতিকে এবং যাবতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের প্রতি সাহায্যদানকে তার নিজের কর্তব্য বলে মনে করে। চীন যে নিঃসঙ্গভাবে লড়ছে না—এর ভিত্তিটি শুধু সাধারণভাবে গোটা আন্তর্জাতিক সাহায্যেই নয়, পরন্তু তার ভিত্তি রয়েছে বিশেষ করে সোভিয়েতের সাহায্যে ও সমর্থনে। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার নিবিড় ভৌগলিক সান্নিধ্য জাপানের সঙ্কটকে বাড়িয়ে তোলে আর চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। জাপানের সংগে চীনের ভৌগোলিক সান্নিধ্য প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীনের বাধাবিপত্তিকে বাড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে ভৌগলিক সান্নিধ্য হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে একটি অনুকূল শর্ত।

(২৪) তাই এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, আপোষের বিপদ আছে কিন্তু তাকে অতিক্রম করা যায়। কারণ শত্রু তার নীতিকে কিছুটা পরিমাণে সংশোধিত করতে পারলেও তাকে মৌলিকভাবে বদলে নিতে পারে না। চীনে আপোষের সামাজিক উৎস রয়েছে, কিন্তু আপোষ-বিরোধীরাই হচ্ছে সংখ্যাগুরু। আন্তর্জাতিকভাবে কিছু কিছু শক্তি আপোষের পক্ষে, কিন্তু প্রধান শক্তিগুলি প্রতিরোধ চালানোর পক্ষে। এই তিনটি উপাদানের সংযোজনে আপোষের বিপদকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়ে ওঠে, এবং সম্ভব হয়ে ওঠে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া।

(২৫) এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যাক। দেশের রাজনৈতিক প্রগতি প্রতিরোধ-যুদ্ধকে অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক প্রগতি যতই বেশি হয়, ততই অটল প্রয়াস আমরা চালাতে পারি প্রতিরোধ-যুদ্ধে; আবার যতই বেশি অটল প্রয়াস আমরা প্রতিরোধ-যুদ্ধে চালাই ততই বেড়ে ওঠে রাজনৈতিক প্রগতি। কিন্তু মৌলিকভাবে সেটি নির্ভর করে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ওপরে। কুওমিনতাঙ শাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অস্বাস্থ্যকর অভিব্যক্তি অত্যন্ত গুরুতর হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এইসব অবাঞ্ছনীয় উপাদানগুলি পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে ব্যাপক স্বদেশপ্রেমিকদের মধ্যে গুরুতর উদ্বেগ ও হয়রানির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রতিরোধ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, অতীতে বহু বছরে যতটা প্রগতি চীনা জনগণ করেছিল, গত দশ মাসেই ততটা এগিয়েছে, তাই হতাশার কোন কারণ নেই। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত দুনীর্তি জাপানকে রুখবার জন্য জনগণের শক্তি বৃদ্ধির গতিবেগকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করছে,

আমাদের জয়লাভের পরিধিকে কমিয়ে দিচ্ছে এবং যুদ্ধে আমাদের ক্ষতিসাধন করছে। কিন্তু তবুও চীনে, জাপানে এবং সারা দুনিয়ায় সামগ্রিক পরিস্থিতিটি আজ এমন যে, চীনা জনগণ প্রগতি না করেই পারেন না। প্রগতিকে ব্যাহত করার উপাদান—দুর্নীতির অস্তিত্বের কারণে এই প্রগতি মন্থর হয়। প্রগতি ও প্রগতির মন্থরগতি হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতির দুটি বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনের সংগে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তাই স্বদেশপ্রেমিকদের কাছে এটি হচ্ছে গভীর উদ্বেগের কারণ। কিন্তু আমরা এখন রয়েছি একটি বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্যে, আর বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে একটা বিষ-প্রতিষেধক, এ যে শুধু শত্রুদের বিষ নাশ করে তাই নয়, বরং আমাদের নিজেদেরও ক্লেদ থেকে মুক্ত করে। প্রতিটি ন্যায় বিপ্লবী যুদ্ধই হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এবং বহু বস্তুকে তা রূপান্তরিত করতে পারে অথবা তাদের রূপান্তরের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারে। চীন-জাপান যুদ্ধ চীন-জাপান উভয় দেশকেই রূপান্তরিত করবে; প্রতিরোধ-যুদ্ধে এবং যুক্তফ্রন্টে চীন যদি অধ্যবসায়ের সংগে অবিচল থাকে, তাহলে পুরানো জাপান নিশ্চয়ই এক নতুন জাপানে এবং পুরানো চীন এক নতুন চীনে পরিণত হবে; আর চীন—জাপান উভয় দেশের লোক এবং সবকিছুই এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ও এই যুদ্ধের পরে রূপান্তরিত হবে। প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও আমাদের দেশের গঠনকার্যকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলে ধরাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত। জাপানও রূপান্তরিত হতে পারে বলার অর্থ এই যে, জাপানের শাসকদের এই আগ্রাসী যুদ্ধ তাদের পরাজয়ের মধ্যে শেষ হবে এবং তা জাপানী জনগণের বিপ্লব ঘটাতে পারে। জাপানী জনগণের বিপ্লবের বিজয়দিনটি হবে সেই দিন, যেদিন জাপান রূপান্তরিত হবে। চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সংগে এ সবই নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, আর এমন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আমাদের হিসেবে ধরা উচিত।

জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব ভুল,
দ্রুত বিজয়ের তত্ত্বও ভুল

(২৬) জাপান হচ্ছে শক্তিশালী অথচ ছোট দেশ, সে অধঃপতনমুখী এবং তার সমর্থন স্বল্প; আর চীন হচ্ছে দুর্বল অথচ বড় দেশ, সে প্রগতিশীল এবং ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থনের অধিকারী—শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার এইসব পরস্পরবিরোধী মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর ইতিমধ্যেই আমরা তুলনা ও পর্যালোচনা করেছি, জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের খণ্ডন করেছি এবং আপোষ কেন অসম্ভব, এবং রাজনৈতিক প্রগতিই-বা কেন সম্ভব—এইসব প্রশ্নের উত্তর

আমরা দিয়েছি। জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীরা প্রবলতা ও দুর্বলতার দ্বন্দ্বের ওপরে জোর দেয় এবং তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সমগ্র সমস্যা সমাধানের যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে, আর এইভাবে অবহেলা করে অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলোকে। তারা কেবল শক্তির বৈসাদৃশ্যের কথা বলে, এবং এটা তাদের একতরফা দৃষ্টি প্রমাণ করে; আবার তারা যে বস্তুর এই একটা দিককেই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সমগ্রে অতিরঞ্জিত করে, এটা তাদের আত্মগত মনোভাবকে প্রমাণ করে। তাই সামগ্রিক দিক থেকে দেখতে গেলে তাদের দাঁড়াবার কোন ভিত্তি নেই এবং তারা হচ্ছে ভুল। যারা জাতীয় পরাধীনতার মতবাদী নয় এবং মজ্জাগত হতাশাবাদীও নয়, অথচ কোন একটা মুহূর্তে এবং কোন একটা আংশিক ব্যাপারে আমাদের ও শত্রুর শক্তির অসমতার দ্বারা কিংবা দেশের দুর্নীতির দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার কারণে শুধু সাময়িকভাবে হতাশাভরা মানসিক অবস্থায় পড়েছে, তাদেরও আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে যে তাদের বিচারদৃষ্টির উদ্ভবও একদেশদর্শিতা ও আত্মগত মনোভবের ঝোঁক থেকে। কিন্তু তাদের সংশোধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, একবার তাদের সতর্ক করে দেওয়া হলেই তারা বুঝতে পারবে, কারণ তারা হচ্ছে স্বদেশপ্রেমিক আর তাদের ভুলটি হচ্ছে নিছক সাময়িক।

(২৭) দ্রুত বিজয়ের মতবাদীরাও অনুরূপভাবেই ভুল। হয় তারা অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলোকেই শুধু মনে রেখে প্রবলতা ও দুর্বলতার দ্বন্দ্বকে পুরোপুরি ভুলে যায়, অথবা চীনের উৎকৃষ্টতাকে এমনভাবে অতিরঞ্জিত করে তোলে যে, তাতে আর বাস্তবতার লেশও থাকে না এবং তাকে চেনাও যায় না; কিংবা প্রবাদে যেমন আছে, 'চোখের সামনে গাছের পাতা, ঢেকে রাখে পাহাড় তাইয়ের মাথা'—তেমনিই তারা কোন একটা কালের ও স্থানের শক্তির অনুপাতকেই গোটা পরিস্থিতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং ধৃষ্টভাবে মনে করে যে, তারা নির্ভুল। এক কথায়, শত্রু যে শক্তিশালী আর আমরা যে দুর্বল এই বাস্তব কথাটি স্বীকার করার সাহাস তাদের নেই। প্রায়শঃই তারা এই বিষয়টি অস্বীকার করে এবং ফলে সত্যের একটি দিককে তারা অস্বীকার করে বসে। আবার আমাদের উৎকৃষ্টতার সীমাবদ্ধতাকেও স্বীকার করার সাহস তাদের নেই, আর এইভাবেই তারা সত্যের আর একটি দিককেও অস্বীকার করে। ফল হয় এই যে, তারা ছোট বা বড় ভুল করে বসে, এই ক্ষেত্রেও সেই আত্মগত মনোভাব ও একদেশদর্শিতাই আবার অমঙ্গল ঘটাচ্ছে। এ সব বন্ধুদের মন ভাল এবং তারা স্বদেশপ্রেমিকও বটে। কিন্তু এই 'ভদ্রলোকদের

উচ্চাকাঙক্ষা সত্যই অতি-উচ্চ, হলেও তাদের বিচারগুলো ভুল, সেই ভুল বিচার অনুসারে কাজ করলে নিশ্চয়ই দেওয়ালে মাথা ঠেকে যাবে। কারণ বাস্তবের সংগে মূল্যায়নের সঙ্গতি না থাকলে কার্যকরণ তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। আর তৎসত্ত্বেও কাজ করার অর্থ হবে ফৌজের পরাজয় ও স্বদেশের পরাধীনতা, পরাজয়বাদীদের বেলায় যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, এতে করেও সেই একই ফল হবে। তাই এই দ্রুত বিজয়ের তত্ত্বটিও কোন কাজে আসবে না।

(২৮) আমরা কি জাতীয় পরাধীনতার বিপদাশঙ্কাকে অস্বীকার করি? না, আমরা তা করি না। আমি মানি যে, চীনের সামনে দুটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে—মুক্তি অথবা পরাধীনতা, আর এ দুটির মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মুক্তি অর্জন করা, এবং পরাধীনতাকে প্রতিহত করা। মুক্তি অজর্নের শর্ত হচ্ছে চীনের প্রগতি, যা হচ্ছে মৌলিক, আর তদুপরি শত্রুর বাধাবিপত্তি ও অসুবিধা এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য। জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীদের সংগে আমাদের মতপার্থক্য আছে। বাস্তবনিষ্ঠভাবে ও সর্বাঙ্গীণভাবে আমরা জাতীয় পরাধীনতা ও মুক্তি—এই উভয় সম্ভবনার অস্তিত্বকেই স্বীকার করি এবং এ বিষয়ে জোর দিই যে, মুক্তির সম্ভাবনা বেশি এবং মুক্তি অর্জনের শর্তাদি আমরাই দেখিয়ে দিই, আর সেই শর্তাদিকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রয়াস চালাই। পক্ষান্তরে জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীরা আত্মগতভাবে ও একতরফাভাবে শুধু একটিমাত্র সম্ভবনাকেই, অর্থাৎ শুধু পরাধীনতার সম্ভাবনাকেই, স্বীকার করে, মুক্তির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে, আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, মুক্তির জন্য তারা প্রয়োজনীয় শর্তাদি দেখিয়ে দেবে না এবং সেগুলিকে সুনিশ্চিত করার জন্য তারা চেষ্টা করবে না। আমরা আপোষের ঝোঁকগুলোকে ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যাপারগুলোকেও স্বীকার করি, কিন্তু আমরা আবার অপরাপর ঝোঁকগুলোকে ও ব্যাপারগুলোকেও দেখতে পাই এবং আমরা দেখিয়ে দিই যে, অপরাপর ঝোঁকগুলো ও ব্যাপারগুলো ক্রমে ক্রমে আপোষের ঝোঁকগুলো ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যাপারগুলোর ওপর প্রাধান্যলাভ করবে এবং এই দুয়ের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলছে; উপরন্তু, হিতকর ঝোঁকগুলো ও ব্যাপারগুলোর জয়লাভের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় শর্তাদি দেখিয়ে দিই, চেষ্টা করি আপোষের ঝোঁককে অতিক্রম করতে এবং দুনীর্তিপরায়ণ ব্যাপারগুলোকে বদলে দিতে। সুতরাং, আমরা ঠিক হতাশাবাদীদের বিপরীতে, আমরা আদৌ মনমরা নই।

(২৯) আমরা যে দ্রুত বিজয় পছন্দ করি না তাও কিন্তু নয়। প্রত্যেকেই 'শয়তানকে' রাতারাতি তাড়ানোর পক্ষেই আছে। কিন্তু আমরা বলতে চাই

যে, সুনির্দিষ্ট শর্তাদির অভাবে দ্রুত বিজয় হচ্ছে এমন একটা কিছু, যা বিরাজ করছে শুধু মনোরাজ্যে এবং যার বাস্তবে কোন অস্তিত্বই নেই—তা হচ্ছে নিছক একটা কল্পনা এবং ভ্রান্ত মতবাদ। তাই, শত্রু ও আমাদের যাবতীয় অবস্থার বাস্তবগত ও সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়ন করে আমরা দেখিয়ে দিই, চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে রণনীতিগত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, এবং দ্রুত বিজয়ের নিছক অমূলক তত্ত্বকে তাই আমরা নাকচ করে দিই। আমরা এই অভিমত পোষণ করি যে, চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য অপরিহার্য যাবতীয় শর্তাদিকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের অবশ্যই চেষ্টা চালাতে হবে এবং যত বেশি পূর্ণতার সংগে ও দ্রুতগতিতে এই শর্তাদি প্রস্তুত হবে, বিজয় সম্পর্কে আমরা তত বেশি সুনিশ্চিত হব, এবং তত বেশি তাড়াতাড়ি আমরা সে বিজয় অর্জন করব। আমরা মনে করি যে, শুধুমাত্র এইভাবেই যুদ্ধের গতিপথটিকে সংক্ষিপ্ত করতে পারা যায়, এবং আমরা অগ্রাহ্য করি দ্রুত বিজয়ের তত্ত্বকে, যা হচ্ছে শুধু শূন্যগর্ভ কথা ও শস্তায় বাজিমাৎ করার চেষ্টা।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন?

(৩০) দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সমস্যাকে এখন একবার পর্যালোচনা করে দেখা যাক। 'দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন?' এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরে পৌঁছাতে পারা যায় কেবলমাত্র শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার সমস্ত মৌলিক বৈপরীত্যগুলির ওপর ভিত্তি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা যদি শুধু এইটুকু বলি যে, শত্রু হচ্ছে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র আর আমরা হচ্ছি একটা দুর্বল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, তাহলে জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের খাদে পড়ার বিপদ আমাদের থাকে। কারণ, কেবলমাত্র শক্তিশালীর বিরুদ্ধে দুর্বলের যুদ্ধ ঘটলেই কোন যুদ্ধ তত্ত্বের দিক থেকে কিংবা বাস্তবে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে না। আবার নিছক ছোটর বিরুদ্ধে বড়র, অথবা নিছক অধঃপতনমুখীর বিরুদ্ধে প্রগতিশীলের, নগণ্য সমর্থনের বিরুদ্ধে প্রচুর সমর্থনের যুদ্ধ বাধলেও অনুরূপভাবে কোন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে না। বড় কর্তৃক ছোটকে দখল করে নেওয়া অথবা ছোট কর্তৃক বড়কে দখল করে নেওয়া তো গতানুগতিক ঘটনা। প্রগতিশীল দেশ যদি শক্তিশালী না হয়, তাহলে তারা প্রায়ই বিরাট অথচ অধঃপতনমুখী দেশ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর এ কথা যা কিছু প্রগতিশীল অথচ শক্তিশালী নয় তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রচুর বা নগণ্য সমর্থন হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সহায়ক উপাদান। এর ভূমিকা কতটুকু হবে তা নির্ভর করে

উভয়পক্ষের মৌলিক উপাদানের ওপরে। সুতরাং আমরা যখন বলি, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ; তখন আমাদের সিদ্ধান্তটি উভয়পক্ষের সমস্ত উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই উদ্ভূত হয়। শত্রু শক্তিশালী আর আমরা দুর্বল—আমাদের দেশের পদানত হওয়ার বিপদ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে শত্রুর দুর্বলতা রয়েছে আর আমাদের আছে শ্রেষ্ঠতা। আমাদের প্রচেষ্টা শত্রুর শ্রেষ্ঠতাকে কমাতে পারে এবং তার দুর্বলতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। পক্ষান্তরে, নিজেদের প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠতাকে বাড়িয়ে নিতে এবং দুর্বলতাকে দূর করতে পারি। তাই আমরা চূড়ান্ত জয়লাভ করতে এবং জাতীয় পরাধীনতাকে প্রতিহত করতে পারি। আর পরিশেষে শত্রু পরাজিত হবে এবং তার গোটা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসকে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

(৩১) শত্রুর শুধু একটিমাত্র ব্যাপারে শ্রেষ্ঠতা আছে, কিন্তু দুর্বলতা তার অন্য সকল ব্যাপারে; আবার আমাদের দুর্বলতা হচ্ছে শুধুমাত্র একটি ব্যাপারে, কিন্তু অন্যান্য সকল ব্যাপারে আমাদের রয়েছে শ্রেষ্ঠতা। তবু কেন এতে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, বরং বর্তমানে শত্রুর জন্য একটা উৎকৃষ্ট অবস্থিতি আর আমাদের জন্য একটা নিকৃষ্ট অবস্থিতি সৃষ্ট রয়েছে? খুবই স্পষ্ট যে, এরকম বাহ্যিক দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্নের বিবেচনা করা উচিত নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, শত্রু ও আমাদের মধ্যে শক্তির বৈষম্য এখনো খুব বেশি; শত্রুর দুর্বলতাগুলি এখনো এমন যথেষ্ট মাত্রায় বিকশিত হয়ে ওঠেনি এবং বর্তমানে সেগুলি বিকশিত হয়ে উঠতেও পারে না, যাতে করে তার প্রবলতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে; আবার আমাদের শ্রেষ্ঠতাও এমন যথেষ্ট মাত্রায় বিকশিত হয়ে ওঠেনি এবং বর্তমানে সেগুলি বিকশিত হয়ে উঠতেও পারে না, যাতে করে আমাদের দুর্বলতার ক্ষতিটি পূরণ করে দিতে পারে। সুতরাং ভারসাম্য এখনো হতে পারে না, হতে পারে শুধু ভারসাম্যহীনতা।

(৩২) যদিও প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও যুক্তফ্রন্ট রক্ষা করে আমাদের প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার ফলে—শত্রু শক্তিশালী আর আমরা দুর্বল, শত্রু উৎকৃষ্ট অবস্থিতিতে আর আমরা নিকৃষ্ট অবস্থিতিতে—এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, তবুও এখনো পর্যন্ত কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। তাই যুদ্ধের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে শত্রু নির্দিষ্ট মাত্রায় জয়লাভ করতে পারবে আর আমরা নির্দিষ্ট মাত্রায় পরাজয় বরণ করব। কিন্তু শত্রুর জয়গুলি ও আমাদের পরাজয়গুলি শুধু এই নির্দিষ্ট পর্যায়ে ও নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমাবদ্ধ এবং সেগুলিকে ছাড়িয়ে যেতে

পারবে না—শত্রু সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে পারবে না আর আমরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হব না।—এর কারণ কি ? কারণ এই যে, প্রথমতঃ, একেবারে শুরু থেকেই শত্রুর প্রবলতা ও আমাদের দুর্বলতা ছিল আপেক্ষিক এবং সেগুলি নিরঙ্কুশ ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও যুক্তফ্রন্ট অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় শত্রুর প্রবলতা ও আমাদের দুর্বলতা আরও বেশি আপেক্ষিক হয়ে উঠবে। প্রারম্ভিক পরিস্থিতির কথা ধরা যাক, শত্রু শক্তিশালী হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রতিকূল উপাদানগুলি তার সেই শক্তিকে হ্রাস করেছে; কিন্তু তবুও তার উৎকৃষ্ট অবস্থিতিকে বানচাল করার জন্য যথেষ্ট মাত্রায় শক্তিহ্রাস তখনো করেনি; আমরা দুর্বল হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রের অনুকূল উপাদানগুলি আমাদের দুর্বলতার ক্ষতিটি পূরণ করেছে। কিন্তু তবুও আমাদের নিকৃষ্ট অবস্থাকে বদলে দেবার মতো যথেষ্ট মাত্রায় তা ঘটেনি। তাই ফলতঃ, শত্রু হচ্ছে আপেক্ষিকভাবে শক্তিশালী আর আমরা আপেক্ষিকভাবে দুর্বল; শত্রু রয়েছে তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট অবস্থায়, আর আমরা রয়েছি তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট অবস্থায়। উভয়পক্ষে প্রবলতা ও দুর্বলতা, উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা কোন-দিনই নিরঙ্কুশ ছিল না। আর তাছাড়া যুদ্ধের সময়ে আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও যুক্তফ্রন্ট অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার ফলে শত্রুর ও আমাদের মধ্যে আগেকার প্রবলতা ও দুর্বলতা, উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার পরিস্থিতির আরও পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং শত্রুর জয়গুলি ও আমাদের পরাজয়গুলি শুধু নির্দিষ্ট পর্যায়ে ও নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমাবদ্ধ, আর তাই যুদ্ধটি হয়ে ওঠে দীর্ঘস্থায়ী।

(৩৩) কিন্তু পরিস্থিতি অব্যাহতভাবে বদলে যাচ্ছে। যুদ্ধের মধ্যে আমরা যদি সঠিক সামরিক ও রাজনৈতিক রণকৌশল নিয়োগ করি, কোন নীতিগত ভুল না করি এবং সর্বাধিক প্রয়াস চালাই, তাহলে যুদ্ধটি প্রলম্বিত হওয়ার সংগে সংগে শত্রুর প্রতিকূল উপাদানগুলি ও আমাদের অনুকূল উপাদানগুলি উভয়ই বেড়ে উঠবে, আর অনিবার্যভাবেই শত্রুর ও আমাদের প্রবলতা ও দুর্বলতার আগেকার মাত্রাটা পরিবর্তিত হতে থাকবে, উভয়পক্ষের উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার পরিস্থিতিতেও পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। একটা নতুন ও নির্দিষ্ট পর্যায় এলে প্রবলতা ও দুর্বলতার মাত্রায় এবং উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটবে, আর তার ফলে শত্রু পরাজিত হবে, আমরা হব জয়ী।

(৩৪) শত্রু এখনো কোনমতে তার প্রবলতার সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ এখনো তাকে মৌলিকভাবে দুর্বল করে দেয়নি। তার জনশক্তির ও সম্পদসম্ভারের অপ্রতুলতা এখনো তার আক্রমণকে রোধ করতে

পারে না; পক্ষান্তরে তার জনশক্তি ও সম্পদসম্ভার তার আক্রমণকে নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারে। শত্রুর নিজ দেশের শ্রেণীবিরোধ এবং চীনা জাতির প্রতিরোধ—এই উভয়কেই তীব্রতর করে তুলতে পারে এমন উপাদানগুলি, অর্থাৎ শত্রুর যুদ্ধের অধঃপতনমুখী ও বর্বর প্রকৃতি, এখনো এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেনি, যা তার আক্রমণকে মৌলিকভাবে ব্যাহত করতে পারে। শত্রুর আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার উপাদান এখনো রয়েছে পরিবর্তন ও বিকাশের পর্যায়ে, এবং শত্রু এখনো সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। আমাদেরকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছে এমন অনেক দেশের অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের কারবারী পুঁজিপতিরা এখনো মুনাফার লোভে জাপানকে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করে চলছে[১৫], এবং সেইসব দেশগুলির সরকার[১৬] এখনো সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে একযোগে বাস্তব উপায়ে জাপানকে শাস্তিবিধান করতে অনিচ্ছুক। এ সবই নির্ধারিত করে দিচ্ছে যে, আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধ তাড়াতাড়ি জয়লাভ করতে পারবে না, সেটি হবে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চীনের যেসব দুর্বলতা প্রকাশ পায়, দশ মাসের প্রতিরোধ-যুদ্ধে তার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রুর আক্রমণকে ব্যাহত করার ও আমাদের পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য যতটা প্রয়োজন, তার থেকে আমরা এখনো বহু দূরে। উপরন্তু, পরিমাণের দিক থেকে আমাদের কিছু ক্ষতি ভোগ করতে হয়েছে। চীনের যাবতীয় অনুকূল উপাদানগুলি যদিও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে, তবুও সেগুলি যাতে শত্রুর আক্রমণকে রুখবার ও আমাদের পাল্টা আক্রমণ প্রস্তুত করার পক্ষে যথেষ্ট মাত্রায় পৌঁছাতে পারে, তার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রবল চেষ্টা চালাতে হবে। দেশের ভেতর থেকে দুর্নীতি দূরীকরণ ও প্রগতি ত্বরান্বিতকরণ কিংবা বিদেশে জাপানের সমর্থক শক্তিগুলির দূরীকরণ ও জাপ-বিরোধী শক্তিগুলির সম্প্রসারণ এখনো ঘটেনি। এইসব আবার নির্ধারণ করে দিচ্ছে যে, আমাদের যুদ্ধটি তাড়াতাড়ি জয়লাভ করতে পারবে না, এবং সেটি কেবলমাত্র একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধই হতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের তিনটি পর্যায়

(৩৫) যেহেতু চীন-জাপান যুদ্ধটি হচ্ছে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং চূড়ান্ত বিজয় হবে চীনের, তাই এই যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরে নেওয়া যেতে

পারে যে, এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধটি তিনটি পর্যায়ের ভেতর দিয়ে যাবে। প্রথম পর্যায়টি হবে শত্রুর রণনীতিগত আক্রমণ ও আমাদের রণনীতিগত প্রতিরক্ষার সময়কাল। দ্বিতীয় পর্যায় হবে শত্রুর রণনীতিগত-সংরক্ষণের ও আমাদের পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতির সময়কাল। তৃতীয় পর্যায় হবে আমাদের রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের ও শত্রুর রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের সময়কাল। তিনটি পর্যায়ে বাস্তব পরিস্থিতি কি হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব, কিন্তু বর্তমান অবস্থার আলোকে যুদ্ধের কয়েকটি প্রধান ঝোঁকের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করা যেতে পারে। বাস্তব ঘটনার গতিপ্রবাহ হবে অত্যন্ত ঘটনাবহুল এবং আঁকাবাঁকা ও পরিবর্তনশীল, আর চীন-জাপান যুদ্ধের 'ঠিকুজী' তৈরী করা কারও পক্ষে সম্ভব নয় ; তবুও যুদ্ধের রণনীতিগত পরিচালনার জন্য দরকার হচ্ছে যুদ্ধের ঝোঁকগুলির একটা খসড়া রূপরেখা তৈরী করা। তাই, যদিও পরবর্তী ঘটনাদির সংগে আমাদের খসড়া রূপরেখাটি সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না এবং সেই পরবর্তী ঘটনাদির দ্বারাই তা শুধরে নেওয়া যাবে, তবুও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের দৃঢ় ও অর্থপূর্ণ রণনীতিগত পরিচালনার জন্যই খসড়া রূপরেখাটি তৈরী করা এখনই প্রয়োজন।

(৩৬) প্রথম পর্যায়টি এখনো শেষ হয়নি। শত্রুর দুরভিসন্ধি হচ্ছে ক্যান্টন, উহান ও লানচৌ দখল করা এবং এই তিনটি বিন্দুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যটি সাধনের জন্য শত্রুকে অন্ততঃপক্ষে ৫০ ডিভিসন— প্রায় ১৫ লক্ষ সৈন্য ব্যবহার করতে হবে, দেড় থেকে দুই বছর সময় ব্যয় করতে হবে এবং এক হাজার কোটিরও বেশি ইয়েন খরচ করতে হবে। এত গভীরে ঢুকতে গিয়ে সে প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি ও অসুবিধাদির সম্মুখীন হবে এবং তার ফল হবে এমন সর্বনাশা, যা কল্পনার অতীত। ক্যান্টন-হানকৌ রেলপথ ও সীআন-লানচৌ মোটর যাতায়াতের সড়ককে সম্পূর্ণভাবে দখল করে নেবার অপচেষ্টা করতে গিয়ে শত্রুকে অত্যন্ত বিপজ্জনক যুদ্ধ লড়তে হবে এবং তাতেও তার দুরভিসন্ধি পুরোপুরি সাধিত না হতে পারে। কিন্তু আমাদের যুদ্ধ চালনার পরিকল্পনা করতে গিয়ে এই অনুমানের ওপরে ভিত্তি করতে হবে যে, শত্রু এই তিনটি বিন্দু, এমনকি এই তিনটি বিন্দু ছাড়াও আরও কোন কোন অঞ্চল দখল করে নিতে পারে এবং সেগুলির মধ্যে সংযোগও সাধন করতে পারে ; আর আমাদের উচিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য বিন্যাস-ব্যবস্থা করা যাতে করে শত্রু তা করলেও আমরা তার সংগে এঁটে উঠতে সমর্থ হই। এই পর্যায়ে যুদ্ধের যে রূপটি আমরা গ্রহণ করব তা হচ্ছে মুখ্যতঃ চলমান যুদ্ধ, আর গেরিলাযুদ্ধ ও অবস্থানগত যুদ্ধ হবে তার সম্পূরক। কুওমিনতাঙ সামরিক কর্তৃপক্ষের আত্মগত

ভুলের কারণে এই পর্যায়ের প্রথমদিকে অবস্থানগত যুদ্ধকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তবুও গোটা পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি হচ্ছে সম্পূরক। এই পর্যায়ে চীন ইতিমধ্যেই একটি ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলেছে এবং অভূতপূর্ব ঐক্য অর্জন করেছে। চীনকে আত্মসমর্পণ করতে প্রলুব্ধ করার জন্য শত্রু ঘৃণ্য ও নির্লজ্জ উপায় অবলম্বন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে, আর এইভাবে বেশি প্রয়াস না করেই তার দ্রুত নিষ্পত্তির পরিকল্পনাকে হাসিল করার এবং গোটা চীনদেশকে দখল করে নেবার অপচেষ্টা করেছে ও করবে। তৎসত্ত্বেও এযাবৎকাল সে ব্যর্থ হয়েছে, ভবিষ্যতেও তার পক্ষে সাফল্যলাভ করা কঠিন। এই পর্যায়ে প্রভূত পরিমাণ লোকসান সত্ত্বেও চীন যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে, আর সেইটিই হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তার জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রধান ভিত্তি। এই পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই চীনকে ভাল রকম সাহায্য দিয়েছে। আর শত্রুর পক্ষে, ইতিমধ্যেই সৈন্যের মনোবল ভেঙে পড়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, এই পর্যায়ের গোড়ার দিকে যেমন ছিল তার তুলনায় এর মধ্যভাগে শত্রুর স্থলবাহিনীর আক্রমণের গতিবেগ কম এবং শেষের দিকে এ গতিবেগ আরও কমে যাবে। তার আর্থিক ব্যবস্থায় ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিঃশেষণের লক্ষণাদি দেখা দিতে শুরু করছে, তার জনসাধারণ ও সৈন্যদের মধ্যে রণক্লান্তি দেখা দিতে শুরু করছে, যুদ্ধের পরিচালক চক্রের ভেতরে 'যুদ্ধ-হতাশা' প্রকাশ পেতে আরম্ভ করছে এবং যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্য বাড়ছে।

(৩৭) দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা যেতে পারে রণনীতিগত ভারসাম্যের পর্যায় শত্রুর সৈন্যশক্তির অপর্যাপ্ততা ও আমাদের দৃঢ় প্রতিরোধের কারণে প্রথম পর্যায়ের শেষাংশ শত্রু নির্দিষ্ট সীমায় তার রণনীতিগত আক্রমণের শেষ গন্তব্যস্থলগুলি স্থির করে নিতে বাধ্য হবে, আর এই শেষ গন্তব্যস্থলগুলিতে পৌঁছে তার রণনীতিগত আক্রমণ থামিয়ে দেবে এবং অধিকৃত এলাকাগুলিকে সংরক্ষিত করার পর্যায়ে প্রবেশ করবে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে শত্রু তার অধিকৃত এলাকাগুলিকে সংরক্ষিত করার চেষ্টা করবে, তাঁবেদার সরকার স্থাপনের কপট পদ্ধতির মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলিকে নিজস্ব করে নেবার প্রয়াস চালাবে, আর চীনের জনগণকে প্রচণ্ডভাবে লুণ্ঠন করবে। কিন্তু সে দৃঢ় গেরিলাযুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। প্রথম পর্যায়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে সৈন্যশক্তি খুবই কম, এই সুযোগ নিয়ে আমাদের গেরিলাযুদ্ধ ব্যাপক মাত্রায় বিকাশলাভ করবে এবং বহু ঘাঁটি এলাকা স্থাপিত হবে, এটা মূলতঃ শত্রুর অধিকৃত এলাকাগুলির সংরক্ষণকে বিপদাপন্ন করে তুলবে। তাই দ্বিতীয় পর্যায়েও ব্যাপক যুদ্ধ হবে। এই

পর্যায়ে আমাদের যুদ্ধের রূপটি হবে মুখ্যতঃ গেরিলাযুদ্ধ, আর সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে চলমান যুদ্ধ। চীন তখনো বিরাট নিয়মিত সৈন্যবাহিনী রাখতে পারবে, কিন্তু অবিলম্বে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ শুরু করা তার পক্ষে কঠিন হবে, কারণ, একদিকে শত্রু তার অধিকৃত বড় বড় শহরগুলিতে ও যোগাযোগের প্রধান প্রধান পথে রণনীতিগতভাবে প্রতিরক্ষাত্মক অবস্থিতি গ্রহণ করবে এবং অন্যদিকে চীন তখনো প্রকৌশলগতভাবে যথোপযুক্তরকমে সুসজ্জিত হয়ে উঠবে না। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যরা ছাড়া আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিপুল সংখ্যায় সরিয়ে দেওয়া হবে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে, সেখানে তারা অপেক্ষাকৃত ছড়িয়ে পড়া বিন্যাসব্যবস্থায় থাকবে; আর সেখানকার যেসব এলাকা শত্রুর অধিকারে নয়, সেইসব এলাকায় নিজেদের ভিত্তি স্থাপন করে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সশস্ত্রবাহিনীর সংগে সহযোগিতা করে তারা শত্রু-অধিকৃত এলাকার বিরুদ্ধে ব্যাপক ও প্রচণ্ড গেরিলাযুদ্ধ চালাবে, এবং শত্রুকে যথাসম্ভব চলন্ত অবস্থায় লিপ্ত করিয়ে তাকে চলমান লড়াইয়ে ধ্বংস করবে— শানসী প্রদেশে এখন যেমন করা হচ্ছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধটি হবে নির্মম, আর বহু এলাকাই গুরুতর বিনাশের কবলে পড়বে। কিন্তু গেরিলাযুদ্ধ জয়যুক্ত হতে পারবে, আর গেরিলাযুদ্ধ সুপরিচালিত হলে শত্রু তার অধিকৃত এলাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র নিজের অধিকারে রাখতে পারবে, বাকি দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে আমাদের হাতে। এটা হবে শত্রুর বিরাট পরাজয় আর চীনের পক্ষে এক বিরাট জয়। গোটা শত্রু-অধিকৃত এলাকা তখন তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে : প্রথমতঃ, শত্রুর ঘাঁটি এলাকা ; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকা; এবং তৃতীয়তঃ, উভয়পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতাভুক্ত গেরিলা অঞ্চল। আমাদের ও শত্রুর ভেতরকার শক্তিসাম্যে পরিবর্তনের মাত্রার ওপরে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের ওপরে নির্ভর করবে এই পর্যায়ের স্থিতিকাল। সাধারণভাবে বলা যায়, এই পর্যায়টা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হবে, তার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এই পর্যায়ের কষ্টসাধ্য পথকে অটলভাবে অতিক্রম করতে হবে। চীনের পক্ষে এটা হবে খুবই কষ্টকর সময় ; দুটি গুরুতর সমস্যা হবে অর্থনৈতিক অসুবিধাদি ও দেশদ্রোহীদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ। চীনের যুক্তফ্রন্টকে ভাঙবার জন্য শত্রুরা সবরকম চেষ্টা করবে, আর সমস্ত শত্রু-অধিকৃত এলাকার দেশদ্রোহীদের সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে তথাকথিত 'একীভূত সরকার' গড়ে তুলবে। বড় বড় শহরগুলির পতনের ফলে এবং যুদ্ধের দুর্ভোগাদির কারণে আমাদের ভেতরকার দোদুল্যচিত্ত ব্যক্তিরা আপোষের জন্য চেঁচাবে আর হতাশাপূর্ণ

মনোভাব গুরুতর আকারে বেড়ে উঠবে। তখন আমাদের কর্তব্য হবে একপ্রাণ হয়ে অপ্রতিহত অধ্যবসায় নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য গোটা দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, যুক্তফ্রন্টকে সম্প্রসারিত ও সুসংবদ্ধ করা, যাবতীয় নৈরাশ্য ও আপোষের ভাবধারাকে ঝেটিয়ে বিদায় করা, কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রেরণা দেওয়া ও নতুন যুদ্ধকালীন নীতি প্রয়োগ করা, এবং এমনি করেই অটলভাবে এই পর্যায়ের কষ্টসাধ্য পথ অতিক্রম করা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে, স্থিরসংকল্প হয়ে একটি সংযুক্ত সরকারকে বজায় রাখার জন্য গোটা দেশকে আমাদের আহ্বান জানাতে হবে, ভাঙনের বিরোধিতা করতে হবে, সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধের পদ্ধতির উন্নতিসাধন করতে হবে, সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠন করতে হবে, সমগ্র জনগণকে সমাবেশ করতে হবে এবং পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এই পর্যায়ে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জাপানের পক্ষে আরও বেশি প্রতিকূল হয়ে পড়বে; যদিও নিজেকে 'সিদ্ধ ঘটনার' সংগে খাপ খাইয়ে নেবার সেই চেম্বারলেন ধরনের 'বাস্তববাদের' কথাও উঠতে পারে, কিন্তু তবুও প্রধান আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি চীনকে আরও বেশি সাহায্য দেবার জন্য উন্মুখ হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সাইবেরিয়ার প্রতি জাপানের আক্রমণাশঙ্কা আগের চেয়ে আরও বেশি দেখা দেবে, এমনকি নতুন যুদ্ধও বেধে যেতে পারে। জাপানের ক্ষেত্রে, তার কয়েক ডজন ডিভিসন সৈন্য চীনের অথৈ জলে পড়ে যাবে। সুবিস্তৃত গেরিলাযুদ্ধ ও জনগণের জাপান-বিরোধী আন্দোলন এই বিরাট জাপানী বাহিনীকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে দেবে, একদিকে প্রভূত পরিমাণে তার ক্ষতিসাধন করবে এবং অন্যদিকে তার স্বদেশে ফেরার জন্য কাতরতা, রণক্লান্তি ও এমনকি যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাবকে আরও বাড়িয়ে দেবে, এমনি করে এই বাহিনীর মনোবলকে ভেঙে দেবে। যদিও এ কথা বলা ভুল হবে যে চীনের লুণ্ঠনে জাপান আদৌ কোন ফলই পাবে না, তবুও পুঁজির স্বল্পতার ফলে ও গেরিলাযুদ্ধের দ্বারা হয়রান হয়ে জাপান সম্ভবতঃ দ্রুত ও ভালরকম কোন ফললাভ করতে পারবে না। এই দ্বিতীয় পর্যায়টি হবে গোটা যুদ্ধের উত্তরণপর্যায় এবং সবচেয়ে কঠিন সময়, কিন্তু এটা হবে গোটা যুদ্ধের মোড় ঘুরবার সন্ধিক্ষণ। চীন স্বাধীন দেশ হয়ে উঠবে কি একটা উপনিবেশে পর্যবসিত হবে, তা প্রথম পর্যায়ে বড় বড় শহরগুলিকে নিজ অধিকারে ধরে রাখা বা খোয়ানোর দ্বারা নির্ধারিত হবে না, পরন্তু সেটি নির্ধারিত হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে গোটা জাতি কিভাবে সচেষ্ট হয় তার মাত্রার দ্বারা। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে, যুক্তফ্রন্টে এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে আমরা যদি অটল থাকি, তাহলে চীন এই দ্বিতীয় পর্যায়ে দুর্বলতাকে প্রবলতায়

বদলে নেবার ক্ষমতা অর্জন করবে। চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের ত্রি-অঙ্ক নাটিকার এটি হবে দ্বিতীয় অঙ্ক। আর এই নাটিকার সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব হয়ে উঠবে একটি সবচেয়ে চমৎকার শেষ অঙ্কের অভিনয়।

(৩৮) তৃতীয় পর্যায়টি হবে আমাদের হৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য পাল্টা আক্রমণের পর্যায়। পূর্ববর্তী পর্যায়ে চীন নিজেই যে শক্তি গড়ে তুলেছে এবং এই তৃতীয় পর্যায়েও যে শক্তি বেড়ে চলতে থাকবে, মুখ্যতঃ তার ওপরেই নির্ভর করবে এই হৃত অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধার। কিন্তু শুধু চীনের একার নিজস্ব শক্তিটিই যথেষ্ট হবে না। আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সমর্থনের ওপরে ও জাপানের ভেতরে যে পরিবর্তনাদি ঘটবে তার ওপরেও আমাদের নির্ভর করতে হবে, অন্যথায় আমরা জয়লাভ করতে পারব না। আন্তর্জাতিক প্রচার ও কুটনৈতিক ক্ষেত্রে চীনের কাজ এতে বেড়ে যাবে। এই পর্যায়ে, আমাদের যুদ্ধ তখন আর রণনীতিগত প্রতিরক্ষাত্মক হয়ে থাকবে না, পরন্তু সে তখন পরিণত হবে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণে, নিজেকে সে তখন প্রকাশ করবে রণনীতিগত আক্রমণে; আর সে যুদ্ধ তখন আর রণনীতিগত অন্তর্লাইনে লড়া হবে না, বরং সে যুদ্ধ তখন ক্রমে ক্রমে সরে যাবে রণনীতিগত বহির্লাইনে। যুদ্ধ করতে করতে যখন আমরা ইয়ালু নদীর তীরে পৌঁছাব, শুধু তখনই এই যুদ্ধ শেষ হয়েছে বলে মনে করতে পারা যাবে। তৃতীয় পর্যায়টিই হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের শেষ পর্যায়। আমরা যখন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলি, তখন আমরা এই পর্যায়ের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার পথটি পেরিয়ে যাবার কথাই বোঝাই। আমাদের চালিত যুদ্ধের প্রধান রূপটি এই পর্যায়েও হবে চলমান যুদ্ধ, কিন্তু অবস্থানগত যুদ্ধের গুরুত্ব বাড়বে। যদি বলি যে, তৎকালীন পরিবেশের কারণে প্রথম পর্যায়ে অবস্থানগত প্রতিরক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে পারা যায় না, তবে পরিবেশের পরিবর্তন ও কর্তব্যের প্রয়োজনের কারণে তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থানগত আক্রমণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তৃতীয় পর্যায়েও চলমান যুদ্ধ ও অবস্থানগত যুদ্ধের পরিপূরক ভূমিকা নিয়ে গেরিলাযুদ্ধ রণনীতিগতভাবে সহযোগিতামূলক ভূমিকা গ্রহণ করবে, এটা দ্বিতীয় পর্যায় থেকে ভিন্ন।

(৩৯) কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধটি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী আর তাই প্রকৃতিতে নির্মম। গোটা চীনকে গিলে ফেলতে শত্রু সমর্থ হবে না, কিন্তু বেশ দীর্ঘদিনের জন্য বহুস্থান সে নিজের দখলে রাখতে পারবে। চীন তাড়াতাড়ি জাপানীদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে না, কিন্তু চীনের বৃহত্তর অংশ চীনের হাতেই থাকবে।

পরিশেষে শত্রু হারবে আর আমরা জিতব, কিন্তু সে জয়লাভ করতে আমাদের একটি দুর্গম পথ পেরিয়ে আসতে হবে।

(৪০) এই দীর্ঘ ও নির্মম যুদ্ধের ভেতর দিয়ে চীনা জনগণ পোড় খেয়ে ইস্পাত-কঠিন হয়ে উঠবেন। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক পার্টিগুলিও অগ্নিতে পোড় খাবে এবং পরীক্ষিত হয়ে উঠবে। যুক্তফ্রন্টকে অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে; যুক্তফ্রন্টকে দৃঢ়ভাবে টিকিয়ে রাখলেই কেবল আমরা অটলভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারি; আবার যুক্তফ্রন্টকে দৃঢ়ভাবে টিকিয়ে রাখা ও যুদ্ধকে অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার ভেতর দিয়েই শুধু আমরা চূড়ান্ত বিজয়লাভ করতে পারি। শুধুমাত্র এইভাবেই সমস্ত বাধাবিপত্তি ও অসুবিধাকে দুর করতে পারা যায়। যুদ্ধের দুর্গম পথ পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছাব বিজয়ের রাজপথে। এই হচ্ছে যুদ্ধের স্বাভাবিক যুক্তি।

(৪১) তিন পর্যায়ে শত্রু ও আমাদের শক্তির অনুপাতে পরিবর্তন নিম্নলিখিত পথে চলবে: প্রথম পর্যায়ে শত্রু উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকবে আর আমরা নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকব। আমাদের নিকৃষ্টতার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পূর্বমুহূর্ত থেকে শুরু করে এই পর্যায়ের শেষ পর্যন্ত দুটি ভিন্ন ধরনের পরিবর্তনকে হিসেবে ধরতে হবে। প্রথম ধারণাটি হচ্ছে খারাপের দিকে পরিবর্তন। প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, অর্থাৎ ভূমিসীমা, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক শক্তি, সামরিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক সংস্থায় হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে চীনের প্রারম্ভিক নিকৃষ্টতার অবস্থা আরও গুরুতর হয়ে উঠবে। প্রথম পর্যায়ের শেষদিকে, এই হ্রাসপ্রাপ্তিটি সম্ভবতঃ বেশ প্রচুর হবে, প্রচুর হবে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব ও আপোষের মতবাদের ভিত্তি হিসাবে এই বিষয়টি কোন কোন লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তন অর্থাৎ ভালর দিকে পরিবর্তনকেও অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। এই পরিবর্তনে আছে যুদ্ধে লব্ধ অভিজ্ঞতা, সৈন্যবাহিনীর প্রগতি, রাজনৈতিক প্রগতি, জনগণের সমাবেশ, নতুন পথে সংস্কৃতির বিকাশ, গেরিলাযুদ্ধের উদ্ভব, আন্তর্জাতিক সাহায্যের বৃদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম পর্যায়ে খারাপের দিকে যা থাকে তা হচ্ছে পুরানো পরিমাণ ও গুণ, আর তার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে মুখ্যতঃ পরিমাণগত। ভালর দিকে যা থাকে তা হচ্ছে নতুন পরিমাণ ও গুণ, আর তার বহিঃপ্রকাশটি হচ্ছে মুখ্যতঃ গুণগত। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ও চূড়ান্ত জয়লাভ করার আমাদের সামর্থ্যের ভিত্তি যোগায় এই দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তন।

(৪২) প্রথম পর্যায়ে, শত্রুর পক্ষে দুই ধরনের পরিবর্তন ঘটে। প্রথম

ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে মন্দাভিমুখী পরিবর্তন, যা প্রতিফলিত হয় কয়েক লক্ষ হতাহতের মধ্য দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ক্ষয়ক্ষতিতে, সৈন্যদের মনোবলের অবনতিতে, স্বদেশে গণ-বিক্ষোভে, বাণিজ্য সংকোচনে, এক হাজার কোটির বেশি ইয়েনের খরচে , বিশ্বজনমত কর্তৃক নিন্দিত হওয়াতে, ইত্যাদিতে। এই প্রকারের পরিবর্তনও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ও চূড়ান্ত জয়লাভ করার জন্য আমাদের সামর্থ্যের ভিত্তি যোগায়। কিন্তু অনুরূপভাবে আমরা অবশ্যই শত্রুপক্ষের দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তনটিকেও হিসেবে ধরব। এ পরিবর্তন হচ্ছে ভালর দিকে পরিবর্তন। অর্থাৎ ভূমিসীমায়, জনসংখ্যায় ও সম্পদসম্ভারে তার সম্প্রসারণ। এটাও হচ্ছে আমাদের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির ও দ্রুত বিজয়ের অসম্ভাব্যতার ভিত্তি। কিন্তু এই একই সময়ে কিছু কিছু লোক এইটিকেই তাদের জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের ও আপোষের মতবাদের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করবে। যাই হোক, শত্রুপক্ষের ভালর দিকে এই পরিবর্তনটির সাময়িক ও আংশিক প্রকৃতিটিকে আমাদের অবশ্যই হিসেবে ধরতে হবে। আমাদের শত্রু হচ্ছে ধ্বংসের মুখে ধেয়ে চলা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, আর তাদের দ্বারা চীনের জমি দখল সাময়িক। চীনে গেরিলাযুদ্ধের বলিষ্ঠ ক্রমবৃদ্ধি তার দখলীকৃত অঞ্চলকে বাস্তবতঃ সঙ্কীর্ণ এলাকায় সীমিত করে রাখবে। উপরন্তু, জাপান কর্তৃক চীনা ভূখণ্ড দখল করে নেওয়াটা আবার জাপান ও অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে এবং দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করেছে। তাছাড়া, তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশের অভিজ্ঞতায় এটা দেখা গেছে যে, বেশ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জাপান সাধারণতঃ শুধু মূলধন খরচ করবে, কিন্তু সেই সময়ে মুনাফা লাভ করতে পারবে না এ সবই আবার জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব ও আপোষের মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ও চূড়ান্ত বিজয়ের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি ভিত্তি আমাদের হাতে তুলে দেয়।

(৪৩) দ্বিতীয় পর্যায়ে উভয় পক্ষের উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি বিকশিত হতে থাকবে। পরিস্থিতি সম্পর্কে সবিস্তারে ভবিষ্যদ্বাণী করা না গেলেও মোটামুটিভাবে বলা যায় জাপান চলতে থাকবে নিম্নমুখী ধারায় চীন চলতে থাকবে ঊর্ধ্বমুখী ধারায়।[১৭] যেমন, চীনের গেরিলাযুদ্ধে জাপানের সামরিক ও আর্থিক শক্তি ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, জাপানে জনগণের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে, তার সৈন্যদের মনোবলের আরও অবনতি ঘটবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে জাপান আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আর চীনের বেলায়ঃ রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং জনগণের সমাবেশে চীন আরও বেশি অগ্রগতিলাভ করবে; গেরিলাযুদ্ধ আরও বেশি বিকশিত হয়ে উঠবে; দেশের অভ্যন্তরভাগে ক্ষুদ্র

শিল্প ও ব্যাপক কৃষির ভিত্তিতে কিছু মাত্রায় নতুন অর্থনৈতিক উন্নতি দেখা দেবে; আন্তর্জাতিক সমর্থন ক্রমে ক্রমে বাড়বে; এবং এখন যা আছে গোটা পরিস্থিতিটা তার থেকে অনেক ভিন্ন ধরনের হবে। এই দ্বিতীয় পর্যায়টি বেশ লম্বা সময় ধরে চলতে পারে, আর সেই সময়ে শত্রু ও আমাদের শক্তির অনুপাতে একটা বিরাট বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটবে—চীন ক্রমে ক্রমে উঠছে আর জাপান ক্রমে ক্রমে পড়ছে। চীন তার নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবে, কিন্তু জাপান তার উৎকৃষ্ট অবস্থাটি খোয়াবে। প্রথমে দুটি দেশ যথাযথভাবে সমকক্ষ হয়ে উঠবে, আর তারপরে তাদের অগেকার অপেক্ষিক অবস্থা উল্টে যাবে। তারপরে, চীন মোটামুটিভাবে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করে পাল্টা আক্রমণের ও শত্রু বিতাড়নের পর্যায়ে প্রবেশ করবে। এটি বারংবার বলা দরকার যে, নিকৃষ্টতা থেকে উৎকৃষ্টতায় পরিবর্তনে এবং পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতিকে পূর্ণাঙ্গকরণে লাগবে তিনটি জিনিস, যেমন, চীনের নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি, জাপানের অসুবিধাদির বৃদ্ধি এবং চীনের আন্তর্জাতিক সমর্থনের বৃদ্ধি। এইসব শক্তির সংযুক্তই চীনের উৎকৃষ্টতার সৃষ্টি করবে এবং পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে।

(৪৪) চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের অসমতার দরুণ তৃতীয় পর্যায়ে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ তার প্রথমদিকে সারা দেশে একটা একভাবানুসারী ও সমান ছবি উপস্থাপিত করবে না, পরন্তু চরিত্রে তা হবে আঞ্চলিক—এখানে উঠছে, আবার ওখানে পড়ছে। এই পর্যায়ে চীনের যুক্তফ্রন্টকে ভাঙবার জন্য শত্রু তার নানারকম বিভেদকারী কৌশল প্রয়োগের প্রয়াসে ঢিলে দেবে না; তাই, চীনের আভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রাখার কাজটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং এটি আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে যে, রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ যেন আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের দরুন মাঝপথে ভেঙে না পড়ে। এই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটি চীনের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হয়ে উঠবে। আর চীনের কর্তব্য হবে এই ধরনের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটির সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ণ মুক্তি অর্জন এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করা, আবার একই সময়ে এর অর্থ হবে বিশ্বের ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সাহায্য করা।

(৪৫) নিকৃষ্টতা থেকে সমতায় এবং তারপরে সমতা থেকে উৎকৃষ্টতায় চলবে চীন, আর জাপান চলবে উৎকৃষ্টতা থেকে সমতায় এবং তারপরে সমতা থেকে নিকৃষ্টতায়। চীন চলবে প্রতিরক্ষা থেকে ভারসাম্যাবস্থায় এবং তারপরে পাল্টা আক্রমণে, আর জাপান চলবে আক্রমণ থেকে সংরক্ষিতকরণে এবং তারপরে

পশ্চাদপসরণে—এইরকমই হবে চীন-জাপান যুদ্ধের প্রক্রিয়া ও চীন জাপান যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী গতিধারা।

(৪৬) তাই প্রশ্ন ও সিদ্ধান্তগুলি হবে নিম্নরূপ ঃ চীন কি পদানত হবে? উত্তর হচ্ছে ঃ না, চীন পদানত হবে না, পরন্তু সে চূড়ান্ত বিজয়লাভ করবে। চীন কি তাড়াতাড়ি জিততে পারবে? উত্তর হচ্ছে ঃ না, চীন তাড়াতাড়ি জিততে পারবে না, যুদ্ধটি অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হবে। এই সিদ্ধান্তগুলি কি ঠিক? আমি মনে করি এগুলি ঠিক।

(৪৭) এইসব কথা শুনে জাতীয় পরাধীনতার ও আপোষের মতবাদীরা আবার ছুটে এসে বলবে ঃ নিকৃষ্টতা থেকে সমতায় আসতে চীনের দরকার জাপানের সমান সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি; আর সমতা থেকে উৎকৃষ্টতায় আসতে তার দরকার হবে জাপানের থেকে বৃহত্তর সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি; কিন্তু এটা অসম্ভব, তাই উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি ঠিক নয়।

(৪৮) এটা সেই তথাকথিত মতবাদ যে, 'অস্ত্রই সবকিছু নির্ধারণ করে'[১৮], যুদ্ধের প্রশ্নের প্রতি এটা হচ্ছে একটা যান্ত্রিক বিচারদৃষ্টি; একটি আত্মগত ও একতরফা অভিমত। আমাদের অভিমত এই মতের বিপরীত। আমরা শুধুই অস্ত্র দেখি না, উপরন্তু জনশক্তিকে ও দেখি। অস্ত্র হচ্ছে যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু নির্ধারক উপাদান নয়; নির্ধারক উপাদান হচ্ছে মানুষ, বস্তু নয়। শক্তির তুলনা শুধু সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির তুলনাই নয়, বরং জনশক্তি ও নৈতিক শক্তির তুলনা। সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি অপরিহার্যরূপেই মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়। চীনাদের, জাপানীদের ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনগণের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ যদি জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে দাঁড়ায় তাহলে জবরদস্তির মাধ্যমে জাপানের অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি কেমন করে উৎকৃষ্ট হিসেবে গণ্য হতে পারে? তা যদি উৎকৃষ্ট না হয়, তবে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী চীন কি উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে না? কোনই সন্দেহ নেই যে, চীন যদি দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং যুক্তফ্রন্টে অটল থাকে, তাহলে তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে। আর আমাদের শত্রুর বেলায়, দীর্ঘ যুদ্ধের দ্বারা এবং অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় দ্বন্দ্বের দ্বারা সে দুর্বল হয়ে পড়বে, ফলে তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি তখন বিপরীত মুখে পাল্টে যেতে বাধ্য। এই অবস্থায়, চীনের উৎকৃষ্ট হয়ে উঠতে না পারার কি কোন কারণ আছে? আর শুধু এই-ই সব নয়। আপাততঃ আমরা অন্যান্য দেশের সামরিক

ও অর্থনৈতিক শক্তিকে বিরাট পরিমাণে ও প্রকাশ্যে আমাদের শক্তি হিসেবে ধরতে না পারলেও, ভবিষ্যতেও কি পারব না ? জাপানের শত্রু যদি শুধুই চীন না হয়, ভবিষ্যতে যদি এক বা একাধিক অন্য দেশ তাদের বেশ প্রচুর সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা প্রকাশ্যে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষাত্মক কার্যকলাপ কিংবা আক্রমণ চালায় এবং প্রকাশ্যে আমাদের সাহায্য করে, তাহলে আমাদের উৎকৃষ্টতা কি আরও বৃহত্তর হবে না ? জাপান হচ্ছে ছোট দেশ, তার যুদ্ধ হচ্ছে অধঃপতনমুখী ও বর্বর, এবং আন্তর্জাতিকভাবে সে ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে ; চীন হচ্ছে বিরাট দেশ, তার যুদ্ধ হচ্ছে প্রগতিশীল ও ন্যায়সঙ্গত, এবং আন্তর্জাতিকভাবে সে অধিক থেকে অধিকতর সমর্থনলাভ করবে। এইসব উপাদানের দীর্ঘমেয়াদী পরিপুষ্টির ফলে শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার আপেক্ষিক অবস্থাটি নিশ্চিতভাবে পাল্টে না যাবার কোন কারণ আছে কি ?

(৪৯) দ্রুত বিজয়ের মতবাদীরা কিন্তু বোঝে না যে, যুদ্ধ হচ্ছে একটি শক্তির প্রতিযোগিতা। তারা উপলব্ধি করে না যে, যুদ্ধরত উভয় পক্ষের শক্তির অনুপাতে নির্দিষ্ট মাত্রার পরিবর্তন ঘটার আগে রণনীতিগতভাবে নির্ধারক লড়াই করতে ও যথার্থ সময়ের আগে মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করার কোন ভিত্তি নেই। তাদের অভিমতকে কাজে প্রয়োগ করতে হলে আমাদের মাথাগুলি অনিবার্যভাবেই ইঁটের দেওয়ালে ধাক্কা খাবে। অথবা, তারা শুধু মজা করার জন্যই নিছক বক্‌বক্ করছে, তাদের অভিমতটিকে প্রয়োগ করতে প্রকৃতপক্ষে তারা প্রস্তুত নয়। পরিশেষে শ্রীমান বাস্তব মশায় এসে এইসব বাচালদের মাথায় এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবে, তাদের নিছক বাক্যবাগীশ স্বরূপটি ফাঁস করে দেবে—এই বাক্যবাগীশরা শস্তায় কিস্তি মাৎ করতে চায়, কষ্ট ছাড়া কেষ্ট পেতে চায়। এ ধরনের অসার কচকচানি আগেও ছিল, আবার এখনো দেখছি, তবে এখন খুব বেশি নয়। কিন্তু যুদ্ধ যখন বিকশিত হয়ে ভারসাম্যের ও পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে প্রবেশ করবে, তখন এ কচকচানি বেড়ে উঠতে পারে। কিন্তু একই সময়ে, যদি প্রথম পর্যায়ে চীনের ক্ষয়ক্ষতি বেশ গুরুতর হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়টি যদি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়, তাহলে জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্ব ও আপোষের মতবাদ তখন আরও বেশি সোচ্চার হয়ে উঠবে। সুতরাং আমাদের অগ্নিবর্ষণ মুখ্যতঃ জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের ও আপোষের মতবাদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করতে হবে, আর গৌণ অগ্নিবর্ষণের দ্বারা অসার কচকচানির দ্রুত বিজয়ের তত্ত্বের বিরোধিতা করতে হবে।

(৫০) যুদ্ধ যে দীর্ঘস্থায়ী হবে এটা নিশ্চিত, কিন্তু কেউই আগে থেকে বলতে পারে না যে, ঠিক কত মাস ও কত বছর এ যুদ্ধ চলবে। কারণ

এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে শত্রু ও আমাদের শক্তির অনুপাতে পরিবর্তনের মাত্রার ওপরে। যারা যুদ্ধের মেয়াদকে সংক্ষিপ্ত করতে চায়, আমাদের নিজেদের শক্তি বাড়াবার জন্য ও শত্রুর শক্তি হ্রাস করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, একমাত্র পথ হচ্ছে যুদ্ধে বেশি বেশি বিজয় অর্জন করার জন্য এবং শত্রুবাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কঠোর চেষ্টা করা; শত্রু-অধিকৃত এলাকাকে ন্যূনতমে কমিয়ে আনার জন্য গেরিলাযুদ্ধ বিকশিত করে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা; যুক্তফ্রন্টকে সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করার জন্য এবং গোটা দেশের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা; নতুন সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা ও নতুন যুদ্ধশিল্প বিকশিত করে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো; শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও জনগণের অন্যান্য অংশকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালানো; শত্রুবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা ও তাদের সৈন্যদেরকে স্বপক্ষে টানার জন্য চেষ্টা করা; বৈদেশিক সমর্থন ও সাহায্যলাভের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচার চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, এবং জাপানী জনগণের ও অন্যান্য নিপীড়িত জাতির সমর্থনলাভের জন্য চেষ্টা করা। এইসব করেই শুধু আমরা যুদ্ধের মেয়াদকে কমাতে পারি। কোন ঐন্দ্রজালিক সোজা পথ নেই।

কলের করাতের ধরনের যুদ্ধ

(৫১) নিশ্চয়তার সংগে আমরা বলতে পারি, মানবজাতির যুদ্ধ-ইতিহাসে একটি গৌরবময় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পৃষ্ঠা লিখবে এই দীর্ঘস্থায়ী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ। এই যুদ্ধের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরস্পর সংবদ্ধ 'কলের করাত' প্যাটার্ন—একদিকে জাপানের বর্বরতা ও তার সৈন্যশক্তির স্বল্পতা এবং অন্যদিকে চীনের প্রগতিশীলতা ও তার ভূমিসীমার বিশালতা—এইসব পরস্পরবিরোধী উপাদান থেকে উদ্ভূত হচ্ছে এই প্যাটার্ন। কলের করাত প্যাটার্নের যুদ্ধ ইতিহাসেও ঘটেছিল। অক্টোবর বিপ্লবের পরে রাশিয়ার তিন বছরের গৃহযুদ্ধে এ ধরনের অবস্থা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু চীনে কলের করাত প্যাটার্নের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার বিশেষ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক চরিত্র, এইক্ষেত্রে তা ইতিহাসের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে দেবে। এই কলের করাত প্যাটার্নটি নিজেকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করে।

(৫২) **অন্তর্লাইন ও বহির্লাইন।** সামগ্রিকভাবে ধরলে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি লড়া হচ্ছে অন্তর্লাইনে। কিন্তু প্রধান সৈন্যবাহিনী ও

গেরিলাবাহিনীগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের দিক থেকে প্রধান সৈন্যবাহিনী থাকে অন্তর্লাইনে আর গেরিলাবাহিনীগুলি থাকে বহির্লাইনে। এইভাবে এরা শত্রুকে ঘিরে সাঁড়াশির মতো একটি আশ্চর্য দৃশ্য উপস্থাপিত করে। বিভিন্ন গেরিলা অঞ্চলগুলির মধ্যেকার সম্পর্কেও এই একই কথা বলতে পারা যায়। তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, প্রতিটি গেরিলা অঞ্চল হচ্ছে অন্তর্লাইনে এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলি হচ্ছে বহির্লাইনে। তারা সবাই মিলে বহু ব্যূহমুখ গড়ে তোলে আর সেগুলি শত্রুকে সাঁড়াশির মধ্যে ধরে রাখে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে, রণনীতিগতভাবে অন্তর্লাইনে লড়াইরত নিয়মিত বাহিনী পশ্চাদপসরণ করছে ; কিন্তু রণনীতিগতভাবে বহির্লাইনে লড়াইরত গেরিলাবাহিনীগুলি ব্যাপকভাবে শত্রুর পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় বিরাট পদক্ষেপে এগিয়ে চলবে, দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও বেশি প্রচণ্ডভাবে তারা এগুবে, আর এইভাবে দেখা যাবে পশ্চাদপসরণ ও অগ্রগমনের উভয়েরই এক আশ্চর্য ছবি।

(৫৩) **পশ্চাদ্বর্তী এলাকা থাকা ও না-থাকা**। প্রধান সৈন্যবাহিনী দেশের মূল পশ্চাদ্বর্তী এলাকার ওপর নির্ভর করে যুদ্ধরেখাকে শত্রু-অধিকৃত এলাকার সবচেয়ে অগ্রভাগের সীমা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে দেয়। আর দেশের মূল পশ্চাদ্বর্তী এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেরিলাবাহিনীগুলি যুদ্ধরেখাকে শত্রুর পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় সম্প্রসারিত করে দেয়। কিন্তু প্রত্যেকটি গেরিলা অঞ্চলে গেরিলাবাহিনীর নিজস্ব একটা ছোট পশ্চাদ্বর্তী এলাকা থাকে, এবং এর ওপর নির্ভর করেই গেরিলাবাহিনী অস্থায়ী যুদ্ধরেখা গড়ে তোলে। নিজ নিজ এলাকার শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে স্বল্পমেয়াদী সামরিক কার্যকলাপ চালাবার জন্য প্রতিটি গেরিলা অঞ্চল কর্তৃক প্রেরিত গেরিলাবাহিনীগুলির ব্যাপার হচ্ছে স্বতন্ত্র। তাদের না থাকে কোন পশ্চাদ্বর্তী এলাকা, না থাকে যুদ্ধরেখা। নতুন যুগে যেখানেই সুবিশাল ভূমিসীমা, প্রগতিশীল জনগণ, অগ্রসর রাজনৈতিক পার্টি ও সৈন্যবাহিনী দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে বিপ্লব যুদ্ধের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'পশ্চাদ্ভূমিহীন লড়াই চালানো।' এতে ভয়ের কিছুই নেই, বরং লাভের অনেক কিছু আছে। এ সম্পর্কে সন্দেহ রাখা উচিত নয়, বরং এটাকে চালু করার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত।

(৫৪) **পরিবেষ্টন ও প্রতি-পরিবেষ্টন**। যুদ্ধকে সামগ্রিকভাবে ধরলে কোন সন্দেহই থাকে না যে, রণনীতিগতভাবে আমরা শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত, কারণ শত্রু রণনীতিগত আক্রমণ চালাচ্ছে এবং বহির্লাইনে সামরিক কার্যকলাপ চালাচ্ছে, আর আমরা রণনীতিগত প্রতিরক্ষায় লিপ্ত এবং অন্তর্লাইনে সামরিক কার্যকলাপ চালাচ্ছি। এটি হচ্ছে শত্রু দ্বারা আমাদেরকে পরিবেষ্টন করার প্রথম রূপ।

বিভিন্ন পথ ধরে আমাদের ওপরে আক্রমণে অগ্রসরমান এক বা অধিক শত্রুকলামকে আমরাও আমাদের দিক থেকে পরিবেষ্টন করতে পারি, কারণ রণনীতিগতভাবে বহির্লাইন থেকে বিভিন্ন পথ ধরে অগ্রসরমান এইসব শত্রুকলামগুলির বিরুদ্ধে সংখ্যাগতভাবে উৎকৃষ্ট সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করে যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ব্যাপারে বহির্লাইন থেকে সামরিক কার্যকলাপ চালাবার নীতি আমরা কাজে লাগাই। শত্রুকে প্রতি-পরিবেষ্টন করার এই হচ্ছে আমাদের প্রথম রূপ। তারপর, পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি এলাকাগুলির কথা আমরা যদি বিবেচনা করি—প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন ঘাঁটি এলাকাকে পৃথক পৃথক করে ধরলে সেগুলি উতাই পার্বত্য অঞ্চলের মতো চারিদিক থেকে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত, অথবা উত্তর-পশ্চিম শানসী এলাকার মতো তিনদিক থেকে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। শত্রুর পরিবেষ্টনের এটা হচ্ছে দ্বিতীয় রূপ। কিন্তু, যদি সবগুলি গেরিলা ঘাঁটি এলাকাকে একত্রে ধরা হয় এবং যদি নিয়মিত বাহিনীর অবস্থানক্ষেত্রের সংগে সমস্ত গেরিলা ঘাঁটি এলাকাকে একসংগে মিলিয়ে বিচার হয়, তাহলে দেখা যায়, আমরাও আমাদের দিক থেকে শত্রুর বেশ অনেকগুলি বাহিনীকে পরিবেষ্টন করে থাকি। যেমন, শানসী প্রদেশে আমরা তাতুং-পুচৌ রেলপথটিকে (পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বদেশ ও দক্ষিণ প্রান্ত) তিন দিক দিয়ে এবং তাইয়ুয়ান শহরটিকে চার দিক দিয়ে ঘিরে ধরেছি; আবার হোপেই ও শানতুং প্রদেশে এইরকম পরিবেষ্টনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এটি হচ্ছে আমাদের শত্রুকে প্রতি-পরিবেষ্টনের দ্বিতীয় রূপ। এইভাবে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টনের দুটি রূপ আর আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টনের দুটি রূপ আছে, এ যেন ওয়েইছী দাবা খেলার মতো। শত্রু ও আমাদের দুই পক্ষের চালিত যুদ্ধাভিযান ও লড়াইগুলি যেন ওয়েইছী দাবা খেলায় পরস্পরের 'ঘুঁটিগুলি দখল করে নেবার' মতো, আর শত্রু কর্তৃক সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন (যেমন তাইয়ুয়ান শহর) ও আমাদের গেরিলা ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা (যেমন উতাই পার্বত্য অঞ্চল) যেন ওয়েইছী দাবা খেলায় 'ফাঁকা ঘর স্থাপন' করার মতো। যদি দুনিয়াকেই ওয়েইছী দাবা খেলার ক্ষেত্র হিসেবে ধরা হয় তাহলে আমাদের ও শত্রুর মধ্যে পরিবেষ্টনের আরও একটি তৃতীয় রূপ দেখা দেবে, যথা আগ্রাসী ফ্রন্ট ও শান্তিফ্রন্টের মধ্যেকার পরস্পর সম্পর্ক। শত্রু তার আগ্রাসী ফ্রন্ট দিয়ে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশগুলোকে পরিবেষ্টন করে, আর আমরা আমাদের শান্তিফ্রন্ট দিয়ে প্রতি-পরিবেষ্টন করি জার্মানি, জাপান ও ইতালীকে। কিন্তু বুদ্ধের হাতের মতো আমাদের পরিবেষ্টনও বিশ্বের

এপাশে-ওপাশে অবস্থানরত পঞ্চভূত পর্বত হয়ে উঠবে আর আধুনিক সুন উ-খোংরা—ফ্যাসিবাদী আক্রমণকারীরা, পরিশেষে তার তলায় চাপা পড়ে যাবে আর কোনদিনই তার তলা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।[১৯] সুতরাং, আমরা যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনকে একটি রণনীতিগত ইউনিট হিসেবে নিয়ে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সম্ভাব্য দেশগুলোর প্রত্যেককে একটি রণনীতিগত ইউনিট হিসেবে নিয়ে এবং আরেকটি রণনীতিগত ইউনিট হিসেবে জাপানের গণআন্দোলনকে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি জাপ-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারি, এবং এইভাবে যদি আমরা এমন একটি বিরাট জাল রচনা করতে পারি, যার থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ আর ফ্যাসিবাদী সুন উ-খোংরা পেতে পারে না, তাহলে সেটাই হবে শত্রুর বিনাশের দিন। বস্তুতঃ, যেদিন এই বিরাট জালটি মোটামুটি রচিত হবে, নিঃসন্দেহে সেইদিনটি হবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ উৎখাতের দিন। এটা মোটেই ঠাট্টা নয়, বরং এই-ই হচ্ছে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী গতিধারা।

(৫৫) **বড় এলাকা ও ছোট এলাকা।** এ সম্ভাবনা আছে যে, চীনের মূল ভূখণ্ডের বৃহত্তর অংশ শত্রু দখল করে নেবে, এবং শুধু ক্ষুদ্রতর অংশটি অক্ষত থাকবে। এটা হচ্ছে পরিস্থিতির এক দিক। কিন্তু তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশ ছাড়া, শত্রু-অধিকৃত এই বৃহত্তর অংশের মধ্যে আসলে শত্রু শুধু বড় বড় শহর, প্রধান যোগাযোগ পথ ও কোন কোন সমতল এলাকা অধিকার করে রাখতে পারে। গুরুত্বের দিক থেকে এগুলি সবই প্রথমশ্রেণীর হলেও, আয়তনে ও জনসংখ্যায় এগুলি সম্ভবতঃ শুধু শত্রু-অধিকৃত এলাকার ক্ষুদ্রতর অংশ; আর শত্রু-অধিকৃত এলাকার বৃহত্তর অংশটি হবে গেরিলা এলাকা, যা সর্বত্রই প্রসারিত হবে। এটি হচ্ছে পরিস্থিতির অপর একটি দিক। চীনের মূল ভূখণ্ডকে ছাড়িয়ে গিয়ে আমরা যদি মঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং, সিংহাই ও তিব্বতকে হিসেবে ধরি, তাহলে অনধিকৃত এলাকাই হবে চীনা ভূখণ্ডের বৃহত্তর অংশ আর তিনটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশকে হিসেবে ধরলেও শত্রু-অধিকৃত এলাকা হবে ক্ষুদ্রতর অংশ। পরিস্থিতির এও হচ্ছে আর একটি দিক। অক্ষত এলাকাটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, এবং তার বিকাশসাধনের জন্য আমাদের প্রভূত প্রচেষ্টা চালাতে হবে; শুধু যে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই তার বিকাশসাধন করতে হবে তাই নয়, উপরন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তার বিকাশসাধন করতে হবে এবং সেটিও হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। শত্রু আমাদের আগেকার সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলিকে সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকায় পরিণত করেছে, এবং আমাদের

উচিত আগেকার সংস্কৃতিগতভাবে পশ্চাৎপদ এলাকাগুলিকে সংস্কৃতি-কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা। সেই একই সময়ে শত্রু পশ্চাদ্ভাগে ব্যাপক গেরিলা এলাকার বিকাশসাধনের কাজটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন দিক দিয়ে তার বিকাশসাধন করতে হবে তার সাংস্কৃতিক কার্যের বিকাশসাধনও করতে হবে। এক কথায় বলা যায় যে, চীনা ভূখণ্ডের বিরাট বিরাট অংশগুলি অর্থাৎ গ্রামীণ এলাকা প্রগতিশীল ও উজ্জ্বল অঞ্চলে রূপান্তরিত হবে, আর ছোট ছোট অংশগুলি অর্থাৎ শত্রু-অধিকৃত এলাকাগুলি, বিশেষ করে বড় বড় শহর, সাময়িকভাবে হয়ে পড়বে পশ্চাৎপদ ও অন্ধকারময় অঞ্চল।

(৫৬) কাজেই এটা দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক-বিস্তৃত জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে একটি কলের করাতের প্যাটার্নের যুদ্ধ। যুদ্ধের ইতিহাসে এটি হচ্ছে একটি আশ্চর্য দৃশ্য, চীনা জাতির এক শৌর্যদৃপ্ত কীর্তিকলাপ এবং বিশ্ব—আলোড়নকারী মহান কার্য। এ যুদ্ধ যে শুধু চীন আর জাপানকেই প্রভাবান্বিত করবে, শুধু যে এই দুই দেশকেই এগিয়ে চলার জন্য বলিষ্ঠভাবে অনুপ্রাণিত করবে তা-ই নয় উপরন্তু গোটা দুনিয়াকেও, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো উৎপীড়িত দেশগুলিকেও এগিয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করবে। প্রতিটি চীনা লোকের উচিত সচেতনভাবে কলের করাত প্যাটার্নের এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া, এটাই হচ্ছে নিজেকে মুক্ত করার জন্য চীনা জাতির যুদ্ধের রূপরীতি, এটাই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর ও ৪০-এর দশকের যুগে একটি বিরাট আধাঔপনিবেশিক দেশের দ্বারা চালিত মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ রূপরীতি।

চিরস্থায়ী শান্তির জন্য যুদ্ধ করা

(৫৭) চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতিটি চীনের ও গোটা দুনিয়ার চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের সংগ্রামের সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। কোন ঐতিহাসিক কালেই যুদ্ধ আজকের মতো চিরস্থায়ী শান্তির এত নিকটবর্তী হয়নি। শ্রেণীসমূহের আবির্ভাবের ফলে কয়েক হাজার বছর ধরে মানবজাতির জীবনটি যুদ্ধে ভরপুর হয়ে রয়েছে ; কতই না যুদ্ধ লড়েছে প্রতিটি জাতি ; যুদ্ধ ঘটেছে একটি জাতির ভেতরে কিংবা বিভিন্ন জাতির মধ্যে। পুঁজিবাদী সমাজের সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধগুলি চালানো হয় বিশেষ ধরনের ব্যাপক মাত্রায় ও একটা বিশেষ নির্মমতার সংগে। বিশ বছর আগের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধটি ছিল ইতিহাসে অভূতপূর্ব, কিন্তু সেটিই শেষ যুদ্ধ নয়।

যে যুদ্ধ এখন শুরু হয়েছে, শুধু সেই শেষ যুদ্ধ হবার কাছাকাছি আসে, অর্থাৎ মানবজাতির চিরস্থায়ী শান্তির কাছাকাছি আসে। এ পর্যন্ত বিশ্ব জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। দেখুন ঃ ইতালী ও জাপান, আবিসিনিয়া আর স্পেন, তারপর চীন। যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলির জনসংখ্যা প্রায় ৬০ কোটির অঙ্কে উঠেছে, অর্থাৎ সারা দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বর্তমান যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে তার চিরস্থায়ী শান্তির সংগে তার নৈকট্য। এ যুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন কেন? আবিসিনিয়ার সংগে যুদ্ধ করার পরে ইতালী স্পেনের সংগে যুদ্ধ করল, আর এই যুদ্ধে যোগ দিল জার্মানি। তারপরে জাপান আক্রমণ করল চীনকে। তারপরে কাদের পালা? নিঃসন্দেহে বলা যায়, হিটলার বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সংগে যুদ্ধ করবে। 'ফ্যাসিবাদই হচ্ছে যুদ্ধ'[২০]—এ কথাটি পুরোপুরি সত্য। বর্তমান যুদ্ধ একটি বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ায় যুদ্ধের বিরতি থাকবে না; মানবজাতি যুদ্ধের বিপর্যয়কে এড়াতে পারবে না। তাহলে আমরা কেন বলছি যে, বর্তমান যুদ্ধ চিরস্থায়ী শান্তির কাছাকাছি? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিশ্ব-পুঁজিবাদের যে সাধারণ সঙ্কট শুরু হয়েছিল তারই বিকাশের ভিত্তিতে ঘটেছে বর্তমান এ যুদ্ধটি। এই সাধারণ সঙ্কটই পুঁজিবাদী দেশগুলিকে একটি নতুন যুদ্ধের মুখে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, আর সর্বপ্রথম, ফ্যাসিবাদী দেশগুলিকে নতুন দুঃসাহসিক যুদ্ধের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা আগে থেকেই বলতে পারি যে, এ যুদ্ধের ফলে পুঁজিবাদ পরিত্রাণ পাবে না, পরন্তু সে ধ্বংসের মুখে যাবে। বিশ বছর আগের যুদ্ধের তুলনায় এ যুদ্ধটি হবে আরও বিরাট ও আরও বেশি নির্মম; সকল জাতিকেই অনিবার্যভাবে এ যুদ্ধে টেনে নামানো হবে, দীর্ঘদিন ধরে চলবে এ যুদ্ধ, আর মানবজাতি প্রভূত দুঃখদুর্দশা ভোগ করবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব ও সারা দুনিয়ার জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার উন্নতির ফলে এই যুদ্ধ থেকে নিঃসন্দেহে উদ্ভূত হবে মহান বিপ্লবী যুদ্ধসমূহ.....উদ্ভূত হবে যাবতীয় প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য; আর এইভাবে সেগুলি বর্তমান যুদ্ধকে চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য সংগ্রামের চরিত্র দেবে। পরে যদি আর একটি যুদ্ধের যুগও আসে, তাহলেও চিরস্থায়ী বিশ্বশান্তি আর বেশি দূরে নয়। মানবজাতি একবার যদি পুঁজিবাদকে বিলোপ করে দেয়, তাহলে সে চিরস্থায়ী শান্তির যুগে পৌঁছে যাবে এবং তখন যুদ্ধের আর কোন দরকারই থাকবে না। কি সৈন্যবাহিনী, কি যুদ্ধজাহাজ, কি সামরিক বিমানপোত, কি বিষাক্ত গ্যাস—এ সবের কিছুরই তখন আর কোন দরকার হবে না। তারপর থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত মানবজাতি আর কোনদিনই যুদ্ধ দেখতে পাবে না। ইতিমধ্যে যে বিপ্লবী যুদ্ধগুলি শুরু

হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য চালিত যুদ্ধের অংশ। চীন ও জাপানের মিলিত জনসংখ্যা হচ্ছে ৫০ কোটির ওপরে। চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য চালিত এই যুদ্ধে চীন-জাপান যুদ্ধটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করবে, আর এর থেকেই আসবে চীনা জাতির মুক্তি। ভবিষ্যতের মুক্ত নয়া চীন হবে ভবিষ্যতের মুক্ত নয়া দুনিয়ার থেকে অবিচ্ছেদ্য। তাই আমাদের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি চিরস্থায়ী শান্তি অর্জনের যুদ্ধের চরিত্র বহন করে।

(৫৮) ইতিহাসে যুদ্ধ দুরকম: একটা ন্যায় যুদ্ধ, আর একটা অন্যায় যুদ্ধ। যেসব যুদ্ধ প্রগতিশীল সেসবই ন্যায় যুদ্ধ, আর যেসব যুদ্ধ প্রগতিকে বাধা দেয় সেসবই হচ্ছে অন্যায় যুদ্ধ। যেসব অন্যায় যুদ্ধ, প্রগতিকে ব্যাহত করে, আমরা কমিউনিস্টরা সে সবেরই বিরোধিতা করি, কিন্তু প্রগতিশীল ন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করি না। আমরা কমিউনিস্টরা ন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা তো করিই না, বরং সেসব যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। অন্যায় যুদ্ধ, ধরা যাক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দুপক্ষই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে এ যুদ্ধে লড়ল, তাই সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টরা দৃঢ়ভাবে এই যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। বিরোধিতা করার পদ্ধতি হচ্ছে যুদ্ধ বেধে যাবার আগেই তাকে বাধাদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করা; যুদ্ধ বেধে যাবার পর যথাসম্ভব যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধের বিরোধিতা করা, ন্যায় যুদ্ধ দিয়ে অন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করা। জাপানের যুদ্ধ হচ্ছে অন্যায় যুদ্ধ, তা প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। আর জাপানী জনগণ সমেত সারা দুনিয়ার জনগণের উচিত এ যুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং তাঁরা তার বিরোধিতা করছেনও। আমাদের দেশে জনগণ ও সরকার, কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙ—সবাই ন্যায়ের পতাকা তুলে ধরে আক্রমণবিরোধী জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ চালাচ্ছে। আমাদের যুদ্ধ পবিত্র ও ন্যায়সঙ্গত; এ যুদ্ধ প্রগতিশীল আর তার লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি। লক্ষ্য যে শুধু একটিমাত্র দেশেরই শান্তি তা নয়, সারা দুনিয়ার শান্তি, শুধুমাত্র সাময়িক শান্তি নয়, চিরস্থায়ী শান্তি। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের অবশ্যই জীবন-মরণ সংগ্রাম করতে হবে, যে-কোন আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে এবং লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই থামা চলবে না। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আত্মত্যাগ যত বড়ই হোক না কেন, যত দীর্ঘ সময়ই লাগুক না কেন, চিরস্থায়ী শান্তি ও চিরস্থায়ী ঔজ্জ্বল্যের নতুন এক দুনিয়া ইতিমধ্যেই আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে প্রসারিত রয়েছে। এই যুদ্ধ চালনায় আমাদের আস্থা স্থাপিত রয়েছে চিরস্থায়ী শান্তি ও চিরস্থায়ী ঔজ্জ্বল্যের নয়া

চীন ও নয়া দুনিয়া অর্জনের ওপরে। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ চায় যুদ্ধকে অনন্তকাল পর্যন্ত জীইয়ে রাখতে, আর আমরা চাই অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবজাতির বিরাট সংখ্যাগুরু অংশকে পরম প্রয়াস চালাতে হবে। চীনের ৪৫ কোটি মানুষ দুনিয়ার জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। আমরা যদি একযোগে প্রচেষ্টা চালিয়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করি এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়া চীন সৃষ্টি করি, তাহলে আমরা নিঃসন্দেহেই বিশ্বের চিরস্থায়ী শান্তির জন্য সংগ্রামে অত্যন্ত বিরাট অবদান যোগাব। এটা কোন অলীক আশা নয়, সমগ্র বিশ্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের গতি ইতিমধ্যেই এদিকে এগিয়ে চলেছে; এবং মানবজাতির সংখ্যাগুরু অংশ চেষ্টা করলে এই লক্ষ্য নিশ্চয়ই কয়েক দশকের মধ্যেই অর্জিত হবে।

যুদ্ধে মানুষের কর্মতৎপরতা

(৫৯) এ পর্যন্ত আমরা এটাই ব্যাখ্যা করেছি যে, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেন এবং কেন চূড়ান্ত বিজয় চীনের হবে, আমরা মুখ্যতঃ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কি এবং কি নয় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা কি করতে হবে এবং কি করা উচিত নয়—এই প্রশ্ন নিয়ে পর্যালোচনা করব। কি করে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাতে হয় এবং কেমন করেই-বা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা যায় ? এইসব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে নীচে। এর জন্য আমরা যথাক্রমে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির আলোচনা করবঃ যুদ্ধে মানুষের কর্মতৎপরতা, যুদ্ধ ও রাজনীতি, প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক সক্রিয়করণ, যুদ্ধের উদ্দেশ্য, প্রতিরক্ষার মধ্যে আক্রমণ, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই, অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই, উদ্যোগ, নমনীয়তা, পরিকল্পনা, চলমান যুদ্ধ, গেরিলাযুদ্ধ, অবস্থানগত যুদ্ধ নির্মূলীকরণের যুদ্ধ, শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ, শত্রুর ভুলত্রুটির সুযোগ নেওয়ার সম্ভাব্যতা, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নির্ধারক লড়াইয়ের প্রশ্ন, এবং জয়ের ভিত্তি হচ্ছে সৈন্যবাহিনী ও জনগণ। এখন মানুষের কর্মতৎপরতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।

(৬০) আমরা যখন বলি যে, আমরা সমস্যা সম্পর্কে আত্মমুখী বিচারদৃষ্টি রাখার বিরোধিতা করি, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে, আমাদের অবশ্যই কোন কোন লোকের এমন ভাবনাচিন্তার বিরোধিতা করতে হবে যা বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং তার সংগে খাপ খায় না, যা হচ্ছে অলীক কল্পনা এবং মিথ্যা যুক্তি; আর সেগুলি অনুসারে কাজ করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। কিন্তু যা কিছু করবার, তা তো মানুষের দ্বারাই করতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও চূড়ান্ত বিজয় মানুষের চেষ্টা ছাড়া সংঘটিত হবে না। এ ধরনের কাজকে

সুসম্পন্ন করতে হলে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা বাস্তব ঘটনা থেকে ধারণা, যুক্তি ও অভিমত আহরণ করে, এবং পরিকল্পনা, কর্মপন্থা, নীতি, রণনীতি ও রণকৌশল উপস্থাপিত করে। ধারণা প্রভৃতি হচ্ছে আত্মগত জিনিস, কিন্তু কার্যকরণ বা কার্যকলাপ হচ্ছে আত্মগত জিনিসের বাস্তবে রূপায়ণ। এগুলি সবই হচ্ছে মানুষের বিশিষ্ট কর্মতৎপরতা। এ ধরনের কর্মতৎপরতাকে আমরা 'মানুষের সচেতন কর্মতৎপরতা' বলে থাকি। আর এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা অন্য সমস্ত কিছু থেকে মানুষকে পৃথক করে দেয়। বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তার সংগে সংগতিপূর্ণ সমস্ত ধারণাই হচ্ছে সঠিক ধারণা, আর সঠিক ধারণার ওপরে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত কার্যকরণ বা কার্যকলাপই হচ্ছে সঠিক কার্যকলাপ। এই ধরনের ধারণাকে ও কার্যকলাপকে এবং এই ধরনের সচেতন কর্মতৎপরতাকে আমাদের অবশ্যই বিকশিত করে তুলতে হবে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি চালানো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে দেবার জন্য এবং পুরানো চীনকে একটা নতুন চীনে রূপান্তরিত করার জন্য। এই লক্ষ্যটি যাতে অর্জিত হয়, তার জন্য অবশ্যই সমগ্র চীনের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তাঁদের সচেতন কর্মতৎপরতাকে অবশ্যই পুরোপুরিভাবে বিকশিত করতে হবে। আমরা যদি শুধু বসে থাকি, কোন কাজ না করি, তাহলে শুধু স্বদেশের পতনই হবে তার ফলশ্রুতি, তাতে না হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, না আসবে চূড়ান্ত বিজয়।

(৬১) সচেতন কর্মতৎপরতা হচ্ছে মানবজাতির বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধে এই বৈশিষ্ট্যকে মানুষ প্রচণ্ডভাবে প্রদর্শন করে থাকে। এটা সত্য যে, উভয় পক্ষের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা, যুদ্ধের চরিত্রের দ্বারা এবং আন্তর্জাতিক সমর্থনের দ্বারা নির্ধারিত হয় যুদ্ধের জয় অথবা পরাজয়; কিন্তু শুধুমাত্র এ সবের দ্বারাই তা নির্ধারিত হয় না। এ সবগুলি শুধু জয় বা পরাজয়ের সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করে, কিন্তু জয় বা পরাজয়ের প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসা তারা নিজেরা করে না। জয় বা পরাজয়ের নিষ্পত্তিকরণে আত্মগত প্রচেষ্টাকেও অবশ্যই যোগ করে নিতে হবে। এটা হচ্ছে যুদ্ধের পরিচালনা ও যুদ্ধ-চালনা, অর্থাৎ যুদ্ধে মানুষের সচেতন কর্মতৎপরতা।

(৬২) যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁরা বাস্তব অবস্থার দ্বারা অনুমোদিত সীমা লংঘন করে যুদ্ধে জয়লাভের আশা করতে পারেন না, কিন্তু বাস্তব অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে উদ্যোগের সংগে যুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টা করতে পারেন, এবং তা অবশ্যই করতে হবে। যুদ্ধ পরিচালকদের ক্রিয়ামঞ্চকে অবশ্যই বাস্তব অবস্থায় সম্ভাবনার ওপরে গড়ে উঠতে হবে, কিন্তু তাঁরা এই

মঞ্চের ওপর শব্দ, বর্ণ, শক্তি ও আড়ম্বরময় অনেক নাট্যানুষ্ঠানই পরিচালনা করতে পারেন। নির্দিষ্ট বাস্তবমুখী বস্তুগত ভিত্তির ওপরে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পরিচালকদের উচিত তাঁদের পরাক্রমকে কাজে লাগানো, সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে পরিচালিত করে জাতীয় শত্রুকে ধ্বংস করা, আমাদের এই আক্রান্ত ও নিপীড়িত সমাজ ও দেশের পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়া এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়া চীন সৃষ্টি করা। এখানেই আমাদের আত্মগত পরিচালনার সামর্থ্য কাজে লাগে এবং অবশ্যই তাকে কাজে লাগাতে হবে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের কোন কম্যাণ্ডারকেই নিজেকে বাস্তব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে গোঁয়ারগোবিন্দের মতো বেপরোয়া ব্যক্তি হতে আমরা অনুমতি দেব না ; কিন্তু আমাদের অবশ্যই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রত্যেকটি কম্যাণ্ডারকে উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে তাঁরা সাহসী ও বিচক্ষণ সেনাপতি হয়ে ওঠেন। তাঁদের যে শুধু শত্রুকে দাবিয়ে রাখার সাহসই থাকবে তাই নয়, পরন্তু সমগ্র যুদ্ধের পরিবর্তন ও বিকাশকে পরিচালনার সামর্থ্যও তাঁদের থাকতে হবে। যুদ্ধের মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়ে কম্যাণ্ডারের অবশ্যই হাবুডুবু খাওয়া চলবে না, বরং দৃঢ়চিত্তে সুবিবেচিত টানে টানে ওপারে পৌঁছানো উচিত। যুদ্ধ পরিচালনার নিয়ম হিসেবে রণনীতি ও রণকৌশলই হচ্ছে যুদ্ধের মহাসাগরে সাঁতরানোর কলাকৌশল।

যুদ্ধ ও রাজনীতি

(৬৩) 'যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ'। এই অর্থে যুদ্ধই হচ্ছে রাজনীতি এবং যুদ্ধ নিজেই রাজনৈতিক প্রকৃতির কার্যকলাপ। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে এমন একটা যুদ্ধও ঘটেনি, যার কোন রাজনৈতিক প্রকৃতি ছিল না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটি হচ্ছে গোটা জাতির বিপ্লবী যুদ্ধ আর তার বিজয় হচ্ছে যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে অর্থাৎ জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়া চীন গড়ে তোলা থেকে অবিচ্ছেদ্য, প্রতিরোধ-যুদ্ধে ও যুক্তফ্রন্টে অটলভাবে প্রচেষ্টা চালানোর সাধারণ নীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য, গোটা দেশের জনগণের সমাবেশ থেকে, অফিসার ও সৈনিকদের ঐক্য, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ঐক্য এবং শত্রুবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি রাজনৈতিক নীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য, আর অবিচ্ছেদ্য যুক্তফ্রন্ট নীতির কার্যকরী প্রয়োগ থেকে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সমাবেশ থেকে এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন ও জাপানের ভেতরকার জনগণের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা থেকে। এক কথায়, ক্ষণকালের জন্যও যুদ্ধকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন

করতে পারা যায় না। জাপ-বিরোধী সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে যদি রাজনীতিকে তুচ্ছ করে দেখার ঝোঁক থাকে, রাজনীতি থেকে যুদ্ধকে বিচ্ছিন্ন করে যুদ্ধের ধারণাটি চরম হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা থাকে, তাহলে এটা ভুল বলে মনে করা উচিত এবং শুধরে নেওয়া উচিত।

(৬৪) কিন্তু যুদ্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে, এবং এই অর্থে যুদ্ধ সাধারণ রাজনীতির সমান নয়। 'যুদ্ধ হচ্ছে অন্য.....উপায়ে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ'।[২১] রাজনীতি যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায় বিকাশলাভ করে এবং আগের মতো আর এগুতে পারে না, তখন যুদ্ধ বাধে রাজনৈতিক পথের বাধাকে ঝেঁটিয়ে দূর করার জন্য। ধরা যাক, চীনের আধা-স্বাধীন অবস্থা ছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক বিকাশের পথের বাধা, তাই জাপান সেই বাধাকে ঝেঁটিয়ে দূর করার জন্য এই আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করেছে। আর চীনের ব্যাপারটা কি ? চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অনেকদিন থেকেই বাধা হয়ে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়ন ; তাই এ বাধাটাকে ঝেঁটিয়ে দূর করার প্রয়াসে অনেকবার মুক্তিযুদ্ধ চালানো হয়েছে। চীনকে উৎপীড়ন করে চীনা বিপ্লবের গতি পথকে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করার জন্য জাপান এখন যুদ্ধকে ব্যবহার করছে, তাই এই বাধাকে ঝেঁটিয়ে দূর করার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে চীন বাধ্য হয়েছে এই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাতে। বাধা যখন দূর হয় এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য যখন অর্জিত হয়, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বাধা পুরোপুরি দূর না হলে যুদ্ধ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যেতেই হবে, যাতে পুরোপুরি লক্ষ্য অর্জিত হয়। যেমন, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের কাজ সম্পন্ন হবার আগেই যদি কেউ আপোষের চেষ্টা করে, তাহলে ব্যর্থ হতে সে বাধ্য ; কারণ কোন-না-কোন কারণে একটা আপোষ-রফা হলেও যুদ্ধ আবার বেধে উঠবেই, ব্যাপক জনসাধারণ বশ্যতা স্বীকার করবেন তো না-ই, পরন্তু তাঁদের যুদ্ধের রাজনৈতিক লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। অতএব, এ কথা বলা যেতে পারে, যে, রাজনীতি হচ্ছে রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি।

(৬৫) যুদ্ধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত হয় যুদ্ধের একটা বিশেষ সংগঠনব্যবস্থা, একটা বিশেষ পদ্ধতিমালা ও এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া। এই সংগঠন হচ্ছে সৈন্যবাহিনী ও তার সংগে জড়িত সব কিছু। এ পদ্ধতি হচ্ছে যুদ্ধ-পরিচালনার রণনীতি ও রণকৌশল। আর এই প্রক্রিয়া হচ্ছে সামাজিক কার্যকলাপের এক বিশেষ রূপরীতি যার মধ্যে যুদ্ধ রত সৈন্যবাহিনীগুলি নিজেদের পক্ষে অনুকূল ও শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগ করে একে অপরকে

আক্রমণ করে অথবা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরক্ষা করে। তাই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা। যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের সবাইকে অবশ্যই প্রথাগত অভ্যাস থেকে নিজেদের মুক্ত করে দিতে হবে আর যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেদের অভ্যস্ত করে নিতে হবে, এবং শুধু এইভাবেই তারা যুদ্ধ জয়লাভ করতে পারবে।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক সমাবেশ

(৬৬) এত মহান একটা জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ ব্যাপক ও সুগভীর রাজনৈতিক সমাবেশ ছাড়া জিততে পারা যায় না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের আগে জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য কোন রাজনৈতিক সমাবেশ ছিল না ; এটি ছিল চীনের বিরাট একটা ত্রুটি ; এইভাবে চীন ইতিমধ্যেই শত্রুর কাছে একটা চালে হেরে গেছে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার পরেও রাজনৈতিক সমাবেশ ব্যাপক হওয়া থেকে বহু দূরে ছিল, সুগভীর হওয়া তো আরও দূরের কথা। জনসাধারণের বিরাটতম অংশ শত্রুর কামানের গোলার আগুন আর তার বিমানবাহিনীর বর্ষিত বোমা থেকেই যুদ্ধের খবর পেয়েছিল। সেটাও এক রকমের সমাবেশ, কিন্তু আমাদের হয়ে সেটি করেছিল শত্রু, আমরা নিজেরা সেটি করিনি। কামানের গোলার দুমদাম শব্দের নাগালের বাইরে দূরান্তবর্তী অঞ্চলের লোকজন এখনো আগের মতোই অচঞ্চলভাবে দিন কাটাচ্ছে। এ পরিস্থিতিকে অবশ্যই পরিবর্তিত করতে হবে, অন্যথায় এই জীবন-মরণ যুদ্ধে আমরা জিততে পারব না। শত্রুর কাছে আর কোনদিনই যেন কোন চালে আমরা অবশ্যই না হারি ; বরং-এর ঠিক বিপরীতে, শত্রুকে পরাজিত করার জন্য যেন আমরা অবশ্যই এই চালের—রাজনৈতিক সমাবেশের পূর্ণ ব্যবহার করি। এ চালটির গুরুত্ব অত্যন্ত বিরাট ; বস্তুতঃই এটির গুরুত্ব হচ্ছে প্রথমশ্রেণীর, আর শত্রুর তুলনায় অস্ত্রশস্ত্রাদিতে আমাদের নিকৃষ্টতা হচ্ছে গৌণ। সারা দেশের সাধারণ মানুষের সমাবেশ সাধিত হল শত্রুকে ডুবিয়ে মারার মতো একটি বিরাট সমুদ্রের সৃষ্টি হবে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্রাদির নিকৃষ্টতার ক্ষতিটা পূরণ করার শর্তের সৃষ্টি হবে এবং যুদ্ধের সমস্ত অসুবিধাকে দূর করার পূর্বশর্তের সৃষ্টি হবে। জয়লাভের জন্য আমাদের অবশ্যই অটলভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, এবং অটলভাবে যুক্তফ্রন্ট ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এ সবই হচ্ছে সাধারণ মানুষের সমাবেশ থেকে অবিচ্ছেদ্য। বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করেও রাজনৈতিক সমাবেশকে অবহেলা করা হচ্ছে, এটা—'উত্তর অভিমুখে রথ চালিয়ে দক্ষিণ দিকে যেতে চাওয়ার মতো, এর ফল অনিবার্যভাবেই হবে বিজয় থেকে বঞ্চিত হওয়া।

(৬৭) রাজনৈতিক সমাবেশ বলতে কি বোঝায় ? প্রথমতঃ, এতে বোঝায় যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে বলা । প্রত্যেকটি সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিককে এটা স্পষ্টভাবে বোঝানো দরকার যে যুদ্ধটি অবশ্যই কেন লড়তে হবে এবং সে যুদ্ধের সংগে তাঁদের কি সম্পর্ক। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে 'জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়া চীন গড়ে তোলা', এই উদ্দেশ্যকে আমাদের অবশ্যই সমস্ত সৈন্য ও জনগণের কাছে বলে দিতে হবে, শুধু এইভাবেই একটা জাপ-বিরোধী জোয়ার সৃষ্টি করতে পারা যাবে এবং যুদ্ধে নিজেদের সবকিছু দিয়ে দেবার জন্য কোটি কোটি মানুষকে একমন—একপ্রাণরূপে ঐক্যবদ্ধ করতে পারা যাবে। দ্বিতীয়তঃ, তাদের কাছে শুধু উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, সে উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিও নীতিগুলিও ব্যাখ্যা করে দিতে হবে, অর্থাৎ একটা রাজনৈতিক কর্মসূচী অবশ্যই থাকতে হবে। ইতিমধ্যেই আমাদের জাপানকে প্রতিরোধ করে দেশকে বাঁচানোর দশ দফা কর্মসূচী রয়েছে, আর প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও দেশগঠনের কর্মসূচীও রয়েছে। সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে এই দুটি কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং কাজে পরিণত করার জন্য সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে সক্রিয় করে তোলা আমাদের উচিত। একটা সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচী ছাড়া জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধটিকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার জন্য গোটা সৈন্যবাহিনী ও সমগ্র জনগণকে সক্রিয় করে তোলা অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, আমাদের কেমন করে তাদেরকে সক্রিয় করা উচিত? মৌখিকভাবে প্রচার করে, ইস্তাহার ও বিজ্ঞাপন দিয়ে, খবরের কাগজ ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে, নাটক ও চলচ্চিত্রের ভেতর দিয়ে, স্কুলের মাধ্যমে, গণ-সংগঠন ও আমাদের কর্মীদের মারফতে। কুওমিনতাঙের শাসিত এলাকায় এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে তা হচ্ছে সমুদ্রে শিশিরবিন্দু মাত্র, উপরন্তু তাও হয়েছে জনগণের রুচি-বিরুদ্ধ পদ্ধতিতে এবং জনগণের অনুপযোগী ভাবরসে। একে অবশ্য আমূলভাবে পরিবর্তন করতে হবে। চতুর্থতঃ, একবার সমাবেশই যথেষ্ট নয়। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক সমাবেশকে অবশ্যই হতে হবে নিরবচ্ছিন্ন। জনগণের কাছে রাজনৈতিক কর্মসূচীকে আউড়ে যাওয়া আমাদের কাজ নয়, কারণ এ ধরনের বুলিতে কেউই কান দেবে না। যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক সমাবেশকে আমাদের অবশ্যই যুদ্ধের বিকাশের সংগে আর সৈন্যদের তথা জনসাধারণের জীবনের সংগে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে, আর এইভাবে তাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন করে তুলতে হবে। এ হচ্ছে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার; যুদ্ধে আমাদের জয় মুখ্যতঃ এরই ওপরে নির্ভর করে।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য

(৬৮) এখানে আমরা যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করছি না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে 'জাপানী-সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়া চীন গড়ে তোলা' বলে ওপরে সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে। এখানে আমরা আলোচনা করছি মানবজাতির 'রক্তপাতময় রাজনীতি' হিসেবে যুদ্ধের, দুই সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড হিসেবে যুদ্ধের মৌলিক উদ্দেশ্যটা কি । যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা' (শত্রুকে ধ্বংস করার অর্থ শত্রুকে নিরস্ত্র করা, অর্থাৎ 'প্রতিরোধ-শক্তি থেকে শত্রুকে বঞ্চিত করা, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তার দেহটা ধ্বংস করা নয়')। প্রাচীন যুদ্ধে ব্যবহৃত হতো বর্শা আর ঢাল ঃ বর্শা আক্রমণ করার জন্য, শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য ; আর ঢাল প্রতিরক্ষার জন্য, নিজেকে রক্ষা করার জন্য। আজকের সব অস্ত্রও এই দুটিরই পরিবর্ধিত রূপ। বোমারু বিমান, মেশিনগান, দূরপাল্লার কামান এবং বিষাক্ত গ্যাস হচ্ছে বর্শার উন্নত রূপ ; বিমান-আক্রমণবিরোধী আশ্রয়স্থল, লৌহ শিরস্ত্রাণ, কংক্রিট নির্মিত দুর্গাদি ও গ্যাসনিরোধক মুখোস হচ্ছে ঢালের উন্নত রূপ। ট্যাংক হচ্ছে বর্শা ও ঢালের সংযোজনে একটা নতুন হাতিয়ার। আক্রমণ হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করার প্রধান উপায়, কিন্তু প্রতিরক্ষাকেও বাদ দেওয়া যায় না। আক্রমণের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা, কিন্তু সেই সংগে নিজেকে রক্ষা করাও, কারণ শত্রু ধ্বংস না হলে আপনি নিজেই ধ্বংস হবেন। প্রতিরক্ষার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা, কিন্তু একই সময়ে আবার প্রতিরক্ষা হচ্ছে আক্রমণের সাহায্যকারী উপায় অথবা আক্রমণ-পর্যায়ে প্রবেশের প্রস্তুতির উপায়। পশ্চাদপসরণ হচ্ছে প্রতিরক্ষার অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক রূপ ; কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন হচ্ছে আক্রমণের ধারাবাহিক রূপ। এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে যুদ্ধের মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা আর গৌণ লক্ষ্য নিজেকে রক্ষা করা, কারণ কেবলমাত্র বিপুল পরিমাণে শত্রুকে ধ্বংস করেই নিজেকে কার্যকরীভাবে রক্ষা করা যায়। অতএব, শত্রুকে ধ্বংস করার মুখ্য উপায় হিসেবে আক্রমণই হচ্ছে প্রধান, আর শত্রুকে ধ্বংস করার সাহায্যকারী উপায় হিসেবে এবং নিজেকে রক্ষা করার অন্যতম উপায় হিসেবে প্রতিরক্ষা হচ্ছে অপ্রধান। বাস্তব যুদ্ধে প্রতিরক্ষা যদিও অনেক সময়ে প্রধান, তৎসত্ত্বেও বাকি সময়ে আক্রমণই প্রধান, তবু যুদ্ধকে সামগ্রিকভাবে ধরলে আক্রমণটাই হচ্ছে প্রধান।

(৬৯) যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগে উৎসাহ দেওয়াটা কেমন করে ব্যাখ্যা করা যায়? 'নিজেকে রক্ষা করা' ও এর মধ্যে কি দ্বন্দ্ব নেই ? না, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, তারা হচ্ছে পরস্পরের বিপরীত আবার পরিপূরকও। যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি, যুদ্ধের জন্য মূল্য দিতে হয়, কখনো কখনো অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতে হয়।

সামগ্রিক ও চিরকালীন সংরক্ষণের জন্য দিতে হয় আংশিক ও সাময়িক আত্মত্যাগ (অসংরক্ষণ)। ঠিক এই কারণে আমরা বলি যে, মূলতঃ শত্রুবিনাশের একটি উপায় হিসেবে আক্রমণের মধ্যে একই সময়ে একটা আত্মসংরক্ষণের ভূমিকাও আছে। এই কারণেই আবার প্রতিরক্ষার সংগে সংগে আক্রমণও করতে হয় এবং শুধু নিছক প্রতিরক্ষা করা চলবে না।

(৭০) নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা—যুদ্ধের এই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যুদ্ধের সারমর্ম এবং যাবতীয় যুদ্ধ-ক্রিয়ার ভিত্তি এই সারমর্মটি প্রযুক্তিগত কার্যকলাপ থেকে শুরু করে রণনীতিগত কার্যকলাপ পর্যন্ত যাবতীয় যুদ্ধ-ক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধের মূল নীতি, আর কোন প্রযুক্তিগত, রণকৌশলগত, যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত ধারণা বা নীতিসূত্র কিছুতেই তার থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। গুলি ছোঁড়ার নীতিতে 'আড়ালে থাকা এবং অগ্নিবর্ষণের শক্তিকে পুরোপুরি ব্যবহার করার' অর্থ কি ? প্রথমটির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা, আর দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা। ভূ-প্রকৃতি ও স্থানিক বস্তুগুলির ব্যবহার করা, উৎক্ষেপে অগ্রসরণ, এবং বিক্ষিপ্ত সেনাবিন্যাসে ছড়িয়ে পড়ার মতো নানারকম কৌশলের উদ্ভব ঘটায় প্রথমটি। দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করে অন্যান্য বিভিন্ন কৌশলের, যেমন গুলিবর্ষণের ক্ষেত্রকে মুক্ত ও পরিষ্কার করা এবং অগ্নিবর্ষণের জাল সংগঠন করা। রণকৌশলগত সামরিক কার্যকলাপে ব্যবহৃত হানাদার বাহিনী, সংবরণী বাহিনী ও অতিরিক্ত মজুতবাহিনীর মধ্যে, প্রথমটি হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য, দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, আর তৃতীয়টি হচ্ছে পরিস্থিতি অনুযায়ী উল্লিখিত দুই উদ্দেশ্যের একটির জন্য—এই বাহিনীটি হয় হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করবে অথবা পশ্চাদ্ধাবনকারী বাহিনী হিসেবে কাজ করবে, অর্থাৎ শত্রুকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে ;আর না হয় নিজেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হবে, অর্থাৎ সংবরণী বাহিনীটিকে সাহায্য করবে অথবা একটি আচ্ছাদক বাহিনী হিসেবে কাজ করবে। এইভাবে কোন প্রযুক্তিগত, রণকৌশলগত, যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত নীতি অথবা কার্যকলাপ কিছুতেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে না, আর এই উদ্দেশ্যটি যুদ্ধের সবটাকে পরিব্যাপ্ত করে রাখে, যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে।

(৭১) চীন-জাপান দুদেশের মধ্যেকার বিভিন্ন ধরনের পরস্পরবিরোধী মৌলিক উপাদান বিবেচনা না করে যুদ্ধ পরিচালনা করা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরের পরিচালকদের অবশ্যই চলবে না, আবার এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করাও চলবে না। দুদেশের মধ্যেকার এইসব পরস্পরবিরোধী মৌলিক উপাদানগুলি যুদ্ধ-ক্রিয়ায় আত্মপ্রকাশ করে এবং এগুলি রূপান্তরিত হয়

নিজেকে রক্ষা করার ও শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য পারস্পরিক সংগ্রামে। আমাদের যুদ্ধে আমরা অবশ্যই প্রতিটি লড়াইয়ে ছোট বা বড় জয়লাভ করার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করি এবং প্রতিটি লড়াইয়ে শত্রুর একটা অংশকে নিরস্ত্র করার এবং তার সৈন্য, ঘোড়া ও সাজসরঞ্জামের একটা ভাগ বিনষ্ট করার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করি। আংশিকভাবে শত্রুকে ধ্বংস করার এইসব ফলকে সঞ্চয় করতে করতে আমরা এগুলিকে বিরাট রণনীতিগত বিজয়ে পরিণত করতে পারি এবং এইভাবেই আমরা চূড়ান্তরূপে আমাদের দেশ থেকে শত্রুকে তাড়িয়ে দেওয়া, মাতৃভূমিকে রক্ষা করা ও এক নয়া চীন গড়ে তোলার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উপনীত হব।

প্রতিরক্ষার মধ্যে আক্রমণ, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই, অন্তর্লাইনের যুদ্ধের মধ্যে বহির্লাইনের লড়াই

(৭২) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিশেষ রণনীতিগত কর্মপন্থাটিকে এখন পর্যালোচনা করে দেখা যাক। আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে, জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের রণনীতিগত কর্মপন্থা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রণনীতি, এবং প্রকৃতপক্ষে এটাই ঠিক কথা। কিন্তু এটা সাধারণ কর্মপন্থা, কোন বিশেষ কর্মপন্থা নয়। বাস্তবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কিভাবে চালানো উচিত? এই প্রশ্নটির আলোচনা এখন আমরা করব। আমাদের উত্তর হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণের ও অধিকৃত এলাকাগুলিকে সংরক্ষিত করার পর্যায়ে আমাদের উচিত রণনীতিগত প্রতিরক্ষার মধ্যে যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত আক্রমণ, রণনীতিগত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত দ্রুত নিষ্পত্তির সামরিক কার্যকলাপ, রণনীতিগত অন্তর্লাইনের মধ্যে যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত বহির্লাইনের সামরিক কার্য-কলাপ চালানো। তৃতীয় পর্যায়ে আমাদের উচিত রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণ চালানো।

(৭৩) জাপান হচ্ছে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ, আর আমরা হচ্ছি দুর্বল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, তাই জাপান রণনীতিগত আক্রমণের নীতি গ্রহণ করেছে আর আমরা রত হয়েছি রণনীতিগত প্রতিরক্ষায়। দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধের রণনীতিকে অবলম্বন করার চেষ্টা করছে জাপান ; আমাদের উচিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রণনীতিকে সচেতনভাবে অবলম্বন করা। জল ও স্থল উভয় দিক থেকে চীনকে ঘিরে ধরার ও অবরুদ্ধ করার জন্য জাপান বেশ উঁচুমানের যুদ্ধক্ষমতাসম্পন্ন কয়েক ডজন ডিভিসন স্থলবাহিনী (বর্তমানে ডিভিসনের সংখ্যা ত্রিশ) ও নৌবাহিনীর একটা অংশকে

ব্যবহার করছে আর চীনের ওপর বোমাবর্ষণ করার জন্য ব্যবহার করছে তার বিমানবাহিনীকে। বর্তমানে জাপানের স্থলবাহিনী ইতিমধ্যে পাওতৌ থেকে শুরু করে হাংচৌ পর্যন্ত বিস্তৃত একটা দীর্ঘ ফ্রন্টলাইন স্থাপন করেছে, আর ফুকিয়ান ও কুয়াংতুংয়ে পৌঁছে গেছে তার নৌবাহিনী, এমনি করেই সে বিরাট আকারে বহির্লাইনের সামরিক কার্যকলাপ গড়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে, আমরা রয়েছি অন্তর্লাইনে সামরিক কার্যকলাপ চালানোর অবস্থায়। এ সবই সৃষ্ট হয়েছে এমন একটা বৈশিষ্ট্যের ফলে, অর্থাৎ শত্রু শক্তিশালী আর আমরা দুর্বল—এই বৈশিষ্ট্যের ফলে। এটা হচ্ছে পরিস্থিতির একটা দিক।

(৭৪) কিন্তু অন্য একটা দিকে অবস্থাটা ঠিক বিপরীত। জাপান শক্তিশালী হলেও তার যথেষ্ট সৈন্য নেই। চীন দুর্বল হলেও তার আছে একটা সুবিশাল ভূখণ্ড, বিরাট জনসংখ্যা ও প্রচুর সৈন্য। এর থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি ঘটে। প্রথমতঃ, একটা বিরাট দেশের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করে শত্রু দখল করে নিতে পারে কেবলমাত্র কয়েকটি বড় বড় শহর, প্রধান প্রধান যোগাযোগ পথ ও সমতল ভূমির কিছুটা অংশ। তাই তার দখলাধীন ভূখণ্ডে এমন ব্যাপক এলাকাগুলি থাকে, যেগুলিকে শত্রু অধিকার করতে অক্ষম। আর এটাই আমাদেরকে ব্যাপক এলাকায় গেরিলাযুদ্ধ চালাবার সুযোগ যোগায়। গোটা চীন দেশে, শত্রু যদি ক্যান্টন-উহান-লানচৌয়ের সংযোগকারী লাইনকে এবং তার নিকটবর্তী এলাকাগুলিকেও দখল করে নিতে পারে, তাহলেও তার বাইরের অঞ্চলগুলি দখল করা শত্রুর পক্ষে কঠিন হবে। এটাই চীনকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাবার ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার জন্য একটা মূল পৃষ্ঠদেশ ও প্রধান ঘাঁটি এলাকা যোগায়। দ্বিতীয়তঃ, বিরাটাকার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তার ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে লিপ্ত করে দিয়ে শত্রু আমাদের বিরাট বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পথ ধরে শত্রু আমাদের ওপরে আক্রমণ চালায়, রণনীতিগতভাবে শত্রু বহির্লাইনে আর আমরা অন্তর্লাইনে, রণনীতিগতভাবে শত্রু আক্রমণে রত আর আমরা প্রতিরক্ষায় রত। এসব কিছু থেকে মনে হয়, আমরা যেন অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় আছি। তবুও আমাদের সুবিশাল ভূখণ্ড ও প্রচুর সৈন্য—এই দুটি সুবিধার ব্যবহার আমরা করতে পারি, জায়গাগুলিকে একগুঁয়েভাবে রক্ষা করার অবস্থানগত যুদ্ধের বদলে নমনীয় চলমান যুদ্ধ চালাতে পারি, শত্রুর এক ডিভিশনের বিরুদ্ধে আমাদের কয়েক ডিভিশন, শত্রুর দশ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে আমাদের কয়েক অযুত সৈন্য, শত্রুর একটি কলামের বিরুদ্ধে আমাদের কয়েকটি কলাম নিয়োগ করে রণক্ষেত্রের বহির্লাইন থেকে আকস্মিকভাবে শত্রুর একটি কলামকে ঘিরে ধরে আক্রমণ করতে পারি। সুতরাং, রণনীতিগতভাবে বহির্লাইনে অবস্থিত ও আক্রমণে লিপ্ত শত্রু যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে অন্তর্লাইনে সামরিক কার্যকলাপ চালাতে

ও প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। আর রণনীতিগতভাবে অন্তর্লাইনে অবস্থিত ও প্রতিরক্ষায় রত আমাদের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে বহির্লাইনে সামরিক কার্যকলাপ চালাবে ও আক্রমণে লিপ্ত হবে। শত্রুর একটি কলামের অথবা শত্রুর অন্য যে-কোন কলামের মোকাবিলা করার এটাই হচ্ছে প্রণালী। উপরে বর্ণিত উভয় পরিণতিই উদ্ভূত হয় এই বৈশিষ্ট্য থেকে যে, শত্রু ক্ষুদ্র আর আমরা বিরাট। আবার, ক্ষুদ্র হলেও শত্রুবাহিনী শক্তিশালী (অস্ত্রশস্ত্রে ও সৈন্যপ্রশিক্ষণের মানে) আর আমাদের সৈন্যবাহিনী বিরাট হলেও দুর্বল (অস্ত্রশস্ত্রে ও সৈন্যপ্রশিক্ষণের মানে, কিন্তু সংগ্রামী মনোবলের অর্থে নয়), আর তাই যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত সামরিক কার্যকলাপে আমাদের শুধুই যে ক্ষুদ্র বাহিনীর বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা এবং বহির্লাইন থেকে অন্তর্লাইনে অবস্থিত শত্রুকে আঘাত করা উচিত তাই নয়, উপরন্তু আমাদের দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের নীতিও অবলম্বন করা উচিত। দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই কার্যকরী করার জন্য, সাধারণতঃ স্থায়ীভাবে অবস্থিত শত্রুকে আক্রমণ করা আমাদের উচিত নয়, বরং চলমান অবস্থায় রত শত্রুকে আক্রমণ করা উচিত। যে পথটি ধরে নিশ্চয়ই শত্রু চলবে, সেই পথ বরাবর আগে থেকেই বিরাট সৈন্যবাহিনীকে গোপনে সমাবেশ করে রাখা আমাদের উচিত ; যখন শত্রু চলতে থাকে, তখন কি ঘটছে সেটা সে বুঝবার আগেই আমাদের উচিত আকস্মিকভাবে এগিয়ে গিয়ে তাকে ঘিরে ধরা ও আক্রমণ করা, আর এইভাবে তাড়াতাড়ি লড়াইটি শেষ করা। ভাল করে আমরা যদি লড়াই করি তাহলে আমরা হয়তো শত্রুর গোটা বাহিনীকে অথবা তার বৃহত্তর কিংবা কিছু অংশকে ধ্বংস করতে পারি। এমনকি ভাল করে লড়াই না করলেও আমরা গুরুতরভাবে শত্রুসৈন্যদের হতাহত করতে পারি। আমাদের একটি লড়াইয়ের এবং অন্যান্য সমস্ত লড়াইয়ের সম্পর্কেই এটা খাটে। বেশি বেশি জয়ের কথা নাই-বা বললাম, পিংসিংকুয়ান অথবা তাইএরচুয়াংয়ের জয়ের মতো অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের জয় আমরা যদি মাসে একটাও অর্জন করতে পারি, তাহলে তা শত্রুবাহিনীর মনোবল প্রচণ্ডভাবে ভেঙে দেবে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর সংগ্রামী মনোবলকে উদ্দীপ্ত করে তুলবে এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন ডেকে আনবে ; এইভাবে আমাদের রণনীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধটি রণক্ষেত্রের সামরিক কার্যকলাপের দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়। আর বহু যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে পরাজিত হবার পরে শত্রুর রণনীতিগত দ্রুত নিষ্পত্তির যুদ্ধটিই বদলে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে বাধ্য।

(৭৫) এক কথায়, ওপরে বর্ণিত যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত সামরিক কার্যকলাপের নীতিটি হচ্ছে 'বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই'। এটা হচ্ছে আমাদের রণনীতিগত নীতির—'অন্তর্লাইনে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের'

বিপরীত ; তবুও এই রণনীতিগত নীতিকে কাজে পরিণত করার জন্য এটা হচ্ছে অপরিহার্য নীতি। আমরা যদি যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের ব্যাপারেও 'অর্ন্তলাইনে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের নীতিকে ব্যবহার করতাম, যেমনটি করা হয়েছিল জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ—যুদ্ধের প্রথমদিকে, তাহলে সেটা শত্রু ক্ষুদ্র ও আমরা বিরাট এবং শত্রু শক্তিশালী ও আমরা দুর্বল—এই দুটি অবস্থার একেবারেই অনুপযোগী হতো, এইভাবে আমরা কোনদিনই আমাদের রণনীতিগত উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারতাম না এবং সামগ্রিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সমর্থ হতাম না, বরং আমরা শত্রুর দ্বারা পরাজিত হতাম। এই কারণেই আমরা সর্বদাই গোটা দেশে কতকগুলি বিরাট বিরাট স্থলবাহিনী সংগঠিত করে নেওয়ার পক্ষে অভিমত পেশ করে আসছি ; এইসব স্থলবাহিনীগুলির প্রত্যেকটির সৈন্যসংখ্যা শত্রুর সংশ্লিষ্ট এক একটি স্থলবাহিনীর থেকে দুই, তিন বা চার গুণ হওয়া চাই ;আর উপরে বর্ণিত নীতি অনুসারে তারা শত্রুর সংগে ব্যাপক রণক্ষেত্রে লড়াই করবে। 'বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই'-এর নীতিকে শুধু নিয়মিত যুদ্ধে নয়, উপরন্তু গেরিলাযুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায় এবং অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। এটা যে শুধু যুদ্ধের কোন একটা পর্যায়েই প্রয়োগ করা যায় তা কিন্তু নয়, উপরন্তু যুদ্ধের গোটা গতিধারাতেই এটা প্রযোজ্য। রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে প্রযুক্তিগতভাবে আমরা বেশি ভালভাবে সজ্জিত হব এবং শত্রু প্রবল আর আমরা দুর্বল এই অবস্থাও একেবারেই থাকবে না, তখনো আমরা যদি বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়োগ করে বহির্লাইন থেকে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই চালাই, তাহলে আরও বেশি কার্যকরভাবে বিরাট পরিমাণে আমরা বন্দী করতে ও শত্রুর মালপত্র দখল করে নিতে সক্ষম হব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শত্রুর একটি যন্ত্রীকৃত ডিভিশনের বিরুদ্ধে আমরা যদি দুই, তিন বা চারটি যন্ত্রীকৃত ডিভিসন নিয়োগ করি, তাহলে সেই শত্রু-ডিভিসনটিকে ধ্বংস করার ব্যাপারে আমরা আরও বেশি নিশ্চিত হতে পারব। এটা তো সাধারণ বুদ্ধির কথা যে, কয়েকজন পালোয়ান একজন পালোয়ানকে সহজেই পরাজিত করে দিতে পারে।

(৭৬) রণক্ষেত্রে লড়বার সময়ে আমরা যদি দৃঢ়ভাবে 'বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের' নীতি অবলম্বন করি, তাহলে আমরা যে শুধু রণক্ষেত্রে শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার প্রবলতা ও দুর্বলতা এবং উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার পরিস্থিতিই বদলে দেব তা নয়, উপরন্তু ক্রমে ক্রমে গোটা পরিস্থিতিকেও বদলে দেব। রণক্ষেত্রে আমরা লিপ্ত হব আক্রমণের আর শত্রু লিপ্ত হবে প্রতিরক্ষায় ; বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আমরা বহির্লাইনে লড়াই করব, আর অন্তর্লাইনে অবস্থিত থাকবে আমাদের শত্রু, যার সৈন্যসংখ্যা আমাদের চেয়ে কম ;আমরা দ্রুত নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা করব, আর যত চেষ্টাই করুক না কেন, সহায়ক অতিরিক্ত বাহিনীর প্রত্যাশায় লড়াইটিকে দীর্ঘস্থায়ী

করতে শত্রু সমর্থ হবে না ;এইসব কারণে শত্রুর অবস্থাটি প্রবলতা থেকে দুর্বলতায়, উৎকৃষ্টতা থেকে নিকৃষ্টতায় বদলে যাবে ;আর আমাদের সৈন্যবাহিনীর অবস্থাটি ঠিক এর বিপরীত—দুর্বলতা প্রবলতায় আর নিকৃষ্টতা উৎকৃষ্টতায় রূপান্তরিত হবে। এই ধরনের অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে আমাদের ও শত্রুর মধ্যেকার গোটা পরিস্থিতিটা বদলে যাবে। অর্থাৎ, রণক্ষেত্রের সামরিক কার্যকলাপে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের দ্বারা অর্জিত অনেকগুলি বিজয় পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে আমরা ক্রমে ক্রমে নিজেদের শক্তিশালী আর শত্রুকে দুর্বল করে তুলব, আর এর প্রভাবে অনিবার্যভাবেই প্রবলতা ও দুর্বলতার এবং উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার গোটা পরিস্থিতিটির পরিবর্তন ঘটবে। তখন আমাদের পক্ষের অপরাপর উপাদানের সংগে মিলিত হয়ে এবং শত্রুপক্ষের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলির ও অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সংগে মিলে এই পরিবর্তনগুলি শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার গোটা পরিস্থিতিটিকে বদলে প্রথমে তাকে সমতার পরিস্থিতিতে এবং পরে আমাদের উৎকৃষ্টতা ও শত্রুর নিকৃষ্টতার পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত করবে। পাল্টা আক্রমণ শুরু করে শত্রুকে আমাদের দেশ থেকে দূর করে দেবার সেইটাই হবে আমাদের সময়।

(৭৭) যুদ্ধ হচ্ছে শক্তির প্রতিযোগিতা, কিন্তু যুদ্ধের গতিপথে শক্তির পূর্ব অবস্থাটি বদলে যায়। এ ক্ষেত্রে নিশ্চায়ক উপাদান হচ্ছে আত্মগত প্রচেষ্টা—অধিকতর বিজয় অর্জন করা ও কম ভুল করা। বস্তুগত উপাদানগুলো এ ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা যোগায়, কিন্তু এই সম্ভাব্যতাকে বাস্তবতায় রূপান্তরিত করার জন্য সঠিক নীতি ও আত্মগত প্রচেষ্টা দরকার। তখন আত্মগত উপাদানই নির্ধারিক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনা

(৭৮) উপরে বর্ণিত যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে 'আক্রমণ' ; 'বহির্লাইন' বলতে আক্রমণের পরিধি, আর 'দ্রুত নিষ্পত্তি' বলতে একটি আক্রমণ কতক্ষণ ধরে চলবে তা বোঝায়। তাই তাকে 'বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই' বলে অভিহিত করা হয়। এটা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাবার সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি, অর্থাৎ চলমান যুদ্ধের নীতি। কিন্তু উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনা ছাড়া এই নীতিকে কার্যকরী করা সম্ভব হয় না। এখন এই তিনটি বিষয়ের পর্যালোচনা করা যাক।

(৭৯) আমরা ইতিপূর্বে মানুষের সচেতন কর্মতৎপরতার কথা আলোচনা করেছি। তাহলে আবার কেন উদ্যোগের কথা বলছি ? সচেতন কর্মতৎপরতা বলতে আমরা সচেতন কার্যকলাপ ও প্রচেষ্টাকে বোঝাই—এটা এমন একটা বৈশিষ্ট্য, যা অন্য সমস্ত

কিছু থেকে মানুষকে পৃথক করে দেয়। মানুষের এই বৈশিষ্ট্যটি যুদ্ধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠভাবে প্রকাশলাভ করে। এসব কথাই আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উদ্যোগ বলতে কোন একটা সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপের স্বাধীনতাকে বোঝানো হয়েছে, স্বাধীনতাকে হারিয়ে বাধ্য হয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়া থেকে এটা পৃথক। কার্যকলাপের স্বাধীনতাই হচ্ছে সৈন্যবাহিনীর প্রাণ। সেটি খোয়া গেলে সৈন্যবাহিনী পরাজয় বা বিনাশের কাছাকাছি এসে পড়ে। কোন সৈনিকের নিরস্ত্র হওয়াটা হচ্ছে এই সৈনিকের কার্যকরণের স্বাধীনতা হারিয়ে বাধ্য হয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ার ফল। কোন সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। এই কারণে যুদ্ধে উভয় পক্ষই উদ্যোগলাভ করার ও নিষ্ক্রিয়তাকে পরিহার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এ কথা বলা যায় যে, আমাদের দখলিকৃত বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের নীতি ও তাকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা ও পরিকল্পনা—সবই হচ্ছে উদ্যোগ-ক্ষমতালাভের জন্য প্রচেষ্টা, যাতে করে শত্রুকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় মধ্যে ফেলে নিজেদের রক্ষা করার ও শত্রুকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যটি অর্জন করা যায়। কিন্তু উদ্যোগ অথবা নিষ্ক্রিয়তা যুদ্ধ চালানোর শক্তির উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অতএব সেটা আবার যুদ্ধের আত্মগত পরিচালনার সঠিকতা অথবা বেঠিকতা থেকেও বিচ্ছিন্ন নয়। তা ছাড়া শত্রুর ভুল ধারণা ও তার অসতর্কতার সুযোগ গ্রহণ করে উদ্যোগলাভ করার এবং শত্রুকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফেলার প্রশ্নও রয়েছে। এইসব নীচে বিশ্লেষণ করা হবে।

(৮০) উদ্যোগ হচ্ছে যুদ্ধ চালানোর শক্তির উৎকৃষ্টতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য; আবার নিষ্ক্রিয়তা হচ্ছে যুদ্ধ চালানোর শক্তির নিকৃষ্টতার সংগে অবিচ্ছেদ্য। এই ধরনের উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা হচ্ছে উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তার বাস্তব ভিত্তি। এটা স্বাভাবিক যে, রণনীতিগত আক্রমণের ভেতর দিয়েই রণনীতিগত উদ্যোগকে অপেক্ষাকৃত ভাল করে আয়ত্ত করতে ও বিকশিত করতে পারা যায় ; কিন্তু সর্বদা ও সর্বত্রই উদ্যোগ বজায় রাখা—অর্থাৎ নিরঙ্কুশ উদ্যোগক্ষমতা বজায় রাখা শুধু তখনই সম্ভব, যখন নিরঙ্কুশ নিকৃষ্টতার বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা প্রতিযোগিতা করে। একজন বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ যখন গুরুতরভাবে রোগগ্রস্ত কোন লোকেরা সংগে কুস্তি লড়ে, তখন নিরঙ্কুশ উদ্যোগক্ষমতা সেই পুরুষের হাতে। জাপান যদি অনেক অনতিক্রম্য দ্বন্দ্বে জর্জরিত না হতো, উদাহরণস্বরূপ, যদি সে এই মুহূর্তে কয়েক মিলিয়ন বা এক কোটি সৈন্যের একটা বিরাট বাহিনী নিয়োগ করতে পারত, তার আর্থিক সঙ্গতি এখন যা তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হতো, যদি তার নিজ দেশের জনগণ বা বিদেশ থেকে কোন বিরোধিতা সে না পেত, আর চীনা জনগণের প্রাণপণ প্রতিরোধ উদ্রেককারী বর্বর নীতি যদি সে অনুসরণ না করত, তাহলে সে নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা বজায় রাখতে

পারত এবং সর্বদা ও সর্বত্রই নিরঙ্কুশ উদ্যোগক্ষমতা পেত। কিন্তু ইতিহাসে এই ধরনের নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা যুদ্ধের বা যুদ্ধাভিযানের শেষদিকে দেখতে পাওয়া যায়, যুদ্ধে বা যুদ্ধাভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে কমই দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে, আঁতাতভুক্ত দেশগুলি নিরঙ্কুশভাবে নিকৃষ্ট ছিল। ফলে জার্মানি গেল হেরে আর বিজয়ী হল আঁতাতভুক্ত দেশগুলি। এটা হচ্ছে যুদ্ধের শেষদিকে নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা ও নিরঙ্কুশ নিকৃষ্টতার দৃষ্টান্ত। আবার, তাইএরচুয়াং-এ চীনাদের বিজয়লাভের প্রাক্কালে, কষ্টকর লড়াইয়ের পরে তখন সেখানকার বিচ্ছিন্ন জাপানী বাহিনী নিরঙ্কুশ নিকৃষ্টতায় পর্যবসিত হয়েছিল। আর পক্ষান্তরে আমাদের সৈন্যবাহিনী নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা অর্জন করেছিল; ফলে শত্রু পরাভূত হয়েছিল আর আমরা বিজয়লাভ করেছিলাম। এটা হচ্ছে যুদ্ধাভিযানের শেষের দিকে নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার একটা উদাহরণ। কোন কোন যুদ্ধ বা যুদ্ধাভিযান আবার আপেক্ষিক উৎকৃষ্টতার বা ভারসাম্যের পরিস্থিতিতেও শেষ হতে পারে। তখন যুদ্ধে একটা আপোষ হয় আর যুদ্ধাভিযানে একটা অচলাবস্থা দেখা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরঙ্কুশ উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে দেয়। এ সবই খাটে যুদ্ধ বা যুদ্ধাভিযানের শেষের দিকে, শুরুতে নয়। চীন-জাপান যুদ্ধের শেষ পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলতে পারা যায় যে, জাপান নিরঙ্কুশভাবে নিকৃষ্ট হয়ে পরাভূত হবে আর নিরঙ্কুশভাবে উৎকৃষ্ট হয়ে চীন জয়লাভ করবে; কিন্তু বর্তমানে কোন পক্ষেরই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা চরম নয়, বরং আপেক্ষিক। জাপানের রয়েছে প্রবল সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক সাংগঠনিক শক্তি—তার এই সুবিধাজনক উপাদান থাকায় সে আমাদের দুর্বল সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তির চাইতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় আছে। এর ফলে জাপানের উদ্যোগক্ষমতার বুনিয়াদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরিমাণগত ভাবে তার সামরিক ও অন্যান্য শক্তি বিরাট নয়, এবং তার অন্যান্য অনেক অসুবিধা আছে বলে তার উৎকৃষ্টতা তার নিজস্ব দ্বন্দ্বের দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। চীনের ওপরে আক্রমণ করতে গিয়ে তাকে আমাদের সুবিশাল দেশ, বিরাট জনসংখ্যা, বিপুলসংখ্যক সৈন্য এবং দৃঢ় জাতীয় প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে হয়েছে, ফলে তার উৎকৃষ্টতাটি আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই জাপানের সাধারণ অবস্থাটি পরিণত হয়েছে আপেক্ষিক উৎকৃষ্টতায়, আর উদ্যোগক্ষমতা বিকশিত করার ও বজায় রাখার সামর্থ্যটিও সীমিত হয়ে অনুরূপভাবেই আপেক্ষিক হয়ে পড়েছে। নিজের নিকৃষ্ট শক্তির কারণে রণনীতিগতভাবে চীন যদিও নির্দিষ্ট মাত্রার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থিত, তবুও ভূখণ্ড, জনসংখ্যা ও সৈন্যসংখ্যায় এবং শত্রুর প্রতি তার জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর ঘৃণায় ও সংগ্রামী মনোবলে সে হচ্ছে উৎকৃষ্ট। অন্যান্য সুবিধাজনক উপাদানের সংগে মিলে

এই উৎকৃষ্টতা তার সামরিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য শক্তির নিকৃষ্টতার মাত্রাকে কমিয়ে দেয় আর রণনীতিগত নিকৃষ্টতাকে আপেক্ষিকে পরিণত করে। এর ফলে চীনের নিষ্ক্রিয়তার মাত্রাটিও কমে যায়, এবং এই নিষ্ক্রিয় অবস্থাটা শুধুই রণনীতিগত ক্ষেত্রের আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তা। যাই হোক, যে-কোন নিষ্ক্রিয়তাই ক্ষতিকর এবং তাকে দূর করে দেবার জন্য যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সামরিক ক্ষেত্রের পদ্ধতি হচ্ছে দৃঢ়ভাবে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই চালানো এবং শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে গেরিলাযুদ্ধ শুরু করা, আর যুদ্ধাভিযানগত চলমান লড়াই ও গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে বহু ক্ষেত্রে আংশিকভাবে শত্রুকে দাবিয়ে রাখার উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগক্ষমতা অর্জন করা। এরূপ বহু যুদ্ধাভিযানগত আংশিক উৎকৃষ্টতা ও আংশিক উদ্যোগক্ষমতার ভেতর দিয়ে আমরা ক্রমে ক্রমে রণনীতিগত উৎকৃষ্টতা ও রণনীতিগত উদ্যোগক্ষমতা সৃষ্টি করে নিজেদেরকে রণনীতিগত নিকৃষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তার অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারি। এটাই হচ্ছে উদ্যোগ ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেকার, উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক।

(৮১) এর থেকে আমরা উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তা ও যুদ্ধের আত্মগত পরিচালনার মধ্যেকার সম্পর্কটাও বুঝতে পারি। আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আমাদের আপেক্ষিক রণনীতিগত নিকৃষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তার এই অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব, তার পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের আপন প্রয়াসে বহু আংশিক উৎকৃষ্টতা ও আংশিক উদ্যোগ সৃষ্টি করা, শত্রুকে বহু আংশিক উৎকৃষ্টতা ও আংশিক উদ্যোগের অবস্থা থেকে বঞ্চিত করে তাকে নিকৃষ্টতার ও নিষ্ক্রিয়তার অতলে নিক্ষেপ করা। এ আংশিক সাফল্যগুলি একত্রিত করলেই সেগুলো হবে আমাদের রণনীতিগত উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগ এবং শত্রুর রণনীতিগত নিকৃষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তা। এ ধরনের পরিবর্তনটি নির্ভর করে সঠিক আত্মগত পরিচালনার ওপরে। কেন? কারণ আমরা যখন উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগ চাই, শত্রুও তাই চায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে যুদ্ধ হচ্ছে সামরিক শক্তি ও আর্থিক শক্তি প্রভৃতি বস্তুগত অবস্থার ভিত্তিতে উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগলাভের সংগ্রামে উভয় সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডারদের মধ্যেকার আত্মগত সামর্থ্যের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়েই উদ্ভূত হয় জয় ও পরাজয়, বাস্তব বস্তুগত অবস্থার বৈষম্যকে বাদ দিলে বিজয়ের কারণ অপরিহার্যভাবেই হবে সঠিক আত্মগত পরিচালনা, আর পরাজয়ের কারণ হবে ভুল আত্মগত পরিচালনা। আমরা স্বীকার করি যে, অন্য যে-কোন সামাজিক ব্যাপারের চেয়ে যুদ্ধের ব্যাপারটি উপলব্ধি করা বেশি কঠিন এবং তার নিশ্চয়তা আরও কম। অন্য কথায় এটা হচ্ছে অধিকতর মাত্রায় একটা 'সম্ভাব্যতার' বিষয়। তবুও যুদ্ধ কোনমতেই অতিপ্রাকৃত নয়, বরং তা হচ্ছে অবশ্যম্ভাবিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি পার্থিব প্রক্রিয়া। সেই কারণে

সুন উ জির নীতি—'শত্রুকে জানুন, নিজেকে জানুন, তাহলে একশবার যুদ্ধ করলেও পরাজিত হবেন না'[২২]—এখনো বৈজ্ঞানিক সত্য হয়ে রয়েছে। শত্রু সম্পর্কে ও আমাদের নিজেদের সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে আসে ভুল, অধিকন্তু যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য বহু ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের পূর্ণ জ্ঞানলাভকে অসম্ভব করে তোলে, তাই দেখা দেয় যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আর সেকারণেই ঘটে ভুল ও পরাজয়। কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কার্যকলাপ যাই হোক না কেন, তাদের সাধারণ অবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি জানতে পারা যায়। প্রথমে সবরকমের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং পরে কম্যাণ্ডারের বুদ্ধিমান অনুমিতি ও বিচার-বিবেচনার ভেতর দিয়ে ভুল কমানো ও সাধারণভাবে সঠিক পরিচালনা সম্ভব। 'সাধারণভাবে সঠিক পরিচালনাকে' অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে আমরা বেশি লড়াই জিততে পারি, আর পারি আমাদের নিকৃষ্টতাকে উৎকৃষ্টতায় এবং নিষ্ক্রিয়তাকে উদ্যোগে রূপান্তরিত করে নিতে। এটাই হচ্ছে যুদ্ধের নির্ভুল বা ভুল আত্মগত পরিচালনার সংগে উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তার সম্পর্ক।

(৮২) যখন আমরা ইতিহাসে বড় বড় পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীগুলির স্বীকৃত পরাজয় ও ছোট ছোট দুর্বল সৈন্যবাহিনীগুলির অর্জিত বিজয়গুলির নজিরের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন এই বিচারতত্ত্বটি আরও যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় যে, ভুল আত্মগত পরিচালনা উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগকে নিকৃষ্টতায় ও নিষ্ক্রিয়তায় বদলে দিতে পারে, আর নির্ভুল আত্মগত পরিচালনা এগুলির বিপরীত পরিবর্তন ঘটাতে পারে। চীনের ও বিদেশের ইতিহাসে এ ধরনের বহু নজির আছে। চীনের উদাহরণ হচ্ছে চিন ও ছু-এর মধ্যে ছেংপু-এর লড়াই[২৩], ছু ও হান-এর মধ্যে ছেংকাওয়ের লড়াই[২৪], হান সিন কর্তৃক চাও বাহিনীকে পরাস্ত করার লড়াই[২৫], সিন ও হানের মধ্যে খুনইয়াংয়ের লড়াই[২৬], ইউয়ান শাও ও ছাও ছাওয়ের মধ্যে কুয়ানতুয়ের লড়াই[২৭], উ ও ওয়েই-এর মধ্যে ছিপি'র লড়াই[২৮], উ এবং শু'র মধ্যে ইলিংয়ের লড়াই[২৯], ছিন ও তোংচিনের মধ্যে ফেইশুইয়ের লড়াই[৩০] প্রভৃতি। বিদেশে এই ধরনের উদাহরণ দেখা যায় নেপোলিয়নের দ্বারা চালিত অধিকাংশ যুদ্ধাভিযানগুলিতে[৩১] এবং অক্টোবর বিপ্লবের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধে। এসব দৃষ্টান্তে ছোট বাহিনী বড় বাহিনীকে এবং নিকৃষ্ট বাহিনী উৎকৃষ্ট বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে, দুর্বল সৈন্যবাহিনী প্রথমে শত্রুর আংশিক নিকৃষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে নিজের আংশিক উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগকে যুদ্ধে নিয়োগ করে শত্রুর ওপরে আক্রমণ চালিয়ে বিজয় অর্জন করেছিল, তার পরে শত্রুর অবশিষ্ট অংশগুলির ওপরে আক্রমণ চালিয়ে একে একে তাদের ধ্বংস করেছিল। এইভাবে দুর্বল সৈন্যবাহিনী সামগ্রিক

পরিস্থিতিতে উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগ অর্জন করেছিল। আর শত্রুর বেলায় ঘটনাটি হল বিপরীত। শুরুতে শত্রু ছিল উৎকৃষ্ট ও উদ্যোগী অবস্থায়, সে তার আত্মগত ভুল ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে তার অত্যন্ত ভাল বা অপেক্ষাকৃত ভাল বা উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগী অবস্থাকে পুরোপুরি খুইয়ে বসল এবং হয়ে পড়ল পরাজিত সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি বা রাজ্যবিহীন এক রাজা। এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে, যুদ্ধ চালানোর শক্তির উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তাকে নির্ধারণ করার বাস্তব ভিত্তি হলেও, সেটি কিন্তু উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তার বাস্তব বিষয় নয়, শুধু সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আত্মগত সামর্থ্যের প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়েই বাস্তব উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তা উদ্ভূত হতে পারে। সংগ্রামে নির্ভুল আত্মগত পরিচালনা নিকৃষ্টতাকে উৎকৃষ্টতায় আর নিষ্ক্রিয়তাকে উদ্যোগে রূপান্তরিত করতে পারে, আর ভুল পরিচালনা করতে পারে তার বিপরীত। কোন শাসনকারী রাজবংশই যে বিপ্লবী বাহিনীকে পরাভূত করতে পারে না, এটা প্রমাণ করে যে, নিছক কোন ব্যাপারের উৎকৃষ্টতা উদ্যোগকে সুনিশ্চিত করে না, চূড়ান্ত বিজয়কে সুনিশ্চিত করা তো আরও দূরের কথা। বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী আত্মগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শর্ত সুনিশ্চিত করে উৎকৃষ্ট ও উদ্যোগী পক্ষের হাত থেকে নিকৃষ্ট ও নিষ্ক্রিয় পক্ষ উদ্যোগ ও জয়কে ছিনিয়ে নিতে পারে।

(৮৩) ভুল ধারণায় ও অসতর্কতায় উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগ খোয়া যেতে পারে। তাই, সুপরিকল্পিতভাবে শত্রুর মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা আর তার ওপরে অতর্কিত আক্রমণ চালানো হচ্ছে উৎকৃষ্টতা অর্জনের ও উদ্যোগ ছিনিয়ে নেবার পদ্ধতি, এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিও বটে। ভুল ধারণা কি কি? ভুল ধারণার একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'পাকোং পর্বতের প্রতিটি ঝোপ ও গাছকে শত্রুসৈন্য বলে মনে করা'।[৩২] আর 'পূর্বদিকে আক্রমণের ভান করে পশ্চিমদিকে আক্রমণ করা' হচ্ছে শত্রুদের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার একটি পদ্ধতি। খবর ফাঁস হয়ে পড়া বন্ধ করার মতো যথেষ্ট জনসমর্থন যখন থাকে, তখন বিভিন্ন ছল ও কৌশল প্রয়োগ করে প্রায়শঃই শত্রুকে কার্যকরীভাবে ভুল বিচার ও ভুল কার্যকারণের কঠিন অবস্থায় নিক্ষেপ করা সম্ভব, যার ফলে শত্রু তার উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগ থেকে বঞ্চিত হয়। 'যুদ্ধে কোন ছলচাতুরীই উপেক্ষণীয় নয়'— এই প্রবাদটি ঠিক এই কথাই বোঝায়। 'অসতর্কতার' অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে অপ্রস্তুত থাকা। প্রস্তুতিবিহীন উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থা নয় এবং এতে কোন উদ্যোগও থাকতে পারে না। এ বিষয়টা বুঝতে পারলে, নিকৃষ্ট অথচ প্রস্তুত সৈন্যবাহিনী প্রায়ই অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা উৎকৃষ্ট শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করতে পারে। আমরা যে বলি, চলমান অবস্থায় রত

শত্রুকে আক্রমণ করা সহজ, তার কারণ এই যে, সে তখন অসতর্ক অর্থাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকে। এই দুটি বিষয়—শত্রুর মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা ও তার ওপরে অতর্কিত আক্রমণ চালানোর অর্থ হচ্ছে শত্রুর কাঁধে যুদ্ধের অনিশ্চয়তাকে পাচার করে দেওয়া আর আমাদের নিজেদের জন্য যথাসম্ভব নিশ্চয়তাকে সুনিশ্চিত করা, আর এইভাবে উৎকৃষ্টতা, উদ্যোগ এবং বিজয় অর্জন করা। এইসব অর্জনের পূর্বশর্ত হচ্ছে জনগণের অনবদ্য সংগঠন। সুতরাং, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমস্ত শত্রুবিরোধী জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে ও তাঁদের সবাইকে অস্ত্রসজ্জিত করে শত্রুর ওপরে ব্যাপকভাবে আকস্মিক আক্রমণ চালানো এবং সংগে সংগে খবর ফাঁস হয়ে পড়া বন্ধ করা ও সৈন্যবাহিনীকে আড়ালে লুকিয়ে রাখা, যার ফলে শত্রু জানতে পারবে না যে, আমাদের সৈন্যবাহিনী কোথায় এবং কখন তাকে আক্রমণ করবে, এবং সৃষ্ট হবে শত্রুর ভুল ধারণা ও অসতর্কতার বাস্তব ভিত্তি। অতীতে কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধের যুগে চীনা লালফৌজ তার দুর্বল ও ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে সর্বদাই যে জিততে সমর্থ হতো তার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে সংগঠিত ও অস্ত্রসজ্জিত জনসাধারণের সমর্থন। যুক্তির দিক থেকে, কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের থেকে অনেক বেশি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করা উচিত জাতীয় যুদ্ধের ; কিন্তু অতীতের ভুলের[৩৩] ফলে জনসাধারণ এখন একটা অসংগঠিত অবস্থায় রয়েছে, জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের কাজে তাড়াতাড়ি তাদের নামাতে পারা যায় না, পরন্তু কখনো কখনো এমনও হয় যে, শত্রুই তাদের কাজে লাগায়। শুধুমাত্র দৃঢ়তার সংগে ব্যাপকভাবে সমগ্র জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেই যুদ্ধের যাবতীয় চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে অফুরন্ত সম্পদ সরবরাহ করতে পারা যায়। অধিকন্তু, এটি শত্রুকে ভুল ধারণায় নিক্ষেপ করে ও অতর্কিত আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করার আমাদের এই রণকৌশলকে কার্যকরী করার ব্যাপারেও বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করবে। আমরা সুং-এর রাজা সিয়াং নই এবং তার গর্দভতুল্য নীতিশাস্ত্রও[৩৪] আমরা চাই না। বিজয়লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের অবশ্যই যতটা সম্ভব শত্রুদের চোখ আর কানকে বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে করে তারা অন্ধ ও বধিরে পরিণত হয় ; আর যথাসম্ভব তাদের কম্যাণ্ডারদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদেরকে পাগলে পরিণত করতে হবে। উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্তগুলি থেকে বোঝা যায় যে, যুদ্ধের আত্মগত পরিচালনার সংগে কিভাবে উদ্যোগ বা নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কিত। জাপানকে পরাভূত করার জন্য এ ধরনের আত্মগত পরিচালনা অপরিহার্য।

(৮৪) আমাদের অতীত ও বর্তমান আত্মগত ভুলভ্রান্তিগুলির সুযোগ নিয়ে এবং নিজের প্রবল সামরিক শক্তির কারণে জাপান তার আক্রমণের পর্যায়ে

মোটামুটিভাবে উদ্যোগী অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু তার নিজের বহু অসুবিধাজনক উপাদানের কারণে এবং যুদ্ধেও কিছু আত্মগত ভুলভ্রান্তি করার কারণে (এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে) আর আমাদের বহু সুবিধাজনক উপাদান থাকার কারণে তার এই উদ্যোগ আংশিকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে তাইএরচুয়াংয়ে শত্রুর পরাজয় ও শানসীতে তার সঙ্কটাবস্থা থেকে। শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে আমাদের গেরিলাযুদ্ধের ব্যাপক বিকাশ সেখানকার শত্রুর রক্ষীবাহিনীকে একেবারে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় এনে ফেলেছে। যদিও রণনীতিগতভাবে এখনো সে আক্রমণে রত আর উদ্যোগ এখনো তার হাতে, তবুও যখন তার রণনীতিগত আক্রমণ থেমে যাবে তখনই শেষ হয়ে যাবে তার উদ্যোগ। শত্রু কেন যে উদ্যোগ বজায় রাখতে পারবে না তার প্রথম কারণ হচ্ছে, সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতার দরুণ অনির্দিষ্টকাল শত্রুর পক্ষে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কেন যে তাকে একটা নির্দিষ্ট সীমায় আক্রমণ বন্ধ করতে হবে এবং কেন যে সে উদ্যোগ বজায় রাখতে পারবে না, তার দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, আমাদের যুদ্ধাভিযানগত আক্রমণাত্মক লড়াই ও শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে আমাদের গেরিলাযুদ্ধ এবং অপরাপর উপাদান। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে তৃতীয় কারণ। এইভাবে এটা দেখা যায় যে, শত্রুর উদ্যোগ হচ্ছে সীমিত আর এই উদ্যোগকে চূর্ণবিচূর্ণ করা যায়। চীন যদি সামরিক কার্যকলাপে তার প্রধান বাহিনীগুলির দ্বারা যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের নীতি চালু রাখতে পারে, শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে প্রচণ্ডভাবে গেরিলাযুদ্ধকে বিকশিত করে তুলতে পারে এবং রাজনীতিগতভাবে ব্যাপক মাত্রায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে, তাহলে আমরা ধীরে ধীরে রণনীতিগত উদ্যোগী অবস্থিতি গড়ে তুলতে পারি।

(৮৫) এখন নমনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। নমনীয়তাটা কি? এটা হচ্ছে সামরিক কার্যকলাপে উদ্যোগের বাস্তব রূপায়ণ। এটা হচ্ছে সৈন্যশক্তির নমনীয় প্রয়োগ। সৈন্যশক্তির নমনীয় প্রয়োগ হচ্ছে যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্রীয় কতর্ব্য, আর এ কাজটি ভালভাবে সম্পাদন করা সবচেয়ে কঠিনও বটে। সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে সংগঠিত ও শিক্ষিত করার কাজ প্রভৃতি ছাড়াও যুদ্ধে আমাদের কাজ হচ্ছে লড়াইয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা, আর এ সবকিছুই করা হয় যুদ্ধে জয়লাভের জন্য। সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করা প্রভৃতি কাজ অবশ্য কঠিন। কিন্তু তার থেকেও বেশি কঠিন হচ্ছে সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করা, বিশেষ করে তখন যখন দুর্বলটি প্রবলটির সংগে লড়ছে। এ কাজ করার জন্য দরকার অত্যন্ত উচ্চমানের আত্মগত সামর্থ্য, দরকার যুদ্ধের বিশিষ্ট বিশৃংখলা, অস্পষ্টতা

ও অনিশ্চয়তাকে দূর করা আর তাতে শৃংখলা, স্পষ্টতা ও নিশ্চয়তা খুঁজে বের করা। শুধুমাত্র এইভাবেই পরিচালনায় নমনীয়তাকে কায়েম করতে পারা যায়।

(৮৬) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণক্ষেত্রে লড়াই করার মৌলিক নীতি হচ্ছে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই। এ নীতিকে কার্যকরী করার জন্য রয়েছে বিভিন্ন রণকৌশল বা পদ্ধতি, যেমন সৈন্যশক্তিকে ছড়িয়ে দেওয়া ও কেন্দ্রীভূত করা, পৃথক পৃথকভাবে অগ্রসর হওয়া ও একাভিমুখী আক্রমণ করা, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা, হানা দেওয়া ও শত্রুকে আটকে রাখা, ঘেরাও করা ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্বে বা পিছনে এগিয়ে যাওয়া, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ। এ রণকৌশলগুলিকে বোঝা সহজ, কিন্তু নমনীয়ভাবে সেগুলিকে কাজে প্রয়োগ করা ও রদবদল সহজ নয়। এ ক্ষেত্রে রয়েছে তিনটি সমস্যামূলক যোগসূত্র—সময়, স্থান ও সৈন্যবাহিনী। সময়, স্থান ও সৈন্যবাহিনী ভালভাবে বাছাই করা না হলে কোন বিজয় অর্জন করতে পারা যায় না। যেমন, চলন্ত অবস্থায় রত শত্রুকে আক্রমণ করতে গিয়ে আমরা যদি অতি তাড়াতাড়ি আঘাত হেনে বসি, তাহলে নিজেদের আমরা প্রকাশ করে ফেলব আর শত্রুকে তৈরী হবার সুযোগ দিয়ে দেব, আবার আমরা যদি খুব দেরি করে আঘাত হানি, তাহলে শত্রু ততক্ষণে ছাউনী গেড়ে তার বাহিনীগুলিকে সন্নিবেশ করে ফেলতে পারে, তাতে আমাদের কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করতে হতে পারে। এটাই হচ্ছে সময়ের প্রশ্ন। আমরা যদি আমাদের আক্রমণস্থল শত্রুর বামপার্শ্বদেশে বাছাই করে নিই আর সেটা ঠিক শত্রুর দুর্বলস্থান হয়, তাহলে জয়লাভটি সহজ হবে। কিন্তু আমরা যদি তার দক্ষিণ পার্শ্বদেশে আক্রমণস্থল বাছাই করে একটা ত্রুটি করে বসি তাহলে কিছুই সাধিত হবে না। এটা হচ্ছে স্থানের প্রশ্ন। আমাদের সৈন্যবাহিনীর একটি নির্দিষ্ট ইউনিটকে যদি একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে জয়লাভ সহজ হতে পারে। কিন্তু সেই একই কাজের জন্য অন্য আর একটি ইউনিটকে নিয়োগ করা হলে ফললাভ করা কঠিন হতেও পারে। এটা হচ্ছে সৈন্যবাহিনীর প্রশ্ন। আমাদের যে শুধু রণকৌশলগুলি প্রয়োগই করতে হবে তাই নয়, বরং সেগুলির রদবদলও করতে হবে। আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষায় অথবা প্রতিরক্ষা থেকে আক্রমণে, অগ্রগমন থেকে পশ্চাদপসরণে অথবা পশ্চাদপসরণ থেকে অগ্রগমনে, সংবরণী বাহিনী থেকে হানাদার বাহিনীতে অথবা হানাদার বাহিনী থেকে সংবরণী বাহিনীতে পরিবর্তন সাধন করা এবং ঘেরাও করা ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্বে বা পিছনে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদির পারস্পরিক পরিবর্তন

সাধন করা, আর উভয় পক্ষের বাহিনীগুলির অবস্থা ও ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে এ ধরনের পরিবর্তন সাধন করা হচ্ছে নমনীয় পরিচলানার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এটা লড়াইয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত পরিচালনার ক্ষেত্রেও সত্য।

(৮৭) প্রাচীনরা বলেন ঃ 'রণকৌশল প্রয়োগের নৈপুণ্য নির্ভর করে বুদ্ধির ওপরে'। এই 'নৈপুণ্যকে' আমরা বলি নমনীয়তা, এটা হচ্ছে বুদ্ধিমান কম্যাণ্ডারদের অবদান। নমনীয়তা বলতে কিন্তু হঠকারিতা বোঝায় না। হঠকারিতাকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। নমনীয়তা হচ্ছে বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে 'সময় বিচার করার ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার পরে' (এখানে 'পরিস্থিতি' বলতে শত্রুর পরিস্থিতি, আমাদের পরিস্থিতি ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি প্রভৃতি বোঝানো হচ্ছে) বুদ্ধিমান কম্যাণ্ডারদের সময়োচিত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সামর্থ্য, অর্থাৎ 'রণকৌশল প্রয়োগের নৈপুণ্য'। এই রণকৌশল প্রয়োগের নৈপুণ্যের ভিত্তিতে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত বেশি বিজয়লাভ করতে পারি, শত্রুর উৎকৃষ্টতাকে আর আমাদের নিকৃষ্টতাকে বদলে দিতে পারি, শত্রুর ওপরে উদ্যোক্ষমতা লাভ করতে পারি, শত্রুকে দাবিয়ে নিয়ে ধ্বংস করতে পারি যাতে করে চূড়ান্ত বিজয় হবে আমাদেরই।

(৮৮) পরিকল্পনার প্রশ্নটি এবারে আলোচনা করা যাক। যুদ্ধের বিশিষ্ট অনিশ্চয়তার কারণে অপরাপর কার্যের তুলনায় সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ চালানো অনেক বেশি কঠিন। তবুও, 'প্রস্তুতিসম্পন্নতা সাফল্য সুনিশ্চিত করে, আর অপ্রস্তুতিসম্পন্নতা বিফলতা সৃষ্টি করে,' পূর্ব থেকে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধে কোন বিজয় অর্জন করা অসম্ভব। যুদ্ধে কোনরকমের নিরঙ্কুশ নিশ্চয়তা নেই, তবুও যুদ্ধে নির্দিষ্ট মাত্রার আপেক্ষিক নিশ্চয়তাও যে নেই, তাও নয়। আমাদের নিজেদের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা তুলনামূলকভাবে নিশ্চিত। শত্রুর পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত অনিশ্চিত, কিন্তু এখানেও আমাদের অনুসন্ধান করার জন্য রয়েছে পূর্বলক্ষণ, অনুসরণ করার জন্য রয়েছে রহস্য সমাধানের সূত্র, আর বিবেচনা করার জন্য রয়েছে ঘটনাক্রম। এসব নিয়ে গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট মাত্রার আপেক্ষিক নিশ্চয়তা, যা যুদ্ধের পরিকল্পনার জন্য একটা বাস্তব ভিত্তি যোগায়। আধুনিক কারিগরীর উন্নতি (টেলিগ্রাফী, বেতার, বিমান, মোটরগাড়ী, রেলপথ, জাহাজ প্রভৃতি) আবার যুদ্ধের পরিকল্পনার সম্ভাব্যতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু, যুদ্ধে শুধু অত্যন্ত সীমিত ও অল্পকালস্থায়ী নিশ্চয়তা থাকে বলে যুদ্ধের পূর্ণাংগ ও অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা খুবই কঠিন; যুদ্ধের

গতির (প্রবাহ বা পরিবর্তন) সংগে সংগে এ ধরনের পরিকল্পনার পরিবর্তন হয়ে থাকে আর যুদ্ধের পরিধি অনুসারে এই পরিবর্তনের মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। রণকৌশলগত পরিকল্পনাগুলি, যেমন ছোট ছোট সৈন্যসংস্থান ও ইউনিটগুলির আক্রমণ বা প্রতিরক্ষার পরিকল্পনাগুলি প্রায়ই দিনে কয়েকবার বদলে নিতে হয়। যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা অর্থাৎ বিরাট বিরাট সৈন্যসংস্থান কর্তৃক কার্যকারণের পরিকল্পনা সাধারণতঃ যুদ্ধাভিযানের পরিসমাপ্তি অবধি বলবৎ থাকতে পারে; কিন্তু যুদ্ধাভিযানের গতিপথে সে পরিকল্পনাকে প্রায়ই অংশতঃ বদলে নেওয়া হয়, আর কোন কোন সময়ে এমনকি পুরোপুরি বদলেও নেওয়া হয়। রণনীতিগত পরিকল্পনা যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে রচিত, আর সেটি আরও বেশি স্থায়ী, কিন্তু তাও শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট রণনীতিগত পর্যায়েই প্রযোজ্য, যুদ্ধ যখনই একটা নতুন পর্যায়ে এগিয়ে চলে তখনই সেই রণনীতিগত পরিকল্পনাকে বদলে নিতে হয়। পরিধি ও পরিবেশ অনুযায়ী রণকৌশলগত, যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত পরিকল্পনা তৈরী করা ও বদলে নেওয়া হচ্ছে যুদ্ধ পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। এটা হচ্ছে যুদ্ধে নমনীয়তার বাস্তব অভিব্যক্তি; অন্য কথায়, এটা হচ্ছে বাস্তবে রণকৌশল প্রয়োগের নৈপুণ্যও বটে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে সর্বস্তরের কম্যাণ্ডারদের এর প্রতি নজর দিতে হবে।

(৮৯) যুদ্ধের প্রবহমানতার কারণে কেউ কেউ যুদ্ধের পরিকল্পনা বা নীতির আপেক্ষিক স্থায়িত্বকে একেবারেই অস্বীকার করে। তারা এ ধরনের পরিকল্পনা বা নীতিকে 'যান্ত্রিক' বলে বর্ণনা করে। এই অভিমত ভুল। পূর্ববর্তী অংশে আমরা পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়েছি যে যুদ্ধের পরিস্থিতিটি কেবল আপেক্ষিকভাবে নিশ্চিত আর যুদ্ধ দ্রুতগতিতে প্রবাহিত (চলন্ত বা পরিবর্তিত) হওয়ার কারণে যুদ্ধের পরিকল্পনা বা নীতিও শুধুই আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী হতে পারে, এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন ও যুদ্ধের প্রবহমানতার সংগে সংগতি রেখে যথাসময়ে সেগুলিকে বদলাতে বা শুধরাতে হবে; নইলে আমরা যান্ত্রিক হয়ে পড়তাম। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী যুদ্ধের পরিকল্পনা বা নীতিকে অস্বীকার করা অবশ্যই চলবে না; এটাকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে সবকিছুকেই অস্বীকার করা—খাস যুদ্ধকে তথা খোদ অস্বীকারকারীকেও অস্বীকার করা। যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কার্যকলাপ উভয়ই আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী; তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত যুদ্ধের পরিকল্পনা বা নীতিগুলিকেও আমাদের অবশ্যই আপেক্ষিক স্থায়িত্ব দিতে হবে। যেমন, একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে উত্তর চীনে যুদ্ধের পরিস্থিতি আর অষ্টম রুট বাহিনীর বিক্ষিপ্ত

সামরিক কার্যকলাপের স্থায়ী চরিত্র থাকে বলে এই পর্যায়ে অষ্টম রুট বাহিনীর 'গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে মৌলিক, কিন্তু অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের সুযোগ হারিও না'—এই রণনীতিগত সামরিক কার্যকলাপের নীতির আপেক্ষিক স্থায়িত্বকে স্বীকার করে নেওয়া একেবারেই অপরিহার্য। উপরে উল্লিখিত রণনীতিগত নীতির কার্যকরী মেয়াদকাল থেকে যুদ্ধাভিযানগত নীতির কার্যকরী মেয়াদকালটি হ্রস্বতর, আর রণকৌশলগত নীতির মেয়াদকালটি আরও বেশি সংক্ষিপ্ততর। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাদের প্রত্যেকটিই স্থায়ী। যে-কেউ এ কথা অস্বীকার করে, যুদ্ধ পরিচালনার কোন পথই সে খুঁজে পাবে না, আর যুদ্ধের ব্যাপারে সে হয়ে পড়বে স্থির অভিমতহীন অপেক্ষবাদী, তার কাছে এটাও হয় না, ওটাও হয় না, অথবা, এটাও হয়, ওটাও হয়। এ কথা কেউই অস্বীকার করে না যে, এমনকি একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্য কার্যকরী নীতিও পরিবর্তনশীল থাকে, অন্যথায় একটি নীতিকে বাতিল করা এবং অন্য একটি নীতিকে গ্রহণ করা অসম্ভব। কিন্তু এ ধরনের পরিবর্তনশীলতা সীমিত, অর্থাৎ এই নীতিকে কার্যকরী করার নানা ধরনের সামরিক কার্যকলাপের চৌহদ্দির মধ্যে পরিবর্তন, কিন্তু এই নীতির মৌলিক প্রকৃতির পরিবর্তন নয়, অন্য কথায়, এটা পরিমাণগত পরিবর্তন, কিন্তু গুণগত নয়। একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকালে এ ধরনের মৌলিক প্রস্তুতি কোনমতেই পরবর্তনশীল নয়। কোন একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকালে আপেক্ষিক স্থায়িত্বের কথা বলতে এটাই আমরা বোঝাই। গোটা যুদ্ধের নিরঙ্কুশ প্রবহমান মহানদীর প্রতিটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে রয়েছে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব—যুদ্ধের পরিকল্পনা বা নীতির মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কে এই হচ্ছে আমাদের অভিমত।

(৯০) রণনীতিগতভাবে অন্তর্লাইনে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধ এবং যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই সম্পর্কে এবং উদ্যোগ, নমনীয়তা ও পরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোচনা করার পর, এখন আমরা সংক্ষেপে তার সারমর্ম বর্ণনা করতে পারি। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের অবশ্যই একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে। যুদ্ধের পরিকল্পনা অর্থাৎ রণনীতি ও রণকৌশলের বাস্তব প্রয়োগকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে, যাতে তাকে যুদ্ধের পরিস্থিতির উপযোগী করে নিতে পারা যায়। আমাদের সর্বত্রই নিকৃষ্টতাকে উৎকৃষ্টতায় ও নিষ্ক্রিয়তাকে উদ্যোগে রূপান্তরিত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে, যাতে করে শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার পরিস্থিতি বদলানো যায়। আর এ সবই অভিব্যক্ত হয় যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির, আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে, এবং একই সময়ে রণনীতিগতভাবে অন্তর্লাইনে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধেও তা অভিব্যক্ত হয়।

(৯১) যে যুদ্ধের বিষয়বস্তু হচ্ছে রণনীতিগতভাবে অন্তর্লাইনে চালিত, দীর্ঘস্থায়ী ও প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধের মধ্যেকার যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই, তা রূপের দিক থেকে নিজেকে প্রকাশ করে চলমান যুদ্ধে। চলমান যুদ্ধ হচ্ছে সেই যুদ্ধরূপ, যাতে নিয়মিত সৈন্যসংস্থান দীর্ঘ যুদ্ধরেখা ও বিরাট যুদ্ধাঞ্চল জুড়ে যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই চালায়। একই সময়ে, এ ধরনের আক্রমণাত্মক লড়াইকে সহজসাধ্য করার জন্য প্রয়োজনবোধে চালিত 'চলন্ত প্রতিরক্ষণও' তাতে সামিল থাকে। এতে আরও সামিল থাকে সহয়ক ভূমিকা গ্রহণ করার অবস্থানগত আক্রমণ ও অবস্থানগত প্রতিরক্ষা। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়মিত সৈন্যসংস্থানের উপস্থিতি, যুদ্ধাভিযানে ও লড়াইয়ে সৈন্যশক্তির উৎকৃষ্টতা এবং আক্রমণাত্মক ও প্রবহমান চরিত্র।

(৯২) চীনের ভূখণ্ড বিরাট, তার সৈন্যসংখ্যা বিপুল, কিন্তু তার সৈন্যবাহিনীর কারিগরী ও প্রশিক্ষণ অনুন্নত। পক্ষান্তরে, শত্রুর সৈন্যরা সংখ্যায় অপ্রতুল কিন্তু তাদের কারিগরী ও প্রশিক্ষণ বেশ উন্নত। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে সামরিক কার্যকলাপের প্রধান রূপরীতি হিসেবে আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে আক্রমণাত্মক চলমান যুদ্ধকে, আর তার পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে অপরাপর রূপরীতিকে এবং এইভাবে গঠিত হবে গোটা চলমান যুদ্ধ। 'শুধুই পশ্চাদপসরণ, কখনোই নয় অগ্রসরণ'—এই পলায়নবাদের বিরোধিতা আমরা অবশ্যই করি। আবার সেই একই সময়ে আমরা 'শুধুই অগ্রসরণ, কখনোই নয় পশ্চাদপসরণ'-এরও বিরোধিতা করি, কারণ এটি হচ্ছে বেপরোয়া হঠকারিতা।

(৯৩) চলমান যুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার প্রবহমানতা। প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসরণের ও পশ্চাদপসরণের অনুমতিই যে শুধু স্থলবাহিনীকে এই প্রবহমানতা দান করে তাই নয়, উপরন্তু তার কাছে তা দাবিও করে। যাই হোক, হান ফু-চ্যু ধরনের পলায়নবাদের[৩৫] সংগে এর কোনই মিল নেই। যুদ্ধের মৌলিক দাবি হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা, আর অন্য দাবি হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা। নিজেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা, আর শত্রুকে ধ্বংস করাই হচ্ছে আবার নিজেকে রক্ষা করার সর্বাধিক কার্যকরী উপায়।

তাই, চলমান যুদ্ধ কোনমতেই হান ফু-চ্যুর মতো লোকজনের পলায়নের অছিলা হয়ে ওঠে না ; শুধু পিছনের দিকে চলা, কখনোই সামনের দিকে নয়— এমন কথা চলমান যুদ্ধ কোনমতেই বোঝাতে পারে না। ঐ ধরনের 'চলা' চলমান যুদ্ধের মৌলিক আক্রমণাত্মক চরিত্রটিকেই নস্যাৎ করে দেয়। চীন সুবিশাল হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের 'চলার' ফলে সে জীবনপথের বাইরে 'চলে' যাবে।

(৯৪) যাই হোক, আর একটি অভিমতও ভুল—অর্থাৎ 'শুধু অগ্রসরণ, কখনোই নয় পশ্চাদপসরণ'—এটা বেপরোয়া হঠকারিতা। আমরা যে চলমান যুদ্ধের সুপারিশ করি, তার বিষয়বস্তু হচ্ছে যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগতভাবে বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই, আর তাতে সামিল থাকে অবস্থানগত যুদ্ধ যা সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং আরও সামিল থাকে 'চলন্ত প্রতিরক্ষণ' ও পশ্চাদপসরণ। এ সবগুলি ছাড়া চলমান যুদ্ধকে পুরোপুরিভাবে চালানো যেতে পারে না। বেপরোয়া হঠকারিতা হচ্ছে সামরিক অদূরদর্শিতা। প্রায়শঃই তার উদ্ভব ঘটে জমি খোয়ানোর ভয় থেকে। বেপরোয়া হঠকারীরা জানে না যে, চলমান যুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রবহমানতা, এই প্রবহমানতা স্থলবাহিনীকে যে শুধু প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসরণের ও পশ্চাদপসরণের অনুমতিই দেয় তাই নয়, উপরন্তু তার কাছে এমন দাবিও করে। সক্রিয়তার দিকে, শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল কিন্তু আমাদের পক্ষে অনুঁকূল কোন একটি লড়াইয়ে শত্রুকে টেনে নামাবার উদ্দেশ্যে সচরাচর এটাই দরকার যে, শত্রুকে থাকতে হবে চলন্ত অবস্থায়, আর আমাদের থাকতে হবে অনেক অনুকূল শর্ত, যেমন ঃ অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ, পরাজয়সাধ্য শত্রু, খবর ফাঁস হয়ে পড়া বন্ধ করতে পারে এমন স্থানীয় লোকজন, শত্রুর ক্লান্তি ও অসতর্কতা ইত্যাদি। এর জন্য দরকার হচ্ছে শত্রুর অগ্রসরণ আর আমাদের এলাকার অংশবিশেষ সাময়িকভাবে খোয়া গেলে আমাদের বিচলিত না হওয়া। কারণ আমাদের জমির আংশিক ও সাময়িক খোয়ানো হচ্ছে সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ীভাবে জমির সংরক্ষণ ও হৃত জমির পুনরুদ্ধারের মূল্য। নিষ্ক্রিয়তার দিকে, যখন আমরা বাধ্য হয়ে সৈন্যশক্তির সংরক্ষণকে মৌলিকভাবে বিপদাপন্ন করে তোলার মতো অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ি, তখন আমাদের উচিত দ্বিধা না করে পশ্চাদপসরণ করা, যাতে করে সৈন্যশক্তিকে সংরক্ষণ করা যায় ও নতুন সুযোগ গ্রহণ করে শত্রুকে আবার আঘাত হানা যায়। বেপরোয়া হঠকারীরা এই নীতি সম্পর্কে

অজ্ঞ, অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে ও নিশ্চিতরূপেই প্রতিকূল হলেও তারা একটা শহর বা একখণ্ড জমির জন্য লড়ে। ফলে, তারা যে শুধু শহরটি বা জমিটি হারায় তাই নয়, পরন্তু তাদের সৈন্যশক্তিকেও সংরক্ষিত করতে তারা ব্যর্থ হয়। সর্বদাই আমরা 'শত্রুকে প্রলুব্ধ করে আমাদের এলাকার গভীরে টেনে আনার' নীতির সপক্ষে আছি, তার কারণ এই যে, শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য রণনীতিগতভাবে প্রতিরক্ষায় রত একটা দুর্বল সৈন্যবাহিনীর পক্ষে এটি হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী সামরিক নীতি।

(৯৫) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধেঃ সামরিক কার্যকলাপের রূপরীতির মধ্যে চলমান লড়াইয়ের স্থান প্রথম, আর গেরিলা লড়াইয়ের স্থান দ্বিতীয়। আমরা যখন বলি যে গোটা যুদ্ধে চলমান লড়াই প্রধান আর গেরিলা লড়াই সহায়ক, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে, যুদ্ধের পরিণতি মুখ্যতঃ নির্ভর করে নিয়মিত লড়াইয়ের ওপরে, বিশেষ করে তার চলমান রূপরীতির ওপরে, এবং যুদ্ধের পরিণতি নির্ধারণের প্রধান দায়িত্বকে গেরিলা লড়াই বহন করতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে গেরিলা লড়াইয়ের রণনীতিগত ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গোটা প্রতিরোধ-যুদ্ধে গেরিলা লড়াইয়ের রণনীতিগত ভূমিকাটি হচ্ছে শুধুই চলমান লড়াইয়ের ভূমিকার পরে। কারণ গেরিলা লড়াইয়ের সহায়তা ছাড়া শত্রুকে আমরা পরাভূত করতে পারি না। এ কথা বলতে গিয়ে গেরিলাযুদ্ধকে চলমান যুদ্ধে বিকশিত করে তোলার রণনীতিগত কর্তব্যকেও আমরা মনে রাখি। এই দীর্ঘ ও নিষ্ঠুর যুদ্ধের মধ্যে গেরিলা লড়াই একই স্তরে থাকবে না, পরন্তু উচ্চতর স্তরে উঠে তা চলমান লড়াইয়ে বিকাশলাভ করবে। তাই গেরিলা লড়াইয়ের রণনীতিগত ভূমিকা হচ্ছে দ্বিবিধ—নিয়মিত লড়াইকে সাহায্য করা, আর নিজেকেও নিয়মিত লড়াইয়ে রূপান্তরিত করা। চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে গেরিলা লড়াইয়ের অভূতপূর্ব ব্যাপ্তি ও অভূতপূর্ব দীর্ঘস্থায়িত্বকে বিবেচনায় ধরলে তার রণনীতিগত ভূমিকাকে উপেক্ষা করা আরও অনুচিত। সেই কারণে চীনে গেরিলাযুদ্ধের যে শুধুই রণকৌশলগত সমস্যাটি আছে তাই নয়, পরন্তু তার নিজস্ব বিশেষ রণনীতিগত সমস্যাও আছে। 'জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা' নামক প্রবন্ধে আগেই আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। উপরে যেমন বলা হয়েছে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের তিনটি রণনীতিগত পর্যায়ে সামরিক কার্যকলাপের রূপরীতি হচ্ছে নিম্নরূপঃ প্রথম পর্যায়ে চলমান যুদ্ধ হচ্ছে

প্রধান, আর গেরিলাযুদ্ধ ও অবস্থানগত যুদ্ধ হচ্ছে সহায়ক। দ্বিতীয় পর্যায়ে গেরিলাযুদ্ধ প্রথম স্থানে এগিয়ে আসবে আর চলমান যুদ্ধ ও অবস্থানগত যুদ্ধ সহায়ক হবে। তৃতীয় পর্যায়ে চলমান যুদ্ধ আবার প্রধান রূপরীতি হয়ে উঠবে আর অবস্থানগত যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ হবে সহায়ক। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের চলমান যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে আগেকার নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর দ্বারা চালানো হবে না, বরং তার একটা অংশ, সম্ভবতঃ বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এমন সৈন্যবাহিনী চালাবে যারা আগে ছিল গেরিলাবাহিনী, কিন্তু তখন গেরিলাযুদ্ধ থেকে চলমান যুদ্ধের স্তরে উন্নীত হয়েছে। এ তিনটি পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের মধ্যে গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে নিশ্চিতভাবেই অপরিহার্য। আমাদের গেরিলাযুদ্ধ মানবজাতির যুদ্ধের ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব মহান নাটক প্রযোজনা করবে। এই কারণে, গোটা শত্রু-অধিকৃত এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে অস্ত্রসজ্জিত করা আর তাঁদের সংগে সমন্বয়সাধন করে গেরিলাযুদ্ধ চালানোর জন্য চীনের কয়েক মিলিয়ন নিয়মিত সৈন্যদের ভেতর থেকে অন্ততঃ কয়েক লক্ষকে বাছাই করা একেবারেই অপরিহার্য। এইভাবে বাছাই করা সৈন্যবাহিনীর উচিত এই পবিত্র কর্তব্যভারকে সচেতনভাবে কাঁধে তুলে নেওয়া। এটা তাদের ভাবা উচিত নয় যে বড় লড়াই লড়বার সুযোগ তাদের কম হবে এবং কিছু সময়ের জন্য তারা জাতীয় বীর হিসেবে দেখা দিতে পারবে না বলে তাদের পদমর্যাদা কমে গেছে। এ ধরনের ভাবটা ভুল। নিয়মিত যুদ্ধের মতো দ্রুত ফল এবং বিপুল খ্যাতি গেরিলাযুদ্ধে মেলে না, কিন্তু 'দীর্ঘ যাত্রার মাধ্যমেই ঘোড়ার শক্তির পরখ হয়, আর দীর্ঘ কর্মসাধনে মানুষের অন্তঃকরণের পরীক্ষা হয়'; আর এই দীর্ঘ ও নির্মম যুদ্ধের গতিপথে গেরিলাযুদ্ধ তার প্রচণ্ড শক্তি দেখাবে। এটা মোটেই সাধারণ কর্মভার নয়। অধিকন্তু, এই ধরনের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেরিলাযুদ্ধ চালাতে পারে, আর সমাবেশিত হলে আবার চলমান যুদ্ধও চালাতে পারে। অষ্টম রুট বাহিনী এমনই করে আসছে। অষ্টম রুট বাহিনীর নীতি হচ্ছেঃ 'গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে মৌলিক, কিন্তু অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের সুযোগ হারিও না'। এ নীতি সর্বাংশে ঠিক, এর বিরোধী সব অভিমত ভুল।

(৯৬) চীনের বর্তমান প্রযুক্তিগত স্তরে প্রতিরক্ষাত্মক ও আক্রমণাত্মক অবস্থানগত যুদ্ধ সাধারণতঃ কার্যকরী করা অসম্ভব। আর এখান থেকেই আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ

পায়। উপরন্তু, আমাদের দুর্গসংরক্ষিত অবস্থানগুলিকে পাশ কাটিয়ে চলার জন্য শত্রু আবার আমাদের দেশের সুবিশালতাকে কাজে লাগাচ্ছে। তাই অবস্থানগত যুদ্ধ আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে হতে পারে না, প্রধান পদ্ধতি হওয়া তো আরও দূরের কথা। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে চলমান যুদ্ধের পরিধির মধ্যে আংশিক অবস্থানগত যুদ্ধকে যুদ্ধাভিযানে সহায়ক ভূমিকায় নিয়োগ করা সম্ভব এবং একান্ত আবশ্যক। প্রতি পদে প্রতিরোধ করে শত্রুর সৈন্যশক্তি লাঘব করার এবং অতিরিক্ত সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত আধা-অবস্থানগত 'চলন্ত প্রতিরক্ষণ' হচ্ছে চলমান যুদ্ধের একটা আরও বেশি অপরিহার্য অঙ্গ। চীনকে অবশ্যই নিজের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের যোগান বৃদ্ধি করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে করে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে অবস্থানগত আক্রমণের কর্তব্যটি সে পুরোপুরি সম্পাদন করতে পারে। রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে অবস্থানগত যুদ্ধ নিঃসন্দেহে বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করবে। কারণ শত্রু তখন তার অবস্থানগুলিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, আর চলমান যুদ্ধের সংগে সমন্বয়সাধনের জন্য প্রচণ্ড অবস্থানগত আক্রমণ শুরু না করে আমরা আমাদের হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হব না। তৎসত্ত্বেও তৃতীয় পর্যায়ে চলমান যুদ্ধকেই যুদ্ধের মৌলিক রূপরীতি হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আমাদের অবশ্যই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপে যে ধরনের অবস্থানগত যুদ্ধ লড়া হয়েছিল, তেমন অবস্থানগত যুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল ও মানুষের সক্রিয় ভূমিকা বহুলাংশে বাতিল হয়। এটা স্বাভাবিক যে, যুদ্ধকে টেনে 'পরিখার বাইরে' আনতে হবে, কারণ যুদ্ধ লড়া হচ্ছে চীনের সুবিশাল বুকের ওপরে, আর আমাদের পক্ষ কারিগরীর দিক থেকে আরও বেশ কিছুকাল অনুন্নত থাকবে। তৃতীয় পর্যায়ে, চীনের কারিগরী অবস্থার উন্নতি হলেও, সেদিক দিয়ে চীন যে নিশ্চিতরূপেই তার শত্রুকে ছাড়িয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। আর তাই, উচ্চ মাত্রায় চলমান যুদ্ধ চালাবার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাতে বাধ্য হব। আর তা না হলে চীন চূড়ান্ত বিজয়লাভ করতে পারবে না। তাই, গোটা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে অবস্থানগত যুদ্ধকে চীন ঃ মৌলিক রূপ হিসেবে গ্রহণ করবে না। মৌলিক আর গুরুত্বপূর্ণ রূপ চলমান যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধই থাকবে। যুদ্ধের এই দুটি রূপরীতির মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল ও মানুষের সক্রিয় ভূমিকাকে কার্যকরী করার পূর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে, আমাদের দুর্ভাগ্যের জঠর থেকে এ এক সৌভাগ্যের অভ্যুদয়।

প্রধান, আর গেরিলাযুদ্ধ ও অবস্থানগত যুদ্ধ হচ্ছে সহায়ক। দ্বিতীয় পর্যায়ে গেরিলাযুদ্ধ প্রথম স্থানে এগিয়ে আসবে আর চলমান যুদ্ধ ও অবস্থানগত যুদ্ধ সহায়ক হবে। তৃতীয় পর্যায়ে চলমান যুদ্ধ আবার প্রধান রূপরীতি হয়ে উঠবে আর অবস্থানগত যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ হবে সহায়ক। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের চলমান যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে আগেকার নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর দ্বারা চালানো হবে না, বরং তার একটা অংশ, সম্ভবতঃ বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এমন সৈন্যবাহিনী চালাবে যারা আগে ছিল গেরিলাবাহিনী, কিন্তু তখন গেরিলাযুদ্ধ থেকে চলমান যুদ্ধের স্তরে উন্নীত হয়েছে। এ তিনটি পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের মধ্যে গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে নিশ্চিতভাবেই অপরিহার্য। আমাদের গেরিলাযুদ্ধ মানবজাতির যুদ্ধের ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব মহান নাটক প্রযোজনা করবে। এই কারণে, গোটা শত্রু-অধিকৃত এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে অস্ত্রসজ্জিত করা আর তাঁদের সংগে সমন্বয়সাধন করে গেরিলাযুদ্ধ চালানোর জন্য চীনের কয়েক মিলিয়ন নিয়মিত সৈন্যদের ভেতর থেকে অন্ততঃ কয়েক লক্ষকে বাছাই করা একেবারেই অপরিহার্য। এইভাবে বাছাই করা সৈন্যবাহিনীর উচিত এই পবিত্র কর্তব্যভারকে সচেতনভাবে কাঁধে তুলে নেওয়া। এটা তাদের ভাবা উচিত নয় যে বড় লড়াই লড়বার সুযোগ তাদের কম হবে এবং কিছু সময়ের জন্য তারা জাতীয় বীর হিসেবে দেখা দিতে পারবে না বলে তাদের পদমর্যাদা কমে গেছে। এ ধরনের ভাবটা ভুল। নিয়মিত যুদ্ধের মতো দ্রুত ফল এবং বিপুল খ্যাতি গেরিলাযুদ্ধে মেলে না, কিন্তু 'দীর্ঘ যাত্রার মাধ্যমেই ঘোড়ার শক্তির পরখ হয়, আর দীর্ঘ কর্মসাধনে মানুষের অন্তঃকরণের পরীক্ষা হয়'; আর এই দীর্ঘ ও নির্মম যুদ্ধের গতিপথে গেরিলাযুদ্ধ তার প্রচণ্ড শক্তি দেখাবে। এটা মোটেই সাধারণ কর্মভার নয়। অধিকন্তু, এই ধরনের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেরিলাযুদ্ধ চালাতে পারে, আর সমাবেশিত হলে আবার চলমান যুদ্ধও চালাতে পারে। অষ্টম রুট বাহিনী এমনই করে আসছে। অষ্টম রুট বাহিনীর নীতি হচ্ছেঃ 'গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে মৌলিক, কিন্তু অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের সুযোগ হারিও না'। এ নীতি সর্বাংশে ঠিক, এর বিরোধী সব অভিমত ভুল।

(৯৬) চীনের বর্তমান প্রযুক্তিগত স্তরে প্রতিরক্ষাত্মক ও আক্রমণাত্মক অবস্থানগত যুদ্ধ সাধারণতঃ কার্যকরী করা অসম্ভব। আর এখান থেকেই আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ

পায়। উপরন্তু, আমাদের দুর্গসংরক্ষিত অবস্থানগুলিকে পাশ কাটিয়ে চলার জন্য শত্রু আবার আমাদের দেশের সুবিশালতাকে কাজে লাগাচ্ছে। তাই অবস্থানগত যুদ্ধ আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে হতে পারে না, প্রধান পদ্ধতি হওয়া তো আরও দূরের কথা। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে চলমান যুদ্ধের পরিধির মধ্যে আংশিক অবস্থানগত যুদ্ধকে যুদ্ধাভিযানে সহায়ক ভূমিকায় নিয়োগ করা সম্ভব এবং একান্ত আবশ্যক। প্রতি পদে প্রতিরোধ করে শত্রুর সৈন্যশক্তি লাঘব করার এবং অতিরিক্ত সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত আধা-অবস্থানগত 'চলন্ত প্রতিরক্ষণ' হচ্ছে চলমান যুদ্ধের একটা আরও বেশি অপরিহার্য অঙ্গ। চীনকে অবশ্যই নিজের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের যোগান বৃদ্ধি করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে করে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে অবস্থানগত আক্রমণের কর্তব্যটি সে পুরোপুরি সম্পাদন করতে পারে। রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে অবস্থানগত যুদ্ধ নিঃসন্দেহে বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করবে। কারণ শত্রু তখন তার অবস্থানগুলিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, আর চলমান যুদ্ধের সংগে সমন্বয়সাধনের জন্য প্রচণ্ড অবস্থানগত আক্রমণ শুরু না করে আমরা আমাদের হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হব না। তৎসত্ত্বেও তৃতীয় পর্যায়ে চলমান যুদ্ধকেই যুদ্ধের মৌলিক রূপরীতি হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আমাদের অবশ্যই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপে যে ধরনের অবস্থানগত যুদ্ধ লড়া হয়েছিল, তেমন অবস্থানগত যুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল ও মানুষের সক্রিয় ভূমিকা বহুলাংশে বাতিল হয়। এটা স্বাভাবিক যে, যুদ্ধকে টেনে 'পরিখার বাইরে' আনতে হবে, কারণ যুদ্ধ লড়া হচ্ছে চীনের সুবিশাল বুকের ওপরে, আর আমাদের পক্ষ কারিগরীর দিক থেকে আরও বেশ কিছুকাল অনুন্নত থাকবে। তৃতীয় পর্যায়ে, চীনের কারিগরী অবস্থার উন্নতি হলেও, সেদিক দিয়ে চীন যে নিশ্চিতরূপেই তার শত্রুকে ছাড়িয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। আর তাই, উচ্চ মাত্রায় চলমান যুদ্ধ চালাবার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাতে বাধ্য হব। আর তা না হলে চীন চূড়ান্ত বিজয়লাভ করতে পারবে না। তাই, গোটা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে অবস্থানগত যুদ্ধকে চীন ঃ মৌলিক রূপ হিসেবে গ্রহণ করবে না। মৌলিক আর গুরুত্বপূর্ণ রূপ চলমান যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধই থাকবে। যুদ্ধের এই দুটি রূপরীতির মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল ও মানুষের সক্রিয় ভূমিকাকে কার্যকরী করার পূর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে, আমাদের দুর্ভাগ্যের জঠর থেকে এ এক সৌভাগ্যের অভ্যুদয়।

শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ এবং নির্মূলীকরণের যুদ্ধ

(৯৭) আগেই আমরা বলেছি, যুদ্ধের সারমর্ম বা উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধের তিনটি রূপ রয়েছে— চলমান যুদ্ধ, অবস্থানগত যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ। আর কার্যকারিতার মাত্রায় তাদের পার্থক্য রয়েছে, এ দিক থেকে যুদ্ধকে সাধারণতঃ শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধে ও নির্মূলীকরণের যুদ্ধে বিভক্ত করা যায়।

(৯৮) সর্বপ্রথমে আমরা বলতে পারি যে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হচ্ছে শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ, আবার নির্মূলীকরণের যুদ্ধও বটে। কেন ? কারণ শত্রু এখনো তার প্রবলতাকে কাজে লাগাচ্ছে, এবং রণনীতিগত উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগকে বজায় রাখছে। আর তাই, যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত নির্মূলীকরণের যুদ্ধ ছাড়া আমরা কার্যকরীভাবে এবং দ্রুতগতিতে শত্রুর প্রবলতাকে কমাতে এবং তার উৎকৃষ্টতা ও উদ্যোগকে ভাঙতে পারি না। এখনো আমাদের দুর্বলতা রয়েছে, রণনীতিগত নিকৃষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে এখনো আমরা মুক্ত হইনি, তাই যুদ্ধাভিযানগত ও লড়াইগত নির্মূলীকরণের যুদ্ধ না করলে আমরা সময় পেতে পারি না, আমাদের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতিবিধান করতে পারি না এবং আমাদের প্রতিকূল অবস্থাটিও বদলে নিতে পারি না। তাই যুদ্ধাভিযানগত নির্মূলীকরণের যুদ্ধ হচ্ছে রণনীতিগত শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধের উদ্দেশ্যসাধনের পথ। এই অর্থে নির্মূলীকরণের যুদ্ধ হচ্ছে শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ। মুখ্যতঃ নির্মূলীকরণের মাধ্যমে শত্রুর শক্তিক্ষয়করণের পদ্ধতি ব্যবহার করেই চীন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাতে পারে।

(৯৯) কিন্তু শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধাভিযানের দ্বারাও রণনীতিগত শক্তিক্ষয়করণের লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, চলমান যুদ্ধ নির্মূলীকরণের কাজ করে, শক্তিক্ষয়করণের কাজ করে অবস্থানগত যুদ্ধ আর গেরিলাযুদ্ধ এ উভয় কাজই একসঙ্গে করে। এইভাবে যুদ্ধের তিনটি রূপরীতিই পরস্পরের থেকে পৃথক। এই অর্থে নির্মূলীকরণের যুদ্ধ হচ্ছে শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধের থেকে ভিন্ন। শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধাভিযানগুলি হচ্ছে সহায়ক, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজন।

(১০০) তত্ত্বের ও প্রয়োজনের দিক থেকে বলতে গেলে, শত্রুর শক্তিকে প্রচুরভাবে ক্ষয় করার রণনীতিগত লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রতিরক্ষাত্মক পর্যায়ে চীনের উচিত চলমান যুদ্ধের মুখ্য ও গেরিলাযুদ্ধের আংশিক নির্মূলীকরণের প্রকৃতিকে ব্যবহার করা এবং অবস্থানগত যুদ্ধের (যা সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে) মুখ্য ও গেরিলাযুদ্ধের আংশিক শক্তিক্ষয়করণের প্রকৃতিকে ব্যবহার করা। ভারসাম্যের পর্যায়ে শত্রুর সৈন্যশক্তির আরও বিরাট পরিমাণ

ক্ষয়করণের উদ্দেশ্যে আমাদের উচিত গেরিলা ও চলমান যুদ্ধের নির্মূলীকরণের ও শক্তিক্ষয়করণের প্রকৃতিকে অবিচলভাবে ব্যবহার করা। এ সবেরই লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করা, ধীরে ধীরে শত্রু ও আমাদের শক্তির অনুপাতকে বদলে দেওয়া, আর আমাদের পাল্টা আক্রমণের জন্য শর্ত তৈরী করা। শেষ পর্যন্ত শত্রুকে যাতে বিতাড়িত করা যায়, তার জন্য রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের সময়ে আমাদের উচিত হবে নির্মূলীকরণের মাধ্যমে শত্রুর শক্তি—ক্ষয়করণের পদ্ধতিকে অব্যাহতভাবে প্রয়োগ করা।

(১০১) কিন্তু বস্তুতঃ, বিগত দশ মাসে আমাদের অভিজ্ঞতা হল যে, চলমান যুদ্ধাভিযানগুলির অনেকগুলি, এমনকি অধিকাংশগুলিই শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধাভিযানে পরিণত হয়েছিল ; আর কোন কোন এলাকায় গেরিলাযুদ্ধের সঠিক নির্মূলীকরণের ভূমিকাটি যথাযথভাবে সম্পাদিত করা হয়নি। এ অবস্থার ভাল দিকটি হচ্ছে এই যে, অন্ততঃপক্ষে আমরা শত্রুর শক্তিকে ক্ষয় করেছিলাম, আর তা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও আমাদের চূড়ান্ত বিজয়—উভয়ের জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ, তাই বৃথাই আমাদের নিজেদের রক্ত ঢালিনি। কিন্তু ত্রুটি হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ শত্রুর শক্তিকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয় করিনি ; আর দ্বিতীয়তঃ, বেশ গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি আমরা এড়াতে অসমর্থ হয়েছিলাম এবং যুদ্ধে শত্রুর দ্রব্যসামগ্রী আমরা কম দখল করেছিলাম। এই পরিস্থিতির বাস্তব কারণটিকে, অর্থাৎ প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জামে এবং সৈন্যদের প্রশিক্ষণে আমাদের ও শত্রুর মধ্যেকার অসমতাকে আমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত হলেও, যাই ঘটুক না কেন, তত্ত্বগতভাবে এবং বাস্তবিকপক্ষে এটা জোর দিয়ে বলা দরকার যে, যখনই পরিবেশ অনুকূল হয়, তখনই আমাদের প্রধান সৈন্যবাহিনীর উচিত সক্রিয়ভাবে নির্মূলীকরণের যুদ্ধ চালানো। অন্তর্ঘাত ও হয়রানি করার মতো অনেক নির্দিষ্ট কাজ করতে গিয়ে গেরিলাবাহিনীগুলিকে বিশুদ্ধ শক্তিক্ষয়ী লড়াই চালাতে হলেও, পরিবেশ যখনই অনুকূল হয় তখনই নির্মূলীকরণের যুদ্ধাভিযান ও লড়াইয়ের সুপারিশ করা ও সক্রিয়ভাবে সম্পাদন করা দরকার, যাতে করে প্রভূত পরিমাণে শত্রুর ক্ষতিসাধন করা যায় , আর আমাদের নিজেদের শক্তিকে প্রভূত পরিমাণে পূরণ করে নেওয়া যায়।

(১০২) বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে যেগুলিকে আমরা 'বহির্লাইন', 'দ্রুত নিষ্পত্তি' এবং 'আক্রমণাত্মক' বলি, আর চলমান যুদ্ধে যেটাকে আমরা 'চলমান' বলি—সে সবগুলিই লড়াইয়ের রূপের দিক থেকে মুখ্যতঃ অভিব্যক্ত হয় ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্ব বা পিছনে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশলের প্রয়োগে। তাই প্রয়োজন উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা। সুতরাং সৈন্যশক্তির কেন্দ্রীভূতকরণ আর ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে

শত্রুর পার্শ্ব বা পিছনে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশলের প্রয়োগ হচ্ছে চলমান যুদ্ধ চালাবার অর্থাৎ বহির্লাইনে দ্রুত নিষ্পত্তির আক্রমণাত্মক লড়াই চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। এ সবের লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুকে নির্মূল করা।

(১০৩) জাপানী সৈন্যবাহিনীর শক্তি শুধু যে তার অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে তাই নয়, পরন্তু যে শক্তি নিহিত রয়েছে তার অফিসার ও সৈন্যদের প্রশিক্ষণেও—তার সংগঠনের মাত্রায়, অতীতে পরাজিত না হওয়া থেকে উদ্ভূত তার আত্মবিশ্বাসে, জাপানী সম্রাটের ও দেবতার ওপরে তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে, তার দাম্ভিকতা ও আত্মমর্যাদায়, চীনা জনগণ সম্পর্কে তার অবহেলায় এবং এ ধরনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে। এ সবই আসে জাপানী যুদ্ধবাজদের দ্বারা কৃত বহু বছরের সমরবাদী শিক্ষা থেকে আর আসে জাপানের জাতীয় ঐতিহ্য থেকে। জাপানী সৈন্যদের প্রচুর সংখ্যককে হতাহত করা সত্ত্বেও আমরা কেন যে অত্যন্ত কম সংখ্যককেই বন্দী করতে পেরেছিলাম, তার মুখ্য কারণ হচ্ছে এইটি। অতীতে অনেকেই এটা উপেক্ষা করেছে। শত্রুর এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধ্বংস করার জন্য দরকার একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার। সর্বপ্রথমে আমাদের দরকার এসব বৈশিষ্ট্যের ওপরে মনোযোগ দেওয়া এবং তারপরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক প্রচার ও জাপানী জনগণের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে এই বিষয় নিয়ে ধৈর্যশীলভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাওয়া; আর সামরিক ক্ষেত্রে নির্মূলীকরণের লড়াইও হচ্ছে অন্যতম পদ্ধতি। শত্রুর এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের ভিত্তি পেতে পারে হতাশাবাদীরা, আবার নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের বিরোধিতার ভিত্তি পেতে পারে নিষ্ক্রিয় মনোভাবাপন্ন রণবিশারদরা। কিন্তু এর বিপরীতে, আমরা এইমত পোষণ করি যে, জাপানী সৈন্যবাহিনীর এইসব শ্রেষ্ঠ উপাদানকে ধ্বংস করতে পারা যায় এবং তাদের ধ্বংস ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সেগুলিকে ধ্বংস করার প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে রাজনীতিগতভাবে জাপানী সৈন্যদেরকে স্বপক্ষে টেনে নেওয়া। তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত করা থেকে আমাদের বরং উচিত তাদের এই আত্মমর্যাদাকে বোঝা আর সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং যুদ্ধবন্দীদের প্রতি উদার ব্যবহারের দ্বারা জাপানী শাসকদের জনবিরোধী আগ্রাসী নীতির চরিত্রটি বুঝতে জাপানী সৈন্যদেরকে শিক্ষা দেওয়া। অন্যদিকে জাপানী সৈন্যদের সামনে আমাদের প্রদর্শন করা উচিত চীনা সৈন্যবাহিনীর ও চীনা জনগণের অদম্য মনোবল এবং বীরোচিত ও অনমনীয় সংগ্রামী শক্তি। এটাই হচ্ছে নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের মাধ্যমে শত্রুদের ওপরে প্রচণ্ড আঘাত হানা। সামরিক কার্যকলাপের গত দশ মাসের আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, শত্রুর সৈন্যশক্তিকে নির্মূল করা সম্ভব—পিংসিংকুয়ান আর তাইএরচুয়াংয়ের

যুদ্ধাভিযানগুলি হচ্ছে এর স্পষ্ট প্রমাণ। জাপানী সৈন্যবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, তার সৈন্যরা যুদ্ধের উদ্দেশ্য বোঝে না, চীনা সৈন্যবাহিনী ও চীনা জনগণের দ্বারা তারা পরিবেষ্টিত, প্রবলবেগে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস চীনা সৈন্যদের তুলনায় তারা অনেক কম দেখায়, ইত্যাদি—এসবই হচ্ছে আমাদের পক্ষে নির্মূলীকরণের লড়াই চালানোর অনুকূল বাস্তব শর্ত, আর সেগুলি আবার যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠার সংগে সংগে দিনের পর দিন বিকশিত হয়ে উঠবে। নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে শত্রুবাহিনীর বিহ্বলকর ঔদ্ধত্যকে ধ্বংস করার দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের নির্মূলীকরণের লড়াই হচ্ছে যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করার এবং জাপানী সৈন্যদের ও জাপানী জনগণের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করার শর্তগুলির অন্যতম। বিড়াল বিড়ালের সংগেই বন্ধুত্ব করে, দুনিয়ার কোথাও বিড়াল ইঁদুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না।

(১০৪) অপরপক্ষে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বর্তমানে প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জামে ও সৈন্যদের প্রশিক্ষণে শত্রুর থেকে আমরা নিকৃষ্ট। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে লড়াইটা যখন সমতল ভূমিতে ঘটে, তখন শত্রুবাহিনীর গোটাটিকে অথবা তার বৃহত্তর অংশকে বন্দী করার মতো চরম মাত্রার নির্মূলীকরণ কঠিন। এই ব্যাপারে দ্রুত বিজয়ের মতবাদীদের অতিরিক্ত দাবিগুলি ভুল। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে সঠিক দাবি এটাই হওয়া উচিত যে, যথাসম্ভব নির্মূলীকরণের যুদ্ধ চালাতে হবে। অনুকূল অবস্থায় প্রতিটি লড়াইয়ে আমাদের উচিত উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা, আর ঘেরাও করার ও ঘুরে ঘুরে শত্রুর পার্শ্ব বা পিছনে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশল কাজে লাগানো—শত্রুর যাবতীয় সৈন্যশক্তিকে ঘেরাও করতে না পারলেও তার একটা অংশকে ঘেরাও করতে হবে, পরিবেষ্টিত সৈন্যশক্তির সবটাকে না পারলেও তার একটা অংশকে বন্দী করতে হবে, আর পরিবেষ্টিত সৈন্যশক্তির এক অংশকে বন্দী করতে না পারলেও সেই অংশকে বহুল পরিমাণে হতাহত করতে হবে। নির্মূলীকরণের লড়াইয়ের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের করতে হবে শক্তিক্ষয়ী লড়াই। নিমূর্লীকরণের লড়াইয়ে আমাদের উচিত সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করার নীতি কাজে লাগানো, আর শক্তিক্ষয়ী লড়াইয়ে আমাদের উচিত সৈন্যশক্তিকে ছড়িয়ে দেওয়ার নীতি কাজে লাগানো। যুদ্ধাভিযানে পরিচালনার সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের উচিত প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত পরিচালনার নীতি, আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকৃত পরিচালনার নীতি প্রয়োগ করা। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রণক্ষেত্রে এইসবই হচ্ছে সামরিক কার্যকলাপের মৌলিক নীতিমালা।

শত্রুর ভুলত্রুটির সুযোগ নেওয়ার সম্ভাব্যতা

(১০৫) শত্রুকে পরাজিত করার সম্ভাব্যতার ভিত্তি রয়েছে শত্রুর পরিচালনার ক্ষেত্রেও। কোন ভুল করেনি এমন সেনাপতি ইতিহাসে কোনদিনই ছিল না। আমরা নিজেরা যেমন ভুল করা এড়াতে পারি না, শত্রুও ঠিক তেমনই ভুল করে। তাই শত্রুর ভুলত্রুটির সুযোগ নেওয়ার সম্ভাব্যতা থেকে যায়। রণনীতি ও যুদ্ধাভিযানের দিক থেকে বলতে গেলে, আগ্রাসী যুদ্ধের দশ মাসে শত্রু ইতিমধ্যেই অনেক ভুল করে বসেছে। এর মধ্যে পাঁচটা ভুল গুরুতর।

প্রথমতঃ, সৈন্যশক্তি অল্প অল্প করে আনা। এর কারণ চীন সম্পর্কে শত্রুর উপেক্ষা আর তার নিজের সৈন্যস্বল্পতাও বটে। শত্রু সর্বদাই আমাদের ছোট মনে করে। স্বল্প আয়াসে চারটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশকে ছিনিয়ে আত্মসাৎ করে নেবার পরে সে পূর্ব হোপেই ও উত্তর চাহার দখল করে। এসবকে শত্রুর রণনীতিগত পর্যবেক্ষণ হিসেবে গণ্য করা যায়। এর মাধ্যমে শত্রু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, চীনা জাতি হচ্ছে একটা আলগা বালির স্তূপ। তাই, একটামাত্র আঘাতেই চীন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে ভেবে শত্রু তথাকথিত 'দ্রুত নিষ্পত্তির' একটা পরিকল্পনা রচনা করেছিল, আর অত্যন্ত কম সৈন্যশক্তি নিয়ে চেষ্টা করেছিল আমরা যাতে ভয়ে ইতস্ততঃ ছুটে পালাই। বিগত দশ মাসে চীন যে প্রচণ্ড ঐক্য ও বিপুল প্রতিরোধ শক্তি দেখিয়েছে, তা সে ভাবেনি। সে ভুলে গিয়েছিল যে, চীন ইতিপূর্বে প্রগতির যুগে এসে গেছে, এবং তার রয়েছে একটি অগ্রণী পার্টি, একটি অগ্রণী সৈন্যবাহিনী ও অগ্রণী জনগণ। বাধাবিপত্তির মুখে পড়ে সে তখন তার সৈন্যশক্তিকে একটু একটু করে বাড়াল—সৈন্যসংখ্যা দশাধিক ডিভিসন থেকে বাড়িয়ে ত্রিশ ডিভিসনে তুলল। যদি সে আরও এগুতে চায় তাহলে সৈন্যসংখ্যা তার আরও বাড়াতে হবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে শত্রুতার কারণে এবং তার নিজের জনবল ও অর্থবলের স্বল্পতার কারণে যে বৃহত্তম সংখ্যক সৈন্য সে চীনে নিয়োগ করতে পারে এবং তার অগ্রগমনের যে দূরতম বিন্দু অবধি সে যেতে পারে, তার একটা অনিবার্য সীমারেখা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, আক্রমণের মুখ্য গতিমুখের অভাব। তাইএরচুয়াং যুদ্ধাভিযানের আগে শত্রু তার সৈন্যশক্তিকে মোটামুটি সমান সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল মধ্য চীন ও উত্তর চীনের মধ্যে, আর দুই এলাকার অভ্যন্তরেও আবার সমানভাবে সৈন্যশক্তি ভাগ করে দিয়েছিল। যেমন, উত্তর চীনে তার সৈন্যশক্তিকে সে তিয়েনসিন-পুখৌ, পিপিং-হানখৌ আর তাতুং-

পুচৌ—এই তিনটি রেলপথের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিল। এই পথগুলির প্রত্যেকটির সৈন্য কিছু হতাহত হয়েছে, আর অধিকৃত এলাকায় সে কিছু রক্ষী সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছে। এ সবের ফলে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যশক্তি তার থাকল না। তাইএরচুয়াংয়ের পরাজয়ে শত্রু শিক্ষালাভ করে তার মুখ্য সৈন্যশক্তিকে স্যুচৌয়ের অভিমুখে সমাবেশ করেছে আর এইভাবে এই ভুলটিকে সাময়িকভাবে শুধরে নিয়েছে।

তৃতীয়তঃ, রণনীতিগত সমন্বয়সাধনের অভাব। মধ্য চীনে ও উত্তর চীনে শত্রুবাহিনীর গ্রুপ দুটির প্রত্যেকটির ভেতরে মোটামুটিভাবে সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু এই দুটির মধ্যে সমন্বয়ের খুবই অভাব। তিয়েনসিন—পুখৌ রেলপথের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত শত্রুবাহিনী যখন সিয়াওপাংপু আক্রমণ করছিল, তখন উত্তর অংশে অবস্থিত শত্রুবাহিনী নিষ্ক্রিয় ছিল ঃ আবার উত্তর অংশে অবস্থিত শত্রুবাহিনী যখন তাইএরচুয়াং আক্রমণ করছিল, তখন দক্ষিণ অংশে অবস্থিত শত্রুবাহিনী নিষ্ক্রিয় ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই শত্রু দুর্দশায় পড়ার পরে, জাপানের স্থলবাহিনীর মন্ত্রী পরিদর্শন—সফরে এসে পৌঁছেছিল, আর নেতৃত্বভার গ্রহণের জন্য ছুটে এসেছিল চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ। এর ফলে কোনরকমে সাময়িকভাবে সমন্বয়সাধন হয়েছে। জাপানের জমিদার, বুর্জোয়াশ্রেণী এবং যুদ্ধবাজদের ভেতরে বেশ গুরুতর দ্বন্দ্ব রয়েছে, এ ধরনের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ বাড়ছে, আর সামরিক সমন্বয়ের অভাব সেই দ্বন্দ্বেরই বাস্তব অভিব্যক্তিগুলির অন্যতম।

চতুর্থতঃ, রণনীতিগত সুবিধাসুযোগকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে ব্যর্থতা। নানকিং আর তাইয়ুয়ান দখল করে নেবার পরে শত্রুর বিরতিতে এই ব্যর্থতা সুস্পষ্টভাবে প্রকট হয়েছিল। এটা ঘটেছিল মুখ্যতঃ তার সৈন্যশক্তির স্বল্পতা ও রণনীতিগত পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈন্যবাহিনীর অভাবের কারণে।

পঞ্চমতঃ, বিরাট সংখ্যক পরিবেষ্টন অথচ স্বল্প সংখ্যক নির্মূলীকরণ। তাইএরচুয়াং যুদ্ধাভিযানের আগে, শাংহাই, নানকিং, ছ্যাংচৌ, পাওতিং, নানখৌ, সিনখৌ আর লিনফেনের যুদ্ধাভিযানগুলিতে বহু চীনা বাহিনীকে পরাজিত করা হয়েছিল, কিন্তু বন্দী করা হয়েছিল সামান্যই। এটা শত্রুর পরিচালনার মূর্খতারই প্রমাণ।

এই পাঁচটি ভুল—সৈন্যশক্তি অল্প অল্প করে আনা, আক্রমণের মুখ্য গতিমুখের অভাব, রণনীতিগত সমন্বয়সাধনের অভাব, সুবিধাসুযোগকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে ব্যর্থতা এবং বিরাট সংখ্যক পরিবেষ্টন অথচ স্বল্প সংখ্যক নির্মূলীকরণ—

ছিল তাইএরচুয়াং যুদ্ধাভিযানের আগে জাপানী পরিচালনার অযোগ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ। তাইএরচুয়াং যুদ্ধাভিযানের পর শত্রু কিছুটা উন্নতিসাধন করেছে, কিন্তু তবুও তার সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতা, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য কারণের দরুন ভুলের পুনরাবৃত্তি সে এড়াতে পারে না। উপরন্তু, এক জায়গায় যদিও সে কিছু লাভ করে, অন্য জায়গায় সে আবার কিছু খুইয়ে বসে। যেমন, উত্তর চীনে অবস্থিত তার সৈন্যশক্তিকে সে যখন স্যুচৌয়ে সমাবেশ করেছিল, তখন উত্তর চীনের অধিকৃত এলাকায় সে একটা বিরাট ফাঁক রেখেছিল, আর তাই গেরিলাযুদ্ধকে বিকশিত করে তোলার পূর্ণ সুযোগ আমাদের দিয়েছিল। এইসব ভুলত্রুটিগুলি কিন্তু শত্রুর নিজেরই সৃষ্টি, আমাদের দ্বারা প্ররোচিত নয়। আমাদের দিক থেকে, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে শত্রুকে দিয়ে ভুলত্রুটি করাতে পারি, অর্থাৎ সুসংগঠিত জনসাধারণের সহায়তায় বুদ্ধিমত্তার ও কার্যকরী চালের মাধ্যমে শত্রুর মধ্যে ভ্রান্ত অনুভবের সৃষ্টি করতে পারি, আর কৌশলে তাকে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী চলতে বাধ্য করতে পারি, যেমন, 'পূর্বদিকে আক্রমণের ভান করে পশ্চিমদিকে আক্রমণ করার' মতো পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করতে পারি। এর সম্ভাবনার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ওপরের এ সবকিছু এটাই প্রমাণ করে যে, শত্রুর পরিচালনার মধ্যেও আমরা আমাদের বিজয়ের কিছু ভিত্তি পেতে পারি। অবশ্য, রণনীতিগত পরিকল্পনার জন্য তাকে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে ধরা আমাদের উচিত হবে না, বরং—শত্রু স্বল্প সংখ্যক ভুলত্রুটি করবে—এই অনুমানের ওপরে আমাদের পরিকল্পনাকে স্থাপন করাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য পথ। তাছাড়া, আমরা যেমন শত্রুর ভুলত্রুটির সুযোগ নিয়ে তা আমাদের কাজে লাগাতে পারি, শত্রুও তেমনি আমাদের ভুলত্রুটির সুযোগ নিয়ে তা তাদের কাজে লাগাতে পারে। তাই শত্রুকে এমন সুযোগ যথাসম্ভব কম দেওয়াই হচ্ছে আমাদের পরিচালনার কর্তব্য। তবু বস্তুতঃ, শত্রুর পরিচালনায় ভুল হয়েছিল, এবং ভবিষ্যতে আবারও ভুল ঘটবে, আর আমাদের প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে তাকে তেমন করতে আমরা বাধ্যও করতে পারি। এইসব ভুলত্রুটির সুযোগ আমরা নিতে পারি। সেগুলিকে কাজে লাগাবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা করা হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের সেনাপতিদের কাজ। যাই হোক, শত্রুর রণনীতিগত ও যুদ্ধাভিযানগত পরিচালনার অনেকটাই অযোগ্য হলেও, তার লড়াই পরিচালনায় অর্থাৎ তার ইউনিট ও ক্ষুদ্রাকার সৈন্যসংস্থানের রণকৌশলে বেশ কিছু চমৎকার বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। এ ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নির্ধারক লড়াইয়ের প্রশ্ন

(১০৬) জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নির্ধারক লড়াইয়ের প্রশ্নটিকে তিন দিক থেকে বিচার করে দেখতে হবেঃ যে যুদ্ধাভিযানে বা লড়াইয়ে জয় সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত, তেমন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের উচিত দৃঢ়ভাবে নির্ধারক লড়াই চালানো; যে যুদ্ধাভিযানে বা লড়াইয়ে জয় সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই, তেমন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের উচিত নির্ধারক লড়াইকে এড়ানো; আর যে রণনীতিগত নির্ধারক লড়াইয়ে গোটা জাতির ভাগ্য বাজি রাখা হয় এমন লড়াইকে আমাদের নিশ্চয়ই এড়ানো উচিত। অন্যান্য অনেক যুদ্ধের থেকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পার্থক্য প্রকাশ পায় নির্ধারক লড়াইয়ের এই প্রশ্নেও। যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন শত্রু শক্তিশালী আর আমরা দুর্বল, তখন শত্রু চায় যাতে আমরা আমাদের মুখ্য সৈন্যশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে তাদের সংগে নির্ধারক লড়াই লড়ি। আর আমরা যা চাই তা ঠিক এর বিপরীত, আমাদের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ বাছাই করে, উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করে আর জয় সম্পর্কে যখন আমরা নিশ্চিত, শুধু তখনই নির্ধারক যুদ্ধাভিযান বা লড়াই চালাতে আমরা চাই। যেমন, পিংসিংকুয়ান, তাইএরচুয়াং আর অন্যান্য অনেক জায়গায় লড়াইয়ে করেছিলাম; প্রতিকূল পরিবেশে আমরা যখন জয় সম্পর্কে নিশ্চিত নই, তখন আমরা চাই নির্ধারক লড়াইকে এড়াতে, যেমন চাংতে ও অন্যান্য জায়গার যুদ্ধাভিযানে এ নীতিই আমরা গ্রহণ করেছিলাম। আর রণনীতিগতভাবে যে নির্ধারক লড়াইয়ে গোটা জাতির ভাগ্যকে বাজি রাখা হয়, তেমন লড়াই আমরা অবশ্যই লড়ব না। যেমন সাম্প্রতিক স্যুচৌ থেকে পশ্চাদপসরণ। এইভাবে শত্রুর 'দ্রুত নিষ্পত্তির' পরিকল্পনাকে বানচাল করা হল, আর তখন আমাদের সংগে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ না লড়ে সে আর পারে না। ভূ-আয়তন যার ছোট, তেমন দেশে এ ধরনের নীতি অকার্যকর, আবার রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ দেশেও এগুলি কার্যকরী করা কঠিন। এগুলি চীনে কার্যকর, কারণ চীন হচ্ছে বিরাট দেশ আর এখন সে রয়েছে তার প্রগতির যুগে। যদি রণনীতিগতভাবে নির্ধারক লড়াই এড়িয়ে যেতে পারি, তাহলে আমরা নিজের শক্তি সংরক্ষণ করতে পারব—'সবুজ পাহাড় যত দিন আছে, জ্বালানি কাঠের চিন্তা নেই'। আমাদের কতকগুলি এলাকা খোয়া গেলেও কৌশলী অভিযানের জন্য তখনো আমাদের প্রচুর বিস্তৃত এলাকা থাকবে। আর এইভাবেই আমরা সমর্থ হব দেশের আভ্যন্তরীণ প্রগতি ও আন্তর্জাতিক সাহায্যের বৃদ্ধি এবং শত্রুর আভ্যন্তরীণ সংহতির ভাঙনকে ত্বরান্বিত করতে, এবং তার জন্য প্রতীক্ষা করতে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের

পক্ষে সেটাই হচ্ছে সেরা নীতি। দ্রুত বিজয়ের ধৈর্যহীন মতবাদীরা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কঠোর দুর্দশা সইতে অক্ষম আর শীঘ্র জয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষী। পরিস্থিতিটি যে মুহূর্তে একটু অনুকূল মোড় নেয়, তখনই তারা রণনীতিগতভাবে নির্ধারক লড়াইয়ের জন্য চেঁচায়। তারা যা চায় তাই করা হলে গোটা যুদ্ধের অভাবনীয় ক্ষতিসাধন করা হবে, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, আর শত্রুর মরণ-ফাঁদে আমরা পড়ে যাব। সত্যিই সেটা হবে সবচেয়ে খারাপ নীতি। নির্ধারক লড়াই যদি আমরা এড়াতে চাই, তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের ভূখণ্ড ছাড়তে হবে। ভূখণ্ড ছাড়াটা যখন একেবারে অপরিহার্য হয়ে ওঠে তখন (এবং একমাত্র তখনই) আমাদের দ্বিধাহীনভাবে ভূখণ্ড ছাড়তে হবে। এমন সময়ে সামান্যতম ইতস্ততঃ করাও আমাদের উচিত নয়, কারণ এটা হচ্ছে সময় পাওয়ার জন্য জমি দেওয়ার সঠিক নীতি। ইতিহাসে নির্ধারক লড়াই এড়াবার জন্য রাশিয়া সাহসের সংগে পশ্চাদপসরণ করেছিল এবং এভাবে যুগ-ত্রাস নেপোলিয়নকে পরাভূত করেছিল[৩৬]। আজ চীনেরও তেমন করা উচিত।

(১০৭) 'অ-প্রতিরোধী' হিসেবে নিন্দিত হবার ভয়ে আমরা কি ভীত নই? না, আমরা ভীত নই। আদৌ যুদ্ধ না করা, শত্রুর সংগে আপোষ করা—সেটাই হচ্ছে অপ্রতিরোধবাদ। তাকে যে শুধু নিন্দা করা উচিত তাই নয়, পরন্তু তাকে কোনমতেই বরদাস্ত করা চলবে না? আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাই; কিন্তু শত্রুর মরণ-ফাঁদটিকে এড়াবার উদ্দেশ্যে, আমাদের বাহিনীর মুখ্য শক্তিকে শত্রুর একটিমাত্র আঘাতে শেষ হয়ে যেতে না দেওয়ার জন্য, এবং এইভাবে যাতে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে কঠিন না হয়ে ওঠে সেজন্য—সংক্ষেপে বলতে গেলে, জাতীয় পরাধীনতাকে এড়াবার জন্য রণনীতিগত নির্ধারক লড়াই এড়ানো একেবারেই অপরিহার্য। এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে যুদ্ধের ব্যাপারে অদূরদর্শী হওয়া, আর এমন করার ফল হবে অবশ্যই নিজেকে জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীদের দলে নিয়ে যাওয়া। 'শুধু অগ্রসরণ, কখনই নয় পশ্চাদপসরণের' বেপরোয়া হঠকারিতার সমালোচনা আমরা করেছিলাম, কারণ, এ ধরনের বেপরোয়া হঠকারিতা যদি রেওয়াজ হয়ে উঠত, তাহলে সেটা আমাদের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে অসম্ভব করে তুলত এবং শেষে আমাদের জাতীয় পরাধীনতার বিপদের মুখে ফেলে দিত।

(১০৮) অনুকূল পরিবেশ আমরা নির্ধারক লড়াইয়ের পক্ষে, তা সে লড়াইয়েই হোক, কিংবা বড় বা ছোট যুদ্ধাভিযানেই হোক। এ ব্যাপারে আমরা কোনমতেই নিষ্ক্রিয়তাকে বরদাস্ত করব না। শুধুমাত্র এই ধরনের নির্ধারক

লড়াইয়ের মাধ্যমেই আমরা অর্জন করতে পারি শত্রুর সৈন্যশক্তির নির্মূলীকরণের অথবা শক্তিক্ষয়করণের লক্ষ্য, আর জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে প্রতিটি সৈন্যকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে এ ধরনের লড়াই চালাতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রভূত পরিমাণ আংশিক আত্মত্যাগ প্রয়োজন। যারা কাপুরুষ আর যারা জাপানের ভয়ে জর্জরিত, তাদের মনোভাব হচ্ছে যে-কোন-রকমের আত্মত্যাগ এড়ানো। অবশ্য দৃঢ়ভাবে এ মনোভাবের বিরোধিতা করতে হবে। লি ফু-ইং, হান ফু-চ্যু ও অন্যান্য পলায়নবাদীদের মৃত্যুদণ্ড ন্যায়সঙ্গত ছিল। সঠিক সামরিক কার্যকলাপের পরিকল্পনার ভিত্তিতে যুদ্ধে শৌর্যদৃপ্ত আত্মত্যাগ এবং বীরত্বপূর্ণ অগ্রসরণের মনোবৃত্তি ও কার্যকলাপকে উৎসাহ দান হচ্ছে একান্ত অপরিহার্য আর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের চালনা ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের সংগে অবিচ্ছেদ্য। আমরা 'শুধু পশ্চাদপসরণ, কখনই নয় অগ্রসরণের' পলায়নবাদের কঠোর নিন্দা করেছি আর শৃংখলানিষ্ঠার প্রবর্তনকে সমর্থন করেছি, কারণ সঠিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে বীরত্বপূর্ণ নির্ধারক লড়াইয়ের ভেতর দিয়েই শুধু আমরা পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাভূত করতে পারি ; পক্ষান্তরে পলায়নবাদীরা জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন যোগায়।

(১০৯) প্রথমে বীরত্বপূর্ণভাবে লড়া এবং পরে ভূখণ্ড ছেড়ে আসা কি পরস্পরবিরোধী নয়? আমাদের বীর যোদ্ধাদের কি তাতে বৃথাই নিজেদের রক্তপাত করা হবে না? প্রশ্নগুলিকে উপস্থাপিত করার পদ্ধতি এটি আদৌ নয়। খাওয়া আর তারপরেই মলত্যাগ করা, এটা কি বৃথাই খাওয়া নয়? ঘুমানো আর তারপরেই জেগে ওঠা, এটা কি বৃথাই ঘুমানো নয়? প্রশ্নগুলিকে কি এভাবে উপস্থাপিত করা যায় ? আমি তো মনে করি, তা যায় না। অনবরত খেয়ে চলা, সর্বদা ঘুমিয়ে থাকা, বীরত্বপূর্ণভাবে লড়তে লড়তে না থেমে ইয়ালু নদী অবধি সারাটি পথ আসা, এসবই হচ্ছে আত্মমুখী আর আনুষ্ঠানিকতাবাদী কল্পনা, জীবনের বাস্তবতা নয় ! প্রত্যেকেই যেমন জানে, সময় পাবার জন্য এবং পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নেবার জন্য রক্ত ঢেলে লড়াই করেও কিছু ভূখণ্ড আমাদের ছেড়ে দিতে হয়েছে, তবুও আমরা সময় পেয়েছি, শত্রুর সৈন্যশক্তির নির্মূলীকরণের ও শক্তিক্ষয়করণের লক্ষ্য অর্জন করেছি, যুদ্ধ চালনার অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি ; অসচেতন জনগণকে আমরা জাগিয়ে তুলেছি, আর আমাদের আন্তর্জাতিক মর্যাদাকে বাড়িয়েছি। আমাদের রক্ত ঢালা কি বৃথাই গেছে? নিশ্চয় নয়। জমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের সামরিক শক্তিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, এবং জমি রক্ষা করার জন্যও বটে ; কারণ প্রতিকূল অবস্থায় যদি জমির কিছু অংশ আমরা ছেড়ে না দিই, পরন্তু

জয়লাভের ন্যূনতম নিশ্চয়তা ছাড়াই আমরা যদি অন্ধভাবে নির্ধারক লড়াই লড়ি, তাহলে আমরা আমাদের সামরিক শক্তি খোয়ানোর পর আমাদের যাবতীয় জমিই অবশ্যম্ভাবীরূপে খুইয়ে বসব; হৃত জমি পুনরুদ্ধারের কথা তো বলারই নয়। ব্যবসা চালানোর জন্য পুঁজিপতির অবশ্যই পুঁজি থাকতে হবে, সে যদি তার সবটা পুঁজিই খুইয়ে বসে তাহলে সে আর তখন পুঁজিপতি থাকবে না। এমনকি বাজি ধরার জন্য জুয়াড়ীরও অবশ্যই টাকা থাকতে হয়, তার সবটা টাকাই যদি সে একটিমাত্র দানে ধরে বসে এবং ভাগ্য যদি তার বিরূপ হয়, তাহলে সে আর জুয়া খেলতে পারে না। ঘটনাপ্রবাহ আঁকাবাঁকা ও আবর্তন-বিবর্তনমূলক, আর ঘটনাপ্রবাহ সোজা সরল পথরেখা ধরে চলে না। যুদ্ধও কোন ব্যতিক্রম নয়। শুধু আনুষ্ঠানিকতাবাদীরাই এই সত্যকে উপলব্ধি করতে অসমর্থ।

(১১০) আমি মনে করি, রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে নির্ধারক লড়াইয়ের ব্যাপারেও এই একই কথা খাটবে। তখন শত্রু এসে পড়বে নিকৃষ্ট অবস্থিতিতে আর আমরা পৌঁছে যাব উৎকৃষ্ট অবস্থিতিতে। তা সত্ত্বেও 'সুবিধাজনক নির্ধারক লড়াইগুলি লড়ার আর অসুবিধাজনক নির্ধারক লড়াইগুলিকে এড়ানোর' নীতি তখনো খাটবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ইয়ালু নদীর তীরে লড়তে লড়তে পৌঁছাই, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নীতি খাটবে। এইভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের উদ্যোগ বজায় রাখতে সক্ষম হব। শত্রুর 'চ্যালেঞ্জ' আর অন্য লোকজনের 'বিদ্রূপমূলক প্ররোচনাকে' আমাদের উত্তেজনাহীনভাবে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া উচিত, সেগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে যেসব সেনাপতি এ ধরনের দৃঢ়তা দেখায়, শুধু তাদেরই সাহসী ও বিজ্ঞ বলে মনে করা যেতে পারে। 'ছুঁলেই লাফিয়ে ওঠে' যারা, এটি তাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আমরা কম-বেশি রণনীতিগতভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থানে থাকি, কিন্তু প্রতিটি যুদ্ধাভিযানে আমাদের উদ্যোগ থাকা উচিত, আর পরবর্তী সমস্ত পর্যায়ে উদ্যোগ অবশ্যই থাকা উচিত আমাদের হাতে। আমরা হচ্ছি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও চূড়ান্ত বিজয়ের পক্ষে। যে জুয়াড়ী একটিমাত্র দানেই তার সবকিছু বাজি ধরে বসে তেমন জুয়াড়ী আমরা নই।

সৈন্যবাহিনী ও জনগণ হচ্ছেন জয়ের ভিত্তি

(১১১) বিপ্লবী চীনের ওপর জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কোনরকমেই তার আক্রমণে ও দমনে শিথিলতা দেখাবে না। তার সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতির দ্বারা

এটি নির্ধারিত। চীন যদি প্রতিরোধ না করত, তাহলে জাপান একটা গুলি না ছুঁড়েই সহজেই গোটা চীনকে কব্জা করে নিত, চারটি উত্তর-পূর্ব প্রদেশ হচ্ছে তারই উদাহরণ। চীন যদি প্রতিরোধ করে, তাহলে জাপান এই প্রতিরোধকে দমন করার চেষ্টা করবে, চীনের প্রতিরোধশক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে যতদিন সে ব্যর্থ না হবে ততদিন চেষ্টা করবে, এটা একটা অনিবার্য বিধি। জাপানী জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণী অত্যন্ত দুরাকাঙ্ক্ষী। দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপর, আর উত্তরে সাইবেরিয়ার ওপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে তারা মধ্যভাগে ভেদ করার নীতি গ্রহণ করে প্রথমে চীনের ওপর আক্রমণ করেছে। যারা মনে করে যে, উত্তর চীন, কিয়াংসু ও চেকিয়াং প্রদেশ দখল করে নিয়েই জাপান তুষ্ট হয়ে থেমে যাবে, তারা এটা উপলব্ধি করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয় যে, সাম্রাজ্যবাদী জাপান একটা নতুন পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে এবং ধ্বংসের মুখে ধেয়ে চলেছে, আর অতীতের জাপান থেকে সে হচ্ছে ভিন্ন রকমের। আমরা যখন বলি যে, জাপানের সৈন্য নিয়োগের ও অগ্রসর হওয়ার দুয়েরই একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে, জাপান তার প্রাপ্তিসাধ্য শক্তির ভিত্তিতে শুধু নির্দিষ্ট পরিমাণের সৈন্যশক্তিকে চীনের বিরুদ্ধে পাঠাতে পারে, আর তার শক্তিসামর্থ্যে যতটা কুলোয় ঠিক ততদূরই তারা চীনের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে, কারণ জাপানকে অন্যান্য দিকেও আক্রমণ চালাতে এবং অন্যান্য শত্রুর থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে হয় ; সেই একই সময়ে চীন প্রমাণ দিয়েছে তার প্রগতির আর তার বজ্রকঠোর প্রতিরোধের শক্তিসামর্থ্যের, এবং কেউই এটা কল্পনা করতে পারে না যে, শুধু জাপানই তীব্র আক্রমণ চালাতে থাকবে, আর এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য চীনের প্রয়োজনীয় শক্তি থাকবে না। গোটা চীনকে জাপান দখল করতে পারবে না, কিন্তু যে অঞ্চলগুলিতে সে পৌঁছাতে পারবে, সেইসব অঞ্চলে চীনের প্রতিরোধকে দমন করার জন্য সে কোন চেষ্টাই বাদ দেবে না, আর দেশী ও বিদেশী ঘটনাপরম্পরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে ঠেলে তার কবরের মুখে না নিয়ে যাওয়া অবধি জাপান তার দমনকে থামাবে না। জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাত্র দুটি সম্ভাব্য পথ রয়েছে : হয় তার গোটা শাসকশ্রেণীর পতন তাড়াতাড়ি ঘটবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে চলে যাবে এবং এইভাবে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে, কিন্তু বর্তমানে সেটা অসম্ভব ; আর না হয় তার জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণী অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠবে এবং তাদের পতনের দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালু রাখবে, যেটি হচ্ছে ঠিক সেই পথ যে পথে জাপান এখন চলছে। এগুলি

ছাড়া আর কোন তৃতীয় পথ নেই। যারা আশা করে যে, জাপানী বুর্জোয়াশ্রেণীর ভেতরকার উদারপন্থীরা এগিয়ে এসে যুদ্ধটিকে থামাবে, তারা শুধু কল্পনাই করছে। জাপানের বুর্জোয়াশ্রেণীর উদারপন্থীরা ইতিমধ্যেই জমিদার ও ধনকুবেরদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছে, এটা হচ্ছে বহু বছর ধরে জাপানী রাজনীতির বাস্তবতা। চীনের বিরুদ্ধে জাপান আক্রমণ শুরু করার পর, প্রতিরোধ-যুদ্ধের মাধ্যমে চীন যদি জাপানের ওপর মারাত্মক আঘাত না দেয় এবং জাপানের হাতে যথেষ্ট শক্তি বজায় থাকে, তাহলে সে অবশ্যই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে বা সাইবেরিয়াকে অথবা এমনকি উভয়কেই আক্রমণ করবে। একবার ইউরোপে যুদ্ধ বেধে গেলে সে তাই করবে। তাদের খুশিমাফিক পূর্ব-হিসেবে জাপানের শাসকরা আড়ম্বরভরা মাত্রায় তার হিসেব করে রেখেছে। অবশ্যই এটা সম্ভব যেঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবলতার কারণে এবং চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে জাপান নিজে গুরুতর পরিমাণে দুর্বল হওয়ার কারণে সাইবেরিয়া আক্রমণ করার গোড়ার পরিকল্পনাটি হয়ত জাপান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি জাপান একটা মৌলিকভাবে প্রতিরক্ষাত্মক মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু এমন পরিস্থিতি ঘটলেও, চীনের বিরুদ্ধে তার আক্রমণে ঢিলে দেওয়া তো দূরের কথা, বরং সেই আক্রমণকে জাপান আরও তীব্র করে তুলবে, কারণ তখন তার সামনে একটিমাত্র পথই থাকবে, আর সেটি হবে দুর্বলকে গ্রাস করা। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ, যুক্তফ্রন্ট ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ অটলভাবে চালিয়ে যাওয়ার চীনের কর্তব্যটি তখন হয়ে ওঠে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আর আমাদের প্রচেষ্টাকে সামান্যতম মাত্রায়ও শিথিল না করাটাই হয়ে ওঠে আরও বেশি অপরিহার্য।

(১১২) এই পরিবেশে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের বিজয়ের মুখ্য শর্ত হচ্ছে দেশজোড়া ঐক্য আর সর্বক্ষেত্রে অতীতের থেকে দশ বা একশ গুণের বেশি মাত্রার প্রগতি। চীন ইতিমধ্যেই প্রগতির যুগে পৌঁছেছে এবং মহান ঐক্য অর্জন করেছে, কিন্তু এখনো এই প্রগতি ও ঐক্য মোটেই যথেষ্ট নয়। জাপান যে এতটা বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছে, সেটা শুধু তার শক্তির জোরেই নয়, পরন্তু তা হচ্ছে চীনের দুর্বলতার কারণেও বটে। এই দুর্বলতা পুরোপুরিই হচ্ছে বিগত একশ বছরের, বিশেষ করে বিগত দশ বছরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভুলগুলোর পুঞ্জীভূত পরিণতি। আর ফলে চীনের প্রগতি তার বর্তমান চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এবং ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা না চালালে এমন শক্তিশালী শত্রুকে এখন পরাজিত করা অসম্ভব।

এমন অনেক কাজ আছে যেগুলি করার জন্য আমাদের নিজেদের সচেষ্ট হতে হবে, এখানে আমি শুধু দুটি মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করব—সৈন্যবাহিনীর প্রগতি ও জনগণের প্রগতি।

(১১৩) সৈনবাহিনীর আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জামের উন্নয়ন ছাড়া আমাদের সামরিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা অসম্ভব। এইসব ছাড়া আমরা শত্রুকে ইয়ালু নদীর পরপারে তাড়িয়ে দিতে পারি না। সৈন্যবিনিয়োগে আমাদের দরকার প্রগতিশীল ও নমনীয় রণনীতি এবং রণকৌশল। এ ছাড়া আমরা বিজয়লাভ করতে পারি না। তবুও, সৈন্যবাহিনীর ভিত্তি হচ্ছে সৈনিক; প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রেরণার দ্বারা সৈন্যবাহিনীকে অনুপ্রাণিত না করলে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কাজ না চালালে, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্য অর্জন করা অসম্ভব হবে, অসম্ভব হবে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের অনুকূলে অফিসার ও সৈনিকদের উৎসাহকে সর্বাধিক মাত্রায় উদ্দীপিত করা, সমস্ত প্রযুক্তি ও রণকৌশল যথাযথভাবে কাজে লাগানর জন্য শ্রেষ্ঠতম ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। আমরা যখন বলি যে, প্রযুক্তিগত উৎকৃষ্টতা সত্ত্বেও পরিশেষে জাপান পরাজিত হবে, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে, নির্মূলীকরণ ও শক্তিক্ষয়করণের ভেতর দিয়ে যেসব আঘাত আমরা হানি, সেগুলি ছাড়াও শত্রুবাহিনীর মনোবল পরিশেষে আমাদের আঘাতে নড়বড়ে হয়ে পড়বেই, এবং শত্রুবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রও অবিশ্বস্ত লোকদের হাতে রয়েছে। আমরা ঠিক তার বিপরীত, আমাদের অফিসার ও সৈনিকরা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ব্যাপারে একমত। এতেই রয়েছে যাবতীয় জাপ-বিরোধী বাহিনীর মধ্যেকার রাজনৈতিক কাজ চালাবার ভিত্তি। একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় গণতন্ত্র সৈন্যবাহিনীতে কার্যকরী করতে হবে, প্রধানতঃ, সামন্ততান্ত্রিক মারধোর, গালাগালের ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়া এবং অফিসার ও সৈনিকদের একসঙ্গে সুখ-দুঃখের ভাগ নেওয়া। এমনি করলেই অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে ঐক্য অর্জিত হবে, সৈন্যবাহিনীর সংগ্রামী শক্তি প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যাবে এবং দীর্ঘ ও নির্মম যুদ্ধে আমরা যে টিকতে পারব, তাতে কোন সন্দেহ থাকবে না।

(১১৪) যুদ্ধের মহান শক্তির গভীরতম উৎস নিহিত রয়েছে জনসাধারণের মধ্যে। জাপান যে আমাদের লাঞ্ছিত করতে সাহস পায়, তার প্রধান কারণ হল চীনা জনসাধারণের অসংগঠিত অবস্থা। এই ত্রুটি দূর করলেই আগুনের আবেষ্টনীতে ঢুকে পড়া একটা বুনো ষাঁড়ের মতো জাপানী আক্রমণকারীরা আমাদের কোটি কোটি জাগ্রত জনগণের সম্মুখীন হবে, আমাদের কণ্ঠস্বরের

নিছক আওয়াজই তার মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করবে এবং এই বুনো ষাঁড়টা অবশ্যই পুড়ে মরবে। আমাদের সৈন্যবাহিনীর জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে নতুন সৈন্য ভর্তি করতে হবে। জোর করে ধরে সৈন্য হিসেবে ভর্তি করা ও ক্রয় করে সৈন্য হিসেবে ভর্তি করার[৩৭] যে অদ্ভুত পদ্ধতিগুলি এখন নীচের দিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে, অবিলম্বে সেটাকে অবশ্যই নিষিদ্ধ করতে হবে, আর সেগুলিকে ব্যাপক—বিস্তৃত ও প্রবল উদ্যমভরা রাজনৈতিক প্রচারের দ্বারা বদলে দিতে হবে, এইভাবে লাখ লাখ লোককে সৈন্যদলে ভর্তি করে নেওয়া সহজ হবে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য টাকা তোলার ব্যাপারে প্রচণ্ড অসুবিধা রয়েছে, কিন্তু জনসাধারণকে একবার সক্রিয় করা হলে আর্থিক ব্যাপারেও আর সমস্যা থাকবে না। চীনের মতো সুবিশাল ও জনবহুল একটা দেশের টাকার অভাব হবে কেন? সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই জনসাধারণের সংগে এক হয়ে মিশে যেতে হবে, যাতে করে জনসাধারণ সৈন্যবাহিনীকে তাঁদের নিজেদের সৈন্যবাহিনী বলে মনে করেন। এই ধরনের সৈন্যবাহিনী পৃথিবীতে হবে অপরাজেয়, আর জাপানের মতো একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশকে পরাজিত করার জন্য যতটুকু শক্তি প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশিই হবে এই বাহিনীর শক্তি।

(১১৫) অনেকে মনে করেন যে, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যেকার এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক অসন্তোষজনক হবার কারণ হচ্ছে পদ্ধতিগত ভুল; আমি সব সময়েই তাঁদের বলি যে, এটা হচ্ছে মৌলিক মনোভাবের (অথবা মৌলিক উদ্দেশ্যের) প্রশ্ন, এই মনোভাব হচ্ছে সৈনিক ও জনগণকে সম্মান করা। এই মনোভাব থেকে বিভিন্ন নীতি, পদ্ধতি ও রূপের উদ্ভব ঘটে। যদি এই মনোভাব থেকে দূরে সরে যাই, তাহলে নীতি, পদ্ধতি ও রূপ নিশ্চয়ই ভুল হবে, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যেকার এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক অবশ্যই অসন্তোষজনক হবে। সৈন্যবাহিনীর রাজনৈতিক কাজের তিনটি প্রধান নীতি হচ্ছেঃ প্রথম, অফিসার ও সৈনিকদের ঐক্য; দ্বিতীয়, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ঐক্য; তৃতীয়, সৈন্যবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা। এই নীতিগুলোকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার জন্য সৈনিকদের সম্মান করার, জনগণকে সম্মান করার এবং শত্রুবাহিনীর যেসব যুদ্ধবন্দীরা একবার অস্ত্র ত্যাগ করেছে, তাদের মানবিক মর্যাদাকে সম্মান করার মৌলিক মনোভাব থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে। যাঁরা এটাকে মৌলিক মনোভাবের প্রশ্ন বলে মনে করেন না, বরং যান্ত্রিক প্রশ্ন বলে মনে করেন, তাঁরা বাস্তবিকই ভুল ভাবছেন, তাঁদের মতামতকে সংশোধন করা দরকার।

(১১৬) বর্তমান মুহূর্তে যখন উহান ও অন্যান্য জায়গাগুলির প্রতিরক্ষা জরুরী কর্তব্য হয়ে উঠেছে, তখন যুদ্ধের সমর্থনের জন্য গোটা সৈন্যবাহিনীর ও গোটা জনগণের সক্রিয়তাকে পূর্ণমাত্রায় উদ্দীপিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কোন সন্দেহ নেই যে, উহান ও অন্যান্য স্থানগুলোর প্রতিরক্ষার কর্তব্যকে অবশ্যই ঐকান্তিকভাবে উপস্থাপিত করতে এবং সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু সেগুলিকে দখলে রাখা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি কিনা, সেটা আমাদের আত্মগত অভিলাষের ওপরে নির্ভর করে না, পরন্তু সেটা নির্ভর করে বাস্তব শর্তাদির ওপরে। আর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব শর্তগুলির একটি হচ্ছে সংগ্রামের জন্য গোটা সৈন্যবাহিনীর ও গোটা জনগণের রাজনৈতিক সমাবেশ। যাবতীয় প্রয়োজনীয় শর্তগুলিকে সুনিশ্চিত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা না করা হলে, এমনকি এইসব শর্তের একটিমাত্র অনুপস্থিত থাকলেও, নানকিং ও অন্যান্য স্থানগুলির পতনের মতো বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটতে বাধ্য। মাদ্রিদে[৩৮] যেসব শর্তাদি ছিল সেইরকম শর্তাদি যেখানে উপস্থিত থাকবে, সেখানেই চীনের মাদ্রিদের সৃষ্টি হবে। এ পর্যন্ত চীনের কোন মাদ্রিদ ছিল না, এখন থেকে কয়েকটি মাদ্রিদ সৃষ্টির জন্য আমাদের প্রয়াস চালানো উচিত। কিন্তু এ সবকিছু নির্ভর করে শর্তাদির ওপরে; আর শর্তগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক শর্ত হচ্ছে গোটা সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ব্যাপক রাজনৈতিক সমাবেশ।

(১১৭) আমাদের সকল কাজে সাধারণ নীতি হিসেবে আমাদের অবশ্যই জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টটি অটলভাবে চালিয়ে যেতে হবে। কারণ শুধুমাত্র এই নীতির সাহায্যেই আমরা প্রতিরোধ—যুদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ দৃঢ়রূপে চালিয়ে যেতে পারি; অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যেকার এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কে ব্যাপক-বিস্তৃত ও প্রগাঢ় উন্নতি ঘটাতে পারি; আর এখনো আমাদের দখলে যেসব এলাকা রয়েছে, সেগুলির প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ লড়তে গোটা সৈন্যবাহিনীর ও গোটা জনগণের সক্রিয়তাকে পূর্ণমাত্রায় উদ্দীপিত করতে পারি; এবং এইভাবে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারি।

(১১৮) সৈন্যবাহিনী ও জনগণের রাজনৈতিক সমাবেশের এই প্রশ্নটি হচ্ছে সত্যসত্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের রাজনৈতিক সমাবেশ ছাড়া যে বিজয়লাভ অসম্ভব, ঠিক সেই কারণেই আমরা পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও বারবার এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি। অবশ্য, বিজয়ের জন্য অন্যান্য অনেক শর্তাদিও অপরিহার্য, কিন্তু রাজনৈতিক সমাবেশ হচ্ছে বিজয়ের জন্য সবচেয়ে মৌলিক শর্ত। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে গোটা সৈন্যবাহিনী

ও গোটা জনগণের যুক্তফ্রন্ট, তা নিশ্চয়ই নিছক কয়েকটি পার্টির ও দলের সদর দপ্তরের বা সদস্যদের যুক্তফ্রন্ট নয়; আমাদের জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট স্থাপনের মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে সে ফ্রন্টে অংশগ্রহণের জন্য গোটা বাহিনী ও গোটা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

উপসংহার

(১১৯) আমাদের উপসংহার কি? আমাদের উপসংহার হচ্ছেঃ

'চীন কোন্ অবস্থায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে পরাভূত ও ধ্বংস করতে পারে বলে আমরা মনে করি? তিনটি শর্তের প্রয়োজনঃ প্রথম, চীনে একটি জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়, জাপ-বিরোধী একটি আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা; তৃতীয়, জাপানী জনগণের ও জাপানী উপনিবেশগুলিতে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্ভব। চীনা জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে, এই তিনটি শর্তের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চীনা জনগণের ঐক্য।'

'এই যুদ্ধ কতদিন চলবে?—সেটা নির্ভর করে চীনের জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের শক্তির ওপর এবং চীন ও জাপান—দুই দেশের অন্যান্য বহু নির্ণায়ক উপাদানের ওপর।'

'এইসব শর্ত যদি দ্রুতগতিতে বাস্তবে পরিণত না হয়, তাহলে যুদ্ধ বিলম্বিত হবে। কিন্তু পরিণতি হবে একই—জাপান নিশ্চিতভাবেই পরাজিত হবে, আর চীন নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবে। শুধু আত্মত্যাগই হবে বৃহত্তর, আর অত্যন্ত কষ্টকর একটা সময়ের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হবে।'

'আমাদের রণনীতি হওয়া উচিত একটা অত্যন্ত সম্প্রসারিত ও পরিবর্তনশীল যুক্তফ্রন্টে লড়াই চালাবার জন্য আমাদের প্রধান শক্তিকে নিয়োগ করা। বিজয় অর্জনের জন্য চীনা সৈন্যবাহিনীর অবশ্যই বিস্তৃত রণক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রার চলমান যুদ্ধ চালাতে হবে।'

'চলমান যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা ছাড়াও কৃষকদের মধ্যে বহুসংখ্যক গেরিলা ইউনিট সংগঠিত করতে হবে।'

'যুদ্ধের গতিপথে....ধীরে ধীরে চীনের সৈন্যবাহিনীর সাজসরঞ্জাম উন্নত হয়ে উঠবে। তাই, যুদ্ধের শেষের পর্যায়ে চীন অবস্থানগত যুদ্ধ চালাতে সমর্থ হবে এবং সমর্থ হবে জাপানের অধিকৃত এলাকাগুলির ওপর অবস্থানগত আক্রমণ চালাতে। এইভাবে চীনের দীর্ঘ প্রতিরোধ-যুদ্ধের চাপে জাপানের অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়বে; এবং অসংখ্য লড়াইয়ের কষ্টভোগের ফলে চুরমার

হয়ে যাবে জাপানী সৈন্যদের মনোবল। আর চীনের ক্ষেত্রে, তার প্রতিরোধ-যুদ্ধের অন্তর্নিহিত শক্তি দিন দিন প্রস্ফুটিত ও বর্ধিত হয়ে উঠবে, আর বিরাট সংখ্যক বিপ্লবী জনসাধারণ নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে অবিরামভাবে যুক্তফ্রন্টে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এইসব উপাদানকে অপরাপর উপাদানের সংগে যুক্ত করে আমরা জাপানের অধিকৃত অঞ্চলের দুর্গ ও ঘাঁটিগুলির ওপর চূড়ান্ত ও মারাত্মক আঘাত হানতে এবং চীনের মাটি থেকে আগ্রাসী জাপানী সৈন্যবাহিনীকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হব।' (১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে এডগার স্নো-র সংগে সাক্ষাৎকার থেকে।)

'চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তখন থেকে সূত্রপাত হয়েছে একটা নতুন পর্যায়ের।.....এই নতুন পর্যায়ের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করা।'

'প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে ইতিমধ্যেই সূচিত প্রতিরোধ-যুদ্ধকে গোটা জাতির সামগ্রিক প্রতিরোধ-যুদ্ধের মাধ্যমেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হতে পারে।'

'প্রতিরোধ-যুদ্ধ বর্তমান দুর্বলতাসমূহ ভবিষ্যতে প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় বহু বিপত্তি, পশ্চাদপসরণ, আভ্যন্তরীণ বিভক্তি ও বিশ্বাসঘাতকতা, সাময়িক ও আংশিক আপোষাদি এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা ঘটাতে পারে। তাই এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, যুদ্ধটি হবে কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, ইতিমধ্যেই সূচিত প্রতিরোধ-যুদ্ধ আমাদের পার্টি ও সারা দেশের জনগণের প্রয়াস-প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে যাবতীয় বাধাবিপত্তিকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেবে এবং অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাবে ও বিকাশলাভ করবে।' (১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত 'বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তব্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত'।)

এইসবই হচ্ছে আমাদের উপসংহার। জাতীয় পরাধীনতার মতবাদীদের চোখে শত্রু হচ্ছে অতিমানব আর আমরা চীনারা হচ্ছি অপদার্থ, এবং দ্রুত বিজয়ের মতবাদীদের চোখে আমরা নিজেরা হচ্ছি অতিমানব আর শত্রু হচ্ছে অপদার্থ। এসবই ভুল। তাদের বিপরীত মত আমরা পোষণ করি—জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, আর চূড়ান্ত বিজয় হবে চীনের। এই হচ্ছে আমাদের উপসংহার।

(১২০) আমার বক্তৃতামালার এখানেই শেষ। মহান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ বিবর্ধিত হয়ে উঠছে। পূর্ণ বিজয় অর্জন করার জন্য অভিজ্ঞতার সার

সংকলনের আশা অনেকেই করছে। আমি যা আলোচনা করছি, তা হচ্ছে শুধু গত দশ মাসের সাধারণ অভিজ্ঞতা, আর এটা এক ধরনের সারসংকলনের প্রয়োজন হয়তো মেটাতে পারে। এইসব সমস্যা সকলের মনোযোগ ও ব্যাপক আলোচনার দাবি করে, এখানে আমি যা বলেছি তা হচ্ছে শুধুমাত্র একটি রূপরেখা। আশা করি যে, আপনারা সেটা পর্যালোচনা ও আলোচনা করবেন এবং সংশোধন ও পরিবর্ধন করবেন ।

টীকা

১। লুকৌছিয়াও পিকিং শহর থেকে দশাধিক কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই তারিখে জাপানী আক্রমণকারী বাহিনী এখানে চীনা সৈন্যবাহিনীর ওপরে আক্রমণ চালিয়েছিল। দেশব্যাপী জনগণের জাপ-বিরোধী উত্তাল তরঙ্গে এখানকার চীনা বাহিনী প্রতিরোধ চালিয়েছিল। চীনা জনগণের ৮ বছর ব্যাপী বীরত্বপূর্ণ জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ তখন থেকে শুরু হয়।

২। জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বটি ছিল কুওমিনতাঙের অভিমত। জাপানকে প্রতিরোধ করতে কুওমিনতাঙ ছিল অনিচ্ছুক, আর পরে জাপানের বিরুদ্ধে তারা লড়েছিল নিছক বাধ্য হয়ে। লুকৌছিয়াও ঘটনার পরে চিয়াং কাই-শেক চক্র জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে যোগদান করেছিল অনিচ্ছাভরে আর ওয়াং চিন-ওয়েই চক্র জাতীয় পরাধীনতার তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ওয়াং চিন-ওয়েই চক্র জাপানের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং বস্তুতঃ পরে তা আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু জাতীয় পরাধীনতার ভাবধারাটি যে শুধু কুওমিনতাঙের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল তাই নয়, পরন্তু সমাজের মধ্যস্তরের কোন কোন অংশকে এবং এমনকি মেহনতী জনগণের ভেতরকার কোন কোন পশ্চাদ্‌পদ লোকজনকেও এক সময় তা প্রভাবিত করেছিল। দুর্নীতিপরায়ণ ও অক্ষম কুওমিনতাঙ সরকার জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে একের পর এক পরাজয় বরণ করল আর জাপানী বাহিনী বিনা বাধায় যুদ্ধের প্রথম বছরেই উহানের নিকটবর্তী অঞ্চলে এসে পৌঁছাল, এতে কিছু কিছু পশ্চাদ্‌পদ লোকজন অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ল।

৩। এই অভিমতগুলি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দেখা দিয়েছিল। জাপ—বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে পার্টির কিছু কিছু সদস্যের ভেতরে শত্রুকে ছোট করে দেখার একটা ঝোঁক ছিল। এইসব পার্টি-সদস্য এই অভিমত পোষণ করত যে, একটিমাত্র আঘাতেই জাপানকে পরাজিত করতে পারা যাবে। তাদের এই অভিমতের যুক্তি এই নয় যে, তারা আমাদের নিজস্ব শক্তিকে খুব শক্তিশালী বলে মনে করত, বরং তারা জানত যে, কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত সৈন্যবাহিনী ও সংগঠিত গণশক্তি তখনো ছোটই ছিল ; কারণটা হচ্ছে এই যে, কুওমিনতাঙ জাপানকে

প্রতিরোধ করতে শুরু করেছিল। তাদের মতে, কুওমিনতাঙ ছিল খুবই শক্তিশালী, আর কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সহযোগিতা করে সে জাপানের বিরুদ্ধে বিশেষ ফলপ্রসূ আঘাত হানতে পারত। এই ভ্রমাত্মক মূল্যায়ন তারা করেছিল, কারণ তারা শুধু কুওমিনতাঙের সাময়িকভাবে জাপানকে প্রতিরোধ করার দিকটা দেখেছিল, কিন্তু অন্য দিকটিকে—কুওমিনতাঙ যে প্রতিক্রিয়াশীল আর দুর্নীতিপরায়ণ—সেই দিকটিকে তারা ভুলে গিয়েছিল।

৪। এটা ছিল চিয়াং কাই-শেক প্রমুখ ব্যক্তিদের অভিমত। জাপানকে প্রতিরোধ করতে বাধ্য হয়ে চিয়াং-কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ তাদের আশা স্থাপন করেছিল একমাত্র দ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের ওপরে, তাদের নিজেদের শক্তির ওপরে তাদের কোন আস্থা ছিল না, জনগণের শক্তির ওপরে আস্থা রাখা তো দূরের কথা।

৫। তাইএরচুয়াং হচ্ছে দক্ষিণ শানতুংয়ের একটি শহর। জাপানী আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে তাইএরচুয়াং অঞ্চলে চীনা সৈন্যবাহিনী একটি লড়াই লড়েছিল। জাপানের ৭০-৮০ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে চার লাখ সৈন্য নিয়োগ করে চীনা সৈন্যবাহিনী জয়লাভ করেছিল।

৬। তৎকালীন কুওমিনতাঙের রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রুপের মুখপাত্র তা কুং পাও-এর এক সম্পাদকীয়তে এই অভিমতটি প্রকাশ করা হয়েছিল। সৌভাগ্যের আশায় মেতে এই চক্র আশা করেছিল যে, তাইএরচুয়াংয়ের মতো আর কয়েকটা বিজয় জাপানের অগ্রসরণকে থামিয়ে দেবে, তখন আর একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য জনগণের শক্তিকে সমাবেশ করার কোন দরকার হবে না। তাদের মতে, এ ধরনের সমাবেশ এই চক্রের নিজ শ্রেণীর নিরাপত্তাকে বিপদাপন্ন করে তুলতে পারে। এই সৌভাগ্যের আশা সে-সময়ে গোটা কুওমিনতাঙকে পরিব্যাপ্ত করেছিল।

৭। ১৯৩৭ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন অষ্টম রুট বাহিনীর ১১৫ নং ডিভিসন কমরেড লিন পিয়াওয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় শানসী প্রদেশের পিংসিংকুয়ান অঞ্চলে একটি নির্মূলীকরণের লড়াই চালিয়েছিল। দেশব্যাপী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার পর এটাই ছিল প্রথম নির্মূলীকরণের লড়াই। এই লড়াইয়ে জাপানের দুর্ধর্ষ বাহিনীর ইতাগাকি ডিভিসনের তিন হাজারের বেশি সৈন্যকে ধ্বংস করা হয়েছিল। এই বিজয়টি দেশ-বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধে নিশ্চিত জয়লাভ করার জন্য সারা দেশের সৈন্যবাহিনী ও জনগণের বিশ্বাসকে প্রভূতভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। এই বিজয়টি চীনা জনগণের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে।

৮। চীনা লালফৌজের ও জনগণের জাপান-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে চ্যাং স্যুয়ে-লিয়াংয়ের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্ব বাহিনী এবং ইয়াং-হু-ছেংয়ের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের সপ্তদশ রুট বাহিনী চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতিটি মেনে নিয়েছিল আর জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চিয়াং কাই-শেকের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির সংগে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার

দাবি করেছিল। চিয়াং কাই-শেক যে শুধু এটাকে অগ্রাহ্য করল তাই নয়, উপরন্তু আরও স্বেচ্ছাচারী হয়ে 'কমিউনিস্টদের দমনের' জন্য তার সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করে তুলল এবং সীআন শহরে জাপানবিরোধী যুবকদের হত্যা করতে লাগল। এই অবস্থায় চ্যাং স্যুয়ে-লিয়াং ও ইয়াং হু-ছেং সম্মিলিতভাবে কার্যকলাপ চালিয়ে চিয়াং কাই-শেককে গ্রেপ্তার করলেন। এটা ছিল ১৯৩৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখের ঘটনা, যা সীআন ঘটনা নামে সুপরিচিত। তখন জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সংগে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শর্তকে মেনে নিতে চিয়াং কাই-শেক বাধ্য হল কাজেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হল, এবং সে নানকিংয়ে ফিরে গেল।

৯। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে কয়েক দশক ধরে ব্রিটেন ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণ আফিম চীনে রপ্তানি করত। এই বাণিজ্য চীনা জনগণকে শুধু গুরুতরভাবে অবসাদগ্রস্তই করেনি, উপরন্তু বিপুল পরিমাণে চীনের রৌপ্যও লুণ্ঠন করেছিল। চীন এই আফিমবাণিজ্যের বিরোধিতা করেছিল। ১৮৪০ সালে বাণিজ্যকে সুরক্ষিত করার অজুহাতে ব্রিটেন চীনের ওপরে এক সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। লিন জে-স্যুর নেতৃত্বে চীনা সৈন্যবাহিনী সে আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ করল, আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুয়াংচৌ-এর জনগণ 'ব্রিটিশদেরকে দমন করার বাহিনী' সংগঠিত করেছিল যা আগ্রাসী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। কিন্তু ১৮৪২ সালে দুর্নীতিপরায়ণ ছিং সরকার আগ্রাসী ব্রিটিশদের সংগে 'নানকিং চুক্তি' স্বাক্ষর করল। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, ব্রিটেনকে হংকং হস্তান্তর এবং শাংহাই, ফুচৌ, অ্যাময়, নিংপো আর ক্যান্টনকে ব্রিটেনের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা হল, আর স্থির হল যে, চীনে আমদানী করা ব্রিটিশ পণ্যের ওপরে ধার্য শুল্কের হার চীন ও ব্রিটেন মিলিতভাবে নির্ধারণ করবে।

১০। তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের যুদ্ধ ছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত ছিং রাজবংশের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিপ্লবী যুদ্ধ। ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে কুয়াংসী প্রদেশের কুইপিং জেলার চিনথিয়ান গ্রামে এই বিপ্লবের নেতা হোং সিউ-ছ্যুয়ান, ইয়াং সিউ-ছিং প্রমুখ বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন আর ঘোষণা করেছিলেন 'তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের' প্রতিষ্ঠা। ১৮৫২ সালে তাইপিং বাহিনী কুয়াংসী প্রদেশ থেকে অভিযান শুরু করে, আর হুনান, হুপেই, কিয়াংসী ও আনহুই প্রদেশের ভেতর দিয়ে অভিযান চালিয়ে নানকিং দখল করে ১৮৫৩ সালে। তারপরে তাইপিং বাহিনীর একটা অংশ নানকিং থেকে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালিয়ে যেতে যেতে থিয়ানচিন শহরের নিকটে পৌঁছেছিল। কিন্তু তাইপিং বাহিনী তার দখলীকৃত স্থানগুলিতে কোন সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকাই স্থাপন করেনি। উপরন্তু, নানকিংয়ে রাজধানী স্থাপন করার পরে এই বাহিনীর নেতৃস্থানীয় গ্রুপ অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ভুল করে বসে। সেইসব কারণেই এই বাহিনী অসমর্থ হয়েছিল ছিং সরকারের প্রতিবিপ্লবী বাহিনী এবং ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী হামলাকারীদের মিলিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে। আর শেষ পর্যন্ত ১৮৬৪ সালে পরাজিত হল।

১১। এখানে ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। উদারপন্থী বুর্জোয়া ও আলোকপ্রাপ্ত জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এই আন্দোলন। খাং ইয়ৌ ওয়েই, লিয়াং ছী-ছাও ও থান সি-থুং প্রমুখ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এ আন্দোলন যুবসম্রাট কুয়াং স্যু-এর আনুকূল্য ও সমর্থনলাভ করেছিল। কিন্তু এর কোন গণভিত্তি ছিল না। সে সময়ে ইউয়ান শি-কাইয়ের অধীনে নিজস্ব সশস্ত্র শক্তি ছিল, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে গোঁড়া রক্ষণশীলদের নেত্রী বিধবা সম্রাজ্ঞী জু সীর কাছে সংস্কারকদের গুপ্ত পরিকল্পনাকে ফাঁস করে দিয়েছিল; অতএব বিধবা সম্রাজ্ঞী জু সী আবার ক্ষমতা জোর করে দখল করে নিল, যুবসম্রাট কুয়াং স্যুকে বন্দী করল আর থান সি-থুং ও অন্যান্য পাঁচজনের শিরশ্ছেদ করাল। এইভাবে এ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল শোচনীয় পরাজয়ে।

১২। সিনহাই বিপ্লব—১৯১১ সালের বিপ্লব ছিং রাজবংশীয় স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়। এই বছরের ১০ই অক্টোবর তারিখে, ছিং সরকারের নয়া সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী সংস্থাগুলির প্রেরণায় উছাং শহরে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। এর পরে বিভিন্ন প্রদেশে পর পর বিদ্রোহ ঘটে এবং অতি সত্বরই ছিং রাজবংশের শাসন ভেঙে পড়ে। ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে নানকিং শহরে স্থাপিত হল চীন প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার, আর সান ইয়াৎ-সেন নির্বাচিত হলেন এর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট। কৃষক, শ্রমিক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের সংগে বুর্জোয়াদের মৈত্রীর ভেতর দিয়ে জয়লাভ করল এই বিপ্লব। কিন্তু যে চক্র এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করেছিল তারা ছিল আপোষপন্থী, আর তারা কৃষকদের প্রকৃত হিতসাধন করেনি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের চাপে আপোষ করেছিল বলে রাষ্ট্রক্ষমতা এসে পড়ল উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজ ইউয়ান শি-কাইয়ের হাতে, আর বিপ্লব হল ব্যর্থ।

১৩। উত্তর অভিযান হল বিপ্লবী সৈন্যদের দ্বারা ১৯২৬ সালের মে-জুলাই মাসে কুয়াংতুং থেকে উত্তরদিকে উত্তরের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত শাস্তিমূলক যুদ্ধ। উত্তরাভিযানী সৈন্যরা, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং পার্টির প্রভাবে (তখন সৈন্যবাহিনীতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রধানতঃ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হতো), ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকদের আন্তরিক সমর্থনলাভ করেছিল। ১৯২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে ইয়াংসি ও পীত নদী সংলগ্ন অধিকাংশ প্রদেশ দখলীকৃত হয়েছিল এবং উত্তরের যুদ্ধবাজদের পরাজিত করেছিল। বিপ্লবী সেনাবাহিনীর মধ্যে চিয়াং কাই শেক-এর নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে এই বিপ্লবী যুদ্ধ ব্যর্থ হয়।

১৪। ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের বিবৃতিতে জাপানী মন্ত্রিসভা এই নীতি ঘোষণা করেছিল যে, জাপান শক্তি প্রয়োগ করে চীনকে পদানত করবে।

একই সময়ে সে আবার ধমক দিয়ে ও চাটু কথায় ভুলিয়ে কুওমিনতাঙ সরকারকে আত্মসমর্পণ করাবার চেষ্টা করছিল এই ঘোষণা করে যে, কুওমিনতাঙ সরকার যদি তার 'প্রতিরোধ-যুদ্ধের পরিকল্পনাকে চালিয়ে যায়' তাহলে জাপান সরকার চীনে একটা নতুন পুতুল সরকার স্থাপন ও পোষণ করবে এবং আর কখনো আলাপ-আলোচনায় কুওমিনতাঙকে 'অপরপক্ষ' হিসেবে স্বীকার করবে না।

১৫। এখানে মুখ্যতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬। এখানে 'সেইসব দেশগুলির সরকার' বলতে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের সরকারগুলির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের ভারসাম্যের পর্যায়ে চীন উর্ধ্বমুখী ধারায় চলবে—কমরেড মাও সে তুঙের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন মুক্ত অঞ্চলে পুরোপুরিই বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু কুওমিনতাঙ শাসিত অঞ্চলে উর্ধ্বগতির বদলে বরং অবনতি ঘটেছে, কারণ চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন শাসকচক্র জাপানকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিল আর কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরোধিতা করার কাজে ছিল সক্রিয়। এতে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে প্রতিরোধের অগ্নি জ্বলে ওঠে আর তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা উদ্দীপ্ত হয়।

১৮। 'অস্ত্রই সবকিছু নির্ধারণ করে'—এই মতবাদ অনুসারে চীন যুদ্ধে পরাজিত হতে বাধ্য ছিল, কারণ, অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে চীন ছিল জাপানের তুলনায় নিকৃষ্ট অবস্থায়। চিয়াং কাই-শেক সমেত কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের সকল সর্দারদের মনেই এই অভিমতটি চালু ছিল।

১৯। বুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক শাক্যমুনি। সুন উ-খোং হচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চীনা পৌরাণিক উপন্যাস 'সী ইউ চী' ('পশ্চিমে তীর্থযাত্রা') -এর বীরনায়ক। এই পৌরাণিক উপন্যাসে বলা হয় যে, সুন উ-খোং ছিল একটা বানর। একটা ডিগবাজি দিয়ে সে এক লাখ আট হাজার লী পথ অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু তবুও একবার বুদ্ধের করতলে পড়লে তার থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে না, তা সে যত ডিগবাজিই দিক না কেন। করতলকে উল্টে দিয়ে বুদ্ধ তাঁর আঙ্গুলগুলিকে পাঁচশিখরযুক্ত পঞ্চভূত পর্বতে রূপান্তরিত করেছিলেন আর তার তলায় চাপা দিয়েছিলেন সুন উ-খোংকে।

২০। ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে কমরেড ডিমিট্রভ তাঁর প্রদত্ত 'ফ্যাসিবাদী আক্রমণ ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্তব্য শীর্ষক রিপোর্টে বলেছিলেন ঃ 'ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অসংযত জাতিদম্ভী আর লুণ্ঠনাত্মক যুদ্ধ'। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে কমরেড ডিমিট্রভ আবার 'ফ্যাসিবাদ হচ্ছে যুদ্ধ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

২১। ভি. আই. লেনিন, 'সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ'-এর প্রথম অধ্যায় এবং 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন'-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২২। 'সুন জি' নামক গ্রন্থের 'আক্রমণের রণনীতি' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৩। ছেংপু পিংইউয়ান প্রদেশের পুসিয়ান জেলায় (বর্তমান হোনান প্রদেশে—অনুবাদক) অবস্থিত। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩২ সালে এখানে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল চিন রাজ্য ও ছু রাজ্যের মধ্যে। লড়াইয়ের গোড়ার দিকে ছু রাজ্যের বাহিনী প্রাধান্যলাভ করেছিল। ৯০ লী পশ্চাদপসরণ করার পরে চিন রাজ্যের সৈন্যবাহিনী ছু বাহিনীর দুর্বল স্থান অর্থাৎ ছু বাহিনীর দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বদেশ বেছে নিয়ে মোক্ষম আঘাত দিল, ফলে ছু বাহিনী সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হল।

২৪। হোনান প্রদেশের বর্তমান ছেংকাও কাউন্টির উত্তর-পশ্চিমের প্রাচীন ছেংকাও শহর প্রভৃত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এটা ছিল খ্রীঃ পূঃ ২০৩ সালে হানের রাজা লিউ প্যাং এবং ছু-এর রাজা সিয়াং উ-র মধ্যে লড়াইয়ের স্থান। প্রথমদিকে সিয়াং উ সিংইয়াং ও ছেংকাও দখল করে এবং লিউ প্যাঙের বাহিনীকে প্রায় ধ্বংস করে দেয়। লিউ প্যাং সুযোগের অপেক্ষায় থেকে যখন সিয়াং উ'র বাহিনী জেশুই নদী পার হবার সময় মাঝ নদীতে এসেছে তখন তাদের চূর্ণবিচূর্ণ করে এবং ছেংকাও পুনর্দখল করে।

২৫। খ্রীষ্টপূর্ব ২০৪ সালে চাও সিয়ের বিরুদ্ধে হান সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হান সিন সৈন্য পরিচালনা করে প্রচণ্ডভাবে লড়াই চালিয়েছিল চিংসিং নামক স্থানে। কথিত আছে যে, চাও সিয়ের সৈন্যবাহিনীতে দুই লাখ সৈন্য ছিল। আর সেটা ছিল হান বাহিনীর থেকে কয়েক গুণ বেশি। নদীর দিকে পিঠ করে সৈন্যসারিকে সম্প্রসারিত করে এক শৌর্যপূর্ণ যুদ্ধে তাদের চালনা করেছিল হান সিন। আর সেই একই সময়ে শত্রুর দুর্বলভাবে রক্ষিত পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ চালিয়ে সেটাকে দখল করে নেবার জন্য সে সৈন্যদল পাঠিয়েছিল, এর ফলে চাও সিয়ের বাহিনী সম্মুখ ও পিছন উভয় দিকেই শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ল, এবং শেষে একেবারে পর্যুদস্ত হয়েছিল।

২৬। হোনান প্রদেশের বর্তমান ইয়েসিন কাউন্টির উত্তরের প্রাচীন শহর খুনইয়াং ছিল পূর্ব হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লিউ সিউ যেখানে ১৩ খ্রীষ্টাব্দে সিন রাজবংশের সম্রাট ওয়াং ম্যাং-এর বাহিনীকে পরাজিত করেছিল সেই স্থানটি। সংখ্যার দিক থেকে দু পক্ষের মধ্যে বিরাট বৈসাদৃশ্য ছিল—লিউ সিউ-এর লোকসংখ্যা ছিল ৮-৯ হাজার, সেখানে ওয়াং ম্যাঙের ছিল ৪ লক্ষ। কিন্তু ওয়াং ম্যাঙের সেনাধ্যক্ষ ওয়াং সুন এবং ওয়াং ই'র শত্রুশক্তি সম্পর্কে অবহেলাভরে অবমূল্যায়নের সুযোগ নিয়ে লিউ সিউ মাত্র তিন হাজার পোড় খাওয়া সৈন্য নিয়ে ওয়াং ম্যাঙের মূল শক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধ্বংস করে দেয়। শত্রুসৈন্যের বাকি অংশকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সে এই বিজয়কে বাস্তবায়িত করে।

২৭। হোনান প্রদেশের বর্তমান ছুংমৌ কাউন্টির উত্তর-পূর্ব ছিল কুয়ানতু এবং এটা ছিল ২০০ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়ান শাও এবং ছাও ছাওয়ের সৈন্যদের মধ্যে লড়াইয়ের স্থান। ইউয়ান শাওয়ের সৈন্য ছিল একলক্ষ, কিন্তু ছাও ছাওয়ের ছিল খুবই কম

সৈন্য এবং রসদ সরবরাহ ব্যবস্থাও ছিল অপ্রতুল। ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যবাহিনীর তরফ থেকে সতর্কতার অভাব এবং শত্রুসৈন্যের অবমূল্যায়নের সুযোগ নিয়ে ছাও তার লঘুপদ সৈন্যদের ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করে এবং তাঁদের সরবরাহ ব্যবস্থায় আগুন ধরিয়ে দেয়। ইউয়ান শাওয়ের সৈন্যরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং তার মূল শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।

২৮। সুন ছুয়ান শাসন করত উ রাজ্য, আর ছাও ছাও শাসন করত ওয়েই রাজ্য। ছিপি হল ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ তীরে হুপে প্রদেশের অন্তর্গত ছিয়াউ-এর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। ২০৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাও ছাও ৫ লক্ষের ওপর এক সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করে, যাকে সে ৮ লক্ষ বলে ঘোষণা করেছিল, সুন ছুয়ান-এর ওপর আক্রমণ হানার জন্য। সুন ছুয়ান ছাও ছাওয়ের শত্রু লিউ পেই-এর সংগে যুক্ত হয়ে ৩০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে। ছাও ছাওয়ের সৈন্যবাহিনী প্লেগ ও মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং তারা নৌযুদ্ধ চালাতে অক্ষম এটা জানতে পেরে সুন ছুয়ান ও লিউ পেই'র মিলিত সৈন্যবাহিনী ছাও ছাওয়ের যুদ্ধজাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তার সেনাবাহিনীকে চূর্ণ করে ফেলে।

২৯। হুপে প্রদেশের বর্তমান ইছাং-এর পূর্বদিকে ইলিং হল সেই স্থান যেখানে উ রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ লু সুন ২২২ খ্রীষ্টাব্দে শু'র শাসক লিউ পেই-এর বাহিনীকে পরাস্ত করে। লিউ পেই পরপর কতকগুলি লড়াইয়ে প্রথমদিকে জয়লাভ করে এবং উ'র ভূখণ্ডের প্রায় ৫/৬ শত লী পর্যন্ত অর্থাৎ ইলিং-এর কাছাকাছি ঢুকে পড়ে। লু সুন, যে ইলিংকে রক্ষা করছিল, সাত মাসের ওপর লড়াই এড়িয়ে চলছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না লু পেই 'তার বুদ্ধির শেষ সীমা পর্যন্ত এসেছে এবং তার সৈন্যরা ক্লান্ত ও হতাশ' হয়ে পড়েছে। সে তখন অনুকূল বাতাসের সুযোগ নিয়ে তাঁবুগুলিতে আগুন লাগিয়ে লু পেই'র সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেছিল।

৩০। আনহুই প্রদেশের ফেইশুই নদীর ধারে ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চিন রাজ্যের শাসক ফু ছিয়েনকে পূর্ব সিন রাজবংশের সেনাধ্যক্ষ সিয়ে সুয়ান পরাজিত করে। ফু ছিয়েনের ৬ লক্ষের ওপর পদাতিক সৈন্য, ২ লক্ষ ৭০ হাজার ঘোড় সওয়ার এবং ৩০ হাজারের ওপর রক্ষীবাহিনী ছিল; কিন্তু পূর্ব সিনের স্থল ও নৌবাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০ হাজার। সৈন্যবাহিনী যখন ফেইশুই নদীর অপর তীরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল তখন সিয়ে সুয়ান শত্রুসৈন্যের অতিরিক্ত আস্থা এবং প্রতারণার সুযোগ নিয়ে ফু ছিয়েনকে তার সৈন্য ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করল যাতে করে পূর্ব সিন বাহিনী নদী পার হতে এবং লড়াই করে তাদের বিতাড়িত করতে পারে। ফু ছিয়েন রাজী হল, কিন্তু সৈন্য প্রত্যাহারের আদেশ দিলে তার সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, আর তাদের থামানো গেল না। সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ব সিন বাহিনী নদী পার হয়ে আক্রমণ শুরু করে শত্রুদের পরাস্ত করল।

৩১। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ফ্রান্সের নেপোলিয়ন ব্রিটেন, প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য বহু দেশের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। বহু যুদ্ধে নেপোলিয়নের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা তার শত্রুর তুলনায় কম ছিল, তবুও নেপোলিয়নবাহিনী সেইসব যুদ্ধেই জয়লাভ করেছিল।

৩২। ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ছিন রাজ্যের শাসক ফু চিয়ান তোংচিন বাহিনীর শক্তিকে খাটো মনে করে তাদের আক্রমণ করে। আনহুই প্রদেশের শৌইয়াং অঞ্চলের লুওচিয়ানে ছিন সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী ইউনিটগুলিকে পরাজিত করে তোংচিন বাহিনী জল ও স্থল উভয় পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। শৌইয়াংয়ের নগরপ্রাকারে উঠে ফু চিয়ান তোংচিন সৈন্যবাহিনীর নিখুঁত সমাবেশরেখা দেখতে পেল এবং পাকোংশান পর্বত-শিখরের প্রতিটি ঝোপঝাড় ও গাছকে শত্রুসৈন্য বলে ভুল করে শত্রুর আপাতঃদৃশ্যমান শক্তিতে ঘাবড়ে গেল।

৩৩। এখানে এই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিয়াং কাই-শেক আর ওয়াং চিং-ওয়েই ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে জনগণের বিরুদ্ধে একটা দশ বছরের যুদ্ধ শুরু করে দিল, আর এইভাবে চীনের জনগণের পক্ষে ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়ে ওঠাকে অসম্ভব করে তুলল। অতীতের এই ভুলের জন্য চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের অবশ্যই দায়ী করতে হবে।

৩৪। সুং-এর রাজা সিয়াং ছিল খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ছুনছিউ যুগে সুং রাজ্যের রাজা। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩৮ সালে সুং রাজ্য পরাক্রমশালী ছু রাজ্যের সংগে যুদ্ধ করেছিল। ছু বাহিনী যখন নদী পার হচ্ছিল, সুং বাহিনী তার আগেই যুদ্ধব্যূহাকারে সম্প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। সুং বাহিনীর একজন অফিসার মনে করল যে, ছু বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সুং বাহিনীর চেয়ে বেশি। অতএব সেই অফিসার ছু বাহিনীর নদী উত্তরণ সমাপ্ত হবার আগেই ছু বাহিনীর ওপর আক্রমণ করার প্রস্তাব করল। কিন্তু সুং-এর রাজা সিয়াং কোং বলল, 'না, যখন কেউ অসুবিধায় আছে এমন সময়ে তাকে আক্রমণ করা ভদ্রমহোদয়গণের পক্ষে উচিত নয়। নদী পার হবার পরে ছু বাহিনী যুদ্ধব্যূহাকারে সম্প্রসারিত হবার আগে সুং রাজ্যের অফিসার আবারও প্রস্তাব করল অবিলম্বে আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু সুং-এর রাজা সিয়াং-কোং আবারও বলল, 'না, যে সৈন্যবাহিনী যুদ্ধব্যূহাকারে সম্প্রসারিত হয়ে উঠেনি, তাকে আক্রমণ করা ভদ্রমহোদয়গণের পক্ষে উচিত নয়'। ছু বাহিনী পুরোপুরি তৈরী হলেই শুধু সুং-এর রাজা সিয়াং-কোং আক্রমণের আদেশ দিল। ফলে সুং বাহিনী বিপর্যয়কর পরাজয় ভোগ করল আর সিয়াং-কোং নিজেও আহত হল।

৩৫। কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ হান ফু-চ্যু বহু বছর ধরে শানতুং প্রদেশ শাসন করত। ১৯৩৭ সালে আগ্রাসী জাপানী সৈন্যবাহিনী পেইপিং ও থিয়ানচিন দখল করে নেবার পরে থিয়ানচিন-পুখৌ রেলপথ বরাবর যখন দক্ষিণ অভিমুখে শানতুং আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল, তখন একটা লড়াইও না লড়ে হান ফু-চ্যু শানতুং থেকে পালিয়ে হোনান প্রদেশে চলে গিয়েছিল।

৩৬। ১৮১২ সালে নেপোলিয়ন ৫ লাখ সৈন্য বিশিষ্ট একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাশিয়ার ওপর আক্রমণ করল। রুশ সৈন্যবাহিনী মস্কো শহর পরিত্যাগ করল এবং তাকে পুড়িয়ে বিনষ্ট করল, এমনি করে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীকে এমন একটা নিরুপায় অবস্থায় নিক্ষেপ করল যে, তারা ক্ষুধা, শীত ও কষ্টে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল, পশ্চাদ্ভাগের সংগে তাদের যোগাযোগ ব্যাহত হল এবং তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল। অতএব নেপোলিয়ন বাধ্য হয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে পশ্চাদপসরণ করল। এই সুযোগ নিয়ে রুশসৈন্যবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাল, ফলে নেপোলিয়ন বাহিনীর মাত্র বিশ হাজারের কিছু বেশি সৈন্য পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

৩৭। কুওমিনতাঙ তার সৈন্যবাহিনীকে সম্প্রসারিত করেছিল নিম্ন পদ্ধতিতেঃ সামরিক ব্যক্তি ও পুলিশ পাঠিয়ে সর্বত্র লোকজনকে ধরে জোর করে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করত। সামরিক ব্যক্তি ও পুলিশ এসব লোকজনকে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদের প্রতি কয়েদীর মতো আচরণ করত। যাদের টাকা ছিল তারা কুওমিনতাঙ অফিসারদেরকে ঘুষ দিয়ে নিজের পরিবর্তে অন্য মানুষ ক্রয় করে ভর্তি করাত।

৩৮। ১৯৩৬ সালে জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাসিবাদীরা স্পেনের ফ্যাসিবাদী যুদ্ধবাজ ফ্রাঙ্কোর মাধ্যমে স্পেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করল। গণফ্রন্ট—সরকারের নেতৃত্বে স্পেনের জনগণ গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাল। গোটা যুদ্ধে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ রক্ষা করার লড়াইটা ছিল সবচেয়ে তীব্র, যা ১৯৩৬ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছিল এবং মোট দুই বছর পাঁচ মাস ধরে টিঁকে ছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশ তথাকথিত 'হস্তক্ষেপ না করার' মেকী নীতির দ্বারা আক্রমণকারীদেরকে সাহায্য করেছিল এবং স্পেনের গণফ্রন্টের ভেতরে ভাঙন ধরেছিল বলে ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে মাদ্রিদের পতন ঘটল।

জাতীয় যুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

অক্টোবর, ১৯৩৮

কমরেডগণ, আমাদের সামনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা এবং একটি নতুন চীন গড়ে তোলাই যে আমাদের পক্ষে জরুরী তাই নয়, বরং এইসব লক্ষ্যে উপনীত হতেও আমরা নিশ্চিতভাবেই সক্ষম। যাই হোক, বর্তমান এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে কঠিন একটি পথ আমাদের সামনে রয়েছে। একটি নতুন চীন গড়ে তোলার সংগ্রামে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনগণকে অবশ্যই একটি পরিকল্পিত উপায়ে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, এবং আর একটা সুদীর্ঘ যুদ্ধের মাধ্যমেই কেবল তাদেরকে তারা পরাজিত করতে পারবে। যুদ্ধের সাথে জড়িত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে অনেক কিছু বলেছি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার আমরা সারসংকলন করেছি এবং বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেছি, সমগ্র জাতির সামনে উপস্থিত জরুরী কর্তব্য আমার ব্যাখ্যা করেছি ও একটি দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সাহায্যে জাপানের বিরুদ্ধে একটি সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কারণ এবং তা চালিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছি, এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিরও আমরা বিশ্লেষণ করেছি। তাহলে কি কি সমস্যা বাকী থাকছে? কমরেডগণ, আরও একটি সমস্যা রয়েছে, অর্থাৎ জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কোন্ ভূমিকা পালন করবে, এই যুদ্ধকে পরাজয়ের দিকে পরিচালিত না করে বিজয়ের দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হওয়ার জন্যে কমিউনিস্টরা কিভাবে তাঁদের নিজেদের

পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। অধিবেশনে কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বাধীন পলিটব্যুরোর লাইন অনুমোদিত হয় এবং অধিবেশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কিত প্রশ্নে আলোচনা করে তিনি জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনা করার কাজে পার্টি সুমহান ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে এবং সচেতনভাবে কাঁধে তুলে নিতে সকল কমরেডকে সাহায্য করেন। এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টে অবিচল থাকার লাইন স্থির করে দেয়, এবং একই সাথে দেখিয়ে দেয় যে, যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে ঐক্যের

ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করবেন, নিজেদের শক্তিশালী করবেন এবং নিজেদের সারিকে সংঘবদ্ধ করবেন।

দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

একজন কমিউনিস্ট যিনি হচ্ছেন একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী, একই সময়ে তিনি কি আবার দেশপ্রেমিকও হতে পারেন ? আমরা মনে করি, তিনি শুধু হতেই পারেন না, তাঁর তা হওয়া উচিত। ঐতিহাসিক অবস্থার দ্বারাই দেশপ্রেমের নির্দিষ্ট অর্ন্তবস্তু নির্ধারিত হয়। জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারেরও 'দেশপ্রেম' আছে, আবার আমাদেরও দেশপ্রেম আছে। কমিউনিস্টদের, অবশ্যই জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের 'দেশপ্রেমের' দৃঢ় বিরোধিতা করতে হবে। তাঁদের দেশের দ্বারা চালিত যুদ্ধ সম্পর্কে বলতে গেলে, জাপান ও জার্মানির কমিউনিস্টরা হচ্ছেন পরাজয়বাদী। প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের পরাজয় ঘটানোটাই হচ্ছে জাপানী ও জার্মান জনগণের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল, আর এই পরাজয় যতই সম্পূর্ণ হয়, ততই ভাল। জাপানী ও জার্মান কমিউনিস্টদের ঠিক এটাই করতে হবে এবং এটাই তাঁরা করছেন। কারণ, জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের দ্বারা চালিত যুদ্ধ শুধু বিশ্ব জনগণেরই ক্ষতি করছে না, বরং তাদের নিজেদের দেশের জনগণেরও ক্ষতি করছে। চীনের ব্যাপার হচ্ছে ভিন্ন, কারণ সে হচ্ছে আক্রমণের শিকার। চীনা কমিউনিস্টদের তাই আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে অবশ্যই দেশপ্রেমকে সংযুক্ত করতে হবে। আমরা হচ্ছি একই সময়ে আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং

সাথে সাথে সংগ্রামও থাকবে আর 'সবকিছুই যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে'—এই প্রস্তাবনা চীনের বাস্তব অবস্থার উপযোগী নয়। এভাবে যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারে খাপ খাইয়ে নেবার মতবাদের ভুলকে সমালোচনা করা হয়; 'যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে স্বাতন্ত্র্য ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রশ্ন' নামক রচনা, যা ছিল ঐ একই অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণের অংশ, তাতে কমরেড মাও সে-তুঙ এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। জাপানের বিরুদ্ধে জনগণের সশস্ত্র সংগঠিত করার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করাই সমগ্র পার্টির পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ—দৃঢ়তার সাথে এটা ঘোষণা করে অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ঃ যুদ্ধাঞ্চল ও শত্রুর পশ্চাদ্ভূমি হবে পার্টির প্রধান কাজের ক্ষেত্র। যেসব ব্যক্তি কুওমিনতাঙ বাহিনীর ওপর তাদের জয়ের আশা নিবদ্ধ করেছিল এবং যারা প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ শাসনের অধীনে বৈধ সংগ্রামের ওপরই জনগণের ভাগ্য ন্যস্ত করত, তাদের ভুল চিন্তাধারাকেও অধিবেশন নাকচ করে দেয়। 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা' নামক রচনা, যা ছিল ঐ অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণেরই একটি অংশ, তাতে কমরেড মাও সে-তুঙ এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

দেশপ্রেমিকও বটে, আর আমাদের শ্লোগান হচ্ছে, 'মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর'। আমাদের পক্ষে পরাজয়বাদ হল অপরাধ এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয়লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ, মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেই কেবলমাত্র আমরা আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে পারি এবং জাতীয় মুক্তি অর্জন করতে পারি। আর কেবলমাত্র জাতীয়, মুক্তি অর্জন করেই সর্বহারাশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের পক্ষে নিজেদের মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে। চীনের বিজয় আর আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজয় অন্যান্য দেশের জনগণকে সাহায্য করবে। তাই জাতীয় মুক্তির যুদ্ধসমূহে দেশপ্রেম হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদের বাস্তব প্রয়োগ। এই কারণে কমিউনিস্টরা অবশ্যই তাঁদের উদ্যোগের সর্বাধিক ব্যবহার করবেন, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে বীরত্বের সাথে ও দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে যাবেন এবং জাপানী আক্রমণকারীদের ওপর তাঁদের বন্দুকের নিশানা ঠিক করবেন। এই কারণেই, ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার ঠিক পরপরই আমাদের পার্টি জাতীয় প্রতিরক্ষা-যুদ্ধের দ্বারা জাপানী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার ঘোষণা জারী করে, পরবর্তী সময়ে জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্তফ্রন্টের প্রস্তাব উত্থাপন করে, জাপ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে লালফৌজকে পুনর্গঠিত করার এবং রণাঙ্গনে যাত্রা করার নির্দেশ দেয়, আর যুদ্ধের সম্মুখসারিতে নিজেদের স্থান গ্রহণের জন্যে এবং নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য পার্টি-সদস্যদের নির্দেশ দেয়। এগুলো হচ্ছে চমৎকার দেশপ্রেমমূলক কার্যক্রম এবং, আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে যাওয়া তো দূরের কথা, চীনে এগুলোই হচ্ছে তার বাস্তব প্রয়োগ। আমরা ভুল করেছি কিম্বা আন্তর্জাতিকতাবাদকে পরিত্যাগ করেছি ইত্যাদি ধরনের বাজে কথা তারাই বলতে পারে, যারা রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত কিংবা যাদের রয়েছে দুরভিসন্ধি।

জাতীয় যুদ্ধে কমিউনিস্টদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত

উপরোল্লিখিত কারণে জাতীয় যুদ্ধে কমিউনিস্টদের প্রচণ্ড উদ্যোগ দেখানো উচিত, আর তা বাস্তবতঃই দেখানো উচিত, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের দৃষ্টান্তমূলক অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। আমাদের যুদ্ধ হল প্রতিকূল অবস্থার অধীনে চালিত একটি যুদ্ধ। ব্যাপক জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধ, জাতীয় আত্মসম্মানবোধ এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাস পর্যাপ্ত পরিমাণে

বিকাশলাভ করেনি, জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অসংগঠিত, চীনের সামরিক শক্তি দুর্বল, অর্থনীতি পশ্চাদ্‌পদ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক, দুর্নীতি ও হতাশাবাদ বিরাজ করছে, এবং যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে ঐক্য ও সংহতির অভাব রয়ে গেছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রয়েছে এগুলোই। সুতরাং, এইসব অনভিপ্রেত বিষয়ের যাতে সমাপ্তি ঘটে, তার জন্য সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মহান দায়িত্ব কমিউনিস্টদের সচেতনভাবে কাঁধে তুলে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের দৃষ্টান্তমূলক অগ্রণী ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর কমিউনিস্টদের বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার, শৃংখলা মেনে চলার, রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যাওয়ার এবং আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতির উন্মেষ ঘটানোর কাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। বন্ধুভাবাপন্ন দল ও বাহিনীগুলোর সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতে গেলে, জাপানকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টদের ঐক্যের জন্য দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচী উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে এবং প্রতিরোধের কর্তব্য সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে; কথায় তাদের হতে হবে বিশ্বস্ত আর কাজে হতে হবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ঔদ্ধত্য থেকে হতে হবে মুক্ত আর বন্ধুভাবাপন্ন দল ও বাহিনীগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনায় ও সহযোগিতা প্রদর্শনে হতে হবে আন্তরিক, এবং যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে অন্তঃপার্টি সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের হতে হবে আদর্শ দৃষ্টান্ত। সরকারী কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক কমিউনিস্টকেই চূড়ান্ত সততার, চাকুরীতে নিযুক্তিদানের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি থেকে মুক্ত থাকার এবং স্বল্প পারিশ্রমিকের বদলে কঠোর কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। জনগণের মধ্যে কাজ করছেন এমন প্রত্যেক কমিউনিস্টকেই জনগণের বন্ধু হতে হবে, তাঁদের বস্ নয়; অক্লান্ত শিক্ষক হতে হবে, আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিক নয়। কখনো, কোন অবস্থাতেই একজন কমিউনিস্ট তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দেবেন না, বরং সেগুলোকে জাতির এবং জনসাধারণের স্বার্থের অধীনস্থ রাখবেন। এই কারণে, স্বার্থপরতা, শিথিলতা, দুর্নীতি, খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণার বিষয়; অন্যদিকে নিঃস্বার্থপরতা, নিজের সকল শক্তি নিয়ে কাজ করা, জনগণের কর্তব্যে সর্বান্তকরণে আত্মনিয়োগ, আর নীরবে কঠিন কাজ করার মনোভাব শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হবে। পার্টির বাইরেকার সকল প্রগতিশীলদের সাথে সমতালে কাজ করা এবং অনভিপ্রেত সবকিছুকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চালানো কমিউনিস্টদের উচিত। এটা অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, কমিউনিস্টরা জাতির একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, পার্টির বাইরে বিপুলসংখ্যক প্রগতিশীল ও সক্রিয়

কর্মী রয়েছেন যাঁদের সাথে আমাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে। এটা চিন্তা করা নেহাতই ভুল যে, আমরা কেবলমাত্র ভাল, আর অন্যরা মোটেই ভাল নয়। রাজনৈতিকভাবে পশ্চাদ্‌পদ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলতে গেলে কমিউনিস্টরা তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন না কিম্বা উপেক্ষা করবেন না, বরং তাদেরকে বন্ধুর মতো দেখবেন, তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন, তাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাবেন এবং সামনে এগিয়ে যেতে তাঁদের উৎসাহিত করবেন। যেসব ব্যক্তি তাদের কাজে ভুল করেছেন, তারা যদি সংশোধনের অতীত না হন, তাহলে পরিবর্তিত হওয়া ও নতুনভাবে কাজ শুরু করায় তাদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি কমিউনিস্টদের বুঝিয়ে বলার দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করা উচিত, সরিয়ে রাখার নয়। বাস্তবনিষ্ঠ এবং দূরদর্শী হওয়ার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। কারণ একমাত্র বাস্তবনিষ্ঠ হয়েই তাঁরা পূর্বনির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন, আর অগ্রগতির ক্ষেত্রে দূরদর্শিতাই তাঁদেরকে আপেক্ষিক অবস্থান হতে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। কমিউনিস্টদেরকে তাই অধ্যয়নেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। সব সময়েই তাঁদেরকে জনগণের কাছ থেকে শিখতে হবে, সব সময়েই জনগণকে শেখাতে হবে। জনগণের কাছ থেকে, প্রকৃত অবস্থা থেকে এবং বন্ধুভাবাপন্ন দল ও বাহিনীর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই কেবলমাত্র আমরা কাজের ক্ষেত্রে বাস্তবনিষ্ঠ হতে পারি এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দূরদর্শী হতে পারি। একটি সুদীর্ঘ যুদ্ধে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, বন্ধুভাবাপন্ন দল ও বাহিনীর মধ্যেকার এবং জনগণের মধ্যেকার সকল অগ্রণী ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে কমিউনিস্টরা যদি তাঁদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সীমায় দৃষ্টান্তমূলক অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন তাহলে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা, শত্রুকে পরাজিত করা এবং একটি নতুন চীন গড়ে তোলার সংগ্রামে সমগ্র জাতির প্রাণবন্ত শক্তির সমাবেশ ঘটানো যাবে।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ কর ও তার মধ্যেকার শত্রুর চরদের মোকাবিলা কর

বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ওঠা, শত্রুকে পরাজিত করা এবং একটি নতুন চীন গড়ে তোলার জন্যে একটিমাত্র নীতিই আছে, আর তা হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে সুসংহত ও প্রসারিত করা এবং সমগ্র জাতির প্রাণবন্ত শক্তিকে সমাবেশ করা। কিন্তু আমাদের জাতীয় যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে শত্রুর গুপ্তচররা আগে থেকেই বিভেদমূলক ভূমিকা পালন করে চলেছে, যেমন,

দেশদ্রোহী, ট্রটস্কিপন্থী এবং জাপানপন্থী লোকেরা। কমিউনিস্টরা সব সময়ই তাদের সম্পর্কে সতর্ক নজর রাখবে, তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপকে তথ্যপ্রমাণ সহকারে উদ্‌ঘাটিত করবে আর যাতে তাদের দ্বারা সহজে প্রতারিত না হন তার জন্য জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেবেন। শত্রুর এসব চরদের প্রতি কমিউনিস্টরা তাঁদের রাজনৈতিক সতর্কতাকে অবশ্যই সুতীক্ষ্ণ করবেন। তাঁদেরকে এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, জাতীয় যুক্তফ্রন্টেই সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের কাজ এবং শত্রুর গুপ্তচরদের মুখোস উন্মোচন ও তাদের নিশ্চিহ্নকরণের কাজ অবিচ্ছেদ্য। শুধু একদিকেই নজর দেওয়া এবং অন্যদিকে ভুলে যাওয়া সামগ্রিকভাবেই ভুল হবে।

কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্প্রসারিত কর ও শত্রুর চরদের অনুপ্রবেশ রোধ কর

বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ওঠা, শত্রুকে পরাজিত করা এবং একটি নতুন চীন গড়ে তোলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে অবশ্যই তার সংগঠনের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে এবং শ্রমিক, কৃষক ও যুবকর্মীদের মধ্যে যারা বিপ্লবের প্রতি সত্যিকারভাবে অনুগত, যারা পার্টির নীতির প্রতি আস্থাশীল, তার কর্মনীতি সমর্থন করে এবং তার শৃংখলা মেনে চলতে ও কঠোর কাজ করতে প্রস্তুত, তাদের জন্যে পার্টির দরজা খুলে দিয়ে পার্টিকে একটি বিরাট গণ-পার্টিতে পরিণত করতে হবে। দরজা বন্ধ রাখার কোন প্রবণতাই এক্ষেত্রে সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু এই একই সাথে, শত্রুর গুপ্তচরদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সজাগ-সতর্কতার ক্ষেত্রে কোন শিথিলতাই থাকতে পারে না। জাপানী সাম্রাজ্যবাদী গুপ্ত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আমাদের পার্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে এবং সক্রিয় কর্মীর ছদ্মবেশে আমাদের সারিতে ছদ্মবেশী দেশদ্রোহী, ট্রটস্কিপন্থী, জাপ-সমর্থক ব্যক্তি, অধঃপতিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী লোকদের গোপনে অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়ার জন্যে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব লোকের বিরুদ্ধে আমাদের সর্তকতা এবং কঠোর সাবধানতা একটি মুহূর্তের জন্যেও যেন আমরা শিথিল না করি। সাহসের সাথে পার্টিকে সম্প্রসারিত করার প্রতিষ্ঠিত কর্মনীতি যেখানে আমাদের রয়েছে, সেখানে শত্রুর গুপ্তচরদের ভয়ে দরজা বন্ধ করা আমাদের অবশ্যই উচিত নয়। কিন্তু একদিকে সাহসের সাথে যখন আমরা আমাদের সভ্যসংখ্যা বাড়াব, তখন অন্যদিকে শত্রুর চর ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী যেসব ব্যক্তি পার্টিতে ঢুকে পড়ার জন্যে এই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্কতা

অবশ্যই শিথিল করা চলবে না। আমরা যদি কেবলমাত্র একদিকের প্রতিই নজর দিই এবং অন্যদিককে ভুলে যাই তাহলে আমাদের ভুলই হবে। একমাত্র সঠিক কর্মনীতি হল ঃ 'সাহসের সাথে পার্টিকে সম্প্রসারিত কর, কিন্তু অনভিপ্রেত একটি লোককেও ঢুকতে দিও না।'

যুক্তফ্রন্ট ও পার্টির স্বাতন্ত্র্য দুই-ই বজায় রাখ

দৃঢ়ভাবে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট বজায় রেখেই কেবলমাত্র বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ওঠা যাবে, শত্রুকে পরাজিত করা যাবে এবং একটি নতুন চীন গড়ে তোলা যাবে। এর মধ্যে কোন সন্দেহই নেই। একই সময়ে, যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ প্রত্যেকটি পার্টি ও গ্রুপকে তার আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই রক্ষা করতে হবে ; এটা কুওমিনতাঙ, কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা অন্য যে-কোনও পার্টি বা গ্রুপের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্তঃপার্টি সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সকল পার্টি ও গ্রুপের সম্মিলন এবং প্রত্যেকটির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এই দুটোই 'তিন গণ-নীতির' অন্তর্ভুক্ত 'গণতন্ত্রের নীতি' দ্বারা স্বীকৃত। কেবল ঐক্যের কথাই বলা এবং স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করার অর্থ হল গণতন্ত্রের নীতিকে পরিত্যাগ করা, আর এতে কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা অন্য যে-কোন পার্টি একমত হতে পারে না। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে স্বাতন্ত্র্য হলো আপেক্ষিক, চূড়ান্ত নয়, আর এটাকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করলে তা শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যের সাধারণ কর্মনীতিকেই দুর্বল করবে। কিন্তু এই আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যকে অবশ্যই অস্বীকার করা উচিত নয় ; আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে প্রত্যেক পার্টিরই থাকবে তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ আপেক্ষিক স্বাধীনতা। তাছাড়া, এই আপেক্ষিক স্বাধীনতা যদি অস্বীকার করা হয় কিংবা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যের সাধারণ কর্মনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং বন্ধুভাবাপন্ন পার্টিগুলোর সকল সদস্যদের এটা স্পষ্টভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই কথা একইভাবে সত্য। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত নীতি যে, প্রতিরোধ-যুদ্ধের ক্ষেত্রে সবকিছুকেই প্রতিরোধের স্বার্থের অধীনস্থ করতে হবে। সুতরাং, শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থ প্রতিরোধ-যুদ্ধের স্বার্থের অধীনস্থ হবে, অবশ্যই তার বিরোধী হবে না। কিন্তু শ্রেণী এবং শ্রেণী-সংগ্রাম বাস্তব ঘটনা, আর যেসব লোক শ্রেণী-সংগ্রামের বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করে তারা ভ্রান্ত। যে তত্ত্ব এই বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করার প্রয়াস পায়, তা একেবারেই ভ্রান্ত। আমরা শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করি না, আমরা তার সমন্বয়সাধন করি। পারস্পারিক সাহায্য

এবং পারস্পরিক সুবিধাদানের যে কর্মনীতির পক্ষে আমরা কথা বলি, তা শুধু পার্টি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং তা শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জাপ-বিরোধী ঐক্য দাবি করে শ্রেণী-সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত সমন্বয়সাধনের কর্মনীতি, এমন এক কর্মনীতি যা শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ-সংরক্ষণ করে না, বরং ধনী লোকর স্বার্থও বিবেচনা করে, এবং এইভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে সংহতির দাবি পূরণ করে। কেবল একদিকের প্রতি নজর দিয়ে অন্যদিককে অবহেলা করা প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার কর, সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা কর, আর আমাদের মিত্রদের সাথে একযোগে কাজ কর

শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা পরিস্থিতিকে অবশ্যই সামগ্রিকভাবে বিচার করবে, জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করবে এবং তাদের মিত্রদের সাথে একযোগে কাজ করবে। অংশের প্রয়োজনকে সমগ্রের প্রয়োজনের অধীনস্থ করার নীতিকে কমিউনিস্টদের আয়ত্ত করতে হবে। যদি কোন পরিকল্পনা একটি আংশিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই প্রয়োগযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়, সামগ্রিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য না হয়, তাহলে অংশকে অবশ্যই সমগ্রের পথ ছেড়ে দিতে হবে। বিপরীত দিক দিয়ে, যদি পরিকল্পনাটি অংশের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য না হয়, বরং সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োগযোগ্য হয়, তাহলে এবারও অংশকে সমগ্রের পথ ছেড়ে দিতে হবে। পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করা বলতে ঠিক এটাই বোঝায়। কমিউনিস্টরা কখনোই জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবে না, অথবা কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক প্রগতিশীল বাহিনীকে একটি বিচ্ছিন্ন ও হঠকারী অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে জনগণকে উপেক্ষা করবে না, বরং প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ ও ব্যাপক জনতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তুলবে। জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা বলতে ঠিক এটাই বোঝায়। আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক গণতান্ত্রিক পার্টি বা ব্যক্তি যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই কমিউনিস্টদের পক্ষে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি হবে তাদের সাথে বিস্তৃতভাবে সব বিষয় আলাপ-আলোচনা করা এবং তাদের সাথে একযোগে কাজ করা। স্বেচ্ছাচারমূলক সিদ্ধান্ত ও প্রভুত্বমূলক কার্যাবলীর প্রশ্রয় দেওয়া এবং আমাদের মিত্রদের উপেক্ষা করাটা অনুচিত।

ভাল কমিউনিস্ট হচ্ছে সে-ই যে পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার-বিবেচনা করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করায় এবং মিত্রদের সাথে কাজ করায় উপযুক্ত। এ ব্যাপারে আমাদের মারাত্মক দোষ-ত্রুটি ছিল, আর এখনো এই বিষয়টির ওপর আমাদের নজর দিতে হবে।

কর্মীসংক্রান্ত নীতি

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে এমন একটা পার্টি, যা সংখ্যার দিক দিয়ে বেশ কয়েক কোটি লোকেরই এক জাতির মধ্যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনা করছে। আর রাজনৈতিক সংহতির সাথে কর্মক্ষমতার সংযোগ সাধনকারী বিপুলসংখ্যক নেতৃস্থানীয় কর্মী ছাড়া পার্টির পক্ষে তার এই ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পন্ন করা অসম্ভব। বিগত সতের বছরে আমাদের পার্টি বেশ ভাল সংখ্যক যোগ্য নেতাকে সুশিক্ষিত করে তুলেছে, যার ফলে সামরিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পার্টিগত এবং গণ-কার্যকলাপের ক্ষেত্রে আমাদের একটা কর্মী-কাঠামো গড়ে উঠেছে ; এই সাফল্যের সকল গৌরবই পার্টির এবং জাতির প্রাপ্য। কিন্তু বর্তমানের এই কর্মী-কাঠামো আমাদের সংগ্রামের বিরাট সৌধকে সমর্থন করার পক্ষে এখনো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, ব্যাপক হারে যোগ্য লোক সুশিক্ষিত করে তোলার এখনো প্রয়োজন রয়েছে। চীনা জনগণের মহান সংগ্রামে বহু সক্রিয় কর্মী এগিয়ে এসেছেন, এবং তাঁদের আগমন এখনো অব্যাহত রয়েছে। তাঁদেরকে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করে তোলা এবং তাঁদের ভালভাবে যত্ন নেওয়া ও উপযুক্ত কাজে লাগানোর দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। রাজনৈতিক লাইন একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে কর্মীরাই হচ্ছেন নির্ধারক উপাদান।[১] সুতরাং আমাদের সংগ্রামী কর্মসূচী হচ্ছে নতুন কর্মীদের বিরাট সংখ্যককে পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষিত করা।

পার্টি-কর্মীদের সাথে সাথে পার্টি-বহির্ভূত কর্মীদের প্রতিও আমাদের সম্পর্ককে সম্প্রসারিত করতে হবে। পার্টির বাইরে অনেক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁদেরকে উপেক্ষা করা অবশ্যই উচিত নয়। প্রত্যেক কমিউনিস্টের কর্তব্য হল ঔদ্ধত্য ও একাকীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করা, পার্টি বহির্ভূত কর্মীদের সাথে মিলে কাজ করতে নিপুণ হওয়া, তাদের আন্তরিক সাহায্য দেওয়া, তাদের প্রতি ঐকান্তিক কমরেডসুলভ মনোভাব গ্রহণ করা এবং জাপানকে প্রতিরোধ করা ও দেশকে পুনর্গঠন করার মহান কাজে তাদের উদ্যোগকে নিয়োজিত করা।

কর্মীদের কিভাবে বিচার করতে হবে, তা আমাদের অবশ্যই জানা দরকার। কোন কর্মীর জীবনের একটা স্বল্প সময় কিংবা একটা স্বতন্ত্র ঘটনার মধ্যেই

আমাদের বিচার-বিবেচনা অবশ্যই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়, বরং তার জীবন ও কার্যকলাপকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা উচিত। এটাই হচ্ছে কর্মীদের বিচার করার প্রধান পদ্ধতি।

কর্মীদের কিভাবে ভালভাবে কাজে লাগানো যায় তা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, নেতৃত্বের সাথে জড়িত রয়েছে দুটো প্রধান দায়িত্ব ঃ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, আর কর্মীদের ভালভাবে কাজে লাগানো। পরিকল্পনা খাড়া করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, আর আদেশ ও নির্দেশ প্রদান করা, এসব বিষয়ই 'কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করার' আওতায় পড়ে ; কর্ম-পরিকল্পনাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে ক্যাডারদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং কাজে নেমে পড়ায় উৎসাহিত করতে হবে ; এটা 'কর্মীদের ভালভাবে কাজে লাগানোর' আওতায় পড়ে। কর্মীদের কাজে লাগানোর ব্যাপারে আমাদের জাতির সমগ্র ইতিহাস জুড়ে দুটো তীব্র বিপরীতমুখী লাইন দেখা যায়, একটা হল 'যোগ্যতা অনুসারে লোক নিয়োগ', আর অন্যটা হল 'স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে লোক নিয়োগ'। প্রথমটি হল সদুপায় আর দ্বিতীয়টি হল অসদুপায়। কর্মী-নীতির ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির যে মানদণ্ড প্রয়োগ করা উচিত তা হল কোন কর্মী-পার্টি-লাইন কার্যকরী করার ব্যাপারে দৃঢ় কিনা, সে পার্টির শৃংখলা মানে কিনা, জনতার সাথে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে কিনা, স্বাধীনভাবে নিজের দায়িত্ব খুঁজে নেবার ক্ষমতা তার আছে কিনা, আর সে সক্রিয়, পরিশ্রমী ও নিঃস্বার্থ কিনা। 'যোগ্যতা অনুসারে লোক নিয়োগ' বলতে এটাই বোঝায়। চ্যাং কুও-তাও'য়ের কর্মী নীতি ছিল তার ঠিক বিপরীত। 'স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করার' লাইন অনুসরণ করে, একটি ক্ষুদ্র চক্র গঠন করার উদ্দেশ্যে নিজের চারিদিকে সে তার প্রিয়পাত্রদের জড়ো করে, আর শেষ পর্যন্ত পার্টির প্রতি নিজেকে সে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করে এবং শিবির ত্যাগ করে। এটা আমাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এই ঘটনা এবং অনুরূপ ঐতিহাসিক শিক্ষাবলী থেকে সর্তকতা গ্রহণ করে, কেন্দ্রীয় কমিটি ও সকল স্তরের নেতাদেরকে কর্মী-নীতির ক্ষেত্রে সৎ ও নিরপেক্ষ পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং অসৎ ও পক্ষপাতমূলক পদ্ধতি বাতিল করার বিষয়টিকে প্রধান দায়িত্ব বলেই গ্রহণ করতে হবে, আর এভাবে পার্টির ঐক্যকে মজবুত করতে হবে।

কর্মীদের কিভাবে ভাল করে যত্ন নিতে হয় তা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। যত্ন নেওয়ার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আছে ঃ

প্রথমতঃ, তাদের পথনির্দেশ করা। এর অর্থ, স্বাধীনভাবে তাদের কাজ করতে দেওয়া, যাতে সাহসের সাথে তারা দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে আর একই সময়ে, তাদের সময়োচিত নির্দেশ দেওয়া, যাতে পার্টির

রাজনৈতিক লাইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা নিজেদের উদ্যোগের পূর্ণ ব্যবহার করতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, তাদের মান উন্নত করা। এর অর্থ, অধ্যয়নের সুযোগ দিয়ে তাদের শিক্ষাদান করা, যাতে নিজেদের তত্ত্বগত উপলব্ধি ও নিজেদের কর্মক্ষমতা তারা বাড়াতে পারে।

তৃতীয়তঃ, তাদের কাজকর্ম পরীক্ষা করে দেখা, আর তাদের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করতে, তাদের সাফল্যকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং তাদের ভুলগুলোকে শুধরে নিতে তাদেরকে সাহায্য করা। পরীক্ষা না করে কাজের দায়িত্ব দেওয়া এবং শুধু মারাত্মক ভুল করলেই কেবল নজর দেওয়া—এটা কর্মীদের যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি নয়।

চতুর্থতঃ, সাধারণভাবে, যেসব কর্মী ভুল করেছে তাদের প্রতি বুঝিয়ে বলার পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, আর তাদের ভুলগুলো শুধরাতে সাহায্য করতে হবে। গুরুতর ভুল করা সত্ত্বেও যারা নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে, কেবলমাত্র তাদের বেলায় সংগ্রামের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা অপরিহার্য। কোন লোককে লঘুভাবে 'সুবিধাবাদী' আখ্যা দেওয়া কিম্বা তার বিরুদ্ধে লঘুভাবে 'সংগ্রাম চালানোর' পদ্ধতি অবলম্বন করা ঠিক নয়।

পঞ্চমতঃ, তাদের অসুবিধার সময় তাদের সাহায্য করা। অসুস্থতা, আর্থিক অনটন বা সাংসারিক কিংবা অন্য কোন বিপত্তির ফলে কর্মীরা যখন অসুবিধায় পড়ে, তখন আমাদের নিশ্চিতভাবেই যতটা সম্ভব যত্ন নিতে হবে।

এগুলোই হচ্ছে কর্মীদের যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি।

পার্টি শৃংখলা

চ্যাং কুও-তাও'য়ের মারাত্মক শৃংখলা ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির শৃংখলাকে আমাদের আবার দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরতে হবে, যা হলঃ

(১) ব্যক্তি সংগঠনের অধীন;
(২) সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অধীন;
(৩) নিম্নতর স্তর উচ্চতর স্তরের অধীন; এবং
(৪) সমগ্র পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির অধীন।

যে কেউ-ই শৃংখলার এই বিধিগুলো লংঘন করে, সে-ই পার্টি-ঐক্যকে বিনষ্ট করে। অভিজ্ঞতা প্রমাণিত করেছে যে, কিছু কিছু লোক পার্টি-শৃংখলা কি

তা না জেনেই শৃংখলা ভঙ্গ করে ; আবার অন্যদিকে চ্যাং কুও তাও'য়ের মতো কিছু কিছু লোক জেনেশুনেই তা ভঙ্গ করে এবং নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বহু পার্টি-সদস্যদের এই অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করে। তাই, পার্টি-সদস্যদের পার্টি-শৃংখলায় শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন, যাতে পার্টির সাধারণ কর্মীরা নিজেরাই যে কেবল শৃংখলা মেনে চলবে তা নয়, বরং নেতারাও যাতে তা মেনে চলেন, সেজন্য তাঁদের ওপর তদারকী প্রয়োগ করবেন, আর এইভাবেই চ্যাং কুও-তাও'য়ের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে। সঠিক পথে অন্তঃপার্টি সম্পর্কের বিকাশসাধনকে যদি আমরা নিশ্চিত করতে চাই, তাহলে শৃংখলার উপরোক্ত চারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধি ছাড়াও বেশ সুবিস্তৃত একপ্রস্থ পার্টি নিয়মবিধি আমাদের প্রণয়ন করতে হবে, যা সকল স্তরের নেতৃত্বদানকারী সংস্থাসমূহের কাজকর্মকে সুসমঞ্জস করার কাজে সহায়তা করবে।

পার্টি গণতন্ত্র

বর্তমানের মহান সংগ্রামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দাবি করে যে, পার্টির সমস্ত নেতৃত্বদানকারী সংস্থা এবং সমস্ত পার্টি-সদস্য ও কর্মীদের উচিত তাদের উদ্যোগের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটানো, আর কেবলমাত্র এটাই বিজয়কে সুনিশ্চিত করতে পারে। নেতৃত্বাদানকারী সংস্থা, কর্মী ও পার্টির সাধারণ কর্মীদের সৃজনশীলভাবে কাজ করার ক্ষমতার, দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের প্রস্তুতিতে, তাদের কাজকর্মে তাদের দ্বারা প্রদর্শিত উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্ততায়, প্রশ্ন উত্থাপন, মত প্রকাশ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনায় তাদের সাহস ও সক্ষমতায়, নেতৃত্বদানকারী সংস্থা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের ওপর আরোপিত কমরেডসুলভ তদারকির ক্ষেত্রেই এই উদ্যোগকে বাস্তবতঃ প্রদর্শন করতে হবে ; অন্যথায় এই 'উদ্যোগ' একটি শূন্যগর্ভ বিষয়ে পরিণত হবে। কিন্তু এই ধরনের উদ্যোগের অনুশীলন পার্টি-জীবনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিস্তৃতির ওপর নির্ভর করে। পার্টি-জীবনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র যদি না থাকে তাহলে এর স্ফুরণ ঘটানো সম্ভব নয়। কেবলমাত্র একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশেই বিপুলসংখ্যক যোগ্য লোককে সামনে টেনে আনা যায়। আমাদের হচ্ছে এমন এক দেশ, যেখানে ক্ষুদে উৎপাদন এবং পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিরাজমান, আর সামগ্রিকভাবে ধরলে দেশে এখনো কোন গণতান্ত্রিক জীবনধারা নেই ; ফলতঃ, আমাদের পার্টিতে এই ধরনের অবস্থার প্রতিফলন ঘটছে পার্টি-জীবনের ক্ষেত্রে অপ্রতুল গণতন্ত্রের মাধ্যমে। এই অবস্থা সমগ্র পার্টিকে তার পরিপূর্ণ উদ্যোগ অনুশীলনে বাধা দিচ্ছে। অনুরূপভাবে যুক্তফ্রন্ট ও গণ-আন্দোলনে এটা অপ্রতুল গণতন্ত্রের জন্ম দিচ্ছে।

এইসব কারণে পার্টির ভেতরে গণতন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যেতে হবে, যাতে পার্টি-সদস্যরা গণতান্ত্রিক জীবনের অর্থ কি, গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার মধ্যেকার সম্পর্ক বলতে কি বোঝায়, আর গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কোন্ পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে তা অনুধাবন করতে পারেন। শুধুমাত্র এই উপায়েই আমরা প্রকৃতভাবে পার্টির ভেতরে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারি এবং একই সময়ে উগ্র গণতন্ত্র ও শৃংখলা ধ্বংসকারী অবাধ স্বাধীনতার নীতিকে এড়াতে পারি।

আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যেকার পার্টি-সংগঠনসমূহের মধ্যেও প্রয়োজনীয় পরিমাণ গণতন্ত্রের প্রসার ঘটানো দরকার যাতে পার্টি-সদস্যদের উদ্যোগ জাগ্রত হয় এবং সৈন্যদের প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য স্থানীয় পার্টি-সংগঠন-সমূহে যে পরিমাণ গণতন্ত্র থাকে, সেনাবাহিনীর মধ্যেকার পার্টি-সংগঠনসমূহে সে পরিমাণ গণতন্ত্র থাকতে পারে না। সেনাবাহিনী ও স্থানীয় সংস্থাসমূহ—এই উভয়টিতেই অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র চালু রাখার উদ্দেশ্য হল শৃংখলা জোরদার করা এবং প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা, সেগুলোকে দুর্বল করা নয়।

পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণকে পার্টির সুসংবদ্ধকরণ ও বিকাশের পথে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবেই দেখতে হবে, দেখতে হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে, যা পার্টিকে মহান সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় হতে, তার কর্তব্য সাধনের উপযোগী হতে, নতুন শক্তি সৃষ্টি করতে ও যুদ্ধের বাধাবিপত্তিসমূহ দূর করায় সক্ষম করে তোলে।

দুটি ফ্রন্টে সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের পার্টি নিজেকে সংহত করেছে ও শক্তিশালী হয়েছে

সাধারণভাবে বলতে গেলে আমাদের পার্টি বিগত সতের বছর ধরে দুটি ফ্রন্টে পার্টির আভ্যন্তরীণ ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে—অর্থাৎ, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শগত হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখেছে।

ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পূর্বে[২] আমাদের পার্টি চেন তু-শিউ'র দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও কমরেড লি লি - সানের 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এই দুটি অন্তঃপার্টি সংগ্রামে অর্জিত বিজয়ের দরুণ পার্টির বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর আরও দুটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন অন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালানো হয়, সেটা হল সুনাই বৈঠকে পরিচালিত সংগ্রাম এবং চ্যাং কুও-তাও'য়ের বহিষ্কার সম্পর্কিত সংগ্রাম।

সুনাই বৈঠক 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী চরিত্রের মারাত্মক ভুলসমূহ—শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে নীতিগত যেসব ভুল করা হয়েছিল সেগুলোকে—সংশোধন করেছে এবং পার্টি ও লালফৌজকে ঐক্যবদ্ধ করেছে; এই বৈঠক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং লালফৌজের মূল শক্তিসমূহকে 'লঙ মার্চের' বিজয়মণ্ডিত সমাপনে, জাপানকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী অবস্থানে এগিয়ে যেতে এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নতুন কর্মনীতি বাস্তবায়নে সক্ষম করে তুলেছে। চ্যাং কুও-তাও'য়ের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদকে মোকাবিলা করার মাধ্যমে পাসী ও ইয়েনান বৈঠক (চ্যাং কুও-তাও'য়ের লাইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয় পাসী বৈঠকে[৩] আর শেষ হয় ইয়েনান বৈঠকে[৪]) লাল শক্তিসমূহের সবগুলোকে একত্রে সম্মিলিত করতে এবং জাপানের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য সমগ্র পার্টির ঐক্যকে জোরদার করতে সক্ষম হয়েছে; বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের আমলেই এই দু'রকমের সুবিধাবাদী ভুল দেখা দিয়েছিল, আর তাদের বৈশিষ্ট্য হল এগুলো ছিল যুদ্ধ সম্পর্কিত ভ্রান্তি।

এই দুটি অন্তঃপার্টি সংগ্রাম থেকে লব্ধ শিক্ষাগুলো কি কি? সেগুলো হচ্ছে:

(১) 'বামপন্থী' ধৈর্যহীনতার প্রবণতা, যা বিষয়গত ও বস্তুগত উভয় উপাদানকে উপেক্ষা করে, তা বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক, আর সেই সূত্রে যে-কোন বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষেই ক্ষতিকারক—এই প্রবণতাই ছিল মারাত্মক নীতিগত ভ্রান্তিসমূহের মধ্যেকার একটি, যা শত্রুর পঞ্চম 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে চালিত সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছিল, আর যা চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল।

(২) চ্যাং কুও-তাও'য়ের সুবিধাবাদ অবশ্য ছিল বিপ্লবী যুদ্ধের ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ এবং পশ্চাদপসরণবাদী লাইন, যুদ্ধরাজ নীতি পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের একটা সংমিশ্রিত রূপ ছিল এটা। শুধুমাত্র এই নিদর্শনের সুবিধাবাদকে অতিক্রম করেই লালফৌজের চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির বিপুল সংখ্যক কর্মী ও পার্টি-সদস্য, যাঁরা অপরিহার্যরূপে চমৎকার গুণাবলী দ্বারা ভূষিত এবং যাঁদের রয়েছে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য, তাঁরা চ্যাং কুও-তাও'য়ের ফাঁদ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক লাইনে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

(৩) কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের দশ বছরকালীন মহান সাংগঠনিক কাজে, অর্থাৎ সেনাবাহিনী গঠন, সরকারী কাজকর্ম, জনগণের মধ্যেকার কাজকর্ম ও পার্টি

গঠনের কাজে অত্যাশ্চর্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। রণাঙ্গনের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের প্রতি এরকম সাংগঠনিক কাজের দ্বারা প্রদত্ত সমর্থন না থাকলে চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে তিক্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। তবুও এই আমলের শেষদিকে কর্মী ও সংগঠন সম্পর্কিত পার্টির কর্মনীতিতে মারাত্মক নীতিগত ভুলভ্রান্তি করা হয়েছিল; সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতা, দৈহিক শাস্তি প্রদান ও মাত্রাতিরিক্ত আদর্শগত সংগ্রামের কর্মনীতির মধ্যেই এসব ভ্রান্তি নিজেদের প্রকাশ ঘটিয়েছিল। পূর্বতন লি লি-সান লাইনের নিদর্শনগুলো দূর করার কাজে আমাদের অকৃতকার্যতা আর ঐ নির্দিষ্ট সময়ে নীতিগত ব্যাপারে কৃত রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি—এই উভয় কারণেই তা ঘটেছিল। সুনাই বৈঠকে এসব ভুলভ্রান্তিও সংশোধন করা হয়, আর এভাবে পার্টি একটি সঠিক কর্মী-নীতি ও সঠিক সাংগঠনিক নীতিমালা নির্ধারণের পথে এগুতে সক্ষম হয়। চ্যাং কুও-তাও'য়ের সাংগঠনিক লাইন সম্পর্কে বলতে গেলে, এই লাইন সকল পার্টি-নীতি লংঘন করেছিল, পার্টি শৃংখলা ভঙ্গ করেছিল এবং পার্টির বিরোধিতা, কেন্দ্রীয় কমিটির বিরোধিতা ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরোধিতার পর্যায় পর্যন্ত উপদলীয় কার্যকলাপ চালিয়েছিল। চ্যাং কুও-তাও'য়ের অপরাধমূলক ও ভ্রান্ত লাইনকে পরাজিত করার জন্য এবং তার পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি যথাসম্ভব সবকিছুই করেছিল, আর স্বয়ং চ্যাং কুও-তাও'কেও বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চ্যাং কুও-তাও যখন গোঁয়ারের মতো নিজের ভুলগুলো সংশোধন করতে অস্বীকার করল এবং দুমুখো নীতির আশ্রয় গ্রহণ করল, আর পরবর্তীকালে এমনকি পার্টির প্রতিও যখন বিশ্বাসঘাতকতা করল ও কুওমিনতাঙের কোলে নিজেকে সমর্পণ করল, তখন পার্টিকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে হয়। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা শুধু যে সকল পার্টি-সদস্যদেরই সমর্থন পেয়েছিল তাই নয়, উপরন্তু জাতীয় মুক্তির আদর্শের প্রতি অনুগত সকল জনগণেরও সমর্থনলাভ করেছিল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকও এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে এবং চ্যাং কুও-তাওকে শিবিরত্যাগী ও বিশ্বাসঘাতক বলে নিন্দা করে।

এই সমস্ত শিক্ষা ও এই সমস্ত সাফল্য সমগ্র পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার, পার্টির আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংহতিকে জোরদার করার, আর সাফল্যের সাথে প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনার পূর্বশর্তসমূহ আমাদের যুগিয়েছে। দুই ফ্রন্টে সংগ্রামের মাধ্যমেই আমাদের পার্টি নিজেকে সংহত করেছে ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

দুই ফ্রন্টে বর্তমান সংগ্রাম

এখন থেকে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে দক্ষিণপন্থী হতাশাবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যদিও 'বামপন্থী' ধৈর্যহীনতার দিকে নজর রাখারও আবশ্যকতা রয়েছে। আমরা যদি অন্যান্য বিভিন্ন জাপ-বিরোধী পার্টি ও গ্রুপের সহযোগিতালাভ করতে চাই, কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্প্রসারিত করতে চাই এবং গণ-আন্দোলনকে ব্যাপকতর করতে চাই, তাহলে যুক্তফ্রন্ট, পার্টি ও গণ-সংগঠনের প্রশ্নে রুদ্ধদ্বারের 'বামপন্থী' প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। একই সময়ে, শর্তহীন চরিত্রের সহযোগিতা ও সম্প্রসারণ-অভিমুখী দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী প্রবণতাকে মোকাবিলা করার কাজেও আমাদের অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, তা না হলে সহযোগিতা ও সম্প্রসারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেগুলো আত্মসমর্পণকারী সহযোগিতা ও নীতিহীন সম্প্রসারণে পর্যবসিত হবে।

দুই ফ্রন্টের মতাদর্শগত সংগ্রামকে অবশ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রের বাস্তব অবস্থার উপযোগী হতে হবে, আর কোন সমস্যার প্রতি আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা কিংবা লোকের গায়ে অযথা 'লেবেল সেঁটে' দেওয়ার পুরানো বদ-অভ্যাস অব্যাহত রাখা কখনোই চলবে না।

বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের বেলায়, দুমুখো আচরণের বিরোধিতার প্রতি অবশ্যই আমাদের তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে। চ্যাং কুও-তাও'য়ের জীবনের গতি প্রমাণ করছে এই ধরনের আচরণের মারাত্মক বিপদ হল এই যে, এটা উপদলীয় কার্যকলাপের জন্ম দিতে পারে। প্রকাশ্যে সম্মতি প্রদান আর পেছনে বিরুদ্ধাচরণ, মুখে 'হ্যাঁ' আর অন্তরে 'না', লোকের সামনে চমৎকার কথাবার্তা বলা আর পেছনে কূট চক্রান্ত করা—এ সবই দুমুখো আচরণের বিভিন্ন রূপ। এ ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে কর্মী ও পার্টি-সদস্যদের সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করেই কেবল পার্টি-শৃংখলাকে আমরা শক্তিশালী করতে পারি।

অধ্যয়ন

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কমিউনিস্ট পার্টির যেসব সভ্য লেখাপড়া জানেন তাঁদের সকলকেই মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্বাবলী অধ্যয়ন করতে হবে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস এবং চলতি আন্দোলন ও প্রবণতাসমূহ সম্পর্কে অধ্যয়ন চালাতে হবে; তদুপরি, কম লেখাপড়া জানেন এমন সব পার্টি-সভ্যকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারেও সহায়তা করতে হবে। বিশেষতঃ কর্মীদের এসব বিষয় যত্নের সাথে অধ্যয়ন করা উচিত, আর

কেন্দ্রীয় কমিটি ও উচ্চস্তরের কর্মীদের এগুলোর প্রতি আরও অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। বিপ্লবী তত্ত্বের অধিকারী না হলেও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে এবং বাস্তব আন্দোলন সম্পর্কে সুগভীর উপলব্ধি না থাকলে কোন রাজনৈতিক পার্টিই সম্ভবতঃ একটি মহান বৈপ্লবিক আন্দোলনকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে না।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্ব সার্বজনীনভাবেই প্রয়োগযোগ্য। অন্ধ মতবাদ হিসেবে নয়, বরং কর্মের পথনির্দেশক হিসেবেই এটাকে দেখা উচিত। নিছক কতকগুলো পদ বা শব্দসমষ্টি শেখার ব্যাপার নয়, বরং এটা অধ্যয়ন করার অর্থ হল বিপ্লবের বিজ্ঞান হিসেবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে শেখা। বাস্তব জীবন সম্পর্কে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের সুবিস্তৃত অধ্যয়ন ও তাঁদের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা যেসব সাধারণ সূত্র নিরূপণ করেছিলেন, সেগুলো নিছক হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারই শুধু এটা নয়, বরং তা হচ্ছে সমস্যার পর্যবেক্ষণ ও সমাধানে তাঁদের অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিকেও অধ্যয়ন করা। অতীতের তুলনায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর আমাদের পার্টির দখল এখন অনেক বেশি কিন্তু এখনো তা যথেষ্ট ব্যাপক ও গভীর নয়। আমাদের কর্তব্য হল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের এক মহান জাতির এক সুমহান ও নজিরবিহীন সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করা। সেইজন্য, মার্কসবাদ লেনিনবাদের অধ্যয়নকে ছড়িয়ে দেওয়া ও গভীরতর করার কাজটি আমাদের সামনে একটি বিরাট সমস্যা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন এবং যা কেবলমাত্র কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় কমিটির এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর, সমগ্র পার্টিতে অধ্যয়ন নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা আমি দেখতে চাই। এতে দেখা যাবে কে প্রকৃতই কিছু শিখছেন, আর কে বেশি শিখেছেন ও ভালভাবে শিখেছেন। নেতৃত্বের প্রধান দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়া সম্পর্কে বলতে গেলে, দু-একশ কমরেড থাকেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর যাঁদের টুকরো-টুকরো নয় সুসম্বন্ধ দখল রয়েছে, ফাঁকা নয় প্রকৃত দখল রয়েছে, তাহলে আমাদের পার্টির লড়াকু শক্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং জাপানকে পরাজিত করার কর্তব্য আরও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

আমাদের আরেকটি কর্তব্য হচ্ছে আমাদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে অধ্যয়ন করা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার সারসংকলন করার জন্য মার্কসীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা। আমাদের কয়েক হাজার বছরের জাতীয় ইতিহাস রয়েছে এবং তার রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অপরিমেয় সম্পদ-ভাণ্ডার। কিন্তু এসব ব্যাপারে আমরা নিছক পাঠশালারই শিক্ষার্থী। অতীত

যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা

৬ই নভেম্বর, ১৯৩৮

১। চীনের বৈশিষ্ট্য ও বিপ্লবী যুদ্ধ

বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, যুদ্ধের দ্বারা সমস্যার সমাধান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই বিপ্লবী নীতি সর্বত্রই প্রযোজ্য, তা চীনদেশেই হোক আর বিদেশেই হোক।

কিন্তু নীতি এক হলেও সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি ভিন্ন পরিবেশে একে ভিন্নভাবেই প্রয়োগ করে। যেসব পুঁজিবাদী দেশ ফ্যাসিবাদী নীতি অনুসরণ করে না ও যুদ্ধাবস্থায় নেই, তারা দেশের ভেতরে বুর্জোয়া গণতন্ত্র চালু রাখে, সেখানে সামন্ততন্ত্র থাকে না। আর বাইরে তারা অন্যান্য জাতির দ্বারা অত্যাচারিত হয় না, বরং নিজেরাই অন্যান্য জাতির ওপর নির্যাতন চালায়। এইসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই, পুঁজিবাদী দেশগুলোর সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির কর্তব্য হল দীর্ঘকাল আইনী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের শিক্ষিত করা, শক্তি সঞ্চয় করা আর এরই মাধ্যমে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এইসব দেশে দীর্ঘকাল ধরে আইনী সংগ্রাম চালানো, পার্লামেন্টকে মত প্রকাশের একটি মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তৈরী ও শ্রমিকদের শিক্ষাদান করাই হল সমস্যা। সেখানকার সংগঠনের রূপ হচ্ছে আইনী আর সংগ্রামের

এই প্রবন্ধটি হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণের একটি অংশ। 'জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা' ও 'দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে' শীর্ষক গ্রন্থ দুটিকে ইতিমধ্যেই কমরেড মাও সে-তুঙ জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকার প্রশ্নটির সমাধান করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভুল করেছে এমন কমরেডরা যুক্তফ্রন্টে পার্টির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে। তাই তারা যুদ্ধ ও রণনীতি সম্পর্কে পার্টির নীতিতেও সন্দেহ প্রকাশ করে এবং তার বিরোধিতা করে। পার্টির ভেতরকার এই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদকে দূর করার জন্য, চীনের বিপ্লবে যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এ কথা সমগ্র পার্টিকে আরও পরিস্কারভাবে বোঝানোর উদ্দেশ্যে এবং মনোযোগের সংগে

রূপ হচ্ছে রক্তপাতহীন (অ-সামরিক)। যুদ্ধের প্রশ্নে, পুঁজিবাদী দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নিজ নিজ দেশের দ্বারা পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করে ; এ ধরনের যুদ্ধ যদি বেধে যায়, তবে নিজ নিজ দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের পরাজয় ঘটানোই হচ্ছে এইসব পার্টির নীতি। যে যুদ্ধ তারা লড়তে চায় সেটা শুধু গৃহযুদ্ধ, যার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে।[১] কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না বুর্জোয়াশ্রেণী সত্যসত্যই অসহায় হয়ে পড়ছে, সর্বহারাশ্রেণীর বেশির ভাগ যতক্ষণ না সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষকসাধারণ সর্বহারাশ্রেণীকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এগিয়ে না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ শুরু করা উচিত নয়। এবং যখনই অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ শুরু করার সময় আসে, তখন প্রথমে শহরগুলোকে দখল করে, তারপর গ্রামাঞ্চলে অভিযান চলে—এর বিপরীতটা নয়। পুঁজিবাদী দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টি এই সবকিছুই করেছিল এবং রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব একে সঠিক বলে প্রমাণিত করেছে।

চীনের অবস্থা স্বতন্ত্র। চীনের বৈশিষ্ট্য হল, সে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ নয়, বরং একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ ; আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তার কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই, বরং সে সমান্ততান্ত্রিক অত্যাচারে জর্জরিত ; আর বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার জাতীয় স্বাধীনতা নেই, বরং সে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিষ্পেষিত। সুতরাং পার্লামেন্টকে ব্যবহার করার মতো কোন পার্লামেন্টই আমাদের নেই এবং ধর্মঘটের জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত করার কোন আইনসঙ্গত অধিকারও আমাদের নেই। মূলতঃ, এখানে কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ শুরু করার আগে দীর্ঘকাল আইনী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়া নয়, প্রথমে শহরগুলি দখল ও পরে গ্রামাঞ্চলগুলোকে অধিকার করে নেওয়া নয়—বরং এর বিপরীতটাই।

যখন সাম্রাজ্যবাদের কোন সশস্ত্র আক্রমণ আমাদের দেশের ওপর পরিচালিত হচ্ছে না, তখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধবাজদের (সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী কুকুরদের) বিরুদ্ধে

এই কাজ করতে গোটা পার্টিকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে, কমরেড মাও সে-তুঙ পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাংগ অধিবেশনে চীনের রাজনৈতিক সংগ্রামের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বের সাথে আবার এ প্রশ্নটি ব্যাখ্যা করেন, এবং সংগে সংগে পার্টির সামরিক কাজকর্মের বিকাশসাধন ও রণনীতিগত কর্মপন্থায় বিশেষ পরিবর্তনগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। এর ফলশ্রুতিতে পার্টি-নেতৃত্বের চিন্তাধারায় ও সমগ্র পার্টির কাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৪-২৭ সালে কুয়াংতুং প্রদেশের যুদ্ধ[২] এবং উত্তর অভিযানের যুদ্ধের মতো গৃহযুদ্ধ চালানো উচিত, নতুবা কৃষক ও শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের সংগে মিলিত হয়ে ১৯২৭-৩৬ সালের কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধের মতো জমিদারশ্রেণী ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের (এরাও সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী কুকুর) বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ চালানো উচিত। যখন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়, তখন পার্টিকে স্বদেশে বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরোধী সকল শ্রেণী ও স্তরের সাথে মিলিত হয়ে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ চালানো উচিত, বর্তমানের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে যেমন করা হচ্ছে।

এ সবই পুঁজিবাদী দেশগুলির সংগে চীনের পার্থক্য দেখিয়ে দিচ্ছে। চীনে সংগ্রামের প্রধান রূপ হচ্ছে যুদ্ধ, আর সংগঠনের প্রধান রূপ হচ্ছে সৈন্যবাহিনী। গণ-সংগঠন ও গণ-সংগ্রামের মতো অন্যান্য সমস্তও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত অপরিহার্য, কোন অবস্থাতেই এদের উপেক্ষা করা উচিত নয়; কিন্তু এগুলো সবই যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধ বেধে ওঠার আগে সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রামই হচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য, যেমন ১৯১৯ সালের ৪ঠা মের আন্দোলন[৩] থেকে ১৯২৫ সালের ৩০শে মের আন্দোলন[৪] পর্যন্ত সময়কালে ঘটেছিল। যুদ্ধ বাধার পর এই সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করে, উদাহরণস্বরূপ, উত্তর অভিযানের যুদ্ধের সময়ে, বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্বর্তী এলাকাগুলিতে সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রামই প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করেছিল, এবং উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শাসনাধীন এলাকাগুলিতে সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করেছিল। আবার কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধেও লাল এলাকার ভেতরকার সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করেছিল এবং লাল এলাকার বাইরের সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করেছিল। একইভাবে, যেমন বর্তমানকালে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে জাপ-বিরোধী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্বর্তী এলাকার এবং শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলের সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রামও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করছে।

'চীনে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে। এটা চীনা বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও সুবিধে।'[৫] কমরেড স্তালিনের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক, এবং এটা উত্তর অভিযানের যুদ্ধে, কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধে কিংবা বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে—সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এসব যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধ, এসব যুদ্ধই প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে চালিত, এবং এতে অংশ নিয়েছেন

গঠনের কাজে অত্যাশ্চর্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। রণাঙ্গনের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের প্রতি এরকম সাংগঠনিক কাজের দ্বারা প্রদত্ত সমর্থন না থাকলে চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে তিক্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। তবুও এই আমলের শেষদিকে কর্মী ও সংগঠন সম্পর্কিত পার্টির কর্মনীতিতে মারাত্মক নীতিগত ভুলভ্রান্তি করা হয়েছিল; সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতা, দৈহিক শাস্তি প্রদান ও মাত্রাতিরিক্ত আদর্শগত সংগ্রামের কর্মনীতির মধ্যেই এসব ভ্রান্তি নিজেদের প্রকাশ ঘটিয়েছিল। পূর্বতন লি লি-সান লাইনের নিদর্শনগুলো দূর করার কাজে আমাদের অকৃতকার্যতা আর ঐ নির্দিষ্ট সময়ে নীতিগত ব্যাপারে কৃত রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি—এই উভয় কারণেই তা ঘটেছিল। সুনাই বৈঠকে এসব ভুলভ্রান্তিও সংশোধন করা হয়, আর এভাবে পার্টি একটি সঠিক কর্মী-নীতি ও সঠিক সাংগঠনিক নীতিমালা নির্ধারণের পথে এগুতে সক্ষম হয়। চ্যাং কুও-তাও'য়ের সাংগঠনিক লাইন সম্পর্কে বলতে গেলে, এই লাইন সকল পার্টি-নীতি লংঘন করেছিল, পার্টি শৃংখলা ভঙ্গ করেছিল এবং পার্টির বিরোধিতা, কেন্দ্রীয় কমিটির বিরোধিতা ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরোধিতার পর্যায় পর্যন্ত উপদলীয় কার্যকলাপ চালিয়েছিল। চ্যাং কুও-তাও'য়ের অপরাধমূলক ও ভ্রান্ত লাইনকে পরাজিত করার জন্য এবং তার পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি যথাসম্ভব সবকিছুই করেছিল, আর স্বয়ং চ্যাং কুও-তাও'কেও বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চ্যাং কুও-তাও যখন গোঁয়ারের মতো নিজের ভুলগুলো সংশোধন করতে অস্বীকার করল এবং দুমুখো নীতির আশ্রয় গ্রহণ করল, আর পরবর্তীকালে এমনকি পার্টির প্রতিও যখন বিশ্বাসঘাতকতা করল ও কুওমিনতাঙের কোলে নিজেকে সমর্পণ করল, তখন পার্টিকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে হয়। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা শুধু যে সকল পার্টি-সদস্যদেরই সমর্থন পেয়েছিল তাই নয়, উপরন্তু জাতীয় মুক্তির আদর্শের প্রতি অনুগত সকল জনগণেরও সমর্থনলাভ করেছিল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকও এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে এবং চ্যাং কুও-তাওকে শিবিরত্যাগী ও বিশ্বাসঘাতক বলে নিন্দা করে।

এই সমস্ত শিক্ষা ও এই সমস্ত সাফল্য সমগ্র পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার, পার্টির আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংহতিকে জোরদার করার, আর সাফল্যের সাথে প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনার পূর্বশর্তসমূহ আমাদের যুগিয়েছে। দুই ফ্রন্টে সংগ্রামের মাধ্যমেই আমাদের পার্টি নিজেকে সংহত করেছে ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

দুই ফ্রন্টে বর্তমান সংগ্রাম

এখন থেকে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে দক্ষিণপন্থী হতাশাবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যদিও 'বামপন্থী' ধৈর্যহীনতার দিকে নজর রাখারও আবশ্যকতা রয়েছে। আমরা যদি অন্যান্য বিভিন্ন জাপ-বিরোধী পার্টি ও গ্রুপের সহযোগিতালাভ করতে চাই, কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্প্রসারিত করতে চাই এবং গণ-আন্দোলনকে ব্যাপকতর করতে চাই, তাহলে যুক্তফ্রন্ট, পার্টি ও গণ-সংগঠনের প্রশ্নে রুদ্ধদ্বারের 'বামপন্থী' প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। একই সময়ে, শর্তহীন চরিত্রের সহযোগিতা ও সম্প্রসারণ-অভিমুখী দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী প্রবণতাকে মোকাবিলা করার কাজেও আমাদের অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, তা না হলে সহযোগিতা ও সম্প্রসারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেগুলো আত্মসমর্পণকারী সহযোগিতা ও নীতিহীন সম্প্রসারণে পর্যবসিত হবে।

দুই ফ্রন্টের মতাদর্শগত সংগ্রামকে অবশ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রের বাস্তব অবস্থার উপযোগী হতে হবে, আর কোন সমস্যার প্রতি আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা কিংবা লোকের গায়ে অযথা 'লেবেল সেঁটে' দেওয়ার পুরানো বদ-অভ্যাস অব্যাহত রাখা কখনোই চলবে না।

বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের বেলায়, দুমুখো আচরণের বিরোধিতার প্রতি অবশ্যই আমাদের তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে। চ্যাং কুও-তাও'য়ের জীবনের গতি প্রমাণ করছে এই ধরনের আচরণের মারাত্মক বিপদ হল এই যে, এটা উপদলীয় কার্যকলাপের জন্ম দিতে পারে। প্রকাশ্যে সম্মতি প্রদান আর পেছনে বিরুদ্ধাচরণ, মুখে 'হ্যাঁ' আর অন্তরে 'না', লোকের সামনে চমৎকার কথাবার্তা বলা আর পেছনে কূট চক্রান্ত করা—এ সবই দুমুখো আচরণের বিভিন্ন রূপ। এ ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে কর্মী ও পার্টি-সদস্যদের সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করেই কেবল পার্টি-শৃংখলাকে আমরা শক্তিশালী করতে পারি।

অধ্যয়ন

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কমিউনিস্ট পার্টির যেসব সভ্য লেখাপড়া জানেন তাঁদের সকলকেই মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্বাবলী অধ্যয়ন করতে হবে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস এবং চলতি আন্দোলন ও প্রবণতাসমূহ সম্পর্কে অধ্যয়ন চালাতে হবে; তদুপরি, কম লেখাপড়া জানেন এমন সব পার্টি-সভ্যকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারেও সহায়তা করতে হবে। বিশেষতঃ কর্মীদের এসব বিষয় যত্নের সাথে অধ্যয়ন করা উচিত, আর

কেন্দ্রীয় কমিটি ও উচ্চস্তরের কর্মীদের এগুলোর প্রতি আরও অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। বিপ্লবী তত্ত্বের অধিকারী না হলেও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে এবং বাস্তব আন্দোলন সম্পর্কে সুগভীর উপলব্ধি না থাকলে কোন রাজনৈতিক পার্টিই সম্ভবতঃ একটি মহান বৈপ্লবিক আন্দোলনকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে না।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্ব সার্বজনীনভাবেই প্রয়োগযোগ্য। অন্ধ মতবাদ হিসেবে নয়, বরং কর্মের পথনির্দেশক হিসেবেই এটাকে দেখা উচিত। নিছক কতকগুলো পদ বা শব্দসমষ্টি শেখার ব্যাপার নয়, বরং এটা অধ্যয়ন করার অর্থ হল বিপ্লবের বিজ্ঞান হিসেবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে শেখা। বাস্তব জীবন সম্পর্কে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের সুবিস্তৃত অধ্যয়ন ও তাঁদের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা যেসব সাধারণ সূত্র নিরূপণ করেছিলেন, সেগুলো নিছক হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারই শুধু এটা নয়, বরং তা হচ্ছে সমস্যার পর্যবেক্ষণ ও সমাধানে তাঁদের অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিকেও অধ্যয়ন করা। অতীতের তুলনায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর আমাদের পার্টির দখল এখন অনেক বেশি কিন্তু এখনো তা যথেষ্ট ব্যাপক ও গভীর নয়। আমাদের কর্তব্য হল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের এক মহান জাতির এক সুমহান ও নজিরবিহীন সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করা। সেইজন্য, মার্কসবাদ লেনিনবাদের অধ্যয়নকে ছড়িয়ে দেওয়া ও গভীরতর করার কাজটি আমাদের সামনে একটি বিরাট সমস্যা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন এবং যা কেবলমাত্র কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় কমিটির এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর, সমগ্র পার্টিতে অধ্যয়ন নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা আমি দেখতে চাই। এতে দেখা যাবে কে প্রকৃতই কিছু শিখছেন, আর কে বেশি শিখেছেন ও ভালভাবে শিখেছেন। নেতৃত্বের প্রধান দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়া সম্পর্কে বলতে গেলে, দু-একশ কমরেড থাকেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর যাঁদের টুক্‌রো-টুক্‌রো নয় সুসম্বদ্ধ দখল রয়েছে, ফাঁকা নয় প্রকৃত দখল রয়েছে, তাহলে আমাদের পার্টির লড়াকু শক্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং জাপানকে পরাজিত করার কর্তব্য আরও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

আমাদের আরেকটি কর্তব্য হচ্ছে আমাদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে অধ্যয়ন করা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার সারসংকলন করার জন্য মার্কসীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা। আমাদের কয়েক হাজার বছরের জাতীয় ইতিহাস রয়েছে এবং তার রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অপরিমেয় সম্পদ-ভাণ্ডার। কিন্তু এসব ব্যাপারে আমরা নিছক পাঠশালারই শিক্ষার্থী। অতীত

চীনের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে সমকালীন চীন; ইতিহাস অন্বেষণের ব্যাপারে আমরা হচ্ছি মার্কসবাদী আর সেজন্যে আমাদের ইতিহাসকে আমরা কেটে-ছেটে বাদ দিতে পারি না। কনফুসিয়াস থেকে শুরু করে সান ইয়াৎ-সেন পর্যন্ত ইতিহাসের সারসংকলন করা আমাদের উচিত, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই মহামূল্য সম্পদকে গ্রহণ করা উচিত। আজকের মহান আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য এই কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদী হওয়ার কারণেই কমিউনিস্টরা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদী, কিন্তু মার্কসবাদকে কেবলমাত্র তখনই আমরা প্রয়োগে নিয়ে যেতে পারি, যখন তাকে আমাদের দেশের সুনির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সমন্বিত করা হবে এবং যখন তা একটি নির্দিষ্ট জাতীয় রূপ লাভ করবে। সকল দেশের বাস্তব বৈপ্লবিক অনুশীলনের সাথে তার সমন্বয়সাধনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান শক্তি। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে, চীনের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে প্রয়োগ করাটা একটা শিক্ষণীয় বিষয়। যেহেতু চীনা কমিউনিস্টরা হচ্ছেন মহান চীনা জাতিরই একটি অংশ, তাঁদের রক্তমাংসের বন্ধনে আবদ্ধ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেইহেতু চীনের বৈশিষ্ট্যসমূহকে বাদ দিয়ে মার্কসবাদ সম্পর্কে যে-কোনরূপ কথাবার্তা বলাই হবে নিছক বিমূর্ত মার্কসবাদ, অন্তঃসারশূন্য মার্কসবাদ। কাজেই, চীনদেশে বাস্তবভাবে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করা, যাতে তার প্রত্যেকটি প্রকাশ সন্দেহাতীত রূপেই চীনা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়, অর্থাৎ চীনের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের আলোকে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করাটা হচ্ছে এমন একটা জরুরী সমস্যা যা সমগ্র পার্টিকেই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং সমাধান করতে হবে। বিদেশী ছাঁচে-ঢালা মানসিকতার অবশ্যই বিলোপ ঘটাতে হবে, ফাঁকা, বিমূর্ত সুরের বাজনা অবশ্যই কমাতে হবে, আর গোঁড়ামিবাদকে অবশ্যই কবর দিতে হবে; আর তার বদলে সতেজ, প্রাণবন্ত চীনা রীতি-পদ্ধতি ও মানসিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যা চীনের সাধারণ মানুষ পছন্দ করেন। আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রাথমিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে যাদের কোনরকম ধারণাই নেই, তাদেরই কাজ হচ্ছে জাতীয় রূপ থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদী মর্মবস্তুকে বিচ্ছিন্ন করা। বিপরীতপক্ষে, এই উভয়কেই আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করতে হবে। এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মারাত্মক ভুলত্রুটি রয়েছে, যা সচেতনভাবে কাটিয়ে ওঠা উচিত।

বর্তমান আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? এর নিয়মবিধিই—বা কি কি? এই আন্দোলন কিভাবে পরিচালিত করতে হবে? এসবই হচ্ছে বাস্তব প্রশ্ন। এখনো পর্যন্ত আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে, কিংবা চীন সম্পর্কে সবকিছু বুঝে উঠতে পারিনি। আন্দোলনের বিকাশ ঘটছে, নতুন নতুন জিনিস এখনো পুরোপুরি মূর্ত হয়ে ওঠেনি, আর সীমাহীন ধারায় তাদের আবির্ভাব অব্যাহত

রয়েছে। এই আন্দোলনকে তার সামগ্রিকতার দিক থেকে এবং তার বিকাশের দিক থেকে অধ্যয়ন করার বিরাট কর্তব্য আমাদের নিরন্তর মনোযোগ দাবি করছে। যেসব লোক এইসব সমস্যাবলী গুরুত্ব সহকারে ও যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করতে অস্বীকার করে, তারা কিছুতেই মার্কসবাদী হতে পারে না।

আত্মপ্রসাদ হচ্ছে অধ্যয়নের শত্রু। যে পর্যন্ত আত্মপ্রসাদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করা না যাবে, সে পর্যন্ত আমরা প্রকৃতই কিছু শিখতে পারব না। নিজেদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে 'শিক্ষা গ্রহণে অতৃপ্ত থাকা' এবং অন্যদের প্রতি 'শিক্ষাদানে অক্লান্ত হওয়া'।

ঐক্য ও বিজয়

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ ঐক্য হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য এবং এক নতুন চীন গড়ে তোলার জন্য সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মৌলিক পূর্বশর্ত। সতের বছরের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আভ্যন্তরীণ ঐক্যবিধানের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেছে এবং বর্তমানে আমাদের পার্টি আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিপক্ক। কাজেই, প্রতিরোধ-যুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য এবং এক নতুন চীন গড়ে তোলার সংগ্রামে সমগ্র জনগণের জন্য একটি শক্তিশালী মূলকেন্দ্র গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম। কমরেডগণ, যতদিন আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব, ততদিন আমরা নিশ্চিতই এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।

টীকা

১। স্তালিন ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে সি. পি. এস. ইউ (বি)-র সপ্তদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট বলেছিলেন, '... সঠিক রাজনৈতিক লাইন নির্ধারিত হয়ে গেলে, সাংগঠনিক কাজই সবকিছুকে নির্ধারণ করে, এমনকি রাজনৈতিক লাইনের ভবিষ্যৎ এবং তার সাফল্য বা ব্যর্থতাকে পর্যন্ত।' ('লেনিনবাদের সমস্যাবলী' দ্রষ্টব্য, ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৪, পৃঃ ৬৪৪।) তিনি 'কর্মকর্তার যথাযথ নির্বাচন' সম্পর্কেও বলেছিলেন। ১৯৩৫ সালের মে মাসে তিনি লালফৌজ একাডেমীগুলির স্নাতকদের কাছে প্রদত্ত বক্তৃতায় নিম্নোক্ত শ্লোগানটি তুলেছিলেন এবং তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেনঃ 'কর্মীরাই সব কিছু নির্ধারণ করে।' (ঐ, পৃঃ ৬৬১-৬২।) ১৯৩৯ সালে মার্চ মাসে সি. পি. এস. ইউ (বি)-র অষ্টাদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে তিনি বলেন, 'কোন সঠিক লাইন উদ্ভূত ও বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়ে যাবার পর পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পার্টি-কর্মীরাই নির্ধারক শক্তিতে পরিণত হন।'

২। এখানে ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর জরুরী সভার সময় থেকে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন পর্যন্ত সময়ের কথা বলা হচ্ছে।

৩। উত্তর-পশ্চিম জেছুয়ান ও দক্ষিণ-পূর্ব কানসুর সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অবস্থিত সুংপান কাউন্টি-শহরের উত্তর-পশ্চিমের পাসী নামক স্থানে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো পাসী সভা আহ্বান করেছিল ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাসে। তখন চ্যাং কুও-তাও একদল লালফৌজ নিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বেরিয়ে যায় এবং তার আদেশ অমান্য করে; এবং তার ক্ষতিসাধন করার অপচেষ্টা চালায়। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটি বিপজ্জনক অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যেসব লালফৌজ, পার্টির অনুগত তাদের নিয়ে উত্তর শেনসীর দিকে অগ্রসর হয়। আর চ্যাং কুও-তাও তার দ্বারা প্রতারিত লালফৌজকে নিয়ে থিয়ান ছুয়ান, লুশান, বড় ও ছোট চিনছুয়ান এবং আপা প্রভৃতি দক্ষিণদিকের অঞ্চলে অগ্রসর হয়। সেখানে সে একটা ভুয়া কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে এবং খোলাখুলিভাবে পার্টির বিপক্ষে চলে যায়।

৪। ইয়েনান সম্মেলন হল ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে ইয়েনানে অনুষ্ঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বর্ধিত সম্মেলন। এই সম্মেলনের আগেই চ্যাং কুও-তাও'য়ের পরিচালিত ফৌজের ব্যাপক কর্মী ও সৈন্যরা চ্যাং কুও-তাও'য়ের প্রতারণা বুঝতে পেরে শেনসী-কানসু সীমান্ত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়। কিন্তু পথিমধ্যে তাদের এক অংশ নেতৃত্বের ভুল নির্দেশে পশ্চিমদিকের কানচৌ, লিয়াংচৌ, সুচৌ-এর দিকে অগ্রসর হয়। তাদের অধিকাংশই শত্রুর আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, অবশিষ্ট সৈন্যরা সিনকিয়াঙের দিকে পালিয়ে যায় এবং পরে শেনসী-কানসু সীমান্ত অঞ্চলে এসে পৌছায়। লালফৌজের অন্য এক অংশ অনেক আগেই শেনসী-কানসু সীমান্ত এলাকায় এসে কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালিত লালফৌজের সাথে সম্মিলিত হয়। চ্যাং কুও-তাও নিজেও উত্তর শেনসীতে আসে এবং ইয়েনান সম্মেলনে যোগদান করে। এই সম্মেলনে ব্যাপকভাবে এবং চূড়ান্তভাবে তার সুবিধাবাদ ও পার্টি-বিরোধিতাকে নিন্দা করা হয়। চ্যাং কুও-তাও পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার ভান করে, কিন্তু আসলে সে পার্টির প্রতি তখন চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল।

যুক্তফ্রন্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের প্রশ্ন

৫ই নভেম্বর, ১৯৩৮

সাহায্য ও সুবিধে ইতিবাচক হওয়া উচিত, নেতিবাচক নয়

যুক্তফ্রন্টের ভেতরকার সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গ্রুপগুলিকে দীর্ঘকালীন সহযোগিতার স্বার্থে অবশ্যই পারস্পরিক সাহায্য করতে হবে ও পারস্পরিক সুবিধে দিতে হবে, এবং এইসব সাহায্য ও সুবিধে হওয়া উচিত ইতিবাচক, নেতিবাচক নয়। আমরা অবশ্যই আমাদের পার্টি ও সৈন্যবাহিনীকে সুসংবদ্ধ ও সম্প্রসারিত করে তুলব, এবং একই সংগে আমাদের উচিত হবে বন্ধুত্বমূলক পার্টি ও সৈন্যবাহিনীগুলিকে সুসংবদ্ধ ও সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে সাহায্য করা। জনগণ চান, সরকার তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিগুলিকে পূরণ করুক, এবং একই সঙ্গে তাঁরা সরকারকে প্রতিরোধ-যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে সমস্ত সম্ভাব্য সাহায্য দিয়ে থাকেন। কারখানার শ্রমিকরা মালিকদের কাছে আরও ভাল অবস্থা দাবি করেন, এবং একই সংগে তাঁরা প্রতিরোধের স্বার্থে কঠোর পরিশ্রম করেন; বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যের স্বার্থে জমিদারদেরও হবে খাজনা ও সুদ কমিয়ে দেওয়া, এবং একই সঙ্গে কৃষকদের

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণেরই একটি অংশ হচ্ছে বর্তমান নিবন্ধটি। সে সময়ে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের প্রশ্নটি ছিল জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং এ ব্যাপারে কমরেড মাও সে-তুঙ ও কমরেড চেন শাও-য়ুর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। মর্মবস্তুর বিচারে প্রশ্নটি ছিল যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সর্বহারা নেতৃত্বের প্রশ্ন। কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর ডিসেম্বর, ১৯৪৭-এ প্রদত্ত রিপোর্টে ('বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য') এই মতপার্থক্যের সংক্ষিপ্ত সারসংকলন করে বলেছিলেন ঃ

> প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময় আমাদের পার্টি আত্মসমর্পণবাদীদের মতো ধ্যান-ধারণাকে (এখানে প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময়কার চেন তু-শিউ'র আত্মসমর্পণবাদের কথা বলা হচ্ছে) প্রত্যাখ্যান করেছিল—অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করেছিল কুওমিনতাঙের

উচিত হবে খাজনা ও সুদ দেওয়া। পারস্পরিক সাহায্যের এইসব নীতি ও কর্মনীতিগুলি হচ্ছে ইতিবাচক ; নেতিবাচক বা একপেশে নয়। পারস্পরিক সুবিধে দেওয়া সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রত্যেক পক্ষেরই অন্যকে হেয় করার থেকে এবং অন্যের পার্টি, সরকার ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গোপন পার্টি -শাখা গড়ে তোলার থেকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত। যেমন আমরা কুওমিনতাঙের মধ্যে এবং তার সরকার বা বাহিনীর মধ্যে কোন গোপন পার্টি-শাখা গড়ে তুলছি না, এবং এভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধের স্বার্থে তাদের মনে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছি না। 'কিছু জিনিস করার জন্য অন্য কিছু জিনিস করা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হও'[১]—এই প্রবাদবাক্যটি এ ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য। লালফৌজের পুনর্গঠন ছাড়া, লাল এলাকার প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মনীতি বর্জন ছাড়া জাতীয় প্রতিরোধ-যুদ্ধ কিছুতেই সম্ভব হতে পারত না। ঐগুলো ছেড়ে দিয়েই কেবল আমরা শেষেরটা অর্জন করতে পেরেছি ; নেতিবাচক ব্যবস্থাই ইতিবাচক ফলাফলের জন্ম দিয়েছে। 'সামনে বিরাট লাফ দেবার জন্য পেছনে সরে যাওয়া'[২]—এটাই হচ্ছে লেনিনবাদ। সুবিধে দেওয়াকেই পুরোপুরি নেতিবাচক কিছু হিসেবে দেখাটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী। বস্তুতঃ পুরোপুরি নেতিবাচক সুবিধে

জন-বিরোধী নীতির প্রতি সুবিধেদান, জনগণের চেয়ে কুওমিনতাঙের ওপর বেশি আস্থা স্থাপন, গণ-আন্দোলন জাগিয়ে তোলার ও তার পূর্ণ বিকাশের ব্যাপারে সাহসের অভাব, জাপ-অধিকৃত এলাকায় মুক্তাঞ্চল ও গণফৌজকে সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে সাহসের অভাব কুওমিনতাঙের হাতে প্রতিরোধ-যুদ্ধের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া প্রভৃতি ধ্যান-ধারণাকে। আমাদের পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিবিরোধী এইসব ব্যাখ্যা ও অধঃপতিত ধারণার বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালিয়েছিল, 'প্রগতিশীল শক্তির বিকাশ ঘটানোর, মধ্যবর্তী শক্তিগুলিকে দলে টানার এবং রক্ষণশীল শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার' লাইনকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছিল এবং দৃঢ়ভাবে মুক্তাঞ্চল ও গণ-মুক্তিফৌজকে সম্প্রসারিত করেছিল। জাপ-আক্রমণের সময় জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির সামর্থ্যকেই তা শুধু বাড়িয়ে দেয়নি, উপরন্তু জাপানের আত্মসমর্পণের পর চিয়াং কাই-শেক যখন প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করেছিল, তখন তা সহজে ও বিনা ক্ষতিতে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী জনযুদ্ধের পথে সরে যাবার এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট বিজয় অর্জনের ব্যাপারেও পার্টির সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সমস্ত কমরেডদেরকে অবশ্যই ইতিহাসের এইসব শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে।

দেবার দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে—দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সহযোগিতার তত্ত্বের[৩] ফল হয়েছিল সমগ্র শ্রেণী ও সমগ্র বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। চীনে চেন তু-শিউ, চ্যাং কুও-তাও দুজনেই ছিল আত্মসমর্পণবাদী; এবং সর্বতোভাবেই আত্মসমর্পণবাদের বিরোধিতা করতে হবে। আমরা যখন মিত্র বা শত্রুদের সংগে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুবিধে দিই, পেছনে সরে আসি, আত্মরক্ষার দিকে মন দিই এবং অগ্রগতিকে ব্যাহত করি, তখন সর্বদাই এ সবকিছুকে আমাদের দেখা উচিত সমগ্র বৈপ্লবিক কর্মনীতির একটা অংশ হিসেবে, সাধারণ বিপ্লবী লাইনের এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র হিসেবে, আঁকাবাঁকা পথের একটা মোড় হিসেবে। এক কথায়, সেগুলিই হচ্ছে ইতিবাচক।

জাতীয় ও শ্রেণী-সংগ্রামের অভিন্নতা

দীর্ঘকালীন সহযোগিতার মাধ্যমে একটি দীর্ঘ যুদ্ধকে দীর্ঘ দিন ধরে অব্যাহত রাখতে হবে—অর্থাৎ অন্য কথায়, শ্রেণী-সংগ্রামকে জাপান-বিরোধী বর্তমান জাতীয় সংগ্রামের অধীন করতে হবে—এবং এই হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের মৌলিক নীতি। এই নীতি সাপেক্ষে, যুক্তফ্রন্টের ভেতরকার পার্টি ও শ্রেণীগুলির স্বাধীন চরিত্র এবং তাদের স্বাধীনতা ও উদ্যোগ বজায় রাখতে হবে, সহযোগিতা ও ঐক্যের কাছে তাদের আবশ্যিক অধিকারগুলিকে বিসর্জন দিলে চলবে না, বরং তার বিপরীতে সেগুলিকে কিছু সীমার মধ্যে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবে। একমাত্র এভাবেই সহযোগিতা গড়ে তোলা যায়, বস্তুতঃ একমাত্র এভাবেই শুধু সহযোগিতা থাকতে পারে। তা না হলে সহযোগিতা পরিণত হয়ে যাবে সংমিশ্রণে, এবং যুক্তফ্রন্ট সুনিশ্চিতভাবেই বরবাদ হয়ে যাবে। জাতীয় চরিত্রবিশিষ্ট কোন সংগ্রামে শ্রেণী-সংগ্রামই জাতীয় সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে, এবং তা এই দুইয়ের অভিন্নতাকেই নির্দেশ করে। একদিকে, ঐতিহাসিক একটি পর্যায় জুড়ে বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিগুলিকে এমন হতে হবে যাতে তা সহযোগিতাকে বিঘ্নিত না করে; অন্যদিকে, (জাপানকে রুখবার প্রয়োজনে) জাতীয় সংগ্রামের দাবিগুলিই হবে সমস্ত শ্রেণী-সংগ্রামের প্রস্থানবিন্দু। কাজেই যুক্তফ্রন্টের মধ্যে রয়েছে ঐক্য ও স্বাধীনতার মধ্যে অভিন্নতা এবং জাতীয় সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে অভিন্নতা।

'সমস্ত কিছুই হবে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে' —এ ধারণা ভুল

কুওমিনতাঙ হচ্ছে ক্ষমতাসীন দল এবং এখনো পর্যন্ত সে যুক্তফ্রন্টকে কোন সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ করতে দেয়নি। কমরেড লিউ শাও-চি সঠিকভাবেই

বলেছেন যে, 'সবকিছুই মাধ্যমে' বলতে যদি বোঝায় চিয়াং কাই-শেক ও ইয়েন শি-শানের মাধ্যমে, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে এককভাবে আত্মসমর্পণ, এবং মোটেই তার অর্থ 'যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে' হবে না। শত্রুর অবস্থানরেখার পেছনে 'সবকিছুই মাধ্যমে' একেবারেই অসম্ভব, কেননা সেখানে আমাদের কাজ করতে হবে স্বাধীনভাবে এবং নিজেদের হাতে উদ্যোগ বজায় রেখে, এবং একই সংগে কুওমিনতাঙের সংগে সাধিত চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে (উদাহরণস্বরূপ, সশস্ত্র প্রতিরোধ ও জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী)। কিংবা কুওমিনতাঙ কি করতে পারে সেটা আন্দাজ করে নিয়ে আমরা আগে কাজ করে পরেও রিপোর্ট করতে পারি। যেমন, প্রশাসনিক কমিশনার নিয়োগ এবং শানতুং প্রদেশে সৈন্য পাঠাবার কাজগুলি যদি 'যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে' করতে হতো, তবে কখনই এ কাজগুলো করা সম্ভব হতো না। বলা হচ্ছে যে, ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি নাকি একবার এই শ্লোগান দিয়েছিল। কিন্তু সেটা সম্ভবতঃ এই কারণে যে, ফ্রান্সে তার আগে থেকেই সম্মিলিত স্বীকৃত কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন পার্টিগুলির একটি যুক্ত কমিটি কাজ করছিল এবং সোশ্যালিষ্ট পার্টি এই সম্মিলিত স্বীকৃত কর্মসূচী অনুসারে কাজ করতে রাজী না হয়ে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করতে চাইছিল, এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে এই শ্লোগান দিতে হয়েছিল সোশ্যালিষ্ট পার্টিকে নিবৃত্ত করার জন্যই, নিজের পায়ে শিকল বাঁধবার জন্য নিশ্চয়ই সে এই শ্লোগান তোলেনি। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে, কুওমিনতাঙ সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিকে সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত করে সবার ওপর নিজের নির্দেশ চাপিয়ে দিতে চাইছে। এই শ্লোগানের অর্থ যদি এই হয় যে, কুওমিনতাঙ যা করবে, সে সবকিছুই আমাদের মাধ্যমে করতে হবে, তবে সেটা হবে একই সংগে হাস্যকর ও অসম্ভব। আমাদের যদি কোন কিছু করতে গেলেই আগে থেকে কুওমিনতাঙের অনুমতি চাইতে হয়, এবং কুওমিনতাঙ যদি অনুমতি না দেয়, তবে তখন কী হবে? যেহেতু কুওমিনতাঙের কর্মনীতিই হল আমাদের বিকাশকে সীমিত করে রাখা, সেহেতু আমাদের পক্ষে এই শ্লোগান তোলার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না, কেননা তা আমাদের হাত-পা বেঁধে ফেলবে। বর্তমানে এমন কিছু ব্যাপার আছে, যেজন্য আমাদের আগে থেকে কুওমিনতাঙের সম্মতি নিতে হবে—যেমন, আমাদের সৈন্যবাহিনীর তিনটি ডিভিসনকে তিনটি আর্মি কোরে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে। এটা হচ্ছে আগে রিপোর্ট করে পরে কাজ করা। আবার এমন কিছু জিনিসও আছে, যা পুরোপুরি করা হয়ে যাবার পরে কুওমিনতাঙকে জানালেই চলবে—যেমন, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে ২ লক্ষ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা। এটা হচ্ছে আগে কাজ করে পরে রিপোর্ট করা। আবার

সীমান্ত অঞ্চলের পর্যদের অধিবেশন আহ্বান করার মতো এমন কিছু ব্যাপারও আছে, যা এখন কুওমিনতাঙকে না জানিয়েই আমরা করে ফেলব, কারণ আমরা জানি, কুওমিনতাঙ এতে রাজী হবে না। আবার অন্যকিছু ব্যাপারও থেকে যাচ্ছে, যা এক্ষুণি আমরা করব না, রিপোর্টও দেব না, কারণ তা সমগ্র পরিস্থিতিকেই বিঘ্নিত করে তুলতে পারে। সংক্ষেপে, আমরা যেমন যুক্তফ্রন্টে ভাঙন আনব না, ঠিক তেমনি নিজেদের হাত-পা বেঁধে ফেলার অবস্থাও তৈরী করব না। কাজেই, 'সবকিছুই যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে'—এই শ্লোগান আমরা তুলতে পারি না। আর 'সবকিছুই যুক্তফ্রন্টের সামনে পেশ করতে হবে'—এই শ্লোগানের অর্থ যদি হয় 'সবকিছুই পেশ করতে হবে' চিয়াং কাই-শেক ও ইয়েন শি-শানের কাছে, তাহলে সেই শ্লোগানও ভুল। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আমাদের নীতি হচ্ছে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের নীতি, একই সংগে ঐক্য ও স্বাধীনতার নীতি।

টীকা

১। এটি 'মেনসিয়াস' থেকে একটি উধৃতি।

২। ভি. আই. লেনিন ঃ ' হেগেলের "দর্শনের ইতিহাস সম্পর্কিত বক্তৃতামালা" গ্রন্থের সারমর্ম', 'সংকলিত রচনাবলী', রুশ সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড ৩৮, পৃঃ ২৭৫ ।

৩। 'পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সহযোগিতার তত্ত্বটি হচ্ছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একটি প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব। এই তত্ত্ব পুঁজিবাদী দেশে এই সহযোগিতার পক্ষে ওকালতি করে এবং বুর্জোয়া শাসনের বিপ্লবী উৎখাত ও সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে।

যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা

৬ই নভেম্বর, ১৯৩৮

১। চীনের বৈশিষ্ট্য ও বিপ্লবী যুদ্ধ

বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, যুদ্ধের দ্বারা সমস্যার সমাধান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই বিপ্লবী নীতি সর্বত্রই প্রযোজ্য, তা চীনদেশেই হোক আর বিদেশেই হোক।

কিন্তু নীতি এক হলেও সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি ভিন্ন পরিবেশে একে ভিন্নভাবেই প্রয়োগ করে। যেসব পুঁজিবাদী দেশ ফ্যাসিবাদী নীতি অনুসরণ করে না ও যুদ্ধাবস্থায় নেই, তারা দেশের ভেতরে বুর্জোয়া গণতন্ত্র চালু রাখে, সেখানে সামন্ততন্ত্র থাকে না। আর বাইরে তারা অন্যান্য জাতির দ্বারা অত্যাচারিত হয় না, বরং নিজেরাই অন্যান্য জাতির ওপর নির্যাতন চালায়। এইসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই, পুঁজিবাদী দেশগুলোর সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির কর্তব্য হল দীর্ঘকাল আইনী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের শিক্ষিত করা, শক্তি সঞ্চয় করা আর এরই মাধ্যমে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এইসব দেশে দীর্ঘকাল ধরে আইনী সংগ্রাম চালানো, পার্লামেন্টকে মত প্রকাশের একটি মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তৈরী ও শ্রমিকদের শিক্ষাদান করাই হল সমস্যা। সেখানকার সংগঠনের রূপ হচ্ছে আইনী আর সংগ্রামের

এই প্রবন্ধটি হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণের একটি অংশ। 'জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা' ও 'দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে' শীর্ষক গ্রন্থ দুটিকে ইতিমধ্যেই কমরেড মাও সে-তুঙ জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকার প্রশ্নটির সমাধান করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভুল করেছে এমন কমরেডরা যুক্তফ্রন্টে পার্টির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে। তাই তারা যুদ্ধ ও রণনীতি সম্পর্কে পার্টির নীতিতেও সন্দেহ প্রকাশ করে এবং তার বিরোধিতা করে। পার্টির ভেতরকার এই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদকে দূর করার জন্য, চীনের বিপ্লবে যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এ কথা সমগ্র পার্টিকে আরও পরিস্কারভাবে বোঝানোর উদ্দেশ্যে এবং মনোযোগের সংগে

প্রধানতঃ বিপ্লবী জনগণ ; এদের মধ্যে তফাৎ যেটুকু তা হল গৃহযুদ্ধের সংগে জাতীয় যুদ্ধের তফাৎ এবং কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে চালিত যুদ্ধের সাথে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্মিলিত শক্তিতে চালিত যুদ্ধের যেটুকু তফাৎ সেটুকু। অবশ্য, এই পার্থক্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে শক্তি যুদ্ধ চালনা করে তা কখনো ব্যাপক হয়, কখনো-বা সংকীর্ণ হয় (শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী অথবা শ্রমিক, কৃষক ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মৈত্রী), এবং বোঝা যায় যুদ্ধে যারা আমাদের বিপক্ষ তারা স্বদেশী অথবা বিদেশী (যুদ্ধটি দেশী শত্রু অথবা বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে ; আর যদি দেশী শত্রুর বিরুদ্ধে হয়, তাহলে যুদ্ধটি উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে অথবা কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে) ; এসব পার্থক্য থেকে আরও বোঝা যায় যে, চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বিষয়বস্তু তার ইতিহাসের গতিপথের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন রকম। অথচ এসব যুদ্ধই হচ্ছে সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের যুদ্ধ, এগুলি সবই হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধ আর এইসবই চীনা বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধেকে দেখিয়ে দেয়। বিপ্লবী যুদ্ধ 'চীনা বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও সুবিধে'—এই বক্তব্য চীনের অবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই। চীনের সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির প্রধান কর্তব্য হচ্ছে—জন্মের প্রায় প্রথম দিন থেকেই পার্টিকে যে কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে—জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি অর্জনের জন্য যথাসম্ভব বেশি মিত্রবাহিনীর সংগে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং অবস্থা অনুসারে দেশের অথবা দেশের বাইরের সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। চীনে সশস্ত্র সংগ্রাম বাদ দিলে সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির দাঁড়াবার স্থান থাকবে না, এবং কোন বিপ্লবী কর্তব্যই তখন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

আমাদের পার্টি গঠনের পর প্রথম পাঁচ বা ছয় বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৬ সালের উত্তর অভিযানের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সময় পর্যন্ত, এই বিষয়টিকে পার্টি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি। চীনে সশস্ত্র সংগ্রামের অসীম গুরুত্বের কথা পার্টি তখন বোঝেনি, মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করেনি, সামরিক রণনীতি ও রণকৌশলের পর্যালোচনার ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করেনি। উত্তর অভিযানের সময়ে সৈন্যবাহিনীকে সপক্ষে টেনে নেবার কাজে পার্টি অবহেলা করেছে, এবং গণ-আন্দোলনের ওপর একপেশে জোর দিয়েছে। এর ফলে যখনই কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠল, তখনই সমস্ত গণ-আন্দোলন ভেঙে পড়ল। ১৯২৭ সালের পর, দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনেক কমরেডই শহরের মধ্যে

অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি এবং শ্বেত এলাকায় কাজকর্ম চালানোকে পার্টির কেন্দ্রীয় কর্তব্য হিসেবে মনে করতেন। ১৯৩১ সালে শত্রুর তৃতীয় 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় অর্জনের পর কিছু কিছু কমরেড এই প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন করেন। কিন্তু গোটা পার্টির তখনো এই প্রশ্ন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি, তখনো কোন কোন কমরেড আমরা এখন যেভাবে ভাবি সেইভাবে ভাবতেন না।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি যে সশস্ত্র শক্তি ছাড়া চীনের সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এ কথাটি উপলব্ধি করতে পারলে ভবিষ্যতে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে সাফল্যজনকভাবে চালাবার ব্যাপারে আমাদের সুবিধা হবে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে সমগ্র জনগণই যে সশস্ত্র প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, এই বাস্তব ঘটনা গোটা পার্টিকে আরও ভালভাবে এই প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শিক্ষা দেবে যে, প্রতিটি পার্টি-সদস্যকেই যে-কোন মুহূর্তে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধফ্রন্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অধিকন্তু, আমাদের বর্তমান অধিবেশন স্থির করেছে যে, পার্টির প্রধান কর্মক্ষেত্র হবে যুদ্ধাঞ্চলে ও শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে, আর এইভাবে অধিবেশন একটি সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করেছে। কোন কোন পার্টি-সদস্য পার্টির সাংগঠনিক কাজ ও গণ-আন্দোলনের কাজ করতে ইচ্ছুক হলেও যুদ্ধের পর্যালোচনা করতে ও যুদ্ধে অংশ নিতে অনিচ্ছুক, কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যুদ্ধফ্রন্টে যাবার জন্য ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে মনোযোগী হয়নি—এসব অভিব্যক্তি ও এ ধরনের অন্যান্য অভিব্যক্তিকে শুধরাবার জন্য এই নীতি এক চমৎকার ঔষধ। চীনের বেশির ভাগ অঞ্চলেই পার্টির সাংগঠনিক কাজ ও গণ-আন্দোলনের কাজ প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের সংগে জড়িত, একাকী ও বিচ্ছিন্নভাবে পার্টির কোন কাজ বা গণ-আন্দোলন হয় না এবং হতেও পারে না। এমনকি যুদ্ধাঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে দূরবর্তী পশ্চাৎ এলাকায় (যেমন, ইয়ুনান, কুইচৌ, জেছুয়ান) ও শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীন কোন কোন এলাকায়ও (যেমন পিপিং, তিয়েনসিন, নানকিং ও শাংহাই) পার্টির সাংগঠনিক কাজ ও গণ-আন্দোলন যুদ্ধের সংগে সহযোগিতা করে, সেগুলি শুধু যুদ্ধফ্রন্টের চাহিদাকে পূরণ করার ব্যাপারে নিয়োজিত হতে পারে এবং শুধু তাই করা উচিত। এক কথায়, গোটা পার্টিকেই যুদ্ধের দিকে গভীরভাবে মনোযোগী হতে হবে, সামরিক বিষয় শিখতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

২। কুওমিনতাঙের যুদ্ধের ইতিহাস

কুওমিনতাঙের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং যুদ্ধের প্রতি তারা কিরকম মনোযোগ দেয়, তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আমাদের পক্ষে দরকার হবে।

সান ইয়াৎ-সেন প্রথম যখন একটি ছোট বিপ্লবী দল গঠন করেন তখন থেকেই ছিং রাজবংশের বিরুদ্ধে কয়েকবার সশস্ত্র অভ্যুত্থান[৬] ঘটান। তুং মেং হুইয়ের (চীনা বিপ্লবী লীগ) আমলটা আরও বেশি সশস্ত্র অভ্যুত্থানে[৭] ভর্তি ছিল, এবং অবশেষে ১৯১১ সালের বিপ্লবে সশস্ত্র শক্তির মাধ্যমে ছিং রাজবংশের পতন ঘটে। এরপর চীনা বিপ্লবী পার্টির আমলে, ইউয়ান শি-কাইয়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান[৮] চলেছিল। তারপর দক্ষিণ অভিমুখে নৌবাহিনীর অভিযান[৯], কুইলিন থেকে উত্তর অভিযান[১০] এবং হুয়াংপু সামরিক একাডেমী[১১] স্থাপন—এই সবই হচ্ছে, সান ইয়াৎ-সেনের সামরিক কার্যকলাপ।

সান ইয়াৎ-সেনের পরে আসে চিয়াং কাই-শেক, তার আমলেই কুওমিনতাঙের সামরিক ক্ষমতার উৎকর্ষ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। সৈন্যবাহিনীকে সে নিজের জীবনের মতোই কদর করে এবং উত্তর অভিযান, গৃহযুদ্ধ ও জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ—এই তিনটি পর্যায়ের অভিজ্ঞতা তার আছে। গত দশ বছর ধরে চিয়াং কাই-শেক বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে। প্রতিবিপ্লবী কাজকর্মের জন্য সে একটি বিশাল 'কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী' তৈরী করেছে। সৈন্যবাহিনী যার ক্ষমতা তার এবং যুদ্ধই সবকিছুর সমাধান করে—এই মৌলিক নীতিকে সে দৃঢ়ভাবেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে। এ ব্যাপারে তার কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে সান ইয়াৎ-সেন ও চিয়াং কাই-শেক উভয়েই আমাদের শিক্ষক।

১৯১১ সালের বিপ্লবের পর থেকে সমস্ত যুদ্ধবাজরা সৈন্যবাহিনীকে নিজের প্রাণের মতোই কদর করেছে, এবং তারা সবাই 'সৈন্যবাহিনী যার, ক্ষমতা তার' এই নীতিকে গুরুত্ব সহকারে দেখেছে।

তান-ইয়ান-কাই[১২] ছিল একজন চালাকচতুর আমলা, হুনান প্রদেশে তার জীবনধারা ছিল উত্থানে-পতনে বিচিত্র, কিন্তু সে কখনো নিছক বেসামরিক গভর্নর হতে চায়নি, বরং সে সামরিক গভর্নর ও বেসামরিক গভর্নর এই উভয় পদাধিকারীই হবার চেষ্টা করেছিল। এরপর যখন যে প্রথমে কুয়াংতুংয়ে ও পরে উহানে জাতীয় সরকারের সভাপতি হল, তখনো সে যুগপৎ দ্বিতীয় বাহিনীর কম্যাণ্ডার ছিল। চীনে এ ধরনের অনেক যুদ্ধবাজ আছে, তারা সবাই চীনের এই বৈশিষ্ট্যটিকে বোঝে।

চীনে আবার এমন পার্টিও ছিল যারা সৈন্যবাহিনী রাখতে চাইত না, তাদের মধ্যে প্রধানটি ছিল প্রগ্রেসিভ পার্টি [১৩], কিন্তু এই পার্টিও বুঝেছিল যে, কোন যুদ্ধবাজের ওপর নির্ভর করলেই কেবল তারা সরকারী পদ লাভ করতে পারে। ইউয়ান শি-কাই[১৪], তুয়ান ছী-রুই[১৫] ও চিয়াং কাই-শেক ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক (চিয়াং কাই-শেকের ওপর যারা নির্ভর করেছিল তারা ছিল প্রগ্রেসিভ পার্টির এক অংশ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রুপ[১৬])। যাদের ইতিহাস বেশিদিনের নয়, এমন কতকগুলো ছোটখাট রাজনৈতিক পার্টি, যেমন যুব পার্টি[১৭], প্রভৃতি, এদের সৈন্যবাহিনী নেই, তাই তারা কিছুই করে উঠতে পারেনি।

অন্যান্য দেশে বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রত্যেকটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সৈন্যবাহিনী রাখার কোন দরকার নেই। কিন্তু চীনে ব্যাপারটা অন্য রকমের, দেশটির সামন্ততান্ত্রিক ভাগাভাগির কারণে, এখানে যেসব জমিদার বা বুর্জোয়া গোষ্ঠী ও পার্টির হাতে বন্দুক আছে ক্ষমতা তাদেরই হাতে, আর যাদের বন্দুক বেশি, ক্ষমতাও তাদের বেশি। এই অবস্থায় সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির উচিত সুস্পষ্টভাবে সমস্যার মর্ম উপলব্ধি করা।

কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগত সামরিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করেন না (এবং কোনমতেই তা করা চলবে না, কেউ যেন আবার চাং-তাও'য়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে), কিন্তু পার্টির জন্য সামরিক ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ও জনগণের জন্য সামরিক ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁদের চেষ্টা করা উচিত। বর্তমানে জাতীয় প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলছে, জাতির জন্য সামরিক ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করতেই হবে। সামরিক ক্ষমতার প্রশ্নে শিশুসুলভ ব্যাধি থাকলে নিশ্চয় কোন কিছুই অর্জন করতে পারা যায় না। মেহনতী জনগণ, যাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর দ্বারা প্রবঞ্চিত ও ভীতসন্ত্রস্ত, তাঁদের পক্ষে নিজেদের হাতে বন্দুক তুলে নেবার গুরুত্বটা উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে গোটা জাতির প্রতিরোধ-যুদ্ধ মেহনতী জনগণকে যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চে ঠেলে দিয়েছে, আর কমিউনিষ্টদের অবশ্যই এই যুদ্ধের সবচেয়ে সচেতন নেতা হওয়া উচিত। প্রতিটি কমিউনিস্টকে অবশ্যই এ সত্য বুঝতে হবেঃ 'বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে'। আমাদের নীতি হচ্ছে—পার্টি বন্দুককে পরিচালনা করে, বন্দুককে কোনমতেই পার্টির ওপর পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না। তবু, বন্দুক থাকলে আমরা সত্যিই পার্টি সৃষ্টি করতে পারি, উত্তর চীনে অষ্টম রুট বাহিনী যেমন শক্তিশালী পার্টি-সংগঠন

গড়ে তুলেছে। আমরা আরও সৃষ্টি করতে পারি কর্মী, স্কুল, সংস্কৃতি ও গণ-আন্দোলন। ইয়েনানের সবকিছুই সৃষ্ট বন্দুকের জোরে। বন্দুকের নল থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি। রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসবাদী মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে সৈন্যবাহিনী হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান উপাদান। যিনি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চান এবং এটাকে বজায় রাখতে চান, তাঁর অবশ্যই একটা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী থাকতে হবে। কেউ কেউ আমাদেরকে 'যুদ্ধের সর্বশক্তিমত্তা তত্ত্বের' প্রবক্তা বলে বিদ্রূপ করে। হাঁ, আমরা বিপ্লবী যুদ্ধের সর্বশক্তিমত্তা তত্ত্বের প্রবক্তাই বটে। এটা খারাপ নয়, ভালই; এটা মার্কসীয়। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বন্দুকই সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি করেছে। আমরা একটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করব। সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছেঃ শুধুমাত্র বন্দুকের শক্তিতেই শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণ সশস্ত্র বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারদের পরাজিত করতে পারে; এই অর্থে আমরা বলতে পারি যে, শুধুমাত্র বন্দুক দিয়েই সমগ্র দুনিয়ার রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। যুদ্ধ বিলোপ করার আমরা সমর্থক, আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু কেবলমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই যুদ্ধ বিলোপ করা যায় এবং বন্দুক থেকে মুক্তি পাবার জন্য বন্দুক ধারণ করা অবশ্য প্রয়োজন।

৩। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধের ইতিহাস

যদিও ১৯২১ সাল (যখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) থেকে ১৯২৪ সাল (যখন কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল) পর্যন্ত—এই তিন-চার বছর ধরে আমাদের পার্টি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতির এবং সৈন্যবাহিনী সংগঠনের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি; ১৯২৪-২৭ সালে, এমনকি তারও পরে কিছুকাল পর্যন্ত এর গুরুত্ব সম্পর্কে পার্টির যথেষ্ট উপলব্ধি ছিল না; কিন্তু ১৯২৪ সালে যখন পার্টি হুয়াংপু সামরিক একাডেমীর কাজে অংশগ্রহণ করল, সেই সময় থেকে পার্টি এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল এবং সামরিক ব্যাপারের গুরুত্বটি বুঝতে শুরু করল। কুয়াংতুং প্রদেশের যুদ্ধে ও উত্তর অভিযানে কুওমিনতাঙকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে পার্টি সৈন্যবাহিনীর এক অংশকে[১৮] নিজেদের প্রভাবে নিয়ে এল। বিপ্লবের ব্যর্থতায় তিক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে পার্টি নানছাং অভ্যুত্থান[১৯], 'শরৎকালীন ফসল' অভ্যুত্থান[২০], ক্যান্টন অভ্যুত্থান গড়ে তোলে, এবং এইভাবে তা একটি নতুন পর্যায়ে—লালফৌজকে প্রতিষ্ঠিত করার পর্যায়ে, প্রবেশ করে। এ পর্যায় ছিল আমাদের পার্টির পুরোপুরিভাবে সৈন্যবাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করার

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। যদি এই পর্যায়ের লালফৌজ ও তার দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধ না হতো, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি যদি ছেন তু-সিউয়ের বিলোপবাদী নীতি গ্রহণ করত, তাহলে বর্তমানের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ এবং একে দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাওয়ার কথাটি কল্পনাও করা যেত না।

১৯২৭ সালের ৭ই আগস্টের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী অধিবেশন রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, ফলে পার্টি অনেকখানি সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসের ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাংগ অধিবেশনে শুধু নামেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রের 'বাম'পন্থী সুবিধাবাদের বিরোধিতা করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে আবার নতুন করে 'বাম'পন্থী সুবিধাবাদের ভুল করা হয়েছিল। এই দুটি সভার বিষয়বস্তু ও তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য ছিল, কিন্তু এদের কোনটাই যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যাগুলি নিয়ে গুরুত্বের সংগে আলোচনা করেনি। এতে এটাই ধরা পড়ে যে, পার্টির কাজকর্মের ভারকেন্দ্রটা তখনো যুদ্ধের ওপর রাখা হয়নি। ১৯৩৩ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি লাল এলাকায় সরে আসার পরে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে; কিন্তু যুদ্ধের সমস্যা (এবং অন্যান্য সমস্ত প্রধান সমস্যাগুলো) সম্পর্কে আবার নীতিগত ভুল করা হল, আর তার ফলে বিপ্লবী যুদ্ধের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়। অপরদিকে, ১৯৩৫ সালের সুনাই বৈঠকে[২১] সংগ্রামটি মুখ্যতঃ ছিল যুদ্ধের ব্যাপারে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে, এবং যুদ্ধের সমস্যাটিকে সেখানে প্রথম স্থান দেওয়া হল; যুদ্ধবস্থারই প্রতিফলন ছিল এটা। আজকে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসে বলতে পারি যে, গত ১৭ বছরের সংগ্রামে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যে শুধুই একটি দৃঢ় মার্কসবাদী রাজনৈতিক লাইন গড়ে তুলেছে তাই নয়, উপরন্তু গড়ে তুলেছে একটি দৃঢ় মার্কসবাদী সামরিক লাইন। শুধু রাজনৈতিক সমস্যারই নয়, উপরন্তু যুদ্ধের সমস্যার সমাধানেও মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে আমরা সমর্থ হয়েছি; পার্টি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম এমন বিরাট সংখ্যক কর্মীকেন্দ্রই যে আমরা শুধু শিক্ষিত করে তুলেছি তাই নয়, উপরন্তু সৈন্যবাহিনীর পরিচালনায় সিদ্ধহস্ত এমন বিপুল সংখ্যক কর্মীকেন্দ্রও আমরা শিক্ষিত করে তুলেছি। এটা হচ্ছে অসংখ্য শহীদের রক্তে রঞ্জিত বিপ্লবের ফল। এটা শুধু যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণের গৌরব তাই নয়, এই গৌরব সারা দুনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ও বিশ্বের জনগণেরও। দুনিয়ায় এখনো পর্যন্ত মাত্র তিনটি সৈন্যবাহিনী সর্বহারাশ্রেণীর ও জনগণের অধিকারে, এই তিনটি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে

পরিচালিত সৈন্যবাহিনী। অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির এখনো সামরিক অভিজ্ঞতা নেই, তাই আমাদের সৈন্যবাহিনী ও আমাদের সামরিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে অত্যন্ত মূল্যবান।

বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে বিজয়ের সংগে চালিয়ে যাবার জন্য অষ্টম রুট বাহিনী, নতুন চতুর্থ বাহিনী এবং আমাদের পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত সমস্ত গেরিলাবাহিনীকে সম্প্রসারিত ও সংসম্বদ্ধ করা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই নীতি অনুযায়ী পার্টির উচিত সবচেয়ে ভাল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণের পার্টি-সদস্য ও কর্মীদের যুদ্ধফ্রন্টে পাঠানো। সবকিছুকেই যুদ্ধফ্রন্টে জয়লাভের কাজে লাগানো উচিত, আর সাংগঠনিক কর্তব্যকে অবশ্যই হতে হবে রাজনৈতিক কর্তব্যের অধীন।

৪। গৃহযুদ্ধে ও জাতীয় যুদ্ধে পার্টির সামরিক রণনীতির পরিবর্তন

আমাদের পার্টির সামরিক রণনীতির পরিবর্তনের প্রশ্ন পর্যালোচনার যোগ্য। ব্যাপারটাকে গৃহযুদ্ধ ও জাতীয় যুদ্ধ—এই দুই প্রক্রিয়ায় ভাগ করে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা যাক।

গৃহযুদ্ধের প্রক্রিয়াকে মোটামুটি রণনীতিগত দুটি সময়কালে ভাগ করে নিতে পারা যায়। প্রথম সময়কালে গেরিলাযুদ্ধই ছিল প্রধান, আর দ্বিতীয় সময়কালে প্রধান ছিল নিয়মিত যুদ্ধ। কিন্তু এই নিয়মিত যুদ্ধ ছিল চীনা ধরনের—এর নিয়মিত চরিত্র অভিব্যক্ত ছিল শুধুই সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করে চলমান যুদ্ধ চালানোর ব্যাপারে এবং পরিচালনার ও সংগঠনের কিছুটা পরিমাণে কেন্দ্রীভূতকরণে ও পরিকল্পনাকরণে; অন্যান্য ব্যাপারে এ যুদ্ধটি গেরিলা চরিত্র বজায় রেখেছিল, এটা ছিল নিম্ন মানের, এবং বিদেশী সৈন্যবাহিনীগুলির সামরিক কার্যকলাপের সংগে এ যুদ্ধটি তুলনার যোগ্য ছিল না, এমনকি কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর সামরিক কার্যকলাপ থেকেও কিছুটা ভিন্ন। তাই, এক অর্থে, এই ধরনের নিয়মিত যুদ্ধ ছিল উচ্চতর মানে উন্নীত গেরিলাযুদ্ধ।

আমাদের পার্টির সামরিক কর্তব্যের দিক থেকে বলতে গেলে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রক্রিয়াকেও মোটামুটি দুটি রণনীতিগত সময়কালে বিভক্ত করতে পারা যায়। প্রথম সময়কালে (যার অন্তর্ভুক্ত দুটি পর্যায়—রণনীতিগত প্রতিরক্ষা ও রণনীতিগত ভারসাম্যাবস্থা) গেরিলাযুদ্ধই হচ্ছে প্রধান; দ্বিতীয় সময়কালে (রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়) নিয়মিত যুদ্ধই হবে প্রধান। কিন্তু, বিষয়বস্তুর দিক থেকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম সময়কালের

গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে গৃহযুদ্ধের প্রথম সময়কালের গেরিলাযুদ্ধ থেকে অনেক ভিন্ন, কারণ এখন নিয়মিত (কিছুটা পরিমাণে নিয়মিত) অষ্টম রুট বাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে গেরিলা কর্তব্যগুলিকে পালন করছে; জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের দ্বিতীয় সময়কালের নিয়মিত যুদ্ধও গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় সময়কালের নিয়মিত যুদ্ধ থেকে ভিন্ন হবে, কারণ এটা আমরা ধরে নিতে পারি যে, নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হওয়ার পর সৈন্যবাহিনী ও তার সামরিক কার্যকলাপের বিরাট পরিবর্তন ঘটবে। আমাদের সৈন্যবাহিনী তখন কেন্দ্রীভূতকরণ ও সংগঠনের উচ্চমান অর্জন করবে এবং তার সামরিক কার্যকলাপ নিয়মিত উচ্চমান অর্জন করবে, তার গেরিলা চরিত্র অনেকটা হ্রাস পাবে, এখন যেটি রয়েছে নিম্নমানে তখন সেটি উন্নীত হবে উচ্চমানে, আর চীনা ধরনের নিয়মিত যুদ্ধ তখন পরিবর্তিত হবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো নিয়মিত যুদ্ধে। এটা হবে রণনীতিগত পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে আমাদের কাজ।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, গৃহযুদ্ধ ও জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ—এই দুটি প্রক্রিয়ায় এবং তাদের চারটি রণনীতিগত সময়কালে রয়েছে রণনীতির তিনটি পরিবর্তন। প্রথমটি ছিল গৃহযুদ্ধের সময়ে গেরিলাযুদ্ধ থেকে নিয়মিত যুদ্ধে পরিবর্তন। দ্বিতীয়টি ছিল গৃহযুদ্ধকালের নিয়মিত যুদ্ধ থেকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকালে গেরিলাযুদ্ধে পরিবর্তন। আর তৃতীয়টি হবে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময়ে গেরিলাযুদ্ধ থেকে নিয়মিত যুদ্ধে পরিবর্তন।

এই তিনটি পরিবর্তনের প্রথমটি ভীষণ অসুবিধার মুখে পড়েছিল। এতে দুদিকের কর্তব্য ছিল। একদিকে, গেরিলা চরিত্রকে আঁকড়ে ধরে থাকা আর নিয়মিত চরিত্রের দিকে পরিবর্তিত হতে অনিচ্ছুক দক্ষিণপন্থী স্থানীয়তাবাদ ও গেরিলাবাদের বিরোধিতা করতে হয়েছিল। এ ঝোঁকটি জন্মেছিল, কারণ কর্মীরা শত্রুর পরিস্থিতির ও নিজেদের কর্তব্যগুলিকে হেয়জ্ঞান করেছিল। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় লাল অঞ্চলের কথা বলতে গেলে, সেখানে অনেক কষ্ট স্বীকার করে শিক্ষা দেওয়ার পরেই শুধু এ ঝোঁকটিকে ক্রমশঃ শুধরে নেওয়া গিয়েছিল। আর অন্যদিকে, নিয়মিতকরণের ওপরে অত্যধিক জোর দেওয়ার 'বাম'পন্থী অতিকেন্দ্রীয়করণ ও হঠকারিতাবাদেরও বিরোধিতা করতে হয়েছিল। এ ঝোঁকের উদ্ভব ঘটেছিল এই কারণে যে, আমাদের কোন কোন নেতৃস্থানীয় কর্মী শত্রুকে বেশি মাত্রায় শক্তিশালী বলে মনে করেছিল, কর্তব্যগুলিকে অত্যন্ত চড়া করে ধার্য করেছিল, আর বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত না করে বিদেশী অভিজ্ঞতাকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করেছিল। দীর্ঘ তিন

বছর ধরে (সুনাই বৈঠকের আগে) এই ঝোঁকটি কেন্দ্রীয় লাল অঞ্চলের ওপরে প্রভূত আত্মত্যাগ চাপিয়ে দিল, আর রক্তের বিনিময়ে শিক্ষালাভ করার পরেই শুধু এ ঝোঁকটিকে শুধরে নেওয়া গিয়েছিল। এই শুধরে নেওয়াটাই ছিল সুনাই বৈঠকের সাফল্য।

রণনীতির দ্বিতীয় পরিবর্তনটি ঘটেছিল ১৯৩৭ সালের শরৎকালে (লুকৌছিয়াও ঘটনার পরে), দুটি ভিন্নতর যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে। এই সময়ে, আমাদের শত্রু হচ্ছে নতুন অর্থাৎ জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, আমাদের মিত্রবাহিনী হচ্ছে আমাদের প্রাক্তন শত্রু—কুওমিনতাঙ (তারা এখনো আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন), আর যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে সুবিশাল উত্তর চীন (সাময়িকভাবে সেটি হল আমাদের সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্র, কিন্তু অচিরেই সেটি শত্রুর দীর্ঘস্থায়ী পশ্চাদ্ভাগে পরিণত হবে)। আমাদের রণনীতির পরিবর্তন হচ্ছে এই বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধিত একটি অত্যন্ত গুরুতর পরিবর্তন। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের অতীত দিনের নিয়মিত বাহিনীকে গেরিলাবাহিনীতে (এখানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রয়োগ করার অর্থে বলছি, কিন্তু সাংগঠনিক সুসম্বদ্ধতা বা শৃংখলানিষ্ঠার অর্থে নয়) রূপান্তরিত করে নিতে হয়েছিল, আর অতীতের চলমান যুদ্ধকে গেরিলাযুদ্ধে রূপান্তরিত করে নিতে হয়েছিল; শুধু এমনি করেই শত্রুর পরিস্থিতির সংগে ও আমাদের কর্তব্যের সংগে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে এই ধরনের পরিবর্তনটি ছিল একটি পিছু হটার পরিবর্তন, তাই এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবীরূপেই অত্যন্ত কঠিন। এ সময়ে, শত্রুকে খাটো করে দেখা এবং জাপানকে ভয় করা, দুটোই ঘটতে পারে এবং বাস্তবে এ দুটোই ঘটেছিল কুওমিনতাঙের মধ্যে। কুওমিনতাঙ যখন গৃহযুদ্ধের রণক্ষেত্র থেকে জাতীয় যুদ্ধের রণক্ষেত্রে নামতে শুরু করল, তখন সে বহু অনাবশ্যক ক্ষতি ভোগ করেছিল। এর প্রধান কারণ ছিল শত্রুকে খাটো করে দেখা, তাছাড়া জাপানকে জয় করাও (হান ফু-চ্যু আর লিউ চি হচ্ছে[২২] তার দৃষ্টান্ত) হচ্ছে এর কারণ। অন্যদিকে আমরা এই পরিবর্তনটি বেশ সহজেই করতে পেরেছি, আমরা ক্ষতি ও পরাজয় ভোগ করিনি, বরং বিরাট বিরাট জয়লাভ করেছি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যদিও কেন্দ্রীয় কমিটি ও সামরিক কর্মীদের একাংশের মধ্যে গুরুতর তর্কবিতর্ক হয়েছিল, তবুও আমাদের ব্যাপক কর্মিগণ যথাসময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন আর নমনীয়তার সংগে পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। গোটা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে অধ্যবসায় সহকারে চালিয়ে যাওয়া, তাকে প্রসারিত করা ও জেতার জন্য তথা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যতের

জন্য এই পরিবর্তনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। চীনের জাতীয় মুক্তির ভাগ্য নির্ধারণে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কথা যদি ভাবি, তাহলে আমরা এর গুরুত্বটি বুঝতে পারব। অসাধারণ ব্যাপকতা ও দীর্ঘস্থায়িত্বের দিক থেকে বলতে গেলে, চীনের জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধটি শুধু যে প্রাচ্যে নজিরবিহীন তা-ই নয়, উপরন্তু, সম্ভবতঃ গোটা মানবজাতির ইতিহাসেও এর তুলনা নেই।

তৃতীয় পরিবর্তনটি হচ্ছে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সময়ে গেরিলাযুদ্ধ থেকে নিয়মিত যুদ্ধে রূপান্তর, এবং এটাই হবে যুদ্ধবিকাশের ভবিষ্যতের ব্যাপার। সে সময়ে হয়ত নতুন অবস্থা ও নতুন অসুবিধার সৃষ্টি হবে, সে সম্পর্কে এখন না বললেও চলে।

৫। জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিগত ভূমিকা

সামগ্রিকভাবে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধই হচ্ছে প্রধান আর গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে সহায়ক, কারণ শুধুমাত্র নিয়মিত যুদ্ধই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি স্থির করতে পারে। গোটা দেশের কথা বলতে গেলে, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোটা প্রক্রিয়ায় যে তিনটি রণনীতিগত পর্যায় (প্রতিরক্ষা, ভারসাম্যাবস্থা ও পাল্টা আক্রমণ) রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম ও শেষটিতে নিয়মিত যুদ্ধই হচ্ছে প্রধান আর গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে সহায়ক। মধ্যবর্তী পর্যায়ে গেরিলাযুদ্ধ হবে প্রধান আর নিয়মিত যুদ্ধ হবে সহায়ক, কারণ শত্রু তার অধিকৃত এলাকাগুলিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে আর আমরা পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি চালালেও তখনো পাল্টা আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়ে উঠব না। যদিও এই পর্যায়টি হয়ত সবচেয়ে দীর্ঘ হবে, কিন্তু এটি হচ্ছে গোটা যুদ্ধের তিনটি পর্যায়ের মাত্র একটি। তাই, যুদ্ধকে সমগ্রভাবে ধরলে, নিয়মিত যুদ্ধই হচ্ছে প্রধান আর গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে সহায়ক। যদি এ অবস্থাকে উপলব্ধি না করি, নিয়মিত যুদ্ধ যে যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণের চাবিকাঠি—এটা না বুঝি, এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার কাজে আর নিয়মিত যুদ্ধের পর্যালোচনা ও পরিচালনার কাজে দৃষ্টি না দিই, তাহলে আমরা জাপানকে পরাজিত করতে পারব না। এটা হচ্ছে সমস্যার একটা দিক।

তবু, গোটা যুদ্ধের মধ্যে গেরিলাযুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত ভূমিকা রয়েছে। গেরিলাযুদ্ধ না করে এবং গেরিলাবাহিনী ও গেরিলাফৌজ গঠনের

কাজ উপেক্ষা করলে, এবং গেরিলাযুদ্ধের পর্যালোচনা ও পরিচালনার কাজ উপেক্ষা করলে আমরা অনুরূপভাবেই জাপানকে পরাজিত করতে অসমর্থ হব। কারণ চীনের বৃহত্তর অংশ শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে পরিণত হবে, আমরা যদি সর্বাধিক ব্যাপক ও সবচেয়ে দৃঢ় গেরিলাযুদ্ধ না চালাই এবং এইভাবে শত্রুকে নিজের পশ্চাদ্ভাগ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তার অধিকৃত অঞ্চলে অটলভাবে বসতে সুযোগ দিই, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সৈন্যবাহিনীর গুরুতর ক্ষতি হতে বাধ্য। শত্রুর আক্রমণ নিশ্চয়ই আরও হিংস্রতর হবে, ভারসাম্যাবস্থা সৃষ্টি করা কঠিন হয়ে উঠবে, আর জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটাই হয়ত-বা বিপদাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। ঘটনাগুলি যদি তেমন নাও ঘটে তাহলেও দেখা দেবে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা, যেমন, আমাদের পাল্টা আক্রমণের জন্য শক্তির প্রস্তুতি যথেষ্ট হবে না, পাল্টা আক্রমণের সময়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগের দিক থেকে আমরা সাহায্য পাব না, এবং শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি পূরণের সম্ভাবনাও থাকবে, ইত্যাদি। এ ধরনের অবস্থা ঘটলে এবং ব্যাপক ও দৃঢ় গেরিলাযুদ্ধকে যথাসময়ে বিকশিত করে সেই অবস্থাকে আয়ত্তে না আনা গেলে, অনুরূপভাবেই জাপানকে পরাজিত করা অসম্ভব হবে। অতএব, গোটা যুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ একটি সহায়ক স্থানের অধিকারী হলেও, আসলে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত স্থান রয়েছে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালানোর ব্যাপারে গেরিলাযুদ্ধকে অবহেলা করাটা হবে নিঃসন্দেহে একটা গুরুতর ভুল। এটা হচ্ছে সমস্যার আর একটা দিক।

দেশ বড় হলেই গেরিলাযুদ্ধ সম্ভব। তাই প্রাচীনকালেও গেরিলাযুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হলেই গেরিলাযুদ্ধকে অটলভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারা যায়। এই কারণেই প্রাচীনকালে গেরিলাযুদ্ধ সাধারণতঃ ব্যর্থ হয়েছে, আর শুধুমাত্র আধুনিককালের বড় বড় দেশে, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্যমান, সেখানে গেরিলাযুদ্ধ জয়যুক্ত হতে পারে, যেমন হয়েছে গৃহযুদ্ধের সময়কার সোভিয়েত ইউনিয়নের ও চীনের মতো দেশে। বর্তমানকালের শর্তগুলি ও সাধারণ শর্তগুলির দিক থেকে বলতে গেলে, যুদ্ধ চালনার ব্যাপারে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এমন একটা শ্রমবিভাজন হচ্ছে অপরিহার্য ও উপযোগী, যে শ্রমবিভাজনে কুওমিনতাঙ যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়মিত-যুদ্ধ চালাবার ভার গ্রহণ করে আর কমিউনিস্ট পার্টি শত্রুর পশ্চাদ্ভাগের গেরিলাযুদ্ধ চালাবার ভার নেয়। এটা হচ্ছে পারস্পরিক প্রয়োজন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের ব্যাপার।

এ থেকেই বোঝা যায়, আমাদের পার্টির সামরিক রণনীতিকে গৃহযুদ্ধের শেষের সময়কালের নিয়মিত যুদ্ধ থেকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম সময়কালের গেরিলাযুদ্ধে বদলে নেওয়া কত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। নিম্নলিখিত ১৮ দফায় এই পরিবর্তনের সুবিধে বর্ণনা করা হল ঃ

(১) শত্রুবাহিনীর অধিকৃত এলাকাগুলির হ্রাসকরণ ;

(২) আমাদের সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি এলাকাগুলির সম্প্রসারণ ;

(৩) প্রতিরক্ষার পর্যায়ে, শত্রুকে টেনে ধরে যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক কার্যকলাপের সংগে সহযোগিতা করা;

(৪) ভারসাম্যের পর্যায়ে, শত্রুর পশ্চাদ্ভাগস্থ আমাদের ঘাঁটি এলাকাগুলি দৃঢ়ভাবে অধিকার করে রাখা, যাতে যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সুসম্বন্ধকরণ ও ট্রেনিংয়ের সুবিধে হয় ;

(৫) পাল্টা আক্রমণের পর্যায়ে, যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক কার্যকলাপের সংগে সংযোগিতা করে হৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করা ;

(৬) দ্রুততম ও সর্বাধিক কার্যকরভাবে আমাদের সৈন্যবাহিনীর সম্প্রসারণ;

(৭) কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপকতম সম্প্রসারণ, যাতে প্রতিটি গ্রামে পার্টি-শাখা গঠন করা যায় ;

(৮) গণ-আন্দোলনগুলির ব্যাপকতম সম্প্রসারণ, যাতে করে শত্রুর ঘাঁটিতে অবস্থিত যারা তাদের বাদ দিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগস্থ সমস্ত জনগণকে সংগঠিত করতে পারা যায় ;

(৯) জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলির সর্বাধিক ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা ;

(১০) জাপ-বিরোধী সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক কাজকর্মের ব্যাপকতম প্রসার ;

(১১) জনগণের জীবনযাত্রার ব্যাপকতর উন্নতিবিধান ;

(১২) শত্রুসৈন্যবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার জন্য সর্বাধিক সুবিধের সৃষ্টি;

(১৩) সবচেয়ে ব্যাপক ও স্থায়ীভাবে গোটা দেশের জনগণের মনোভাবের ওপরে প্রভাব বিস্তার এবং গোটা দেশের সৈন্যদের সংগ্রামী মনোবল ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত করা ;

(১৪) বন্ধুভাবাপন্ন সৈন্যবাহিনী ও পার্টিগুলিকে প্রগতির জন্য ব্যাপকতর প্রেরণা দেওয়া ;

(১৫) শত্রু শক্তিশালী আর আমরা দুর্বল এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উপযোগী হওয়া, যাতে আমরা কম ক্ষতি ভোগ করি এবং বেশি জয়লাভ করি ।

(১৬) শত্রু ছোট আর আমরা বড়—এই অবস্থার উপযোগী হওয়া, যাতে শত্রু বেশি ক্ষতি ভোগ করে এবং কম জয়লাভ করে ;

(১৭) সবচেয়ে দ্রুত ও সবচেয়ে কার্যকরীভাবে বিরাট সংখ্যক নেতৃস্থানীয় কর্মী গড়ে তোলা ;

(১৮) রসদাদি সরবরাহের সমস্যা সমাধানের সর্বাধিক সুবিধার সৃষ্টি করা।

এ কথা সন্দেহাতীত যে, দীর্ঘকালীন সংগ্রামে গেরিলাবাহিনী ও গেরিলাযুদ্ধকে নিজের পূর্বাবস্থায় নিশ্চল হয়ে থাকা উচিত নয়, তাকে বরং উচ্চতর পর্যায়ে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে, আর ক্রমে ক্রমে নিয়মিত বাহিনীতে ও নিয়মিত যুদ্ধে রূপান্তরিত হতে হবে। গেরিলাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমরা শক্তি সঞ্চয় করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণবিচূর্ণ করার কাজে নিজেদেরকে অন্যতম নির্ধারক উপাদানে পরিণত করব ।

৬। সামরিক সমস্যার পর্যালোচনায় মনোযোগ দাও

শত্রুভাবাপন্ন দুটি সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার যাবতীয় সমস্যার সমাধান নির্ভর করে যুদ্ধের ওপরে, আর চীনের অস্তিত্ব বা বিলুপ্তি নির্ভর করে যুদ্ধে তার জয়—পরাজয়ের ওপর। তাই সামরিক তত্ত্ব, রণনীতি ও রণকৌশল এবং সৈন্যবাহিনীর রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনায় আর এক মুহূর্তও দেরী করলে চলবে না। রণকৌশল সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা পর্যাপ্ত না হলেও, সামরিক কাজকর্মে নিয়োজিত আমাদের কমরেডরা গত দশ বছরে বহু সাফল্য অর্জন করেছেন এবং চীনের পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন অনেক কিছুর উদ্ভব ঘটিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি হচ্ছে এই যে সে সবকিছুর সারসংকলন করা হয়নি। এখনো মাত্র খুব অল্পসংখ্যক লোকই রণনীতির সমস্যা ও যুদ্ধের তাত্ত্বিক সমস্যার পর্যালোচনা করছেন। রাজনৈতিক কাজকর্মের পর্যালোচনায় প্রথমশ্রেণীর সাফল্য পাওয়া গেছে, এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যসমৃদ্ধিতে এবং উদ্ভাবনের সংখ্যায় ও গুণে সারা দুনিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পরেই আমাদের স্থান, কিন্তু ত্রুটি হচ্ছে এই যে, সেগুলির সমন্বয়সাধন ও সুব্যবস্থিতকরণ পর্যাপ্ত নয়। গোটা পার্টি ও গোটা দেশের প্রয়োজনে, সামরিক জ্ঞানকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করা হচ্ছে জরুরী কর্তব্য। এইসব বিষয়ের দিকে এখন থেকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে, আর যুদ্ধ ও রণনীতির তত্ত্ব হচ্ছে সবকিছুর মূল। সামরিক তত্ত্বের পর্যালোচনায়

আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করা ও সামরিক সমস্যা পর্যালোচনার দিকে দৃষ্টি দিতে গোটা পার্টিকে উদ্বুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজনীয় বলেই আমি মনে করি।

টীকা

১। ভি. আই. লেনিন—'যুদ্ধ এবং রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি', 'আর. এস. ডি. এল. পি.-এর বিদেশস্থ শাখাগুলির সম্মেলন', 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিজের সরকারের পরাজয় সম্পর্কে', 'রাশিয়ার পরাজয় ও বিপ্লবী সংকট' দ্রষ্টব্য। লেনিনের এই প্রবন্ধগুলি ১৯১৪-১৫ সালে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। এগুলি ছাড়া, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ, 'যুদ্ধ, শান্তি ও বিপ্লবের প্রশ্নে বলশেভিক পার্টির তত্ত্ব ও রণকৌশল' দ্রষ্টব্য।

২। কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষকদের সংগে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ১৯২৪ সালে মুৎসুদ্দি ও জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনী — 'সদাগর বাহিনীকে' পরাজিত করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে যোগসাজসে এরা সেই সময়ে কুয়াংচৌতে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপে নিয়োজিত ছিল। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থাপিত বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে কুয়াংচৌ থেকে রওনা হয়ে পূর্বমুখী অভিযানে লড়ে, এবং কৃষকদের সাহায্যে ও সমর্থনে পরাজিত করে যুদ্ধবাজ ছেন চিয়োং-মিংয়ের সৈন্যবাহিনীকে। তারপরে কুয়াংচৌতে ফিরে এসে ধ্বংস করে ইয়ুনান ও কুয়াংসীর যুদ্ধবাজদের, যারা কুয়াংচৌতে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। সেই বছরের শরৎকালে এই বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী দ্বিতীয় পূর্বমুখী অভিযান চালায় আর ছেন চিয়োং-মিংয়ের সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এইসব যুদ্ধাভিযানের পুরোভাগে বীরত্বের সংগে লড়াই করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট যুব লীগের সদস্যরা। এই যুদ্ধাভিযানগুলিই কুয়াংতুং প্রদেশের ঐক্যসাধন ঘটিয়ে উত্তর অভিযানের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছিল।

৩। ৪ঠা মের আন্দোলনটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র—বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন যা ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে শুরু হয়েছিল। সেই বছরের প্রথমার্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীরা, অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান, ইতালী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি প্যারিসে এক বৈঠকে মিলেছিল লুটের মাল ভাগাভাগি করে নেবার জন্য, আর এই বৈঠকে তারা স্থির করেছিল যে, চীনের শানতুং প্রদেশে আগের দিনে জার্মানি যেসব সুযোগ-সুবিধে ভোগ করত, সে সবই জাপান পাবে। ৪ঠা মে তারিখে, পিকিংয়ের ছাত্ররা সর্বপ্রথম সমাবেশ ও বিক্ষোভ-মিছিল আয়োজন করে দৃঢ়ভাবে এর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল। এই আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টায় উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার ত্রিশ জনেরও বেশি ছাত্রকে গ্রেপ্তার

করেছিল। প্রতিবাদে ধর্মঘট করেছিল পিকিংয়ের ছাত্ররা, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররাও এই ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছিল। ৩রা জুন তারিখে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার পিকিংয়ে আরও ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু করল, দুই দিনের মধ্যে প্রায় হাজারখানেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল। ৩রা জুনের ঘটনা সারা দেশের জনগণের ক্রোধকে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলল। ৫ই জুন থেকে শুরু করে শাংহাই ও অন্যান্য অনেক জায়গার শ্রমিকরা পরপর ধর্মঘট করল, আর ব্যবসায়ীরাও তাঁদের দোকানপাট বন্ধ রাখল। শুরুতে যা ছিল মুখ্যতঃ বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশপ্রেমী আন্দোলন, সেটি অবিলম্বে হয়ে উঠল দেশব্যাপী স্বদেশপ্রেমী আন্দোলন। তাতে যোগ দিল সর্বহারাশ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী। এই স্বদেশপ্রেমী আন্দোলনের প্রসারলাভের সংগে সংগে ৪ঠা মের আগে আরম্ভ করা যা সাংস্কৃতিক আন্দোলনটি, যা শুরু হয়েছিল সামন্ততন্ত্র-বিরোধী আর বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের উন্নতিবিধায়ক এক আন্দোলন হিসেবে, তা এক ব্যাপক আকারের বলিষ্ঠ বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বিকশিত হয়ে উঠল। আর এর প্রধান প্রবাহটি ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার।

৪। ১৯২৫ সালের ৩০শে মে শাংহাইয়ে ব্রিটিশ পুলিস কর্তৃক চীনা জনগণকে হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সারা দেশের জনগণ যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিল, এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৫ সালের মে মাসে ছিংতাও ও শাংহাইয়ের জাপানী সূতাকলগুলোতে পরপর ধর্মঘট হয়, এই ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের পদলেহী কুকুর—উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজরা এটা দমন করতে আসে। ১৫ই মে শাংহাইয়ের জাপানী সূতাকলের মালিক কু চেং-হোং নামক একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং দশ জনেরও বেশি শ্রমিক আহত হয়। ২৮শে মে তারিখে ছিংতাওয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার আটজন শ্রমিককে হত্যা করে। ৩০শে মে শাংহাইয়ে দু হাজারেরও বেশি ছাত্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বিদেশীদের এলাকাগুলোতে শ্রমিকদের সমর্থনে প্রচার চালায় এবং এইসব এলাকা ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানায়, এর পরেই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ এলাকার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সম্মুখে দশ হাজারেরও অধিক লোক জমায়েত হয় এবং বজ্রনির্ঘোষে 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক !' 'সমগ্র চীনা জনগণ, এক হও।' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালায়, ফলে বহু ছাত্র হতাহত হয়, এই ঘটনাই '৩০শে মের হত্যাকাণ্ড' বলে পরিচিত। এই বিরাট হত্যাকাণ্ডে সমগ্র দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, দেশের সর্বত্রই বিক্ষোভ-মিছিল ও হরতাল এবং ছাত্র, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট শুরু হয়, যা বিরাটাকারের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

৫। জে. ভি. স্তালিন, 'চীনে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ' থেকে উধৃত।

৬। ১৮৯৪ সালে সান ইয়াৎ-সেন হনলুলুতে একটি ছোট বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন। তার নাম ছিল 'সিং চোং হুই' (চীনের পুনর্জীবন সমিতি)। ১৮৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধে ছিং রাজবংশীয় সরকারের পরাজয়ের পরে, জনগণের

ভেতরের 'হুইতাং' নামক গুপ্ত সংগঠনগুলির সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে সান ইয়াৎ-সেন ছিং সরকারের বিরুদ্ধে কুয়াংতুং প্রদেশে দুবার সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন, একটি ১৮৯৫ সালে কুয়াংচৌতে, আর অন্যটি ১৯০০ সালে হুইচৌয়ে।

৭। ১৯০৫ সালে সিং চোং হুই অন্য দুটি ছিং-বিরোধী সংগঠন—হুয়াং সি হুই (চীনা পুনর্জীবন সমিতি) আর কুয়াং ফু-হুই (পুনরুদ্ধার সমিতি)-এর সংগে একত্রিত হয়েছিল এবং ফলে গঠিত হয়েছিল তুং মেং হুই অর্থাৎ 'মৈত্রী সমিতি' (বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া এবং কিছু সংখ্যক ছিং সরকার-বিরোধী জমিদার ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের যুক্তফ্রন্ট সংগঠন)। এই সমিতি বুর্জোয়া বিপ্লবের কার্যক্রম উপস্থাপন করেছিল। 'মাঞ্চুদের বিতাড়ন, চীন পুনরুদ্ধার, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জমির মালিকানার সমতাবিধান'-এর সুপারিশ করা হয়েছিল এই কার্যক্রমে। তুং মেং হুই-এর কালে, 'হুইতাঙ' ও ছিং সরকারের নয়া সৈন্যবাহিনীর এক অংশের সংগে মৈত্রী গড়ে তুলে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ছিং সরকারের বিরুদ্ধে অনেকবার সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। এই অভ্যুত্থানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯০৬ সালের পিংসিয়াং (কিয়াংসী প্রদেশে), লিউইয়াং ও লিলিংয়ের (হুনান প্রদেশে) বিদ্রোহ, ১৯০৭ সালের ছাওচৌ—হুয়াংকাংয়ের (কুয়াংতুং প্রদেশে) বিদ্রোহ, ছিনচৌয়ের (কুয়াংতুং প্রদেশে) বিদ্রোহ, চেন্নানকুয়ানের [অর্থাৎ বর্তমানের ইয়ৌইকুয়ান—অনুবাদক] (কুয়াংসী প্রদেশে) বিদ্রোহ, ১৯০৮ সালের ইয়ুনান প্রদেশের হোকৌয়ের বিদ্রোহ আর ১৯১১ সালের কুয়াংচৌ বিদ্রোহ ও উছাং অভ্যুত্থান।

৮। ১৯১২ সালে 'তুং মেং হুই' পুনর্গঠিত হয়ে কুওমিনতাঙে পরিণত হল এবং তৎকালীন উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ ইউয়ান শি-কাইয়ের শাসনের সংগে আপোষ করল। ১৯১১ সালের সিনহাই বিপ্লবের ফলে কিয়াংসী, আনহুই ও কুয়াংতুং প্রদেশে যেসব উক্তির উদ্ভব ঘটেছিল, সেগুলিকে দাবিয়ে রাখার জন্য ইউয়ান শি-কাইয়ের সৈন্যবাহিনী ১৯১৩ সালে দক্ষিণ অভিমুখে অভিযান চালায়। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুললেন কিন্তু অচিরেই সে প্রতিরোধ ভেঙে গেল। কুওমিনতাঙের আপোষনীতির ভুল বুঝতে পেরে ডঃ সান ইয়াৎ সেন ১৯১৪ সালে জাপানের টোকিও শহরে 'চোং হুয়া কে মিং তাঙ' (চীনা বিপ্লবী পার্টি) নামে একটি পার্টি গঠন করলেন, সে সময়কার কুওমিনতাঙের সংগে তাঁর পার্টির পার্থক্য দেখিয়ে দেবার জন্য। বস্তুতঃ এই নতুন পার্টিটি ছিল ইউয়ান শি-কাইয়ের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া অংশবিশেষ ও বুর্জোয়াদের একটি অংশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মৈত্রীসংস্থা। এই মৈত্রীসংস্থার ওপর নির্ভর করে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ১৯১৪ সালে শাংহাইয়ে একটা ছোট আকারের বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে ইউয়ান শি-কাই নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করলে ইউয়ান শি-কাইয়ের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাই এ এবং অন্যান্যরা তার বিরুদ্ধে ইয়ুনান থেকে যুদ্ধ শুরু করল। আর ইউয়ান শি-কাইয়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিরোধিতা গড়ে তোলবার ব্যাপারেও ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ছিলেন সক্রিয় প্রচারক ও সংগঠক।

৯। ১৯১৭ সালে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন তাঁর প্রভাবাধীন নৌবাহিনীকে পরিচালিত করে শাংহাই থেকে কুয়াংচৌয়ে গিয়েছিলেন। কুয়াংতুং প্রদেশকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমী যুদ্ধবাজদের সংগে মিলিত হয়ে তিনি তুয়ান ছী-রুইবিরোধী একটি সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিমী যুদ্ধবাজরা সে সময়ে ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ তুয়ান ছী-রুইয়ের বিরোধী।

১০। ১৯২১ সালে, কুইলিন শহরে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন উত্তর অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর অধীনস্থ ছেন চিয়োং-মিং উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের সংগে যোগসাজস করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এই কারণে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের চেষ্টা সফল হয়নি ।

১১। ১৯২৪ সালে, ডঃ সান ইয়াৎ-সেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা পেয়ে কুওমিনতাঙের পুনঃসংগঠনের পর কুয়াংচৌয়ের নিকটবর্তী হুয়াংপুতে একটি সামরিকবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এটাই হুয়াংপু সামরিক একাডেমী নামে খ্যাত । চিয়াং কাই-শেকের ১৯২৭ সালের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের আগে এ ছিল কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। কমরেড চৌ এন-লাই, ইয়ে চিয়ান-ইং, ইয়ুন তাই-ইং, সিয়াও ছু-ন্যু ও অন্যান্য বহু কমরেড বিভিন্ন সময়ে এই বিদ্যালয়ে নানা রকমের দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়েছিলেন। আর এই বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রও ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির বা কমিউনিস্ট যুব লীগের সদস্য। তাঁরা এই বিদ্যালয়ের বিপ্লবী অন্তঃসার হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন।

১২। তান ইয়ান-কাই ছিল হুনানের অধিবাসী । সে ছিল একজন 'হানলিন', অর্থাৎ ছিং রাজবংশের অধীনস্থ সর্বোচ্চ সরকারী বিদ্বৎ সংস্থার সদস্য। গোড়াতে সে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের সপক্ষে ওকালতি করত। আর পরে স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য ১৯১১ সালের বিপ্লবে (সিনহাই বিপ্লবে) অংশগ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে কুওমিনতাঙ শিবিরে তার যোগদানটা ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের সংগে হুনানের স্থানীয় জমিদারদের বিরোধের প্রতিফলন।

১৩। প্রগ্রেসিভ পার্টি (চিনপুতাঙ) হল চীনা প্রজাতন্ত্রের শুরুর বছরগুলিতে ইউয়ান শি-কাইয়ের কৃপাশ্রয়ে লিয়াং ছী-ছাও প্রমুখদের দ্বারা সংগঠিত একটি পার্টি।

১৪। ছিং রাজবংশের শেষ বছরগুলিতে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের সর্দার ছিল ইউয়ান শি-কাই। ১৯১১ সালের বিপ্লবে ছিং রাজবংশের পতনের পর, প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র শক্তির ওপরে ও সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যের ওপরে নির্ভর করে এবং তৎকালীন বিপ্লব পরিচালনাকারী বুর্জোয়াশ্রেণীর আপোষমূলক চরিত্রের সুযোগ নিয়ে ইউয়ান শি-কাই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের পদটি কুক্ষিগত করে নিয়েছিল, আর উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের প্রথম সরকার গঠন করেছিল। এ সরকার প্রতিনিধিত্ব করত বড় বড় জমিদার ও বড় বড় মুৎসুদ্দিশ্রেণীর। ১৯১৫ সালে সে নিজেকে সম্রাট হিসেবে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনলাভের জন্য জাপানের

একুশ দফা দাবি মেনে নিয়েছিল। এই একুশ দফা দাবির সাহায্যে জাপান গোটা চীনের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন করতে চেয়েছিল। সে বছরের ডিসেম্বর মাসে ইউয়ান শি-কাইয়ের সম্রাট হওয়ার ঘোষণার বিরুদ্ধে ইয়ুনান প্রদেশে একটি বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল এবং অবিলম্বেই সারা দেশ এই বিদ্রোহে সাড়া দিল। ইউয়ান শি-কাই মারা যায় পিকিংয়ে ১৯১৬ সালের জুন মাসে।

১৫। তুয়ান ছী-রুই ছিল ইউয়ান শি-কাইয়ের একজন প্রবীণ অধীনস্থ ব্যক্তি এবং উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের আনহুই চক্রের সর্দার। ইউয়ান শি-কাইয়ের মৃত্যুর পরে সে একাধিকবার পিকিং সরকারের ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল।

১৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রুপটি ছিল ১৯১৬ সালে প্রগ্রেসিভ পার্টির (চিনপুতাঙের) এক অংশ ও কুওমিনতাঙের এক অংশ নিয়ে গঠিত অত্যন্ত দক্ষিণপন্থী একটি রাজনৈতিক গ্রুপ। সরকারী পদ লাভের জন্য এই গ্রুপ কখনো দক্ষিণাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের, আবার কখনো বা উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের সাথে জোট বাঁধে। ১৯২৬-২৭ সালের উত্তর অভিযানের সময়ে এই গ্রুপের একাংশ যেমন হুয়াং ফু, চাং ছুন ও ইয়াং ইয়োং-তাইয়ের মতো জাপান-অনুরাগী সদস্যরা চিয়াং কাই-শেকের সংগে যোগসাজস করতে শুরু করেছিল, আর নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চিয়াং কাই-শেককে সাহায্য করেছিল।

১৭। যুব পার্টি অর্থাৎ তথাকথিত 'রাষ্ট্রবাদী' গ্রুপের চীনা যুব পার্টি—এটা হচ্ছে মুষ্টিমেয় ফ্যাসিবাদী নির্লজ্জ রাজনীতিবিদদের সংগঠন। কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য লাভ করাটাকে তারা নিজেদের প্রতিবিপ্লবী পেশা করে নিয়েছিল।

১৮। এখানে মুখ্যতঃ উত্তর অভিযানের যুদ্ধকালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য জেনারেল ইয়ে থিংয়ের নেতৃত্বাধীন স্বতন্ত্র রেজিমেন্টেরই উল্লেখ করা হয়েছে। এই রেজিমেন্ট ছিল উত্তর অভিযানে বিখ্যাত সংগ্রামী বাহিনী, বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক উছাং দখলের পরে এই রেজিমেন্টটি ২৪তম ডিভিসনে সম্প্রসারিত হয় এবং নানছাং অভ্যুত্থানের পর ১১তম বাহিনীতে সম্প্রসারিত হয়।

১৯। কিয়াংসী প্রদেশের রাজধানী নানছাং হল ১৯২৭ সালের ১লা আগস্টের বিখ্যাত অভ্যুত্থানের স্থান। চিয়াং কাই-শেক এবং ওয়াং ছিং-ওয়েই-এর প্রতিবিপ্লবকে দমন ও ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবকে চালিয়ে নেবার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই অভ্যুত্থানকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কমরেড চৌ এন-লাই, চু তে, হো লুং এবং ইয়ে তিঙের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজারেরও বেশি সৈন্য এই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে। পরিকল্পনামাফিক অভ্যুত্থানকারী বাহিনী ৫ই আগস্ট নানছাং থেকে প্রত্যাহৃত হয়, কিন্তু কুয়াংতুং প্রদেশের ছাওচৌ ও সোয়াতৌ-এর দিকে অগ্রসরকালে পরাজয় বরণ করে। কমরেড চু তে, চেন ঈ এবং লিন পিয়াও-এর বাহিনীর একটা অংশ

পরবর্তীকালে লড়াই করে ছিংকাং পর্বতমালা পর্যন্ত পথ করে নেয় এবং কমরেড মাও সে-তুঙের পরিচালনাধীন প্রথম শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী বাহিনীর প্রথম ডিভিসনের সাথে যোগ দেয়।

২০। বিখ্যাত শরৎকালীন ফসল অভ্যুত্থান ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে সিউশুই, পিংসিয়াং, পিংকিয়াং কবং লিউয়াং শহরের জনগণের সশস্ত্র অংশ দ্বারা হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে সংঘটিত হয়। এদের নিয়েই প্রথম শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী বাহিনীর প্রথম ডিভিসন গঠিত হয়। এই বাহিনীকে কমরেড মাও সে-তুঙ ছিংকাং পর্বতমালা পর্যন্ত পরিচালনা করে সেখানে একটা বিপ্লবী ভিত প্রতিষ্ঠা করেন।

২১। এই অধিবেশন ছিল ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে কুইচৌ প্রদেশের সুনাই শহরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা আয়োজিত পলিটব্যুরোর বর্ধিত অধিবেশন। এই অধিবেশন সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করে তখনকার নির্ধারক তাৎপর্যসম্পন্ন সামরিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রের ভুলগুলোকে শোধরায়, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে সুবিধাবাদী লাইনের প্রাধান্যের বিলোপসাধন করে এবং প্রধান নেতা হিসেবে কমরেড মাও সে-তুঙের দ্বারা পরিচালিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নতুন নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। এটা হচ্ছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন।

২২। হান ফু-চ্যু প্রথমে ছিল শানতুং প্রদেশস্থ একজন কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ। লিউ চি ছিল চিয়াং কাই-শেকের নিজস্ব চক্রের যুদ্ধবাজ। প্রথমে সে হোনান প্রদেশে ছিল, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ বেধে ওঠার পর হোপেই প্রদেশের পাওতিং অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছিল তার ওপরে। যখন জাপানী হামলাকারীরা আক্রমণ করল, তখন তারা উভয়েই বাধা না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

৪ঠা মে'র আন্দোলন

মে ১৯৩৯

বিশ বছর আগে সংঘটিত ৪ঠা মে'র আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি নতুন স্তর চিহ্নিত করে দিয়েছে। ৪ঠা মে'র আন্দোলন থেকে সাংস্কৃতিক সংস্কারের আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল, যেটা ছিল এই বিপ্লবেরই অন্যতম অভিব্যক্তি। সে সময়ে নতুন সামাজিক শক্তিগুলির উন্মেষ ও বিকাশের সংগে সংগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে একটি শক্তিশালী শিবিরের আবির্ভাব ঘটে। এই শিবিরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল শ্রমিকশ্রেণী, ব্যাপক ছাত্র ও নতুন জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের সমসাময়িককালে শত-সহস্র ছাত্র সাহসের সংগে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে। এদিক থেকে ৪ঠা মে'র আন্দোলন ১৯১১ সালের বিপ্লবের চেয়েও একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল।

চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রারম্ভিক গঠনকাল থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, এর বিকাশধারার কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে তা পেরিয়ে এসেছে : আফিং যুদ্ধ, তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের যুদ্ধ, ১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ[১], ১৮৯৮-র সংস্কার আন্দোলন[২], ঈ হো তুয়ান আন্দোলন[৩], ১৯১১ সালের বিপ্লব, ৪ঠা মে'র আন্দোলন, উত্তরাভিমুখী অভিযান, এবং কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধ। বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধও এরই আরেকটি পর্যায়, এবং এটি হচ্ছে সবচেয়ে বিরাট, সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও সবচেয়ে গতিশীল পর্যায়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদের শক্তি মূলগত উৎখাত এবং একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। আফিং যুদ্ধ থেকে শুরু করে বিপ্লবের বিকাশধারার প্রত্যেকটি স্তরেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসূচক

কমরেড মাও সে-তুঙের এই রচনাটি লেখা হয়েছিল ইয়েনানের সংবাদপত্রগুলির জন্য ৪ঠা মে'র আন্দোলনের বিংশত বার্ষিকী উপলক্ষে।

বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এই যে, সেগুলি কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের আগে না পরে সংগঠিত হয়েছে তাই। যাই হোক, সামগ্রিকভাবে, সবগুলি স্তরই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র বহন করছে। এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যই হচ্ছে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন যা চীনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব অর্থাৎ এমন একটি গণতান্ত্রিক-সামাজিক ব্যবস্থা যার পূর্বসুরী হল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ (বিগত সহস্র বছরের আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ) এবং যার উত্তরাধিকারী হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, কেন প্রথমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজ এবং তারপর সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্টরা চেষ্টা করবেন, তবে তার উত্তরে আমাদের বক্তব্য হল ঃ আমরা ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী ধারা অনুসরণ করছি মাত্র।

চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব তার সম্পূর্ণতার জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক শক্তিসমূহের ওপর নির্ভরশীল। এই সামাজিক শক্তিসমূহ হল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, বুদ্ধিজীবী এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার প্রগতিশীল অংশ, অর্থাৎ— শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মৌলিক বিপ্লবী শক্তি হিসেবে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের নেতৃত্বকারী শ্রেণী হিসেবে নিয়ে বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী এবং ব্যবসায়ীরা। আজ এইসব মৌলিক বিপ্লবী শক্তিগুলি ছাড়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আজ বিপ্লবের প্রধান শত্রু হচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও চীনা বিশ্বাসঘাতকরা, এবং বিপ্লবের মৌলিক নীতি হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নীতি, যে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সমাবেশ ঘটেছে জাপ-আক্রমণবিরোধী শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের। প্রতিরোধ-যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়লাভ তখনই ঘটবে, যখন এই যুক্তফ্রন্ট দৃঢ়ভাবে সংগঠিত ও বিকশিত হবে।

চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীরাই সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়েছিল। ১৯১১ সালের বিপ্লব এবং ৪ঠা মে'র আন্দোলনে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এটা দেখা গিয়েছে, এবং ৪ঠা মে'র আন্দোলনের দিনগুলিতে বুদ্ধিজীবীরা ১৯১১ সালের বিপ্লবের সময়ের তুলনায় সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি, তাদের রাজনৈতিক চেতনাও ছিল অনেক বেশি উন্নত। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে কিছুই করতে সক্ষম হবে না। শেষ বিচারে, বিপ্লবী ও অবিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার পার্থক্যরেখা হচ্ছে এটাই যে, তারা শ্রমিক-কৃষকদের সংগে একাত্ম হতে চাইছে কি চাইছে না, এবং

প্রকৃতই তারা সেটা করছে কিনা। পরিশেষে, এটাই, এবং শুধুমাত্র এটাই, তিন গণ-নীতি বা মার্কসবাদে বিশ্বাস করার ঘোষণা নয়, এদের থেকে অন্যদের পার্থক্য নির্ণয় করে। সত্যকারের বিপ্লবী হচ্ছে সে-ই, যে নিজে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হতে ইচ্ছুক, এবং সত্যসত্যই যে তা করছে।

৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর বিশ বছর এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হবার পর দু'বছর পার হয়ে গেল। যুবকদের এবং দেশের সমগ্র সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রতি বিরাট দায়িত্ব আছে। আমি আশা করি, তাঁরা চীনা বিপ্লবের চরিত্র ও তার পরিচালিকাশক্তিগুলি অনুধাবন করতে পারবেন, তাঁদের কাজ দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের সেবা করবেন, তাদের মধ্যে যাবেন, এবং তাদের মধ্যে প্রচারক ও সংগঠকের কাজ করবেন, জাপানের বিরুদ্ধে সমগ্র জনতা সামিল হলে বিজয় আমাদের হবেই। সমগ্র দেশের যুবকবৃন্দ, উদ্যোগী হয়ে উঠুন!

টীকা

১। কোরিয়া ও চীনকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করে। বহু চীনা সাধারণ সৈন্য ও কিছু কিছু দেশব্রতী সেনাপতি বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেন কিন্তু প্রতিরোধ-যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপারে চিং সরকারের দুর্নীতির দরুণ চীন পরাজিত হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চিং সরকার জাপানের সঙ্গে অত্যন্ত অপমানকর ঘৃণ্য শিমনশেকি চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

২। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে এই খণ্ডে প্রকাশিত 'দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে' নামক প্রবন্ধের ১১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের 'ঈ হো তুয়ান আন্দোলন' ছিল উত্তর চীনের কৃষক ও হস্তশিল্পীদের এক ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সশস্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত লড়াই। ধর্ম ও অন্যান্য সূত্রে যোগাযোগ করে গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে তারা ব্যাপক যুদ্ধ চালায়। কিন্তু অত্যন্ত হিংস্র বর্বরতার সঙ্গে এই আন্দোলনকে অবদমিত করা হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালী ও অস্ট্রিয়া—এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সৈন্যবাহিনী পিকিং ও তিয়েনসিন দখল করে।

যুব আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশ

৪ঠা মে, ১৯৩৬

৪ঠা মে'র আন্দোলনের আজ বিংশতিতম বার্ষিকী। এই স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য ইয়েনানের সমস্ত যুবক এখানে সমবেত হয়েছেন। অতএব, আমি চীনের যুব আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশ সম্পর্কে কয়েকটি সমস্যার ওপর এই উপলক্ষে কিছু বলব।

প্রথমতঃ, ৪ঠা মেকে এখন চীনের যুব-দিবস[১] বলে স্থির করা হয়েছে, এবং এটা খুবই যথার্থ হয়েছে। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর ২০ বছর গত হয়েছে, তবু এ-বছরই মাত্র দিবসটিকে জাতীয় যুব-দিবস হিসেবে স্থির করা হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কারণ এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব শীঘ্রই এক সন্ধিক্ষণে উপনীত হবে। কয়েক দশক ধরে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব বার বার ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু এখন এই অবস্থা অবশ্যই পরিবর্তিত হবে—এবং এ পরিবর্তন হবে বিজয়ের দিকে, আর একটি পরাজয়ের দিকে নয়। চীনা বিপ্লব এখন সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—জয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অতীতের বারংবার ব্যর্থতা আর সংঘটিত হতে পারে না এবং কোনমতেই তা হতে দেওয়া উচিত হবে না, বরং তাকে জয়ের দিকেই পরিচালিত করতে হবে। কিন্তু এই পরিবর্তন কি ইতিমধ্যেই ঘটেছে? না, তা এখনো ঘটেনি, আমরা এখনো জয়লাভ করিনি। কিন্তু জয়লাভ করা সম্ভব। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমরা পরাজয় থেকে বিজয়ের সন্ধিক্ষণে পৌঁছাবার চেষ্টা করছি। ৪ঠা মে'র আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, সে সরকার হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার সরকার, সে সরকার সাম্রাজ্যবাদের সংগে যোগসাজস করে জাতীয় স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়েছিল এবং জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল। এরকম একটি সরকারের বিরোধিতা করার কি প্রয়োজন ছিল না? যদি তা না থাকে, তাহলে ৪ঠা মে'র আন্দোলন ছিল একটা নিছক ভ্রান্তি। এটা খুবই স্পষ্ট যে, এরকম সরকারের অবশ্যই বিরোধিতা করতে হবে, পতন ঘটাতে হবে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সরকারের। একটু ভেবে দেখুন, ৪ঠা মে'র আন্দোলনের বহু পূর্বেই ডঃ সান ইয়াৎ-সেন তৎকালীন সরকার-বিরোধী

এই প্রবন্ধটি হচ্ছে ৪ঠা মে'র আন্দোলনের বিংশতিতম বার্ষিকী উপলক্ষে ইয়েনানের যুবকদের আয়োজিত এক সভায় কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত ভাষণ। এই ভাষণে কমরেড মাও সে-তুঙের চীনা বিপ্লবের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মতবাদের বিকশিত রূপ প্রকাশ পাচ্ছে।

বিদ্রোহী ছিলেন। তিনি ছিং রাজবংশীয় সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন এবং তার পতন ঘটিয়েছিলেন। তিনি কি ঠিক করেন নি? —আমার মতে তিনি সম্পূর্ণ ঠিকই করেছিলেন। কারণ যে সরকারের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন, সে সরকার সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করেনি, বরং তার সংগে যোগসাজস করেছিল, এবং তা বিপ্লবী সরকার ছিল না, বরং বিপ্লবকে দাবিয়েই রেখেছিল। ৪ঠা মে'র আন্দোলন জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সরকারের বিরোধিতা করেছিল, তাই ৪ঠা মে'র আন্দোলন ছিল বিপ্লবী আন্দোলন। ৪ঠা মে'র আন্দোলনকে সমস্ত চীনা যুবকের এই আলোকেই দেখা উচিত। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে আজ যখন সমগ্র দেশের জনগণ রুখে দাঁড়িয়েছেন, তখন অতীতের বিপ্লবের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে আমরা জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি; —আর কোন বিশ্বাসঘাতককেই আমরা বরদাস্ত করব না এবং বিপ্লবকে পুনরায় ব্যর্থ হতে দেব না। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া চীনের সমগ্র যুব-সম্প্রদায়ই জেগে উঠেছেন এবং নিশ্চিত জয়লাভের জন্যে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন, এটা ৪ঠা মেকে যুব-দিবস হিসেবে নির্দিষ্ট করার মধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছে। আমরা বিজয়ের পথ বেয়ে অগ্রসর হচ্ছি এবং দেশের সমস্ত জনসাধারণ যদি একত্রে প্রচেষ্টা চালান, তাহলে চীনা বিপ্লব অবশ্যই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের ভেতর দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, চীনা বিপ্লব কিসের বিরুদ্ধে পরিচালিত? বিপ্লবের লক্ষ্যবস্তু কি? সকলেই জানেন, একটি লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদ, অপরটি সামন্তবাদ। বর্তমানে বিপ্লবের লক্ষ্যবস্তু কি? একটি হল জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, এবং অন্যটি চীনা আপোষকামী। বিপ্লব সম্পাদন করার জন্য অবশ্যই জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং চীনা দেশদ্রোহীদের পতন ঘটাতে হবে। বিপ্লবের স্রষ্টা কারা? এর প্রধান শক্তি কি? চীনের সাধারণ মানুষ। বিপ্লবের পরিচালিকাশক্তি হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষকসাধারণ এবং অন্যান্য শ্রেণীর সেই সমস্ত সদস্য যারা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক। এগুলোই হল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শক্তি। কিন্তু এসবের মধ্যে বিপ্লবের মূল শক্তি ও মেরুদণ্ড কারা? তাঁরা হচ্ছেন শ্রমিক এবং কৃষক, যাঁরা দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ। চীনা বিপ্লবের প্রকৃতি কি? কি ধরনের বিপ্লব আজ আমরা সম্পাদন করছি? আজ আমরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন করছি, এবং এর আওতার বাইরে যায় এমন কিছুই আমরা করছি না। সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের ব্যক্তিগত মালিকানা-ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা বর্তমানে আমাদের উচিত নয়, আমাদের যা ধ্বংস করা উচিত তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলতে আমরা এটাই বোঝাই। কিন্তু এর সমাপ্তি ইতিমধ্যেই বুর্জোয়াদের সামর্থ্যের বাইরে চলে গেছে এবং সর্বহারাশ্রেণী ও ব্যাপক জনগণের প্রচেষ্টার ওপরই তা নির্ভরশীল। এ বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য হল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের পতন ঘটানো এবং জনগণের একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। এই ধরনের

জনগণের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অর্থ হল বিপ্লবী তিন-গণনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র। এটা বর্তমানের আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে ভিন্ন হবে এবং ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকেও ভিন্ন হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের কোন স্থান নেই ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের অস্তিত্বকে টিঁকে থাকতে দিতে হবে। চীনে কি পুঁজিপতিদের জন্য সর্বদাই স্থান থাকবে? না ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই থাকবে না? কেবলমাত্র চীনের বেলায়ই নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর জন্যেই এটা সত্য। ভবিষ্যতে কোন দেশের—সে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি অথবা ইতালী যে দেশেই হোক না কেন, পুঁজিপতিদের কোন স্থানই থাকবে না। চীনেও এর ব্যতিক্রম হবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নই এমন একটি দেশ, যে দেশে ইতিপূর্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে সমগ্র বিশ্ব এর দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করবে। চীন ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সমাজতন্ত্রে বিকাশলাভ করবে ; এ বিধানকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করা আমাদের কাজ নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করা, চীনের বর্তমান আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার পরিবর্তন করা ও জনগণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কাজ। সমগ্র দেশের যুবকদের এর জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

তৃতীয়তঃ, চীনা বিপ্লবে অতীতের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা কি? এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যা আমাদের যুবকদের উপলব্ধি করতে হবে। সূক্ষ্ম বিচারে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ডঃ সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক সূচিত হয়েছে এবং ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে। চীনের বিরুদ্ধে বিদেশী পুঁজিবাদী আক্রমণ সম্পর্কে বলা যায়, এটা প্রায় ১০০ বছর ধরে চলছে। বিগত ১০০ বছর ধরে চীনের সংগ্রাম—প্রথমে ব্রিটিশ আক্রমণের বিরুদ্ধে আফিং যুদ্ধ, তারপরে তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের যুদ্ধ, তারপর ১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন, ঈ হো তুয়ান আন্দোলন, ১৯১১ সালের বিপ্লব, ৪ঠা মে'র আন্দোলন, উত্তর অভিযান এবং লালফৌজ কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধ— যদিও এ-সমস্ত সংগ্রাম একে অপর থেকে পৃথক, তবুও তাদের অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শত্রুদের প্রতিরোধ করা অথবা প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন করা। কিন্তু কেবলমাত্র ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের সময় থেকেই একটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট রূপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু হয়েছে। বিগত ৫০ বছরের ডঃ সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক সূচিত বিপ্লবে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই ছিল। আপনারা দেখুন, ১৯১১ সালের বিপ্লব সম্রাটকে তাড়িয়ে দিয়েছে,—এটা কি একটা সাফল্য নয়? তবুও এই অর্থে এটা ব্যর্থ যে, ১৯১১ সালের বিপ্লব সম্রাটকে তাড়িয়ে দিলেও চীন আগের মতোই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের অত্যাচারের কবলে থেকে যায়, আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লবী কর্তব্য অসম্পন্ন থেকে যায়। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের

লক্ষ্য কি ছিল? এরও লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে উৎখাত করা, কিন্তু এটাও বিফল হয়েছিল। চীন আগের মতো সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের শাসনাধীনেই থেকে যায়। উত্তর অভিযানের বিপ্লবও তাই। এই বিপ্লব সফলতাও অর্জন করেছে, আবার ব্যর্থও হয়েছে। কুওমিনতাঙ যে সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যায়[২], তখন থেকেই চীন আবার সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের প্রভুত্বের অধীনে পতিত হয়। লালফৌজ কর্তৃক দশ বছর যুদ্ধ চালনা তারই অনিবার্য ফল। কিন্তু এ দশ বছরের সংগ্রামও কেবলমাত্র চীনের অংশবিশেষে বিপ্লবী কর্তব্য সম্পাদন করেছে, সমগ্র দেশের নয়। আমরা যদি বিগত কয়েক দশকের বিপ্লবের সারসংকলন করি, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, তা অস্থায়ী এবং আংশিক বিজয়লাভ করেছিল, কিন্তু স্থায়ী ও দেশব্যাপী বিজয়লাভ করেনি। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনি 'বিপ্লব এখনো সাফল্যমণ্ডিত হয়নি, কমরেডদের অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।' এখন প্রশ্ন হল ঃ কয়েকদশক ধরে সংগ্রামের পরেও কেন এখনো চীনা বিপ্লব তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায়নি? কারণগুলো কি? আমি মনে করি, তার দুটি কারণ রয়েছে—প্রথমতঃ, শত্রুর শক্তি ছিল খুবই প্রবল ; দ্বিতীয়তঃ আমাদের নিজস্ব শক্তি ছিল খুবই দুর্বল। যেহেতু একপক্ষ সবল এবং অপরপক্ষ দুর্বল ছিল, তাই বিপ্লব সফল হয়নি। শত্রুর শক্তি খুবই প্রবল—এ কথা বলে আমরা এটাই বোঝাই যে, সাম্রাজ্যবাদ (যা প্রধান) ও সামন্তবাদের শক্তি খুবই প্রবল ছিল। আমাদের নিজস্ব শক্তি খুবই দুর্বল ছিল—এ কথা বলে আমরা এই অর্থ করি যে, সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের শক্তি দুর্বল ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্বলতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থতা প্রধানতঃ এই কারণে যে, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনসাধারণ, যাঁরা দেশের শতকরা ৯০ জন, তাঁরা এখনো সমাবিষ্ট হননি। যদি বিগত কয়েক দশকের বিপ্লবের সারসংকলন করি, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, দেশব্যাপী জনসাধারণকে পুরোপুরিভাবে সমাবিষ্ট করা হয়নি এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা সর্বদাই এরকম সমাবেশের বিরোধিতা এবং ক্ষতিসাধন করেছে। সমগ্র দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সমাবিষ্ট ও সংগঠিত করেই কেবল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের উচ্ছেদ করা সম্ভব। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন তাঁর শেষ ঘোষণাপত্রে বলেছেন ঃ

> চীনের জন্যে স্বাধীনতা এবং সমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৪০ বছর ধরে আমি নিজেকে জাতীয় বিপ্লবের কাজে নিয়োজিত রেখেছি। এই ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে গভীরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনসাধারণকে জাগাতে হবে এবং পৃথিবীর সেই সব জাতির সংগে সাধারণ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যারা আমাদেরকে সমকক্ষ বলে গণ্য করে।

আজ দশ বছরেরও বেশি হয়েছে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন মারা গেছেন, যদি এ বছরগুলোকে আমরা সেই ৪০ বছরের সংগে যোগ দিই তাহলে মোট ৫০ বছরেরও

বেশি হয়। এই বছরগুলোতে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা কি? মূলতঃ এটা হল 'জনসাধারণের জাগরণ'। আপনাদের এই পাঠ ভাল করে অধ্যয়ন করা উচিত এবং সমগ্র দেশের যুবকদেরও তাই করা উচিত। তাঁদের অবশ্যই জানতে হবে যে, যাঁরা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন কেবলমাত্র সেই ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সমাবিষ্ট করেই আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে পরাজিত করতে পারি। যদি না আমরা সমগ্র দেশের ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সমাবিষ্ট করি তাহলে জাপানকে পরাজিত করা এবং এক নয়া চীন গড়ে তোলা অসম্ভব হবে।

চতুর্থতঃ, যুব আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা যাক। ২০ বছর আগে আজকের এই দিনে ৪ঠা মে'র আন্দোলন নামে খ্যাত মহান্ ঐতিহাসিক ঘটনা চীনেই সংঘটিত হয়েছিল। ছাত্ররা এতে অংশ নিয়েছিলেন। এটা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের সময় থেকে চীনের যুবকরা কি ভূমিকা গ্রহণ করে আসছেন? একভাবে তাঁরা অগ্রবাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এই কথা গোঁড়া লোকেরা ছাড়া সমগ্র দেশের জনগণই স্বীকার করেন। অগ্রবাহিনীর ভূমিকার অর্থ কি? এর অর্থ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা, অর্থাৎ বিপ্লবী দলের পুরোভাগে দাঁড়ানো। চীনা জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদ-বিরোধী দলগুলোর মধ্যে দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের ও ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত একটি বাহিনী রয়েছে। এটি একটি বৃহৎ আকারের বাহিনী, এবং যাঁরা প্রাণত্যাগ করেছেন তাঁদের সংখ্যা বাদ দিলেও বর্তমানে এদের সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন। কয়েক মিলিয়নের এই বাহিনী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে অন্যতম ফ্রন্টের বাহিনী এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীও বটে। কিন্তু শুধু এই বাহিনীই যথেষ্ট নয়। শুধুমাত্র এর ওপর নির্ভর করেই আমরা শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করতে পারব না। কারণ এটা প্রধান বাহিনী নয়। তাহলে, প্রধান বাহিনী কারা? ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণ। চীনের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের এবং ছাত্রদের অবশ্যই শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের মধ্যে যেতে হবে এবং সমগ্র দেশের জনসংখ্যার যারা শতকরা ৯০ ভাগ সেই শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে সমাবিষ্ট ও সংগঠিত করতে হবে। শ্রমিক ও কৃষকদের এই প্রধান বাহিনী ব্যতীত কেবলমাত্র তরুণ বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের বাহিনীর ওপর নির্ভর করেই আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করতে পারব না। অতএব, দেশব্যাপী তরুণ বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের অবশ্যই ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের সংগে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং তাঁদের সংগে একাত্ম হতে হবে। কেবলমাত্র তাহলেই একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা যেতে পারে। কোটি কোটি লোকের একটি বাহিনী ! কেবলমাত্র এই বিশাল বাহিনীর দ্বারাই শত্রুর দৃঢ় ঘাঁটিগুলো দখল করা যেতে পারে এবং সর্বশেষ দুর্গগুলো বিধ্বস্ত করা যেতে পারে। অতীতের যুব আন্দোলনকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে তার একটি ভুল প্রবণতা

দেখিয়ে দেওয়া উচিত। বিগত কয়েক দশকের যুব আন্দোলনে যুবকদের একাংশ শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের সংগে ঐক্যবদ্ধ হতে অনিচ্ছুক ছিল এবং তারা শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। এটা ছিল যুব আন্দোলনের জোয়ারে একটি প্রতিকূল স্রোত। তারা সমগ্র দেশের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ নিয়ে গঠিত ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সংগে ঐক্যবদ্ধ হতে অস্বীকার করেছে এবং মূলতঃ তাঁদের বিরোধিতা করেছে ; বস্তুতঃ, তারা বুদ্ধিমানের কাজ করেনি। এটা কি একটা ভাল প্রবণতা? আমি মনে করি, না; কারণ শ্রমিক ও কৃষকদের বিরোধিতা করে তারা প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবেরই বিরোধিতা করছে। সেজন্যেই আমি বলি যে, যুব আন্দোলনের মধ্যে এটা একটা প্রতিকূল স্রোত। ঐরকম যুব আন্দোলন কোন ভাল ফলই আনতে পারে না। কিছুদিন পূর্বে আমি একটি ছোট নিবন্ধ রচনা করেছিলাম, যার মধ্যে আমি লিখেছিলাম ঃ

> বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও অবিপ্লবী বুদ্ধিজীবী বা প্রতিবিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চূড়ান্ত প্রভেদরেখা হল এই যে, তারা শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের সংগে এক হতে ইচ্ছুক কিনা এবং প্রকৃতই তা করে কিনা, তা দেখা।

এখানে আমি একটি মানদণ্ড উপস্থাপিত করেছি, এবং এটিকেই আমি একমাত্র মানদণ্ড বলে মনে করি। একজন যুবক বিপ্লবী কিনা, তা বিচার করতে কি রকম মানদণ্ড প্রয়োগ করা উচিত? কেমন করে পার্থক্য করা যায় ? কেবল একটিমাত্র মানদণ্ড আছে, তা হচ্ছে সে নিজেকে ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সংগে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক কিনা, এবং বাস্তবে তা করছে কিনা। যদি সে এমন করতে ইচ্ছুক থাকে এবং বাস্তবে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগে মিশে যায়, তাহলে সে একজন বিপ্লবী ; অন্যথায়, সে অবিপ্লবী অথবা প্রতিবিপ্লবী। যদি আজ সে নিজেকে শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সংগে মিশিয়ে ফেলে, তাহলে আজই সে বিপ্লবী ; কিন্তু আগামীকাল যদি সে তাঁদের সংগে না মেশে অথবা উল্টোদিকে সাধারণ জনগণকে অত্যাচার করে, তাহলে সে হবে অবিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী। কিছু কিছু যুবক তিন-গণনীতিতে অথবা মার্কসবাদে তাঁদের বিশ্বাসের কথা পঞ্চমুখে বলে থাকেন। কিন্তু এর দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ হয় না। আপনারা দেখুন, হিটলারও কি এ কথা বলত না যে, সে 'সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী'? ২০ বছর পূর্বে এমনকি মুসোলিনীও একজন 'সমাজতন্ত্রী' ছিল ! তাদের 'সমাজতন্ত্র' আসলে কি ছিল? ফ্যাসিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয় ! চেন তু-সিউ কি একদা মার্কসবাদে 'বিশ্বাস' করত না? পরে সে কি করেছিল? সে প্রতিবিপ্লবের পক্ষে চলে গিয়েছিল। চ্যাং কুও-তাও'ও কি মার্কসবাদে 'বিশ্বাস' করত না? সে এখন কোথায়? সে পালিয়ে গেছে এবং নিমজ্জিত হয়েছে। কিছু লোক নিজেদের 'তিন-গণনীতির অনুসরণকারী' বলে এবং এই নীতির প্রবীণ সমর্থক বলেও অভিহিত করে ; কিন্তু তারা কি করেছে? আসলে তাদের জাতীয়তাবাদের নীতির অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদের সংগে যোগসাজস করা ; তাদের গণতন্ত্রের নীতির অর্থ সাধারণ জনগণকে অত্যাচার করা

এবং তাদের জনকল্যাণের নীতির অর্থ যতবেশি সম্ভব সাধারণ জনগণের রক্ত শোষণ করা। তারা হল সেই ধরনের লোক, যারা মুখে তিন-গণনীতির ভক্ত, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাকে অস্বীকার করে। সুতরাং, আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে বিচার করে দেখি, তিন-গণনীতির সে আসল অনুসরণকারী না নকল অনুসরণকারী, সে প্রকৃত মার্কসবাদী না মেকী মার্কসবাদী, তখন আমাদের শুধু খুঁজে দেখা দরকার, ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের সংগে তার সম্পর্ক কি রকমের। এবং এটা বিচার করলেই তার সম্পর্কে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠবে। পার্থক্য করার জন্য এটাই একমাত্র মানদণ্ড, এ ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি আশা করি, সারা দেশের যুবকগণ এই কথা মনে রাখবেন যে, তাঁরা যেন কোনমতেই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে পড়ে না যান ; তাঁরা যেন শ্রমিক ও কৃষকদের তাঁদের বন্ধু বলে পরিষ্কারভাবে বোঝেন এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হন।

পঞ্চমতঃ, বর্তমানের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চীনা বিপ্লবের একটি নতুন পর্যায় এবং একটি সবচেয়ে উদ্দীপ্ত ও সবচেয়ে প্রাণবন্ত নতুন পর্যায়। এই পর্যায়ে যুব সম্প্রদায় গুরুতর দায়িত্ব বহন করেন। কয়েক দশক ধরে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলন কঠোর সংগ্রামের বিবিধ পর্যায়ের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু বর্তমানের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের মতো এটা কোনদিনই এত ব্যাপক ছিল না। যখন আমরা মনে করি যে, বর্তমানের চীনা বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য অতীতের বিপ্লব থেকে ভিন্ন এবং তা ব্যর্থতা থেকেই বিজয়ের দিকে ধাবিত হবে, তখন আমরা এটাই বোঝাই যে, চীনের ব্যাপক জনগণ অগ্রগতি লাভ করেছেন। যুবকদের অগ্রগতি তার একটি স্পষ্ট প্রমাণ। অতএব, এবারকার জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ নিশ্চয়ই সফল হবে, অবশ্যই হবে। সকলেই জানে যে, এই যুদ্ধের মৌলিক নীতি হল জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট— যার উদ্দেশ্য হল জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা আপোষকামীদের পতন ঘটানো, পুরানো চীনকে নয়া চীনে রূপান্তরিত করা এবং সমগ্র জাতিকে আধা ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে মুক্ত করা। বর্তমানে চীনের যুব-আন্দোলনে ঐক্যের অভাব একটা সাংঘাতিক ত্রুটি। আপনাদের একতার জন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালানো উচিত, কারণ একতাই বল। আপনারা অবশ্যই ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন, যাতে করে সমস্ত দেশের যুবকগণ বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে, ঐক্য স্থাপন করতে এবং জাপানকে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করতে পারেন।

ষষ্ঠতঃ, এবং সর্বশেষে, আমি বলতে চাই ইয়েনানের যুব আন্দোলন সম্পর্কে। দেশব্যাপী যুব আন্দোলনের এটাই হল আদর্শ। ইয়েনানের যুব আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশই হচ্ছে সমগ্র দেশের যুব আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশ। কেন? কারণ এটাই ছিল নির্ভুল। আপনারা দেখুন, ইয়েনানের যুবকগণ শুধু যে তাঁদের একতার কাজই করেছেন তা নয়, উপরন্তু ভালভাবেই করেছেন। ইয়েনানের যুবকগণ

সংহতি এবং ঐক্য অর্জন করেছেন। ইয়েনানের তরুণ বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র, তরুণ শ্রমিক ও কৃষক সকলেই ঐক্যবদ্ধ। দেশের সমস্ত স্থান থেকেই, এমনকি সুদূর প্রবাসী চীনা সমাজ থেকেও বিপুল সংখ্যক বিপ্লবী যুবক অধ্যয়ন করতে ইয়েনানে এসেছেন। আজ এই সভায় যোগদানের জন্য আপনাদের অনেকেই হাজার মাইল দূর থেকে এসেছেন। আপনার ডাকনাম চ্যাং বা লি যা-ই হোক না কেন, আপনি পুরুষ বা মহিলা, শ্রমিক বা কৃষক যা-ই হোন না কেন, আপনারা সকলেই এক মতের। সমগ্র দেশের জন্য এটা কি একটা আদর্শরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত নয়? ইয়েনানের যুবকগণ তাঁদের নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়াও তাঁদের নিজেদেরকে শ্রমিক ও কৃষক-সাধারণের সংগে এক করে ফেলেছেন এবং এটাই আপনাদেরকে আরও বেশি করে সমগ্র দেশের জন্য আদর্শ করে তুলেছে। ইয়েনানের যুবকগণ কি করছেন? তাঁরা বিপ্লবের তত্ত্ব শিক্ষা করছেন এবং জাপানকে প্রতিরোধ ও দেশকে রক্ষা করার নীতি ও পন্থা অধ্যয়ন করছেন। তাঁরা উৎপাদনের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছেন এবং হাজার হাজার মু[৩] পতিত জমি আবাদ করেছেন। পতিত জমি আবাদ কিংবা জমি চাষের মতো কাজ কনফুসিয়াসও কখনোই করেননি। তিনি যখন বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন, তখন তাঁর ছাত্রও কম ছিল না। '৭০ জন গুণবান ব্যক্তি এবং তিন সহস্র শিষ্য' কতই-না জাঁকজমকপূর্ণ বিদ্যালয়! কিন্তু ইয়েনানের ছাত্রসংখ্যার তুলনায় তাঁর ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই অল্প। অধিকন্তু তারা উৎপাদন আন্দোলন অপছন্দ করত। যখন একজন ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, কিভাবে জমিতে লাঙ্গল চালাতে হয়, কনফুসিয়াস উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি জানি না, সে বিষয়ে আমি একজন কৃষকের মতো দক্ষ নই।' তার পরই কনফুসিয়াসকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তরিতরকারী কিভাবে উৎপাদন করা হয়, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি জানি না, একজন মালীর মতো সে বিষয়ে আমি দক্ষ নই।' প্রাচীনকালে চীনের যুবকেরা যারা কোন ঋষির অধীনে অধ্যায়ন করত, তার না শিখত কোন বিপ্লবী তত্ত্ব, না অংশগ্রহণ করত শ্রমে। আজকাল সমগ্র দেশের বিশাল অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে বিপ্লবী তত্ত্বের শিক্ষা কম দেওয়া হয়, আর উৎপাদন আন্দোলনের তো কোন বিষয়ই নেই। শুধুমাত্র ইয়েনানের যুবকেরা এবং শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকাগুলোর যুবকেরা মূলতঃ ভিন্ন, জাপানকে প্রতিরোধ করতে এবং দেশকে রক্ষা করতে তাঁরা প্রকৃতই অগ্রবাহিনী। কারণ, তাঁদের রাজনৈতিক দিক্‌নির্দেশ ও কর্মপদ্ধতি নির্ভুল। সে-কারণেই আমি বলি যে, ইয়েনানের যুব আন্দোলন সমগ্র দেশের যুব আন্দোলনের জন্য আদর্শস্বরূপ।

আমাদের আজকের সভা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা সবই বলেছি। আমি আশা করি, আপনারা বিগত পঞ্চাশ বছরের চীনা বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন করবেন, এর ভাল দিককে বিকশিত করবেন ও এর ভুল দিককে

বর্জন করবেন, এর ফলশ্রুতিতে সমগ্র দেশের জনগণের সংগে সমগ্র দেশের যুবকেরা একত্রিত হবেন এবং বিপ্লব ব্যর্থতা থেকে বিজয়ের দিকে মোড় নেবে। যেদিন সমগ্র দেশের যুবকগণ ও সমগ্র দেশের জনগণ উদ্বুদ্ধ হবেন, সংগঠিত হবেন এবং ঐক্যবদ্ধ হবেন সে-দিনই জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটবে। প্রত্যেক যুবককে অবশ্যই এই দায়িত্ব বহন করতে হবে। প্রত্যেক যুবককে অবশ্যই পূর্বের থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে এবং সমগ্র দেশের যুবকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, সমগ্র দেশের জনগণকে সংগঠিত করার জন্য, জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে উল্টে দেবার জন্য এবং পুরানো চীনকে নয়া চীনে রূপান্তরিত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আপনাদের সকলের কাছে এটাই আমি প্রত্যাশা করি।

টীকা

১। সর্বপ্রথমে শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের যুব-সংগঠনের দ্বারা ৪ঠা মেকে চীনা যুব-দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে সময়ে ব্যাপক যুবসাধারণের দেশপ্রেমী উত্তাল জোয়ারের চাপে কুওমিনতাঙও বাধ্য হয়ে এটা স্বীকার করেছিল। কিন্তু পাছে যুবকরা বিপ্লবী হয়ে ওঠে এই ভয়ে কুওমিনতাঙ এই সিদ্ধান্তটিকে খুব বিপজ্জনক বলে মনে করল, তাই পরে তার পরিবর্তে ২৯শে মার্চ তারিখকে (১৯১১ সালের ক্যান্টনের অভ্যুত্থানে শহীদ ও পরে ক্যান্টনের উপকণ্ঠে হুয়াংহুয়াকাং নামক স্থানে সমাধিস্থ বিপ্লবী শহীদদের স্মৃতি দিবস) যুব-দিবস হিসেবে স্থির করল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় ৪ঠা মে যুব-দিবস পালন অব্যাহত থাকে। আর চীন গণ-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় গণ-সরকারের প্রশাসন পরিষদ ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ৪ঠা মেকে চীনা যুব-দিবস হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে।

২। এখানে ১৯২৭ সালের চিয়াং কাই-শেকের দ্বারা শাংহাই ও নানকিংয়ে আর ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের দ্বারা উহানে সংঘটিত প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের কথা বলা হয়েছে।

৩। জমির পরিমাপের একক (চীনে প্রচলিত)। এক মু = প্রায় দশ কাঠা।

আত্মসমর্পণবাদী কার্যকলাপের বিরোধিতা করুন

৩০শে জুন, ১৯৩৯

চীনা জাতি জাপানী আক্রমণের সম্মুখীন হবার পর থেকেই, যুদ্ধ করা হবে কি হবে না এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা থেকে ১৯৩৭-এর ৭ই জুলাই তারিখের লুকৌচিয়াও ঘটনার সময় পর্যন্ত এই প্রশ্নটি গুরুতর বিতর্ক জাগিয়ে তুলেছিল। অবশেষে সমস্ত দেশপ্রেমিক দল ও গ্রুপ এবং সমস্ত দেশপ্রেমিক জনসাধারণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে ঃ 'বাঁচতে হলে যুদ্ধ করতে হবে আর যুদ্ধ না করলে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে।' আর সমস্ত আত্মসমর্পণবাদীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে ঃ 'যুদ্ধ করলেই ধ্বংস হয়ে যেতে হবে, বাঁচতে হলে যুদ্ধ করা চলবে না।' তখনকার মতো লুকৌচিয়াও'র প্রতিরোধের কামান গর্জন বিতর্কের সমাধান করে দিয়েছিল। সেটা এ কথাই ঘোষণা করে দিয়েছিল যে, প্রথম সিদ্ধান্তটাই ছিল সঠিক, আর দ্বিতীয়টা ছিল ভুল। কিন্তু কেন প্রশ্নটির সমাধান সাময়িক হয়েছিল সব সময়ের জন্য নয়? কারণ জাপ-সাম্রাজ্যবাদ আত্মসমর্পণের পথে চীনকে ঠেলে দেবার কর্মনীতি গ্রহণ করতেই আন্তর্জাতিক আত্মসমর্পণবাদীরা[১] একটা আপোষের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল, এবং আমাদের জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যেকার কিছু লোকও দোদুল্যমানতা দেখতে শুরু করল। এখন এই প্রশ্নটিই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, এবং একটু ভিন্ন ভাষায় প্রশ্নটি তোলা হচ্ছে ঃ 'যুদ্ধ, না শান্তি'—এই প্রশ্ন হিসেবে। ফলতঃ, চীনে যাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান ও যারা শান্তি চায়, তাদের মধ্যে একটা মতান্তর দেখা দিয়েছে। তাদের পারস্পরিক অবস্থান কিন্তু একই থেকে গেছে। যাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান, তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ঃ 'যুদ্ধই হচ্ছে বাঁচার পথ, শান্তি মানেই ধ্বংস।' আর শান্তিগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, 'শান্তিই হচ্ছে বাঁচার পথ, যুদ্ধ মানেই ধ্বংস।' প্রথম দলে আছেন সমস্ত দেশপ্রেমিক দল ও ব্যক্তি, এবং তাঁরাই দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। আর পরের দলে, অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারীদের দলে আছে জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যেকার অল্পসংখ্যক সংখ্যালঘিষ্ঠ দোদুল্যমানেরা। ফলে, শান্তিকামীদের মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নিতে হচ্ছে, এবং বিশেষ করে কমিউনিস্ট-বিরোধী অপপ্রচার শুরু করতে হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এরা মনগড়া মিথ্যা সংবাদ, মিথ্যা রিপোর্ট, মিথ্যা দলিল ও মিথ্যা প্রস্তাব বিতরণ করতে শুরু করেছে, যেমন ঃ 'কমিউনিস্ট পার্টি বিভেদমূলক

কার্যকলাপে লিপ্ত', 'অষ্টম রুট ও নয়া চতুর্থ বাহিনী নির্দেশ অমান্য করে যুদ্ধ না করে ঘুরে বেড়াচ্ছে', 'শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তৈরী হয়েছে এবং সীমানা প্রসারিত করে তা এগিয়ে চলেছে', 'কমিউনিস্ট পার্টি ষড়যন্ত্র করছে সরকারকে উৎখাত করার জন্য', এবং এমনকি 'সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছে।' এ সবকিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সত্য ঘটনাসমূহকে আড়াল করে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করে এরা শান্তির পথ প্রশস্ত করতে চাইছে, অর্থাৎ চাইছে আত্মসমর্পণ করতে। এই শান্তিগ্রুপটি আত্মসমর্পণকারীদের এই উপদলটি এইসব কাজ করছে একারণেই যে, যুক্তফ্রন্টের উদ্যোক্তা ও উদগাতা কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ না করলে তারা কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতায় ভাঙ্গন ধরাতে পারছে না, জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টে বিভেদ আনতে পারছে না, এবং জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করাতে পারছে না। দ্বিতীয়তঃ, এই গ্রুপটির আশা যে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদ কিছু সুবিধে দেবে। তারা বিশ্বাস করে যে, জাপান খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সে তার মূল কৌশলের পরিবর্তন করে মধ্য, দক্ষিণ ও এমনকি, উত্তর চীন থেকেও নিজেই সরে আসবে, এবং সেই কারণে চীন আর বিশেষ যুদ্ধ না চালিয়েও বিজয় অর্জন করতে পারবে। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক চাপের ওপর তারা আস্থা স্থাপন করেছে। এই শান্তিগ্রুপের বহু লোক আশা করছে যে, জাপান যাতে কিছু সুবিধে দেবার কথা ঘোষণা করে এবং শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি হয় তার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলি শুধুমাত্র জাপানের ওপরেই চাপ দেবে না, উপরন্তু চীন সরকারের ওপরেও চাপ দেবে, যাতে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়াসী গ্রুপটিকে বলতে পারে ঃ 'দেখ ! বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আমাদের শান্তির পথই গ্রহণ করতে হবে!' এবং 'একটা আন্তর্জাতিক প্রশান্ত মহাসাগরীর সম্মেলন[২] চীনাদের পক্ষে সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। এটা অবশ্যই—আর একটা মিউনিক[৩] হবে না, হবে চীনের নবীন শক্তিতে বলীয়ান হয়েওঠার পদক্ষেপ!' এই হচ্ছে শান্তিপ্রয়াসী গ্রুপটির, অর্থাৎ চীনা আত্মসমর্পণকারীদের বক্তব্য, রণকৌশল ও পরিকল্পনা। এই নাটকটি ওয়াং চিং-ওয়েই নিজেই যে শুধু মঞ্চস্থ করছে তা নয়, সব থেকে আশঙ্কার কথা হচ্ছে এই যে, জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের আড়ালে থেকে তার মতন অনেকেই ওয়াঙের সংগে সহযোগিতা করেছে, একই মঞ্চে বা দ্বৈতসঙ্গীতে[৪] কণ্ঠ মেলাচ্ছে, তাদের কেউ কেউ নামছে সাদা রং গায়ে-মুখে মেখে দুর্জনের ভূমিকায়, আর কেউ কেউ নামছে লাল রং মেখে বীরের ভূমিকায়।

আমরা কমিউনিস্টরা খোলাখুলিই ঘোষণা করছি যে, আমরা সবসময়েই যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী, এবং যারা শান্তির প্রয়াসী আমরা তাদের ঘোরতর বিরোধী। আমাদের একটিমাত্র বাসনাই আছে এবং তা হচ্ছে এই যে, অন্য সমস্ত দেশপ্রেমিক পার্টি ও ব্যক্তিদের সংগে আমাদের ঐক্যকে শক্তিশালী করে তোলা,

জাতীয় যুক্তফ্রণ্টকে আরও শক্তিশালী করে তোলা, কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতাটিকে আরও দৃঢ় করে তোলা, তিন গণনীতি কার্যকরী করা, শেষপর্যন্ত প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, ইয়ালু নদী পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে গিয়ে আমাদের সমস্ত অধিকৃত অঞ্চলকে পুনরুদ্ধার করা। প্রকাশ্য ও ছদ্মবেশী সমস্ত ওয়াং চিং-ওয়েইদেরই আমরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নিন্দা করছি—যারা কমিউনিস্ট-বিরোধী আবহাওয়া সৃষ্টি করছে, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে 'সংঘর্ষ'[৬] বাঁধাচ্ছে, এমন কি এই দুই পার্টির মধ্যে আবার একটা গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেবার পর্যন্ত চেষ্টা করছে। এদের উদ্দেশ্যে আমরা বলছি ঃ তোমাদের বিভেদ সৃষ্টির পরিকল্পনা মূলতঃ আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তোমাদের এই বিভেদ সৃষ্টির ও আত্মসমর্পণের কৌশলটি যে তোমাদের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি স্বার্থের প্রয়োজনে সমস্ত জাতির স্বার্থকে বিক্রি করে দেবার সাধারণ পরিকল্পনা, তা অত্যন্ত নগ্নভাবে উদঘাটিত হয়ে গেছে। জনসাধারণ অন্ধ নয়, তোমাদের এই ষড়যন্ত্র তারা ধরে ফেলবে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনটি প্রাচ্যের মিউনিক হবে না বলে তোমরা যে বক্তব্য ছেড়েছ, তা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। তথাকথিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনটি যে প্রাচ্যের মিউনিক হতে যাচ্ছে, এবং তা যে চীনদেশকে আর একটা চেকোশ্লোভাকিয়ায় পরিণত করার প্রস্তুতি-পর্ব মাত্র সে—বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। জাপ-সাম্রাজ্যবাদ যে আবার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে এবং তারা সুবিধে ঘোষণা করতে পারে—এই ভিত্তিহীন দাবিরও দৃঢ় বিরোধিতা আমরা করছি। সমগ্র চীনকে পরাধীন করার মূল পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন জাপ-সাম্রাজ্যবাদ কখনই করবে না)। উহাদের পতনের পর জাপানের মধু-মাখা কথাবার্তা—যেমন, 'আলাপ-আলোচনার' সময় জাতীয় সরকারকে বিরোধী দল হিসেবে গ্রহণ না করার'[৭] পূর্বনীতিটি এখন পরিত্যক্ত হবে এবং তার পরিবর্তে তাকে স্বীকার করে নেওয়া হবে, কিংবা কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তে মধ্য ও দক্ষিণ চীন থেকে জাপান তার সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেবে—এসব হচ্ছে বঁড়শিতে মাছ ধরার একটা ধূর্ত টোপ মাত্র, সে-টোপটি যে গিলবে তাকে ভালভাবে ভোজ্য দ্রব্যে পরিণত হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে থাকতে হবে। আত্মসমর্পণের আন্তর্জাতিক প্রবক্তারা একই ধূর্ত কায়দায় চীনকে আত্মসমর্পণের গাড্ডায় ঠেলে দেবার চেষ্টা করছে। চীনে জাপানী আক্রমণ তারা সমর্থন করেছে, 'পাহাড়ের চূড়ায় বসে বাঘের লড়াই দেখতে দেখতে' তারা সুযোগের অন্বেষণ করছে, যাতে তথাকথিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনের নামে একটা কিছু মঞ্জুর করে অন্যের কাঁধে ভর করে নিজেদের কোলে মাছ টানা যায়। এইজাতীয় ষড়যন্ত্রের ওপর যারাই আস্থা স্থাপন করবে, তারাই একইভাবে প্রতারিত হবে।

এককালে প্রশ্নটি ছিল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হবে কি হবে না, এখন প্রশ্নটি হয়ে

দাঁড়িয়েছে যুদ্ধ চালানো হবে, না শান্তি স্থাপন করা হবে। তবে প্রশ্নটি কিন্তু মূলতঃ সেই একই থেকে গেছে, এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন হিসেবেই থেকে গেছে। বিগত ছ'মাস ধরে জাপান যখন তার আত্মসমর্পণের দাবির কাছে মাথা নোয়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছে, যখন চলেছে আত্মসমর্পণের আন্তর্জাতিক প্রবক্তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, এবং সর্বোপরি, আমাদের জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের ভেতরকার কিছু কিছু ব্যক্তি যখন খুব দোদুল্যমান হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে শান্তি ও যুদ্ধের প্রশ্নটিকে নিয়ে চিৎকার উঠেছে তীব্রভাবে এবং এসবের ফলে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আত্মসমর্পণের বিষয়টি প্রধান বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিদের পক্ষে প্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রস্তুতি হিসেবে কমিউনিজ্‌মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, অর্থাৎ কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা ভেঙে দেওয়ার এবং জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের ঐক্য ভেঙে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সব দেশপ্রেমিক পার্টিগুলো ও ব্যক্তিদের অত্যন্ত সজাগ লক্ষ্য রাখতে হবে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিত্বের কার্যকলাপের ওপর, তাঁদের নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে বর্তমান পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি, যেমন আত্মসমর্পণ হচ্ছে প্রধান বিপদ এবং আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি-পর্বের ধাপ হিসেবেই কমিউনিজ্‌মের বিরোধিতা শুরু হয়েছে, এবং এই আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে ও ঐক্য ভাঙার বিরুদ্ধে তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। বিগত দু'বছর ধরে সমগ্র জাতিকে যে বিপুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছে সেই জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন গোষ্ঠীকেই আমাদের এই যুদ্ধে ক্ষতি বা বিশ্বাসঘাতকতা করার কোন সুযোগই দেওয়া চলবে না। সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টে কোন গোষ্ঠীতেই কিছুতেই কখনো বিভেদ বা ভাঙ্গন আনতে দেওয়া চলবে না।

লড়াই চালিয়ে যান, ঐক্য রক্ষায় সচেষ্ট থাকুন, তাহলেই চীন রক্ষা পাবে!

শান্তি স্থাপন করলে বা ভাঙনে সচেষ্ট থাকলে চীন ধ্বংস হয়ে যাবে।

এর কোন্‌টা আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন, কোন্‌টাই-বা গ্রহণ করবেন? আমাদের দেশবাসীকে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

আমরা কমিউনিস্টরা, নিশ্চিতভাবেই যুদ্ধ চালিয়ে যাব, ঐক্য রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকব।

সমস্ত দেশপ্রেমিক পার্টিগুলো ও সমস্ত দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধ করে যাবেন, তাঁরা ঐক্য রক্ষায় সচেষ্ট থাকবেন।

এমনকি আত্মসমর্পণ ও বিভেদের জন্য সচেষ্ট আত্মসমর্পণকারীরা যদি কিছুদিনের জন্য প্রাধান্যও পায়, তবুও তাদের মুখোস কিছুকালের মধ্যেই খুলে যাবে, এবং তারা জনগণ কর্তৃক শাস্তি পাবেই। চীনা জাতির ঐতিহাসিক কর্তব্যই হচ্ছে

ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে মুক্তি অর্জন করা। আত্মসমর্পণকারীরা চাইছে ঠিক এর বিপরীতটি। তারা যতই সুবিধা পাক না কেন, কেউ তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না মনে করে যত উল্লাসই তাদের মধ্যে দেখা যাক না কেন, সমগ্র জনসাধারণের শাস্তি থেকে তাদের রেহাই নেই।

আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে ও বিভেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান—সমস্ত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপের এবং আমাদের দেশপ্রেমিক স্বদেশবাসীদের এটাই হচ্ছে এই মুহূর্তের আশু কর্তব্য।

সমস্ত দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হোন ! ঐক্য ও প্রতিরোধে অবিচল থাকুন। আত্মসমর্পণের ও বিভেদ সৃষ্টির সমস্তরকম ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান !

টীকা

১। 'আন্তর্জাতিক আত্মসমর্পণকারীরা' হচ্ছে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, যারা চীনদেশকে বলি দিয়ে জাপানের সঙ্গে সমঝওতায় আসার ষড়যন্ত্র করছিল।

২। পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনটিকে অভিহিত করা হচ্ছিল দূর প্রাচ্যের মিউনিক বলে, কারণ চীনদেশকে বিকিয়ে দিয়ে জাপানের সঙ্গে সমঝওতায় আসার জন্য এই সমঝওতার পক্ষপাতী চীনের একদল রাজনীতিজ্ঞ ব্রিটিশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে মিলে চেষ্টা করছিল। এই সম্মেলন প্রাচ্যের মিউনিকে পরিণত হবে না—এই আজগুবি যুক্তি চিয়াং কাই-শেকও সমর্থন করেছিল। তার এই যুক্তি কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন।

৩। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান ও ইতালীর সরকারের প্রধানগণ জার্মানির মিউনিক নগরে এক আলোচনায় বসে 'মিউনিক চুক্তি' নামে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার মধ্য দিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়া দেশটিকে জার্মানির কব্জায় ছেড়ে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর জার্মান আক্রমণ ঘটানোর পরিকল্পনা করে। ১৯৩৮-১৯৩৯-এ ঠিক একই পদ্ধতিতে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চীনদেশটিকে বলি দিয়ে জাপানের সঙ্গে একটা সমঝওতায় পৌঁছবার চেষ্টা করে। ১৯৩৯-এর জুনে মাও সে-তুঙ যখন এই প্রবন্ধটি রচনা করেন, তখন জাপান ও ব্রিটেনের মধ্যে এই ষড়যন্ত্রের জন্য আরও একবার আলোচনা-সভা বসেছিল। এই ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাটির নামকরণ হয়েছিল 'প্রাচ্যের মিউনিক' কারণ এর চেহারাটি ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালীর মধ্যে যে মিউনিক ষড়যন্ত্র হয়েছিল ঠিক তারই মতন ।

৪। নামভূমিকায় অবতরণ করেছিল চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়েই। প্রকাশ্য আত্মসমর্পণকারীদের পাণ্ডার ভূমিকায় ছিল ওয়াং চিং-ওয়েই আর চিয়াং ছিল জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যে লুক্কায়িতদের নেতা ।

৫। ১৯৩৯-এর জানুয়ারি মাসে কুওমিনতাঙ পার্টির পঞ্চম কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে চিয়াং কাই-শেক প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে যে, 'শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ-যুদ্ধটি চালিয়ে নিয়ে যাও'—এই রণধ্বনির 'শেষ পর্যন্ত' বলতে 'লুকৌচিয়াও ঘটনার পূর্বের স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনা' বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ এ ব্যাখ্যাটির অর্থ এমনই হল যে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব চীনের বিপুল এলাকা জাপ-অধিকারে ছেড়ে রাখার স্বীকৃতি দেওয়া হল। সুতরাং, চিয়াঙের আত্মসমর্পণের কর্মনীতির মোকাবিলা করার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ বিশেষ জোর দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন যে, 'শেষ পর্যন্ত' কথাটির অর্থ হল 'ইয়ালু নদী পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে গিয়ে আমাদের সমস্ত হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা'।

৬। 'সংঘর্ষ' কথাটি দিয়ে তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙের সমস্তরকম রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্ম বোঝানো হতো, যার সাহায্যে তাঁরা জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে দেওয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিরোধিতা করছিল— যেমন হত্যাকাণ্ড ও অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীর ওপর বৃহদাকারে আক্রমণ চালানো ।

৭। ১৯৩৭-এর ১৩ই ডিসেম্বরে জাপ-হানাদাররা নানকিং অধিকার করার পর জাপ-সরকার ১৯৩৮-এর ১৬ই জানুয়ারিতে এক বিবৃতি দিয়ে বলে যে, জাপান কোনরকম 'চুক্তি-আলোচনায় জাতীয় সরকারকে বিরোধী দল হিসেবে গ্রহণ করবে না এবং এক নয়া সরকারের প্রতিষ্ঠা সে আশা করে।' ১৯৩৮-এর অক্টোবরে ক্যান্টন্ ও উহান জাপ-অধিকারে যাওয়ার পর জাপ-সরকার চিয়াঙের দোদুল্যমানতার সুযোগ গ্রহণ করে তার কর্মনীতির পরিবর্তন করে। ৩রা নভেম্বর জাপ-সরকার আর একটা বিবৃতি দিয়ে বলে, যার অংশবিশেষ হচ্ছে ঃ 'জাতীয় সরকার সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যদি ঐ সরকার তার এতদিন পর্যন্ত অনুসৃত ভ্রান্ত কর্মনীতির পরিবর্তন সাধন করে তার মধ্যে নতুন লোক নিয়ে পুনর্বাসনের কাজ শুরু করে, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে, তবে জাপ-সম্রাট তার সঙ্গে আলোচনা করতে গররাজী হবে না।'

প্রতিক্রিয়াশীলদের শাস্তি দিতেই হবে

১লা আগস্ট, ১৯৩৯

আজ ১লা আগস্ট আমরা এখানে সমবেত হয়েছি একটি স্মরণ-সভায়। কেন আমরা এই স্মরণ-সভা উদ্‌যাপন করছি? কারণ প্রতিক্রিয়াশীলরা আমাদের বিপ্লবী কমরেডদের খুন করেছে, খুন করেছে জাপান-বিরোধী যোদ্ধাদের। এ সময়ে খুন করা উচিত কাদের? চীন বিশ্বাসঘাতক ও জাপানি সাম্রাজ্যবাদীদের। গত দু'বছর ধরে চীন জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সংগে যুদ্ধ করছে, কিন্তু এর ফলাফল এখনো নির্ধারিত হয়নি। বিশ্বাসঘাতকরা এখনো খুবই তৎপর রয়েছে, তাদের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যকই খুন হয়েছে। কিন্তু তবুও আমাদের বিপ্লবী কমরেডরা—যাঁরা সকলেই যুদ্ধ করছিলেন জাপানের বিরুদ্ধে—খুন হয়েছেন। কারা তাঁদের খুন করেছে? সৈন্যরা খুন করেছে। কেন সৈন্যরা জাপান-বিরোধী যোদ্ধাদেরকেই খুন করল? তারা নির্দেশ পালন করেছে, বিশেষ কিছু ব্যক্তি তাদেরকে খুন করার এই নির্দেশ দিয়েছে। কারা তাদেরকে খুন করার এই নির্দেশ দিয়েছে? প্রতিক্রিয়াশীলরা।[১] কমরেডগণ ! জাপ-বিরোধী যোদ্ধাদের খুন করার ইচ্ছেটা কাদের পক্ষে হওয়া স্বাভাবিক? প্রথমতঃ, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে, এবং তারপর ওয়াং চিং-ওয়েইর মতো চীনা দালাল ও বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের স্থান তো জাপানী আক্রমণকারী ও তাদের চীনা দালালদের দ্বারা অধিকৃত সাংহাই, পিপিং, তিয়েনসিন বা নানকিঙের মতো জায়গায় হয়নি, এটা হয়েছে পিংকিয়াঙে, প্রতিরোধ-যুদ্ধের পশ্চাদ্ভাগে, এবং খুন হয়েছেন কমরেড তু চেং-কুন ও কমরেড লো জু-মিঙের মতো নয়া চতুর্থ বাহিনীর পিংকিয়াং গণ-সংযোগ কার্যালয়ের দায়িত্বশীল কমরেডরা। স্পষ্টতঃই এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী ও ওয়াং চিং-ওয়েই'র নির্দেশাধীন একঝাড় চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা। আত্মসমর্পণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব এইসব প্রতিক্রিয়াশীলরা গোপনে গোপনে জাপানী ও ওয়াং চি-ওয়েই'র নির্দেশ কার্যকরী করেছে এবং প্রথমেই তারা যাঁদের খুন করেছে, তাঁরাই হচ্ছেন

পিংকিয়াঙের শহীদের স্মরণে ইয়েনানের জনগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত একটি সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই ভাষণটি দিয়েছিলেন।

জাপানীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে দৃঢ়পণ যোদ্ধা। ঘটনাটিকে মোটেই তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেবার কারণ নেই, এর বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সোচ্চার হয়ে উঠতে হবে, একে নিন্দা করতেই হবে !

সমগ্র জাতি এখন জাপানের প্রতিরোধ করছে এবং প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সমস্ত জনগণের এক মহান ঐক্য গড়ে তুলেছে। কিন্তু এই মহান ঐক্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও আত্মসমর্পণকারীরাও আছে। এরা কি করছে? এরা জাপ-বিরোধী যোদ্ধাদের হত্যা করছে, এবং অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করছে, এবং জাপ-হানাদার ও চীনা দালালদের সংগে যোগসাজসে আত্মসমর্পণের পথ প্রশস্ত করছে।

জাপ-বিরোধী কমরেডদের এই গুরুত্বপূর্ণ খুনের ঘটনার বিরুদ্ধে কেউ কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? ১২ই জুন বেলা ৩ টায় এই খুন করা হয়েছে, আজ ১লা আগস্ট, এই সময়ের মধ্যে কি আমরা কাউকে দেখেছি, যে এগিয়ে এসে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? না। কে সেটা করবে? দেশের আইন অনুযায়ী আইনের প্রশাসকদেরই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। এই ঘটনা শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে ঘটলে আমাদের হাইকোর্ট অনেকদিন আগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করত। পিংকিয়াং হত্যাকাণ্ডের পর দুমাস কেটে গেছে, আইন এবং তার প্রশাসকরা এখনো পর্যন্ত কিছুই করেনি। কি তার কারণ? কারণটি হচ্ছে এই যে, চীন ঐক্যবদ্ধ নয়।[২]

চীনকে ঐক্যবদ্ধ করতেই হবে ; একতা ছাড়া বিজয়লাভ হতে পারে না। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকেই জাপানকে রুখবে, সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে ও প্রগতির জন্য চেষ্টা করবে, এবং যথাযোগ্য পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। কাদের পুরস্কৃত করা হবে? যারা জাপানকে প্রতিরোধ করে, যারা ঐক্যকে উঁচুতে তুলে ধরে, যারা প্রগতিশীল, তাদের। আর শাস্তি কারা পাবে? শত্রুর দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীলরা, যারা প্রতিরোধের, ঐক্যের ও প্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি করে। আমাদের দেশ কি এখন ঐক্যবদ্ধ ? না, তা নয়। পিংকিয়াং ঘটনাই তার প্রমাণ। যে একতা থাকা উচিত ছিল তা যে নেই, এই ঘটনাই তা দেখিয়ে দেয়। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই সমগ্র দেশের ঐক্য চেয়ে আসছি। প্রথমতঃ, প্রতিরোধ-যুদ্ধের ভিত্তিতে ঐক্য। কিন্তু এখন তু চেং-কুন, লো জু-মিং এবং অন্যান্য যেসব কমরেড জাপানকে প্রতিরোধ করেছিলেন, তাঁরা পুরস্কৃত হবার বদলে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন, আর যেসব বদমায়েশরা প্রতিরোধের বিরোধিতা করে আসছিল, যারা আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, তারা কোন শাস্তিই

পায়নি, এটাকে একতা বলে না। এইসব বদমায়েস ও আত্মসমর্পণকামীদের বিরোধিতা আমরা নিশ্চয়ই করব, খুনেদের গ্রেপ্তার করব। দ্বিতীয়তঃ, একতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। যাঁরা একতার পক্ষে তাঁদের পুরস্কৃত হওয়া উচিত এবং যারা এর ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করেছে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত, কিন্তু তু চেং-কুন, লো জু-মিং প্রভৃতি কমরেডরা এই ঐক্য উঁচুতে তুলে ধরার জন্যই শাস্তি পেয়েছেন, নৃশংসভাবে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে, আর যেসব শয়তান এই ঐক্য বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে তারা বেশ বহালতবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একে মোটেই ঐক্যবদ্ধ হওয়া বলে না। তৃতীয়তঃ, প্রগতির ভিত্তিতে একতা। সমগ্র দেশকে এগিয়ে যেতে হবে ; অনগ্রসরদের দ্রুত এগিয়ে গিয়ে অগ্রগামীদের ধরার চেষ্টা করতে হবে, অগ্রগামী যারা তারা অনগ্রসরদের সংগে তাল রাখার জন্য থেমে থাকলে হবে না। পিংকিয়াঙের খুনীরা প্রগতিশীলদের খুন করেছে। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার কমিউনিস্ট ও দেশপ্রেমিকদের খুন করা হয়েছে, পিংকিয়াঙের হত্যাকাণ্ড তার একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ মাত্র। এ যদি চলতে দেওয়া হয়, চীনের পক্ষে তা হবে চরম ক্ষতিকর; যাঁরাই জাপানের প্রতিরোধ করেছেন তাঁরাই খুন হবেন। এই খুনের অর্থটা কী? এর সোজা অর্থ হল এই যে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদী ও ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের হুকুমে চীনা প্রতিক্রিয়াশীলরা আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, এবং সেই কারণে জাপ-বিরোধী যোদ্ধাদের, কমিউনিস্ট ও দেশপ্রেমিকদের খুন করতে শুরু করেছে। এটা যদি বন্ধ না হয়, এই প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে চীনের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডের সংগে সমগ্র দেশের সম্পর্ক জড়িত, এর গুরুত্ব অসীম, এবং আমরা জাতীয় সরকারের কাছে দাবি করছি যে, এই প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে চরম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

কমরেডদের আরও খেয়ালে রাখতে হবে যে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রতি তার বিভেদমূলক কার্যকলাপ জোরদার করেছে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ জাপানকে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে আরও তৎপর হয়েছে[৩], এবং চীনের বিশ্বাসঘাতকরা, গোপনে ও প্রকাশ্যে ওয়াং চিং-ওয়েইরা আরও বেশী সচেষ্ট হয়ে উঠেছে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালাবার জন্য, ঐক্যকে বিঘ্নিত করার জন্য, এবং ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেবার জন্য। এরা চাইছে আমাদের দেশের বৃহদাংশ ছেড়ে দিতে, এরা চাইছে আভ্যন্তরীণ বিভেদ ঘটিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু করতে। এখন এরা 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ বিধি'[৪] নামক গোপন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে কার্যকরী করতে শুরু করেছে। এরা হচ্ছে চরম প্রতিক্রিয়াশীল, এরা জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যকারী, এরা প্রতিরোধ,

একতা ও প্রগতির বিধ্বংসী শক্তি। এই 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টি' কারা? জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা, ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকরা। জাপ-প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক পার্টিকে কিভাবে 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টি' বলা যায়? তবুও কিন্তু আত্মসমর্পণকারী, প্রতিক্রিয়াশীল ও গোঁড়াপন্থীরা যথেচ্ছভাবে জাপ-বিরোধী কর্মীদের মধ্যে কোন্দল ও বিরোধ ঘটানোর কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের কাজ কি সঠিক, না ভুল? এ ধরনের কাজ অত্যন্ত ভুল ! (**সমস্বরে হর্ষধ্বনি।**) নিয়ন্ত্রণের কথা বলতে গেলে, কোন্ ধরনের লোকদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত? করা উচিত জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের, ওয়াং চিং-ওয়েই, প্রতিক্রিয়াশীল ও আত্মসমর্পণকারীদের। (**সমস্বরে হর্ষধ্বনি।**) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সবচেয়ে বিপ্লবী ও সবচেয়ে প্রগতিশীল কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ কেন? এ কাজ চূড়ান্তভাবেই ভুল। আমরা ইয়েনানের লোকেরা এর দৃঢ় বিরোধিতা ও তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছি। (**সমস্বরে হর্ষধ্বনি।**) আমরা 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ বিধি' নামক বিধিটির বিরোধিতা করছি, কারণ এই ধরনের সমস্ত ব্যবস্থা ঐক্য ভাঙার সমস্ত দুষ্কর্মের মূলে আছে। আমরা আজ যে এই জনসভায় জমায়েত হয়েছি, তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরোধ, একতা ও প্রগতি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঐ 'বিদেশী পার্টিসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ বিধিটি' অবশ্যই বাতিল করতে হবে, আত্মসমর্পণকারী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে এবং সমস্ত বিপ্লবী কমরেডদের, সমস্ত কমরেড ও জাপ-প্রতিরোধে ব্যাপৃত জনগণকে নিশ্চয়ই রক্ষা করতে হবে। (**প্রবল হর্ষধ্বনি ও শ্লোগান।**)

টীকা

১। চিয়াং কাই-শেক ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাই হচ্ছে এই প্রতিক্রিয়াশীলবৃন্দ। ১৯৩৯ সালের ১২ই জুন চিয়াং কাই-শেকের গোপন নির্দেশে কুওমিনতাঙের ২৭নম্বর গ্রুপ বাহিনী হুনান প্রদেশের পিংকিয়াঙে নয়া চতুর্থ বাহিনীর গণসংযোগ দপ্তর অবরোধ করার জন্য সৈন্য পাঠায় এবং ঠাণ্ডা মাথায় নয়া চতুর্থ বাহিনীর ষ্টাফ অফিসার কমরেড তু চেং-কুন, অষ্টম রুট বাহিনীর মেজর ও অ্যাডজুট্যান্ট কমরেড লো জু-মিং এবং আরও চারজন কমরেডকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড শুধু জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাতেই নয়, এমনকি কুওমিনতাঙ অঞ্চলে সৎব্যক্তিদের মধ্যেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ সঞ্চার করে।

২। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলরা 'ঐক্যবদ্ধ হবার' আওয়াজ তুলে তাদের কমিউনিস্ট পরিচালিত জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী ও ঘাঁটি অঞ্চল ভেঙে দেবার ঘৃণ্য চক্রান্ত কার্যকরী করেছিল, এবং তার মোকাবিলা করার জন্যই কমরেড মাও সে-তুঙ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। জাপানের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর 'ঐক্যবদ্ধ হবার' শ্লোগানটিকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়ে কুওমিনতাঙরা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলে যে, তারা নাকি সব সময়েই আলাদা থাকতে চায়, তারা নাকি ঐক্যে বিঘ্ন ঘটিয়ে প্রতিরোধের কাজকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকে, কুওমিনতাঙের পঞ্চম কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির পঞ্চম বর্ধিত অধিবেশনে চিয়াং কর্তৃক প্রস্তাবিত 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ বিধি' গৃহীত হবার পর থেকে এই প্রতিক্রিয়াশীল হট্টগোল আরও বাড়তে থাকে। কমরেড মাও সে-তুঙ প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙের হাত থেকে 'ঐক্যবদ্ধ হও' এই শ্লোগানটি ছিনিয়ে নিয়ে এটিকে জাতি ও জনগণের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙের বিভেদপন্থী কার্যাবলীর একটি বিপ্লবী রণধ্বনিতে রূপান্তরিত করেন।

৩। ১৯৩৮-এর অক্টোবর উহানের পতনের পর জাপানের প্রধান কর্ম-নীতিই হয় রাজনৈতিক উপায়ে কুওমিনতাঙকে আত্মসমর্পণে প্রলুব্ধ করা। ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদও বারবার চিয়াংকে শান্তি স্থাপনের জন্য সমঝওতা করতে উপদেশ দিয়েছে, এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিন এই ইঙ্গিতও দেন যে, 'দূর প্রাচ্য পুনর্গঠনের' পরিকল্পনায় সে যোগ দেবে। জাপ-আক্রমণকারীরা ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ১৯৩৯-এ তাদের ষড়যন্ত্রের জাল আরও বিস্তার করে। ঐ বছরের এপ্রিল মাসেই চীনে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ক্লাক-কের চিয়াং ও জাপ-আক্রমণকারীদের মধ্যে শান্তি-আলোচনার সূত্রপাত করে দেওয়ার জন্য মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করে। জুলাই মাসে জাপান ও ব্রিটেনের মধ্যে এক চুক্তি হয়, এবং তাতে চীনদেশে জাপান যে 'বাস্তব পরিস্থিতি' সৃষ্টি করেছে ব্রিটিশ সরকার তার স্বীকৃতি দিতে রাজী হয়।

৪। 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ বিধি'—অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশটি দেয়। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সমস্তরকম প্রগতিশীল চিন্তাধারা, বক্তৃতা ও কার্যাবলীর ওপর প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়, যার ফলে সমস্ত রকমের জাপ-বিরোধী গণ-সংগঠনের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। তারা আরও নির্দেশ দেয় যে, যেসব জায়গায় 'কমিউনিস্টরা অত্যন্ত প্রবল' বলে কুওমিনতাঙ মনে করে, সেখানে 'যৌথ দায়িত্ব ও শাস্তির আইনটি' প্রযুক্ত হবে, এবং সাধারণভাবে 'সংবাদ সংগ্রহের জাল', অর্থাৎ প্রতিবিপ্লবী গোয়েন্দা বিভাগের জাল 'পাও-চিয়া' শাসনসংস্থার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। 'পাও' ও 'চিয়া' তখন ছিল কুওমিনতাঙের ফ্যাসিস্ট শাসনের বুনিয়াদী প্রশাসনিক একক। দশটি পরিবার নিয়ে হতো একটি 'চিয়া', এবং দশটি 'চিয়া' নিয়ে একটি 'পাও'।

নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 'নয়া চীন দৈনিক' পত্রিকার সাংবাদিকের সংগে সাক্ষাৎকার

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

সাংবাদিক ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির মধ্যে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তির[১] তাৎপর্য কী ?

মাও সে-তুঙ ঃ সোভিয়েত - জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিটি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক শক্তি এবং সোভিয়েত সরকার কর্তৃক অবিচলভাবে অনুসৃত শান্তি নীতিরই ফলশ্রুতি। চেম্বারলিন-দালাদিয়েরের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ারা একটা সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার যে চক্রান্ত চালাচ্ছিল, এই চুক্তি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে, কমিউনিস্ট-বিরোধী জার্মানি-ইতালী-জাপান গোষ্ঠীর দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের চারিদিকে গড়ে তোলা পরিবেষ্টনীকে ভেঙে দিয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে শান্তিকে জোরদার করে তুলেছে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের অগ্রগতিকে রক্ষা করছে। প্রাচ্যে এই চুক্তি জাপানকে আঘাত হেনে চীনকে সাহায্য করেছে; চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করে তুলে আত্মসমর্পণবাদীদের আঘাত হেনেছে। এবং এ সবকিছুই সমগ্র দুনিয়ায় জনগণকে স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এই হচ্ছে সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির সম্পূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্য।

প্রশ্ন ঃ কিছু লোক এখনো এ কথা বুঝতে পারছে না যে, সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিটা হচ্ছে ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েত আলোচনার ব্যর্থতারই ফলশ্রুতি; তারা বরং এই সোভিয়েত-জার্মান চুক্তিকেই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী বলে ভাবছে। ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েত আলোচনা কেন ব্যর্থ হল, সে সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি ?

উত্তর ঃ ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের আন্তরিকতার অভাবের জন্যই সম্পূর্ণতঃ এই আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া, এবং প্রাথমিকভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা ফ্যাসিস্ট জার্মানি, ইতালী ও জাপানের আগ্রাসনের প্রতি 'হস্তক্ষেপ না করার' প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতি

ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে চলেছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আগ্রাসী যুদ্ধগুলোকে উপেক্ষা করে চলা, এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেদের সুবিধে অর্জন করা। সেই কারণেই আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি প্রকৃত ফ্রন্ট সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচেষ্টা বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ; দূরে দাঁড়িয়ে তারা 'হস্তক্ষেপ না করার' অবস্থান গ্রহণ করে জার্মান, ইতালীর ও জাপ-আক্রমণ উপেক্ষা করছে। যুদ্ধমান পক্ষগুলো যখন লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন এগিয়ে এসে হস্তক্ষেপ করাটাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। এই প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতি অনুসরণ করে তারা জাপানের কাছে অর্ধেক চীন ছেড়ে দিয়েছে, সমস্ত আবিসিনিয়া, স্পেন, অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে ইতালী ও জার্মানির হাতে।[২] তারপর তারা চাইছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বলি দিতে। এই ষড়যন্ত্রটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে সাম্প্রতিক ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েতের আলোচনার মধ্য দিয়ে। ১৫ই এপ্রিল থেকে ২৩শে আগস্ট—চার মাস ধরে এই আলোচনা চলে এবং এই আলোচনাপর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু গোড়া থেকে শেষদিন পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্স সমতা ও পারস্পরিক আবশ্যিকতার নীতি প্রত্যাখ্যান করে এসেছে, তারা দাবি করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ছোট বাল্টিক দেশগুলোর ক্ষেত্রে সেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে তারা রাজী হল না। এভাবে জার্মানিকে আক্রমণ চালানোর সুযোগ করে দেবার জন্য ফাঁক রেখে দেওয়া হল, কিন্তু আক্রমণকারীকে রোখার জন্য পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর চলাচলের পথ করে দেওয়ার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হল ; আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার এই হল কারণ। ইতিমধ্যে জার্মানি এই বলে ইংগিত দিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তার কার্যকলাপ সে বন্ধ রাখবে, তথাকথিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে চুক্তিটি[৩] তারা পরিত্যাগ করবে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা অলঙ্ঘ্য বলে স্বীকৃতি দেবে ; সুতরাং সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হল। 'হস্তক্ষেপ না করার' যে নীতিটি আন্তর্জাতিক, এবং প্রধানতঃ ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করছিল, তা হল 'পাহাড়ের চূড়ায় বসে বাঘের লড়াই দেখার' নীতি, অন্যের স্বার্থহানি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি। চেম্বারলিন মন্ত্রী হয়ে বসার পর থেকে এই কর্মনীতির সূত্রপাত, গতবছরের সেপ্টেম্বরে মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এটি চরমাবস্থায় গিয়ে পৌঁছায়, এবং পরিশেষে এর অবসান ঘটে সাম্প্রতিক ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েত আলোচনায়। এখন থেকে পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাবে ইঙ্গ-ফরাসী ও জার্মান-ইতালীয়—এই দুটি বৃহৎ

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের দিকে। ১৯৩৮-এর অক্টোবরে আমাদের পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ বর্ধিত অধিবেশনে আমি বলেছিলাম 'চেম্বার লিন-অনুসৃত কর্মনীতির নিশ্চিত পরিণতি হচ্ছে "নিজের পায়ে ফেলার জন্যই পাথর তোলা"। পরের ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্য নিয়ে চেম্বারলিন শুরু করেছিল, কিন্তু তার পরিসমাপ্তি ঘটল নিজের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। এটা হচ্ছে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতির পরিচালিকা নিয়মেরই বিকাশের ফল।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান পরিস্থিতির বিকাশ কিভাবে ঘটবে বলে আপনি ভাবছেন?

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক অবস্থা ইতিমধ্যেই এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কিছুদিন ব্যাপী যে একমুখী পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, অর্থাৎ 'হস্তক্ষেপ না করার' দরুণ উদ্ভূত যে পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর একটা গ্রুপ আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছিল আর অন্য গ্রুপ তখন চুপচাপ বসে লক্ষ্য করছিল, সে পরিস্থিতি সুনিশ্চিতভাবেই বিশেষ করে ইউরোপে এক সর্বগ্রাসী যুদ্ধের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

ইউরোপে জার্মান-ইতালীয় ও ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী দুই ব্লকের মধ্যে ঔপনিবেশিক জনগণের ওপর আধিপত্য করা নিয়ে বৃহদাকারের এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে। এই যুদ্ধে বিবাদমান উভয়পক্ষই জনগণকে ধোঁকা দিয়ে তাদের সমর্থন পাবার জন্য তাদের নিজ নিজ অবস্থানকে সঠিক এবং বিপরীতপক্ষের অবস্থানকে বেঠিক বলে ঘোষণা করে তারস্বরে প্রচার চালিয়ে যাবে। বাস্তবে এটা হচ্ছে একটা ভাঁওতা। দুপক্ষেরই উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদী, দুপক্ষই উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার ও প্রভাবাধীন অঞ্চল স্থাপনের জন্য লড়ছে, উভয়েই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে তারা লড়াই করছে পোল্যাণ্ড, বলকান দেশসমূহ এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল নিয়ে। এ যুদ্ধ কোনক্রমেই ন্যায় যুদ্ধ নয়। ন্যায় যুদ্ধ কখনো আগ্রাসী যুদ্ধ হয় না, তা হয় মুক্তিযুদ্ধ। কমিউনিস্টরা কখনই কোন অবস্থাতেই আগ্রাসী যুদ্ধ সমর্থন করবে না। তারা মুক্তির জন্য অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে আগ্রাসী নয় এমন প্রত্যেকটি যুদ্ধই সমর্থন করবে, তারা থাকবে সংগ্রামের সামনের সারিতে। চেম্বারলিন ও দালাদিয়েরের ভীতি প্রদর্শন ও উৎকোচ প্রদানের সামনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংগে সংশ্লিষ্ট সামাজিক-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলো বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কালে যেমন হয়েছিল, ঠিক তেমনি একটা অংশ—ওপরের স্তরের প্রতিক্রিয়াশীল অংশটি—সেই জঘন্য পুরানো পথটিই অনুসরণ করে চলেছে, তারা নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থন জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু

আরেকটি অংশ কমিউনিস্টদের সংগে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণফ্রন্ট তৈরী করবে। চেম্বারলিন ও দালাদিয়ের জার্মানি ও ইতালীর পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে চলেছে, প্রতিনিয়ত তারা আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে, যুদ্ধকালীন সমাবেশের সুযোগ গ্রহণ করে তারা তাদের দেশের রাষ্ট্র-কাঠামোটাকে ফ্যাসিষ্ট কাঠামোয় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটাচ্ছে। সংক্ষেপে, সাম্রাজ্যবাদী দুটি শিবিরই যুদ্ধপ্রস্তুতি চালাচ্ছে তীব্র গতিতে, লক্ষ লক্ষ লোক গণহত্যার আশংকার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এ সবকিছুই জনগণের মধ্যে নিশ্চিতভাবে প্রতিরোধ-আন্দোলন জাগিয়ে তুলবে। জার্মানি কি ইতালী, ব্রিটেন কি ফ্রান্স, ইউরোপের বা বিশ্বের সর্বত্রই, জনগণ যদি সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের কামানের খোরাক হতে না চান, তাহলে তাঁদের জেগে উঠতে হবে, সমস্তরকম সম্ভাব্য উপায়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করতে হবে।

এই দুটি বৃহৎ ব্লক ছাড়াও ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার আরও একটি ব্লক আছে, যাদের নেতৃত্বে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এবং এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশ। নিজেদের স্বার্থেই এই গ্রুপের দেশগুলো এখনই যুদ্ধে নামবে না। নিরপেক্ষতার নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সাময়িকভাবে এই দুই বিবদমান পক্ষের কোনদিকেই যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকবে, যাতে করে ভবিষ্যতে সে মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতৃত্বলাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়ারা যে এখনো গণতন্ত্রের কাঠামোটি এবং তাদের দেশের শান্তিকালীন অর্থনীতি এখন পরিত্যাগ করেনি, তা বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অনুকূলেই কাজ করছে।

সোভিয়েত-জার্মান চুক্তির আঘাতটি চরমভাবে পড়েছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের ওপরে, এবং তারা বৃহত্তর বিপদের ঝুঁকি-সম্বলিত এক ভবিষ্যতের মুখোমুখি গিয়ে পড়েছে। জাপানের অভ্যন্তরে তার পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে দুই উপদলের মধ্যে লড়াই চলছে। জাপ-সমরবাদীরা জার্মানি ও ইতালীর সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করে চীনের ওপর তাদের পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে, তারা চাইছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আক্রমণ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এ অঞ্চল থেকে উৎখাত করতে; অন্যদিকে বুর্জোয়াদের আর একটা অংশ চীনের ওপর লুণ্ঠনে প্রধান জোর দেবার জন্য ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সকে সুবিধে দিতে চাইছে। বর্তমান মুহূর্তে ব্রিটেনের সঙ্গে একটা সমঝওতা করার দিকের ঝোঁকটাই বেশ শক্তিশালী। ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াশীলরা আর্থিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যসহ চীনকে যুক্তভাবে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেবে, এবং তার বদলে তারা চাইবে যাতে জাপান প্রাচ্যখণ্ডে ব্রিটিশ স্বার্থের প্রহরী হিসেবে কাজ করে, চীনা জাতীয় মুক্তি-

আন্দোলনকে অবদমিত করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে আটকে রাখে। সুতরাং, যাই হোক না কেন, চীনদেশ জয় করার জাপানী মূল উদ্দ্যেশ্যের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। চীনে জাপানীরা সামনাসামনি বড় আকারের সামরিক অভিযান চালাবে—এমন সম্ভাবনা হয়তো ততটা নেই, তবে 'চীনাদের অবদমিত করার জন্য চীনাদের ব্যবহার করার'[৪] এবং চীনের ওপর অর্থনৈতিক লুণ্ঠন পরিচালনার জন্য 'যুদ্ধের সাহায্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার'[৫] রাজনৈতিক আক্রমণ সে বাড়িয়ে তুলবে, এবং একই সঙ্গে অধিকৃত অঞ্চলকে 'ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার' অভিযান[৬] চালিয়ে যাবে। তাছাড়া, চীন যাতে আত্মসমর্পণ করে, ব্রিটেনের মধ্যস্থতায় তার চেষ্টাও সে করবে। সুযোগ বুঝে সে পূর্বাঞ্চলের মিউনিক প্রস্তাব দিয়ে বসবে এবং তুলনামূলকভাবে বড় টোপ ফেলে চেষ্টা করবে চীনকে প্রলোভিত করতে বা ভয় দেখাতে, যাতে সে অত্মসমর্পণের চুক্তি করে এবং তার চীনকে দখলে রাখার উদ্দেশ্য সফল হয়। জাপানী শাসকশ্রেণী তার মন্ত্রিসভার মধ্যে যে পরিবর্তনই করুক না কেন, যতদিন না জাপানী জনগণ বিপ্লবী অভ্যুত্থানে জেগে উঠছেন, ততদিন পর্যন্ত এই জাপানী সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য অপরিবর্তিতই থাকবে।

এই ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বাইরেও রয়ে গেছে এক আলোর দুনিয়া, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি সোভিয়েতকে সুযোগ দিয়েছে শান্তি-আন্দোলনে আরও সাহায্য করতে, জাপ-প্রতিরোধে চীনকে আরও সাহায্য দিতে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এই হচ্ছে আমার মূল্যায়ন।

প্রশ্ন ঃ এই পরিস্থিতিতে চীনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি ?

উত্তর ঃ দুটি সম্ভাবনা আছে। একটি হচ্ছে প্রতিরোধ, ঐক্য ও প্রগতির ব্যাপারে অধ্যবসায়—যার অর্থ হচ্ছে জাতীয় পুনর্জাগরণ। অন্যটি হচ্ছে সমঝওতা, বিভক্ত হওয়া ও পশ্চাদপসরণ—যার অর্থ হচ্ছে জাতীয় আত্মসমর্পণ।

নতুন আন্তর্জাতিক অবস্থায় জাপান যত বেশি ক্রমবর্ধমান অসুবিধার মধ্যে পড়তে থাকবে এবং চীন দৃঢ়ভাবে সমঝওতা করতে অস্বীকার করবে, ততই আমাদের পক্ষে রণনীতিগত পশ্চাদপসরণের স্তরটির পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং রণনীতিগত অচলাবস্থার সূত্রপাত হবে। পরবর্তী স্তরটি হবে প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতিপর্বের।

যাই হোক, যুদ্ধের ফ্রণ্টে অচলাবস্থার অর্থই হচ্ছে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অচলাবস্থার বিপরীত ; ফ্রণ্ট লাইন ধরে অচলাবস্থার সূত্রপাত হওয়ার সংগে সংগে শত্রুর পশ্চাতের লাইন ধরে সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠবে। ফলে, প্রধানতঃ উহান পতনের পর অধিকৃত অঞ্চলে শত্রু যে ব্যাপকভাবে 'ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার'

অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে—বিশেষভাবে উত্তর চীনে—তা শুধু তারা চালিয়েই যাবে না, এখন থেকে তারা তা আরও তীব্রতর করবে। তারও ওপর, যেহেতু শত্রুর প্রধান কর্মনীতিই এখন 'চীনাদের অবদমনের জন্য চীনাদের ব্যবহার' করার রাজনৈতিক আক্রমণ পরিচালনা এবং 'যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার' অর্থনৈতিক আক্রমণ পরিচালনা, এবং যেহেতু ব্রিটিশের প্রাচ্য নীতির লক্ষ্যও হচ্ছে দূর প্রাচ্যের মিউনিক তৈরী করা, সেহেতু চীনদেশের বৃহদাঞ্চল বিসর্জন দেওয়ার বিপদ এবং আভ্যন্তরীণ বিভেদের আশঙ্কা প্রভূতভাবে বৃদ্ধি পাবে। শত্রুর তুলনায় চীন এখনো যথেষ্ট দুর্বল, এবং সমগ্র দেশ যদি কঠিন সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ না হয়, তবে প্রতি-আক্রমণে যে শক্তির প্রয়োজন, তা গড়ে তুলতে সে সক্ষম হবে না ।

সুতরাং, এখনো আমাদের দেশের পক্ষে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ পরিচালনায় অধ্যবসায়ী হওয়া, এবং সেখানে কোনরকম শৈথিল্যই চলবে না।

এ সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই যে, চীনের পক্ষে বর্তমান সুযোগ কোনমতেই হারানো চলবে না, কোন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে চলবে না, অত্যন্ত দৃঢ় রাজনৈতিক অবস্থান তাকে গ্রহণ করতেই হবে ।

অন্য কথায় ঃ প্রথমতঃ, জাপ-প্রতিরোধের নীতিতে দৃঢ়প্রত্যয়ে অবিচল থাকা, এবং যে-কোন রকমের সমঝওতার বিরোধিতা করা। প্রত্যক্ষ বা ছদ্মবেশী ওয়াং চিং-ওয়েইদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প আঘাত হানতেই হবে। তোষামোদের মিষ্টি বুলি, তা সে জাপানের কাছ থেকেই আসুক বা ব্রিটেনের কাছ থেকেই আসুক, চীন তা অবশ্যই দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে, এবং প্রাচ্যের মিউনিকে সে কখনই যোগ দেবে না।

দ্বিতীয়তঃ, জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের নীতিতে দৃঢ়প্রত্যয়ে অবিচল থাকা এবং বিভেদের দিকে যে-কোন পদক্ষেপেরই বিরোধিতা করা। প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে এইসব পদক্ষেপের দিকে, তা সেগুলো জাপ-সাম্রাজ্যবাদ, অন্য কোন বিদেশী বা দেশের মধ্যেকার পরাজয়কামীদের যাদের কাছ থেকেই আসুক না কেন। প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকর সমস্তরকম আভ্যন্তরীণ বিরোধ দৃঢ়হস্তে রোধ করতেই হবে।

তৃতীয়তঃ, প্রগতির অবস্থানের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়ে অবিচল থাকতে হবে এবং বিরোধিতা করতে হবে যে-কোন পশ্চাদপসরণের। সামরিক, রাজনৈতিক, আর্থিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বা পার্টি বিষয়ে, কিংবা সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ে বা গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে-কোন তত্ত্ব, সংস্থা বা ব্যবস্থা যদি যুদ্ধের পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবে তা পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের স্বার্থে তার পরিবর্তন

সাধন করতে হবে।

এইসব কাজ যদি করা হয়, তবে চীন তার প্রতি-আক্রমণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শক্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এখন থেকে 'প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুতিকেই' সমগ্র দেশের মুখ্য কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

আজ, একদিকে যেমন ফ্রন্ট-লাইন ধরে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আন্তরিকভাবে রক্ষা করে যেতে হবে এবং শত্রু-লাইনের পেছনকার সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে যেতে হবে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে রাজনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য সংস্কারসাধনও করতে হবে এবং প্রচণ্ড শক্তি গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে উপযুক্ত মুহূর্ত এলেই আমাদের হৃত ভূখণ্ডগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য দেশের সমগ্র শক্তি নিয়ে ব্যাপক এক প্রতি-আক্রমণে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

টীকা

১। ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।

২। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের 'হস্তক্ষেপ না করার' নীতির সাহায্য ও মদৎ পেয়ে ফ্যাসিষ্ট জার্মানি ও ইতালী একের পর এক আগ্রাসন চালিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে থাকে। ১৯৩৫-এর অক্টোবরে ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে এবং ১৯৩৬-এর মে মাসের মধ্যেই সমগ্র দেশ দখল করে নেয়। ১৯৩৬-এর জুলাই মাসে জার্মানি ও ইতালী স্পেনে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে এবং 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট ফ্র্যাংকোর বিদ্রোহকে সমর্থন করে। জার্মান ও ইতালীর হানাদার বাহিনী এবং ফ্র্যাংকোর প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ চালাবার পর ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে পপুলার ফ্রন্ট সরকার পরাজয় বরণ করে। ১৯৩৮-এর মার্চে জার্মান বাহিনী অষ্ট্রিয়া দখল করে এবং অক্টোবর মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল দখল করে।

৩। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে জাপান ও জার্মানির মধ্যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-বিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হয়, এবং ১৯৩৭-এর নভেম্বরে ইতালী এই চুক্তিতে যোগ দেয়।

৪। 'চীনাদের অবদমিত করার জন্য চীনাদের ব্যবহার করা' ছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের চীন আক্রমণের এক শয়তানি হাতিয়ার। দেশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য তারা তাদের দালাল হিসেবে কাজ করার জন্য কিছু চীনাকে জোগাড় করে। যুদ্ধ

শুরু হবার পর তারা ওয়াং চিং-ওয়েই'র নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙের জাপপন্থী চক্রটিকে তো বটেই, এমনকি চিয়াং কাই-শেক চক্রকে কাজে লাগিয়েছিল। এটা তারা করেছিল জাপ-প্রতিরোধে সবচেয়ে দৃঢ় কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার জন্য। ১৯৩৯ সালে তারা চিয়াঙের বাহিনীর ওপর আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ে তার কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্যকলাপে রাজনৈতিক মদৎ দিতে শুরু করে।

৫। 'যুদ্ধের সাহায্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া' হচ্ছে জাপানের আগ্রাসী যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার জন্য তার অধিকৃত চীনা ভূখণ্ডে নির্মম লুণ্ঠন চালাবার জাপানী কর্মনীতি ।

৬। 'ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করা' অভিযানগুলি ছিল জাপানীদের ত্রিবিধ হিংস্র ও বর্বর কর্মনীতির—সব কিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দাও, খুন কর, লুট কর— জাপানী সংজ্ঞা।

কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থা, 'সাও তাং পাও' এবং 'শিন মিন পাও' পত্রিকার তিনজন সাংবাদিকের সংগে সাক্ষাৎকার[১]

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

সাংবাদিক ঃ কয়েকটি বিষয়ে আপনার মতামত জানাতে পারি কি? আজকের **নয়া চীন সংবাদ** -এ আপনার ১লা সেপ্টেম্বরের বিবৃতি আমরা পড়েছি। আমাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর তাতে পাওয়া গেলেও, অন্য কিছু প্রশ্ন সম্পর্কে আপনার বিশদ বক্তব্য জানতে চাই। আমাদের লিখিত প্রশ্নগুলি তিনভাগে বিভক্ত, সেগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে পারলে আমরা খুবই খুশি হব।

মাও সে-তুঙ ঃ আপনাদের তালিকা অনুসারেই আমি বলছি।

আপনারা জানতে চেয়েছেন, প্রতিরোধ-যুদ্ধে কোন অচলাবস্থা এসেছে কিনা। আমার মনে হয়, এক অর্থে তা এসেছে—এই অর্থে যে, নতুন এক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছে, চীন যখন সমঝওতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে, জাপান তখন আরও বেশি বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ থেকে এই সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, শত্রু এখনো বেশ বড় রকমের একটি আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করতে পারে; যেমন, সে পাখোই, চ্যাংশা, বা এমনকি সিয়ানও আক্রমণ করতে পারে। আমরা যখন বলি যে, শত্রুর রণনীতিগত আক্রমণ এবং আমাদের রণনীতিগত পশ্চাদপসরণ এক অর্থে মোটামুটি শেষ হয়ে এসেছে, তখন আমরা আরও আক্রমণ বা পশ্চাদপসরণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিই না। এই নতুন স্তরের বিশেষ কর্তব্য হবে প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা, এবং এর মধ্যেই সব কিছু এসে যাচ্ছে। অর্থাৎ অচলাবস্থার স্তরে ভবিষ্যতের প্রতি-আক্রমণের প্রয়োজনে চীনের যে শক্তির দরকার তা সুসংগঠিত করে তুলতে হবে। প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুতির অর্থ মোটেই এই মুহূর্তে আক্রমণ চালানো নয়, কারণ পরিস্থিতি পরিপক্ক না হলে তা করা যায় না। আমরা প্রতি-আক্রমণের নীতির কথা বলছি, রণকৌশলের নয়। রণকৌশলগত প্রতি-আক্রমণ, যেমন ধরুন দক্ষিণ-পূর্ব শানসি অঞ্চলে শত্রুর 'নির্মূলীকরণের' বিরুদ্ধে আমাদের প্রত্যাঘাত শুধু যে সম্ভব তাই নয়, তা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। কিন্তু সর্বাত্মক রণনীতিগত প্রতি-আক্রমণের সময় এখনো আসেনি, এবং আমরা এখন রয়েছি তার দ্রুত প্রস্তুতিপর্বের স্তরে। এই পর্যায়েও আমাদের

শত্রুর কিছু সম্ভাব্য আক্রমণাত্মক অভিযান রুখতে হবে ।

এই নতুন পর্যায়ের কর্তব্যগুলির তালিকা যদি করা যায় তবে তা হবে শত্রুর পশ্চাতে আমাদের গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, তার 'নির্মূলীকরণের' অভিযান ভেঙে দেওয়া, এবং তার অর্থনৈতিক আক্রমণ বিধ্বস্ত করে দেওয়া ; ফ্রন্টে আমাদের কাজ হবে সামরিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করে তোলা এবং শত্রুর যে-কোন আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রচেষ্টা প্রতিহত করা ; সুবিস্তৃত পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে আমাদের প্রধান কাজ হবে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য দৃঢ়ভাবে কাজ করা। প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতি বিষয়ে এইসবই হবে সুনির্দিষ্ট কাজ ।

আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংস্কারসাধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ বর্তমানে শত্রু প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্যোগ নিচ্ছে, সুতরাং আমাদের বিশেষ কর্তব্য হবে রাজনৈতিক প্রতিরোধ শক্তিশালী করা। অর্থাৎ, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের গণতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করে ফেলতে হবে, কারণ কেবলমাত্র এই পথেই আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে পারব, পারব সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে, প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীনকে প্রধানতঃ আত্মপ্রচেষ্টার ওপরেই নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। আমরা আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে নবজন্মের পক্ষে, এবং নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই পুনরুজ্জীবনের মর্মকথাই হচ্ছে গণতন্ত্র ।

প্রশ্ন ঃ আপনি এইমাত্র বললেন যে, প্রতিরোধ-যুদ্ধে আত্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে বিজয় অর্জনের জন্য গণতন্ত্র অবশ্য প্রয়োজনীয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থা কিভাবে চালু করা সম্ভব হবে ?

উত্তর ঃ ডঃ সান ইয়াৎ-সেন প্রথমে সামরিক শাসন, রাজনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং শাসনতান্ত্রিক সরকারের তিনটি পর্যায়ের কথা ভেবেছিলেন ।[২] মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্রদত্ত তাঁর 'উত্তরে যাওয়ার মুহূর্তে আমার বিবৃতি'তে[৩] তিনি কিন্তু আর তিন পর্যায়ের কথা বলেননি, তার বদলে বলেছিলেন, একটা জাতীয় পরিষদ এই মুহূর্তে আহ্বান করা হোক। এটাই স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বহুদিন আগেই ডঃ সান নিজেই পরিস্থিতির পরিবর্তনের সংগে সংগে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। আজকের সংকটময় পরিস্থিতিতে যখন প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলেছে, তখন জাতীয় পরাজয়ের বিপর্যয় এড়াবার জন্য এবং শত্রুকে দূরীভূত করার জন্য অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের আহ্বান এবং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রচলন অত্যাবশ্যকীয়। অবশ্য এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। কারও কারও অভিমত হচ্ছে যে, সাধারণ লোক অজ্ঞ, সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রচলন সম্ভব নয়। এরা ভুল করেছে। যুদ্ধের মধ্যে সাধারণ লোকের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, এবং সঠিক নীতি ও নেতৃত্ব পেলে গণতান্ত্রিক সরকার নিশ্চিতভাবেই প্রচলিত হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তর চীনে এর প্রচলন

হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি জেলা ও শহরে, 'পাও' ও 'চিয়ার' প্রধানরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। এমনকি কোন কোন 'কাউন্টির ম্যাজিস্ট্রেটরাও এই পদ্ধতিতেই নিযুক্ত হয়েছে, এবং নির্বাচিত হয়েছেন প্রগতিবাদী ব্যক্তিরা ও সম্ভাবনাসম্পন্ন যুবকেরা। বিষয়টিকে জনগণের আলোচনার জন্য ছেড়ে দেওয়াটাই উচিত হবে।

আপনাদের তালিকার দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রশ্নাবলীতে আপনারা 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিগুলোর দমন সম্বন্ধে' অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলে যে সংঘর্ষ চলছে তার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আপনাদের দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। বর্তমানে কিছু কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বটে, তবে মূলতঃ পরিস্থিতিটা কিন্তু অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

প্রশ্ন ঃ এ বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি কি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার অবস্থানটি স্পষ্টভাবে রেখেছে ?

উত্তর ঃ আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ কিভাবে ?

উত্তর ঃ আমাদের পার্টির প্রতিনিধি চৌ এন-লাই গত জুলাই মাসে জেনারালিসিমো চিয়াং কাই-শেককে চিঠি লিখেছেন। তারপর ১লা আগস্ট ইয়েনানের বিভিন্ন জীবিকাশ্রয়ী ব্যক্তিরা মিলে জেনারালিসিমোকে এবং নানকিং সরকারের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে 'বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টিগুলোর দমন সম্বন্ধে' এই নির্দেশটা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য দাবি জানান, যে নির্দেশটা সংগোপনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যেটা বিভিন্ন অঞ্চলে যে 'সংঘর্ষ' চলেছে তার মূলে কাজ করছে।

প্রশ্ন ঃ কেন্দ্রীয় সরকার কি কোন জবাব পাঠিয়েছে ?

উত্তর ঃ না। তবে শোনা যাচ্ছে যে কুওমিনতাঙের কিছু কিছু ব্যক্তি এইসব ব্যবস্থার বিরোধী। সবাই জানেন যে, যে-সামরিক বাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সে-বাহিনী বন্ধু-বাহিনী, 'বিদেশী ভাবাপন্ন' বাহিনী নয়। একইভাবে, যে-কোন পার্টি জাপানের বিরুদ্ধে সাধারণ সমস্বার্থে লড়ছে সে-পার্টি বন্ধু-পার্টি, 'বিদেশী ভাবাপন্ন' পার্টি নয়। প্রতিরোধ-যুদ্ধে বহু পার্টি ও গ্রুপ যোগ দিয়েছে, তাদের শক্তির তারতম্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা সবাই সাধারণ সমস্বার্থেই লড়ছে ; নিশ্চয়ই তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে এবং কোনমতেই একে অপরকে 'দমন করবে না। বিদেশী ভাবাপন্ন পার্টি কাকে বলে? জাপানের পোষা কুকুর ওয়াং চিং-ওয়েইর নেতৃত্বাধীন দলই হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকদের দল, কারণ জাপ-বিরোধী পার্টিগুলোর সমস্বার্থসম্বলিত কোন রাজনীতিই তার নেই ; এই ধরনের পার্টিগুলোকেই দমন করা দরকার। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে রয়েছে সমস্বার্থভিত্তিক রাজনীতি, যেমন জাপ-হানাদারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। সুতরাং আমাদের সামনে সমস্যাটি হচ্ছে জাপান ও ওয়াং চিং-ওয়েইর বিরুদ্ধে বিরোধিতা ও প্রতিরোধ সংগঠিত করার জন্য সর্বশক্তি

নিয়োগের সমস্যা, কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করা বা তার প্রতিরোধ নয়। সঠিক শ্লোগান উদ্ভাবনের এটাই হচ্ছে একমাত্র ভিত্তি। ওয়াং চিং-ওয়েইর তিনটি শ্লোগান হচ্ছে 'চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা কর', 'কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা কর', এবং 'জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর'। ওয়াং চিং-ওয়েই হচ্ছে কুওমিনতাঙের শত্রু, কমিউনিস্ট পার্টির শত্রু এবং সমগ্র জনগণের শত্রু। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙের শত্রু নয়। কাজেই পরস্পরের বিরোধিতা বা 'দমন' নয়, বরং এদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, পরস্পরের সাহায্যে আসতে হবে। আমাদের দিকের শ্লোগান হবে ওয়াং চিং-ওয়েইর শ্লোগানের থেকে আলাদা, ঠিক বিপরীত, তার শ্লোগানের সঙ্গে এগুলিকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। সে যদি বলে ঃ 'চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা কর', তাহলে প্রত্যেকেরই চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন জানানো উচিত ; যদি সে বলে ঃ 'কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা কর', তবে প্রত্যেকেরই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত ; এবং যদি সে বলে ঃ 'জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর' তবে প্রত্যেকেরই জাপ-প্রতিরোধে নামা উচিত। শত্রু যা-কিছুরই বিরোধিতা করবে আমাদের তাকেই সমর্থন করতে হবে, সে যা সমর্থন করবে আমাদের তারই বিরোধিতা করতে হবে। আজকাল বিভিন্ন লেখায় অনেকেই এই উধৃতিটি দিচ্ছেঃ 'বন্ধুদের মনে দুঃখ দিও না, শত্রুদের খুশি কর না।' পূর্বাঞ্চলের হান বংশের লিউ সিউয়ের অধীনস্থ সেনাধ্যক্ষ চু ফু য়ুয়াঙের নগরপাল পেং চুংকে একটা চিঠিতে এ কথাটি লিখেছিলেন। চিঠিতে আছে 'যাই তুমি কর না কেন, তোমায় নিশ্চিত হতে হবে যে, তুমি তোমার বন্ধুদের মনে দুঃখ দিচ্ছ না এবং শত্রুকে খুশি করছ না।' চু ফু'র কথাগুলো একটা বিশেষ রাজনৈতিক নীতির কথা তুলে ধরেছে, যা আমরা কখনই ভুলতে পারি না।

আপনাদের প্রশ্নাবলীতে আপনারা আরও জিজ্ঞেস করেছেন 'সংঘর্ষ' হিসেবে অভিহিত বিষয় সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি কি। আপনাদের খোলাখুলিভাবেই বলছি, জাপ-বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের আমরা বিরোধী, এর দ্বারা আমাদের শক্তির ক্ষয় হয়। কিন্তু কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধে হিংস্রতা চালিয়েই যেতে চায়, আমাদের দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়, তবে কমিউনিস্ট পার্টিকে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতেই হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ঃ আমাদের আক্রমণ না করলে আমরা আক্রমণ করব না ; আমরা যদি আক্রান্ত হই তাহলে আমরা নিশ্চয়ই প্রতি-আক্রমণ করব। আমাদের অবস্থান হচ্ছে পুরোপুরি আত্মরক্ষামূলক ; নীতির বাইরে কোন কমিউনিস্টই যাবে না।

প্রশ্ন ঃ উত্তর চীনের সংঘর্ষ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ?

উত্তর ঃ চ্যাং য়িন-য়ু ও ছিন চি-জুং এরা দুজন হচ্ছে সংঘর্ষ বাধাবার ব্যাপারে ওস্তাদ। হোপেইতে চ্যাং য়িন-য়ু আর শানতুঙে ছিন চি-জুং সোজাসুজি সব

নিয়মকানুন—তা মানবীয়ই হোক বা স্বর্গীয়ই হোক-পদদলিত করছে, বিশ্বাসঘাতকদের থেকে তাদের পার্থক্য করা কঠিন। শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা খুব কমই লড়াই করে, তাদের যত লড়ই অষ্টম রুট বাহিনীর বিরুদ্ধে। আমরা বহু সন্দেহাতীত প্রমাণ জেনারালিসিমো চিয়াংয়ের কাছে পাঠিয়েছি, যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, অষ্টম রুট বাহিনীর ওপর আক্রমণ সম্বন্ধে তার অধঃস্তনদের প্রতি চ্যাং য়িন-য়ু'র নির্দেশাবলী।

প্রশ্ন ঃ নয়া চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে কি কোন সংঘর্ষ হয়েছে ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, হয়েছে বৈকি। পিংকিয়াঙের হত্যাকাণ্ড সমস্ত জাতিকেই হতভম্ব করে দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ বলছে যে, যুক্তফ্রন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনে সীমান্ত অঞ্চলের সরকার ভেঙে দেওয়াই উচিত। এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি ?

উত্তর ঃ সর্বত্রই বিভিন্ন ধরনের আজেবাজে কথা বলা হয়ে থাকে, সীমান্ত অঞ্চলের সরকার ভেঙে দেওয়া সম্বন্ধে কথাটিও ঐ ধরনেরই একটি দৃষ্টান্ত। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল হচ্ছে একটি জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি অঞ্চল এবং সমগ্র দেশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে সব থেকে প্রগতিশীল অঞ্চল। একে ভেঙে দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? তা ছাড়া, জেনারালিসিমো চিয়াং বহুদিন হল এই সীমান্ত অঞ্চলকে মেনে নিয়েছেন এবং জাতীয় সরকারের কার্যকরী সংস্থা যুয়ানও সরকারীভাবে প্রজাতন্ত্রের ২৬তম বছরের (১৯৩৭) শীতকালে তা মেনে নিয়েছে। চীনকে নিশ্চিতভাবেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, কিন্তু তার ভিত্তি হল প্রতিরোধ, একতা ও প্রগতি। এর বিপরীত ভিত্তিতে যদি একতার দাবি হয়, তবে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিভিন্ন ব্যাখ্যা যখন আছে, তখন কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙে ভাঙন ধরার কি কোন সম্ভাবনা আছে ?

উত্তর ঃ শুধু সম্ভাবনার কথাই যদি বলা হয়, তবে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির, বিশেষ করে সমগ্র দেশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে ঐক্য ও ভাঙন— দুয়েরই সম্ভাবনার কথা বলা যায়। আমাদের কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলতে পারি, আমরা বহুদিন ধরেই বলে আসছি যে, সহযোগিতাই কর্মনীতি, আমরা শুধু দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার কথাই বলছি না, সেজন্য আমরা দৃঢ়ভাবে কাজও করছি। শুনেছি, কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম বর্ধিত অধিবেশনে জেনারালিসিমো চিয়াং কাই-শেক ঘোষণা করেছেন, আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান শক্তি প্রয়োগের দ্বারা হওয়া উচিত নয়। শক্তিমান শত্রুর মুখোমুখি হয়ে এবং অতীতের শিক্ষা মনে রেখে চললে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি উভয়কেই বিভেদের পথ পরিত্যাগ করে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার পথ অনুসরণ করতেই হবে।

বিভেদের আশঙ্কা পরিহার করতে হলে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার রাজনৈতিক নিশ্চয়তা চাই, যেমন প্রতিরোধ-যুদ্ধে অবিচলতা এবং গণতান্ত্রিক সরকারের সূচনা চাই। এর দ্বারাই একতা রক্ষা করা সম্ভব হবে, বিভেদ পরিহার করা যাবে ; উভয় পার্টির ও সমগ্র জাতির সাধারণ প্রচেষ্টার ওপর এটা নির্ভর করছে, এবং এটা করতেই হবে। 'প্রতিরোধে অধ্যবসায়ী হও, আত্মসমর্পণের বিরোধিতা কর', 'একতার জন্য লড়াই কর, বিভেদের বিরোধিতা কর', 'প্রগতির পথে অবিচল থাক, পশ্চাদ্‌গামিতার বিরোধিতা কর'—এই তিনটি হচ্ছে আমাদের পার্টির তিনটি মহান রাজনৈতিক শ্লোগান, যা এ বছরের ৭ই জুলাই তারিখে আমরা দিয়েছি। আমাদের মতে এই পথ অনুসরণ করেই চীন পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে পারে, পারে শত্রুকে দূর করে দিতে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

টীকা

১। এই কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থাটি ছিল কুওমিনতাঙের সরকারী সংবাদ সংস্থা। 'সাও তাং পাও' ছিল কুওমিনতাঙ সরকারের সামরিক বিভাগের পত্রিকা। আর 'শিন মিন পাও' ছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের অন্যতম পত্রিকা।

২। ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের 'জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী' দ্রষ্টব্য। চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অনেকদিন ধরেই তাদের নির্মম প্রতিবিপ্লবী একনায়কত্বের পক্ষে যুক্তি খাড়া করার জন্য একে ডঃ সানের পরিকল্পিত 'সামরিক শাসন' বা 'রাজনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ' বলে সাফাই গাইবার চেষ্টা করত।

৩। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন এই বিবৃতিটি দিয়েছিলেন ১৯২৪ সালের ১০ই নভেম্বর, ফেং উ-সিয়াঙের আমন্ত্রণে ক্যান্টন থেকে পিকিং যাবার দুদিন আগে। এই বিবৃতিতে ডাঃ সান্‌ সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরোধিতা আবার ঘোষণা করে দেশের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য একটি জাতীয় পরিষদ আহ্বান করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এবং তাঁর এই বিবৃতি সারা দেশের সমর্থনলাভ করেছিল। ফেং উ-সিয়াৎ প্রথমে চিহ্‌লি যুদ্ধবাজদের চক্রের লোক হলেও, ১৯২৪ সালে দ্বিতীয়বার তাদের সংগে ফেংতিয়ান যুদ্ধবাজদের চক্রের যখন যুদ্ধ বাধে, তখন তিনি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে তাঁর সৈন্যদের পিকিঙে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, এবং তার ফলে চিহ্‌লি যুদ্ধবাজদের আসল নেতা উ পেই-ফুর পতন ঘটে। এরপরই তিনি ডঃ সানকে পিকিঙে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মানবজাতির স্বার্থ অভিন্ন

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাইশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় এগিয়ে আসায় চীন-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতি আমাকে একটা লেখা দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমার নিজস্ব ধারণা অনুসারে আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে কিছু বলতে চাই। কেননা, বর্তমানে চীনের জনগণ সেগুলো নিয়েই আলোচনা করছেন এবং মনে হচ্ছে, কোন সিদ্ধান্তে এখনো পর্যন্ত পৌঁছানো যায়নি। যারা ইউরোপের যুদ্ধ ও চীন—সোভিয়েত সম্পর্ক নিয়ে ভাবছেন, এই সুযোগে তাঁদের বিবেচনার জন্য আমরা মতামত তুলে ধরাটা সম্ভবত সুবিধেজনকই হবে।

কেউ কেউ বলছেন, দুনিয়ায় শান্তি বজায় থাকুক, এটা সোভিয়েত ইউনিয়ন চায় না, কারণ একটা বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেলেই সেটা তার পক্ষে সুবিধেজনক হবে, আর বর্তমান যুদ্ধটাও বাধিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নই—ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি না করে জার্মানির সংগে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। আমার মতে, এ ধারণা ভুল। দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে আসছে, সেটা হচ্ছে শান্তির নীতি, এবং এ নীতি গড়ে উঠেছে তার স্বার্থের সংগে মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। তার নিজের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের প্রয়োজনেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময়েই শান্তি চেয়ে এসেছে, সব সময়েই তার দরকার হয়েছে অন্যান্য দেশের সংগে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ককে জোরদার করার এবং একটি সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধ ঠেকাবার। দুনিয়া জুড়ে শান্তি রক্ষার স্বার্থেই তার আরও দরকার হয়ে পড়েছে ফ্যাসিস্ট দেশগুলির আক্রমণ প্রতিহত করার, তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলির যুদ্ধ-বাজি সীমিত করে রাখার, এবং একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূত্রপাতকে যতদিন সম্ভব বিলম্বিত করে দেবার। দীর্ঘদিন ধরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব শান্তির জন্য প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। যেমন, সে লীগ অব নেশানস-এ [১] যোগ দিয়েছে, ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সংগে পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি[২] সম্পাদন করেছে, এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেছে যাতে ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশ, যারা শান্তিরক্ষায় সচেষ্ট হতে পারে, তাদের সংগে নিরাপত্তা-চুক্তি সম্পাদনের জন্য। জার্মানি ও ইতালী

যখন যুক্তভাবে স্পেনের ওপর আক্রমণ করল এবং যখন ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স লোক-দেখানো 'হস্তক্ষেপ না করার' নীতি গ্রহণ করে আসলে আক্রমণ না দেখার ভান করে চলতে লাগল, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই তখন সেই 'হস্তক্ষেপ না করার' নীতির তীব্র বিরোধিতা করে জার্মানি ও ইতালীর আক্রমণের বিরুদ্ধে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক শক্তিসমূহের প্রতিরোধ-সংগ্রামে সাহায্য প্রেরণ করেছিল। জাপান যখন চীনের ওপর আক্রমণ করল, এবং যখন সেই একই তিন-শক্তি একই ধরনের 'হস্তক্ষেপ না করার' নীতি গ্রহণ করে চলতে থাকল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন শুধুমাত্র চীনের সংগে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনই করেনি, সে চীনকে তার প্রতিরোধ-সংগ্রামে কার্যকরী সাহায্যও প্রেরণ করেছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স যখন হিটলারের আক্রমণ না দেখার ভান করে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে বিসর্জন দিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন তার সর্বক্ষমতা দিয়ে মিউনিক কর্মনীতির প্রকৃত কুৎসিৎ লক্ষ্য উদঘাটন করে দিতে থাকে এবং সেই সংগে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে কিভাবে আক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে সে সম্বন্ধে প্রস্তাব দেয়। এ বছর বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পোল্যাণ্ড যখন বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, এবং এখান থেকেই বিশ্বযুদ্ধ লাগার আশংকা দেখা দিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন চেম্বারলিন ও দালাদিয়েরের আন্তরিকতায় সম্পূর্ণ অভাবের কথা জানা সত্ত্বেও চার মাস ধরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সংগে আলোচনা চালিয়ে গেল, যাতে একটা পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয় এবং যুদ্ধ ঠেকানো যায়। কিন্তু ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অনুসৃত কর্মনীতিই হচ্ছে যুদ্ধ যে হতে যাচ্ছে তা না দেখার ভান করা, যুদ্ধে প্ররোচনা জোগানো, যুদ্ধের বিস্তারসাধন করা এবং এইভাবে বিশ্বের শান্তি ব্যাহত হয়, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায়। তারা সোভিয়েতের সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল করে দিতে থাকে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের সরকারগুলির যুদ্ধ রোখার সত্যিকারের কোন ইচ্ছাই নেই ; বরং তাদের প্রচেষ্টাই হচ্ছে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া। সমতা ও পরস্পর নির্ভরতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তিকে কার্যকরী করার সোভিয়েত প্রস্তাব তারা মেনে না নেওয়ায় এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা যুদ্ধ চায়, শান্তি চায় না। সবাই জানেন যে, আজকের দুনিয়ায় সোভিয়েতকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থই হচ্ছে শান্তি প্রত্যাখ্যান করা। এমনকি ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের সেই বিশেষ প্রতিনিধি লয়েড জর্জের মতো লোকও এ কথা জানেন।[৩] এইরকম পরিস্থিতিতে জার্মানি যখন তার সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার, 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে চুক্তি' পরিত্যাগ করার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা অলঙ্ঘনীয় বলে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব দিল, তখনই কেবল সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হল। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের পরিকল্পনাই ছিল

জার্মানিকে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করানো, যাতে তারা 'পাহাড়ের চূড়ায় বসে বাঘের খেলা দেখতে পারে', সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির পরস্পরের শক্তিক্ষয় হয়ে যাবার পর মঞ্চে নেমে এসে সবকিছু দখলে নিতে পারে। সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি এই চক্রান্তকে চুরমার করে দিয়েছে। এই ষড়যন্ত্রটির দিকে এবং ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ না দেখার ভান, প্ররোচনা দেবার এবং প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার পরিকল্পনার দিকে না তাকিয়ে আমাদের দেশের কিছু কিছু লোক এইসব চক্রান্তের মিষ্টি বুলিতে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। এই ধূর্ত রাজনীতিজ্ঞরা স্পেনের ওপর আক্রমণ, চীনের ওপর আক্রমণ, কিংবা অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর আক্রমণ বন্ধ করার ব্যাপারে একটুও আগ্রহ দেখায়নি, বরং তারা আক্রমণগুলোকে না দেখার ভান করেছে, যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়েছে, এবং বঁড়শী ও চার দুজনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে দুটোকেই ধরার সুযোগের প্রতীক্ষা করার সেই চিরাচরিত জেলের খেলাটাই খেলে গেছে। তারা বুলি দিয়েছে যে, 'হস্তক্ষেপ না করাটাই' নাকি তাদের নীতি ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা যে-কাজটা করেছে তা হল 'পাহাড়ের চূড়ায় বসে বাঘের খেলা দেখা'। পৃথিবীর সর্বত্র বেশ কিছু লোক চেম্বারলিন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মধুমাখা কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়েছে, তাদের হাসির আবরণে ঢাকা খুনীর উদ্দেশ্যটি তারা দেখতে পায়নি, তারা বুঝতে পারেনি যে, এই সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছে তখনই, যখন চেম্বারলিন ও দালাদিয়ের সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শেষমূহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা প্রমাণ করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ ও মানবজাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থ অভিন্ন। এই হচ্ছে প্রথম প্রশ্নটি, যার কথা আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম।

কিছু কিছু লোক বলছে, এখন যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বোধহয় কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করবে—অর্থাৎ সোভিয়েতের লালফৌজ জার্মান সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে যোগ দেবে। এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলেই আমি মনে করি। ইঙ্গ-ফরাসী বা জার্মান যে-কোন পক্ষের বিচারেই হোক না কেন, যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সে-যুদ্ধ অন্যায়ের যুদ্ধ, লুণ্ঠনের যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহকে এবং জনগণকে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবং উভয় আক্রমণকারীদের চরিত্রই উদঘাটিত করে দিতে হবে, কারণ এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুধু ক্ষয়ক্ষতিই বহন করে নিয়ে আসে, বিশ্বের জনগণের জন্য কোনরকম সুবিধে তা নিয়ে আসে না। সামাজিক-গণতন্ত্রী পার্টিগুলোর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থন ও সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার কাজকেও

স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ, যে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাসীন, এবং সেই কারণে যুদ্ধ বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তার আছে ঃ (১) কোন অন্যায়, লুণ্ঠনকারী এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ দেওয়ার বিষয়টিকে সে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং সব আক্রমণকারীদের সম্বন্ধেই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। সুতরাং সোভিয়েত লালফৌজ কখনো নীতি পরিত্যাগ করে দুটি সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের কোন পক্ষের সঙ্গেই হাত মেলাবে না। (২) সোভিয়েত ইউনিয়ন কার্যকরীভাবে লুণ্ঠনবিরোধী মুক্তি যুদ্ধের সমর্থন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তের বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের জনগণের উত্তরাভিযানের যুদ্ধে এবং গত বছর জার্মানি ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্পেনের জনগণকে সাহায্য দিয়েছে ; বিগত দুবছর হল জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীনা জনগণকে সাহায্য দিচ্ছে, বিগত কয়েক মাস হল সাহায্য দিচ্ছে মঙ্গোলিয়ার জনগণকে জাপানের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধে ;এবং নিশ্চিতভাবেই সে ভবিষ্যতে কোন দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সে-দেশের জনগণকে সাহায্য দেবে, নিশ্চিতভাবেই সে সাহায্য দেবে শান্তিরক্ষার পক্ষে পরিচালিত যে-কোন যুদ্ধে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিগত ২২ বছরের ইতিহাসই তার প্রমাণ বহন করছে এবং ভবিষ্যতেও তার আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে। সোভিয়েত-জার্মান বাণিজ্যচুক্তি অনুসারে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েতের ব্যবসাকে কেউ কেউ মনে করছে যুদ্ধে জার্মানির দিকে সোভিয়েতের পদক্ষেপ। এই দৃষ্টিভঙ্গিটিও ভ্রান্ত, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে যুদ্ধে সংগে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে কোনমতেই যুদ্ধে নামা বা সাহায্য প্রদানের সংগে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্পেন-যুদ্ধের সময়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানি এবং ইতালীর সঙ্গে বাণিজ্য করেছে এবং সে-সময়ে কেউই কোথাও এ কথা বলেনি যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানি ও ইতালীকে তাদের স্পেনের ওপর আক্রমণে সাহায্য করেছে ; বরং জনগণ বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যে স্পেনকে প্রতিরোধ-যুদ্ধে সাহায্য করেছে, তার কারণ ছিল এই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষেই স্পেনকে সাহায্য করেছে। আবার ধরুন, বর্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের সময়েও জাপানের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য রয়েছে, কিন্তু কেউই কোথায়ও এ কথা বলছে না যে চীনের ওপর হানাদারীতে জাপানকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন সাহায্য করছে ; বরং জনসাধারণ বলছেন যে, হানদারীর প্রতিরোধে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে সাহায্য করছে, এবং তার কারণটি হল এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষে চীনকেই সাহায্য করছে। বর্তমানে যুদ্ধে লিপ্ত দুই পক্ষেরই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ব্যবসা রয়েছে, কিন্তু একে দুই পক্ষের কাউকেই সাহায্য হিসেবে ভাবা যাবে না, যুদ্ধে সাহায্য দেওয়ার কথা তো

ওঠেই না। যদি যুদ্ধের চরিত্র বদলায়, যদি কোন একটি বা কয়েকটি দেশে কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটে এবং তা সোভিয়েতের ও বিশ্বজনগণের পক্ষে সুযোগ সৃষ্টি করে, তখনই কেবল সোভিয়েতের পক্ষে তাতে সাহায্য করার বা যোগদানের প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্যথায় তা সম্ভব নয়। কম-বেশি সুবিধের চুক্তিতে সোভিয়েত দুই পক্ষের সঙ্গে যে বাণিজ্য করছে, সে-সম্বন্ধে বলা যায় সুবিধের পার্থক্যটি নির্ভরশীল সোভিয়েতের প্রতি বন্ধুত্ব বা শত্রুতার ওপর, এবং তা নির্ভর করছে আক্রমণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। কিন্তু কোন বিশেষ দেশ বা কয়েকটি দেশ যদি সোভিয়েত-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেও, তবুও সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক বন্ধ করে দেবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখবে, বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করবে এবং যুদ্ধ ঘোষণা না করবে। ২৩শে আগস্টের আগে পর্যন্ত জার্মানি যেমন করেছিল। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এ কথা বুঝতে হবে যে, এই ধরনের বাণিজ্য-সম্পর্ক সাহায্য বোঝায় না, যুদ্ধে যোগদান তো নয়ই। এই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্নটি, যা আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম।

পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত ফৌজের প্রবেশে চীনদেশের অনেক বিহ্বল হয়ে পড়েছে।[৪] পোল্যাণ্ডের প্রশ্নটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে, বিচার করতে হবে জার্মানির দিক থেকে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দিক থেকে, পোল্যাণ্ডের সরকারের দিক থেকে, পোল জনগণের দিক থেকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে। পোল জনগণকে লুণ্ঠনের জন্য এবং ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের একটা পার্শ্বদেশ ভেঙে দেবার জন্য জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছে। কিন্তু চরিত্রগতভাবে জার্মানির যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী এবং তা শুধু স্বীকার করে নেওয়া নয়, তার বিরোধিতাও করতে হবে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দিক থেকে, তারা পোল্যাণ্ডকে তাদের লগ্নী পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করেছে, লুণ্ঠনের জন্য নতুন বিশ্ববিভাগে জার্মান-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সামনে বলি হিসেবে তুলে ধরে তাকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের এক পার্শ্বদেশ হিসেবে খাড়া করে দিয়েছে। সুতরাং তাদের যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তাদের তথাকথিত সাহায্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পোল্যাণ্ডের ওপর জার্মান আধিপত্যের পথ তৈরী করে দিয়ে তাকে তুষ্ট করা, এবং এই যুদ্ধেরও বিরোধিতা করতে হবে, তার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পোল সরকারের দিক বিচার করে বলা যায়, এটা একটা ফ্যাসিস্ট সরকার, পোল জমিদার ও বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার, যে সরকার শ্রমিক ও কৃষকদের চরম হিংস্রতার সংগে শোষণ করে এবং পোল গণতন্ত্রীদের ওপর চরম অত্যাচার করে। তা ছাড়া এই সরকারটি হচ্ছে বৃহত্তর পোল্যাণ্ডের উগ্র জাতি-দাম্ভিকতার সরকার, যারা অত্যন্ত জিঘাংসার সংগে পোল নয় এমন সমস্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিসমূহের ওপর নির্যাতন চালায়—যেমন উক্রেনীয়,

বিয়েলোরুশীয়, ইহুদী, জার্মান, লিথুয়ানীয় ও অন্যান্যদের ওপর, যাদের মোট সংখ্যা হবে এক কোটিরও ওপর। এই সরকার নিজেই সাম্রাজ্যবাদী। এই প্রতিক্রিয়াশীল পোল সরকার ইচ্ছে করেই ব্রিটিশ ও ফরাসী লগ্নী পুঁজির যুদ্ধে কামানের খোরাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য পোল জনগণকে পাঠাচ্ছে, ইচ্ছে করেই আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির প্রতিক্রিয়াশীল ফ্রণ্টের একটা অংশ হিসেবে কাজ করছে। বিগত বিশ বছর ধরে পোল সরকার নিরন্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করেছে এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনাকালে সে একগুঁয়েভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছে। তা ছাড়াও, এ সরকার সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য সরকার, যার ১৫ লক্ষ সামরিক বাহিনী থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রথম আঘাতেই মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যেই, সমগ্র দেশটাকে সে ধ্বংসের মধ্যে এনে ফেলেছে, সমস্ত পোল জনগণকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পায়ের নীচে ঠেলে দিয়েছে। এইসব হচ্ছে পোল সরকারের অন্যায় কার্যকলাপের দীর্ঘ তালিকা, এবং এর জন্য কোনরকম সহানুভূতি দেখানোটাও নিতান্তই সময়ের অপচয়। পোল জনগণকে আসলে বলি দেওয়া হয়েছে; জার্মান ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাঁড়াতে হবে, উঠে দাঁড়াতে হবে তাদের নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং স্বতন্ত্র, স্বাধীন গণতান্ত্রিক পোল সরকার গঠন করতে হবে। নিঃসন্দেহে আমাদের সহানুভূতি রয়েছে পোল জনগণের প্রতি। সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে বিচারে দেখা যাচ্ছে যে, তার কাজ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত হয়েছে। দুটো সমস্যার মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছিল। প্রথম সমস্যাটি ছিল ঃ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পায়ের তলায় সমগ্র পোল্যাণ্ডকে ছেড়ে দেওয়া হবে, না পূর্ব পোল্যাণ্ডের সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিসমূহকে তাদের মুক্তি অর্জনে সাহায্য করবে। দ্বিতীয় পথটিই সে গ্রহণ করল। বিয়েলোরুশীয় ও উক্রেনীদের বাসস্থান এই বিরাট অঞ্চল সেই ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দেই জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তির মাধ্যমে সদ্যজাত সোভিয়েত সরকারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, এবং তারপর এই অঞ্চলটিকে খুশিমত ভার্সাই চুক্তি অনুসারে প্রতিক্রিয়াশীল পোল সরকারের আধিপত্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন যা করেছে তা হল তার হৃত অঞ্চল পুনরধিকার মাত্র, অত্যাচারিত বিয়েলোরুশী ও উক্রেনীদের মুক্ত করে এনে জার্মান অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে। গত কয়েকদিনের সংবাদে দেখা যাচ্ছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলো কী প্রভূত সম্বর্ধনাসহ স্বাগত জানাচ্ছে লালফৌজকে, তারা মুক্তিদাতাদের খাদ্য ও পানীয় দিচ্ছে; পশ্চিমাঞ্চল থেকে গিয়ে যে-অঞ্চল জার্মান সৈন্যবাহিনী অধিকার করে বসেছে, কিংবা পশ্চিম জার্মানির অংশ থেকে যে-অঞ্চল ফরাসী সামরিক বাহিনী অধিকার করেছে এ ধরনের কোন রিপোর্টই সেখান থেকে পাওয়া যাবে না। স্পষ্টতঃই

দেখা যাচ্ছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ হচ্ছে লুণ্ঠনহীন মুক্তিযুদ্ধ, যে-যুদ্ধ দুর্বল ও ছোট ছোট জাতিগুলোকে সাহায্য করছে তাদের জনগণের মুক্তি অর্জনে। অন্যদিকে জার্মানি, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে-যুদ্ধ চালাচ্ছে, তা অন্যায় যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও সাম্রাদজ্যবাদী যুদ্ধ, অন্যায় জাতি ও জনগণের ওপর অত্যাচার চালানোর যুদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে দ্বিতীয় সমস্যাটি হল চেম্বারলিনের অনুসৃত সোভিয়েত-বিরোধী পুরানো প্রচেষ্টা। চেম্বারলিনের কর্মনীতি হল প্রথমতঃ পশ্চিমদিক থেকে চাপ সৃষ্টির জন্য জার্মানির ওপর বিরাট অবরোধ তৈরী করা; দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্টের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করে ইতালী, জাপান ও উত্তর ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোকে টেনে নিয়ে এসে জার্মানিকে আলাদা করে ফেলা; এবং তৃতীয়তঃ, জার্মানিকে ঘুষ দেওয়া, পোল্যাণ্ড, এমনকি হাঙ্গেরী ও রুমানিয়াকেও তার অধিকারে ছেড়ে দেওয়া। সংক্ষেপে, চেম্বারলিনের সমস্ত প্রচেষ্টাই হল জার্মানি যাতে সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিটি পরিত্যাগ করে, এবং যাতে তার বন্দুকের মুখ সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঘুরিয়ে ধরে, তারজন্য সর্বপ্রকারের ভীতি প্রদর্শন ও ঘুষ দেওয়া। এই ষড়যন্ত্রটি কিছুদিন হল চলেছে এবং আরও কিছুদিন ধরে চলবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজস্ব অঞ্চল পুনরাধিকার ও সেখানকার দুর্বল ও সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিসমূহের মুক্তি অর্জনে সাহায্য করার জন্য পূর্ব পোল্যাণ্ডে শক্তিমান সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর প্রবেশ প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পূর্বদিকে জার্মান হানাদারীর পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং চেম্বারলিনের ষড়যন্ত্রের মূলে আঘাত হেনেছে। গত কয়েকদিনের সংবাদ বিচার করে দেখা যাচ্ছে যে, সোভিয়েতের এই কর্মনীতি অত্যন্ত সাফল্যলাভ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ এবং পোল কুশাসন-ব্যবস্থায় অত্যাচারিত জনগণসহ মানবজাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন, এ হচ্ছে তারই এক বাস্তব দৃষ্টান্ত। এই হচ্ছে তৃতীয় প্রশ্ন যা আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম।

সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে সমগ্র পরিস্থিতিটিই জাপানের ওপর এক চরম আঘাত হয়ে পড়েছে, আর চীনের কাছে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপুলভাবে সহায়ক। জাপানকে যাঁরা প্রতিরোধ করছেন তাঁদের অবস্থানই এতে শক্তিশালী হয়ে উঠছে, আর যারা আত্মসমর্পণকারী তাদের অবস্থা দুর্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চুক্তিকে চীনা জনগণ সঠিকভাবেই স্বাগত জানিয়েছে। যাই হোক, নোমনহান সন্ধিচুক্তি[৫] স্বাক্ষরের সংগে সংগে ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থাগুলি অত্যন্ত তৎপর হয়ে এই কাহিনীটি ছড়িয়ে দিচ্ছে যে, অবিলম্বে একটি সোভিয়েত-জাপান অনাক্রমণ চুক্তি হতে যাচ্ছে, এবং এই সংবাদের দরুণ কিছু কিছু চীনার মধ্যে এই ভাবনা শুরু হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে আর সাহায্য

দিতে সক্ষম হবে না। তাঁরা যে ভ্রান্ত এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। নোমনহান চুক্তি হচ্ছে ঠিক আগের চ্যাংকুফেং চুক্তির[৬] মতোই ; অর্থাৎ জাপ-সমরবাদীরা পরাজয় মেনে নিয়ে বাধ্য হচ্ছে সোভিয়েত-মঙ্গোলিয়ার অলংঘনীয় সীমান্তের স্বীকৃতি দিতে। সাহায্য প্রদান হ্রাস তো দূরের কথা, এই সন্ধিচুক্তি সোভিয়েতকে চীনের প্রতি আরও বেশি করে সাহায্য প্রদানের সুযোগ দেবে। জাপ-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তির যে কথা উঠেছে, তার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বহুদিন ধরেই এ প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু জাপান তা সংগে সংগেই প্রত্যাখ্যান করে আসছে। এখন অবশ্য জাপ-শাসকশ্রেণীর মধ্যে একটা অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐ ধরনের এক চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন তাতে রাজী হবে কিনা তা নির্ভর করছে এই মূল নীতিটি বিচারের ওপর যে, চুক্তিটি সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ এবং সমগ্র মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থরক্ষা করবে কিনা। বিশেষ করে এটা নির্ভর করছে এই বিষয়টির ওপর যে, চুক্তিটি চীনের মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিনা। এ বছরের ১০ই মার্চ অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে স্তালিন প্রদত্ত রিপোর্ট এবং ৩০শে মার্চ সোভিয়েতের সর্বোচ্চ পরিষদে মলোটভের ভাষণ বিচার করে আমার মনে হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মূল নীতির কোন পরিবর্তন করবে না। ঐ ধরনের কোন চুক্তি যদি সম্পাদিত হয়ও, তবুও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিশ্চয়ই চীনকে তার সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতাই স্বীকার করবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ চীনের জাতীয় মুক্তির স্বার্থের সংগে সবসময়েই সমার্থক এবং কখনই তা বিরোধী হবে না। এ বিষয়ে আমার মনে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই। যেসব লোক সোভিয়েত বিরোধিতায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তারাই নোমনহান সন্ধিচুক্তি ব্যবহার ও জাপ-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি সম্বন্ধে গুজব ছড়িয়ে দিয়ে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো দুই মহান দেশের মধ্যে গোলমাল পাকিয়ে ও অশুভ মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করে সুবিধা করে নেবার প্রচেষ্টায় আছে। এ কাজটিই ব্রিটিশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফরাসী ষড়যন্ত্রকারীরা করছে এবং করছে চীনা আত্মসমর্পণকারীরা। এটা খুবই বিপদাশঙ্কার বিষয়, এবং এই জঘন্য ফন্দিটা সম্পূর্ণভাবে উদঘাটন করে দিতেই হবে। সন্দেহ নেই যে, চীনের পররাষ্ট্রনীতিকে হতে হবে জাপ-আক্রমণের প্রতিরোধের নীতি। এ নীতির অর্থ হচ্ছে প্রাথমিকভাবে আমাদের হতে হবে নিজস্ব প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল এবং বহিঃসাহায্যের কোন সম্ভাবনাকেই প্রত্যাখ্যান না করা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এখন আরম্ভ হয়েছে, তিনটি সূত্র থেকে প্রধানতঃ বিদেশী সাহায্য আসছে ঃ (১) সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে, (২) ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের জনগণের কাছ থেকে, এবং (৩) উপনিবেশ

ও আধা উপনিবেশের অত্যাচারিত জাতিগুলির কাছ থেকে। এই হচ্ছে আমাদের নির্ভরযোগ্য সাহায্যের উৎস। এ ছাড়া যে-কোন বৈদেশিক সাহায্যই আসুক না কেন, তাকে গ্রহণ করতে হবে অতিরিক্ত বা সাময়িক সাহায্য হিসেবেই। চীনকে অবশ্যই এই ধরনের অতিরিক্ত বা সাময়িক বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু তার ওপর নির্ভর করলে চলবে না, সে-সাহায্যকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করাও চলবে না। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুদ্ধমান পক্ষ সম্বন্ধে চীনকে দৃঢ় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে এবং কোন পক্ষেই তাকে যোগ দেওয়া চলবে না। ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষে চীনের যোগ দেওয়া উচিত বলে যে কথা বলা হচ্ছে তা হচ্ছে আত্মসমর্পণবাদীদের যুক্তি, যা প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, চীনা জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির পক্ষেও তা ক্ষতিকর, এবং একে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এই হচ্ছে চতুর্থ প্রশ্ন যা আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম।

আমাদের দেশের জনসাধারণ এই চারটি বিষয় নিয়েই ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করছেন। আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সম্পর্ক নিয়ে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে এই যে আলাপ-আলোচনা তাঁরা করছেন তা খুব ভাল, কারণ তাঁদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জাপ-আক্রমণকে পরাভূত করে বিজয় অর্জন করা। এইসব সমস্যাবলী সম্বন্ধে আমি এখানে কিছু মূল নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করলাম, এবং আমি আশা করি, পাঠকবৃন্দ এ সম্বন্ধে তাঁদের মন্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকবেন না।

টীকা

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দর কষাকষি ও পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সাময়িক বোঝাপড়ার মাধ্যমে দুনিয়াকে নতুন করে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই 'লীগ অব নেশানস' গড়ে তোলে। ১৯৩১ সালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল দখল করে নেয়, এবং আরও অব্যাহতভাবে তার আগ্রাসন চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ সালে সে লীগ অব নেশানস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সেই বছরই জার্মান ফ্যাসিষ্টরাও ক্ষমতায় আসে, এবং পরবর্তীকালে তারাও তাদের আগ্রাসী যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার জন্য লীগ অব নেশানস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ১৯৩৪ সালে, একটি ফ্যাসিস্ট আগ্রাসী যুদ্ধের আশংকা যখন বেড়েই চলেছে, এমন সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগ অব নেশানস-এ যোগ দেয়, এবং এভাবে, দুনিয়াকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার জন্য গঠিত এই সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাটির বিশ্বশান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত একটি সংস্থায় রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯৩৫ সালে আবিসিনিয়ায় আক্রমণ করার পরে

ইতালীও লীগ অব নেশানস থেকে বেরিয়ে আসে ।

২। ১৯৩৫-এ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের মধ্যে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের দুটি চুক্তি সম্পাদিত হয় ।

৩। ব্রিটিশ বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ লয়েড জর্জ ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। তিনি ১৯৩৮-এর নভেম্বরে পার্লামেন্টে বলেন যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালী চুক্তিবদ্ধ হলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তিতে যোগ না দিলে শান্তি কখনই আসবে না ।

৪। ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বরে জার্মানরা পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে এবং বেশির ভাগ অঞ্চলই অধিকার করে নেয়। ১৭ই তারিখে পোল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার দেশের বাইরে পালিয়ে যায়। সেইদিনই সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব পোল্যাণ্ডে তার বাহিনী প্রেরণ করে তার পূর্বহৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে, অত্যাচারিত ইউক্রেনী ও বিয়েলোরুশীয় জনগণকে মুক্ত করে এবং জার্মান ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর পূর্বপ্রান্তের অভিযান রুদ্ধ করে দেয় ।

৫। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে নোমনহান সন্ধিচুক্তি মস্কোয় স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৩৯-এর মে মাসে জাপানী ও পুতুল 'মাঞ্চুকুয়ো' বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের ওপর আক্রমণ করে মঙ্গোলিয়া ও তথাকথিত 'মাঞ্চুকুয়োর' সীমান্তে অবস্থিত নোমনহানে, এবং সেই যুদ্ধে সোভিয়েত ও মঙ্গোলিয়ার বাহিনী হানাদারদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে দেয়। জাপানীরা তখন শান্তি প্রার্থনা করে। সন্ধিচুক্তিতে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধা বন্ধ করা হয় এবং মঙ্গোলিয়া গণতন্ত্র ও 'মাঞ্চুকুয়োর' সীমানায় যেখানে সংঘর্ষ হয়েছিল সেখানে সীমানা নির্ধারণ করার জন্য দুপক্ষ থেকে দুজন দুজন করে চারজনের একটা 'কমিশন' তৈরী করা হয়।

৬। ১৯৩৮-এর ১১ই আগস্ট তারিখে মস্কোতে 'চ্যাংকুফেং চুক্তি' সম্পাদিত হয়। ১৯৩৮-এর জুলাইয়ের শেষদিকে ও আগস্টের প্রথমদিকে জাপান, চীন, কোরিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানায় অবস্থিত চ্যাংকুফেং জেলায় সোভিয়েত বাহিনীকে নানাধরনের উস্কানি দিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সমুচিত জবাবও পায়। জাপানীরা শান্তি প্রার্থনা করে। সন্ধিচুক্তিতে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ বিরতি স্বাক্ষরিত হয় এবং সোভিয়েত পক্ষ থেকে দুজন ও জাপানী-'মাঞ্চুকুয়ো' থেকে দুজন নিয়ে চারজনের এক 'কমিশন' তৈরী করা হয় সীমানা বিষয়ে অনুসন্ধান করে ব্যাপারটার পূর্ণ সমাধান করে ফেলার জন্য।

'দি কমিউনিস্ট' পত্রিকা প্রকাশের পটভূমি

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৯

কেন্দ্রীয় কমিটি দীর্ঘদিন ধরে একটি আভ্যন্তরীণ পার্টি-পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করে আসছিল। অবশেষে এখন এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হল। এরকম একটি পত্রিকা দরকার একটি বলশেভিক ধরনের চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য, যে-পার্টি ব্যাপ্তির দিক দিয়ে হবে জাতীয় এবং ব্যাপক গণ-চরিত্রের অধিকারী ; মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে যে-পার্টি হবে পুরোপুরি সুসংবদ্ধ। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে সুস্পষ্ট, যে পরিস্থিতির রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ একদিকে, জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের অভ্যন্তরে আত্মসমর্পণ, ভাঙন ও পিছু হঠার বিপদ নিয়তই বেড়ে চলেছে, আবার অন্যদিকে, আমাদের পার্টি তার সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং একটি বৃহত্তর জাতীয় পার্টিতে পরিণত হয়েছে। পার্টির কর্তব্য হচ্ছে আত্মসমর্পণ, ভাঙন ও পিছু হঠার বিপদকে কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে জনগণকে সমবেত করা এবং সকল সম্ভাব্য ঘটনাবলীর জন্য তাঁদেরকে প্রস্তুত করে রাখা, যাতে সেরকম কোন ঘটনা আদৌ ঘটে গেলে পার্টি এবং বিপ্লবকে কোন অপ্রত্যাশিত ক্ষতি ভোগ করতে না হয়। এরকম সময়ে একটি আভ্যন্তরীণ পার্টি-পত্রিকা বাস্তবিকই অত্যন্ত জরুরী।

এই আভ্যন্তরীণ পার্টি-পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে **দি কমিউনিস্ট**। এর উদ্দেশ্য কি? এতে কি কি বিষয় থাকবে? অন্যান্য পার্টি-প্রকাশনা থেকে এটা কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ভিন্ন?

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বলশেভিক ধরনের চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করা, যা ব্যাপ্তির দিক দিয়ে হবে জাতীয়, যার থাকবে ব্যাপক গণ-চরিত্র, আর মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে যা হবে পুরোপুরি সুসংবদ্ধ। চীনা বিপ্লবের বিজয় অর্জনের জন্যে এ ধরনের একটি পার্টি গড়ে তোলাই হচ্ছে জরুরী, আর এরজন্য মোটামুটিভাবে বিষয়গত ও বাস্তব শর্তসমূহ বিদ্যমান রয়েছে; বাস্তবিকই এই মহান দায়িত্বপূর্ণ কাজ এখন অগ্রগতির পথেই এগিয়ে চলেছে। এই মহান কর্তব্য সম্পন্ন করার কাজে

সহায়তা করার জন্য একটি স্বতন্ত্র পার্টি-সাময়িকী প্রয়োজনীয়, কেননা সাধারণ পার্টি-প্রকাশনার পক্ষে এই কর্তব্য সম্পন্ন করা হল সামর্থ্যের বাইরে, আর সেজন্যেই এখন **দি কমিউনিস্ট** পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে।

নির্দিষ্ট পরিমাণে আমাদের পার্টি আগে থেকেই ব্যাপ্তির দিক দিয়ে জাতীয় এবং ব্যাপক গণ-চরিত্রের অধিকারী। আর তার নেতৃত্বের কেন্দ্র, তার সভ্যদের একটি অংশ এবং সাধারণ লাইন ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্পর্কে বলতে গেলে আগে থেকেই এটা হল মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে সুসংহত একটি বলশেভিক ধরনের পার্টি।

তাহলে আমরা নতুন একটা কতর্ব্য সামনে রাখছি কেন?

এর কারণ হচ্ছে আমাদের এখন বহুসংখ্যক নতুন পার্টি-শাখা রয়েছে, এসব শাখার রয়েছে বিপুলসংখ্যক নতুন সদস্য, কিন্তু এখনো এগুলোকে ব্যাপক গণ-চরিত্রের অধিকারী, কিংবা মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে সুসংহত, অথবা বলশেভিক ধরনে গঠিত বলে গণ্য করা যায় না। একই সময়ে, পুরানো পার্টি-সভ্যদের রাজনৈতিক মান উন্নত করা এবং পুরানো শাখাগুলোর বলশেভিকীকরণের কাজে আরও অগ্রগতি সাধন করা ও তদেরকে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে সুসংহত করার সমস্যাও রয়েছে। বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের আমলে যে অবস্থা ছিল, তা থেকে বর্তমানে পার্টি যে অবস্থায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে এবং যেসব দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যস্ত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন; অবস্থা এখন আরও বেশি জটিল এবং দায়িত্ব আরও বেশি কঠিন।

বর্তমান আমল হচ্ছে জাতীয় যুক্তফ্রন্টের আমল, আমরা বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছি। এই আমল হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধের আমল, আমাদের পার্টির সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে রণাঙ্গনে, বন্ধুভাবাপন্ন বাহিনীগুলোর সাথে সমন্বয়সাধন করে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে এক নির্মম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই আমল হচ্ছে এমন একটি আমল, যখন আমাদের পার্টি একটি বৃহত্তর জাতীয় পার্টিতে পরিণত হয়েছে, আর সেজন্য আগে পার্টি যেরকম ছিল বর্তমানে তা আর সেরকম নেই। যদি এইসব উপাদানকে আমরা একসাথে বিবেচনা, না করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব না কীরকম গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আমরা সম্পন্ন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি—যে কর্তব্য হল 'এটি বলশেভিক ধরনের চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা, এমন এক পার্টি যা হবে ব্যাপ্তির দিক দিয়ে জাতীয় এবং ব্যাপক গণ-চরিত্রের অধিকারী এবং মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিকে দিয়ে যে পার্টি হবে পুরোপুরি সুসংবদ্ধ।'

এই জাতীয় একটা পার্টিই আমরা গড়ে তুলতে চাই, কিন্তু এই কাজে আমরা কিভাবে অগ্রসর হব? আমাদের পার্টি এবং তার আঠারো বছরের সংগ্রামের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা না করে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।

১৯২১ সালে আমাদের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের পর আজ পুরো আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে। এই আঠারো বছরে আমাদের পার্টি বহুসংখ্যক বড় বড় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসেছে। আর এইসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টির সদস্যবৃন্দ, তার কর্মী এবং সংগঠনগুলোর সবগুলোই নিজেদের পোড় খাইয়ে তুলেছে। বিপ্লবের ক্ষেত্রে গৌরবময় বিজয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পরাজয়—এই উভয় অভিজ্ঞতাই তাদের রয়েছে। পার্টি বুর্জোয়াদের সাথে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিল, আর এই যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে যাওয়ার পর, বৃহৎ বুর্জোয়া ও তার মিত্রদের সাথে তিক্ত সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিল। বিগত তিন বছর ধরে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে পার্টি আবার একটি জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের আমলে প্রবেশ করেছে। চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে এ জাতীয় জটিল সম্পর্কের মধ্য দিয়েই চীনা বিপ্লব ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তার বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এটা হচ্ছে এক বিশেষ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য, এমন এক বৈশিষ্ট্য যা ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশসমূহের বিপ্লবেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং কোন পুঁজিবাদী দেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে যা দেখা যায় না। অধিকন্তু, যেহেতু চীন হচ্ছে একটি আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্তবাদী দেশ, যেহেতু তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ হচ্ছে অসম, যেহেতু তার অর্থনীতি হচ্ছে প্রধানতঃ আধা-সামন্তবাদী আর যেহেতু তার ভূখণ্ড হচ্ছে সুবিশাল, সেইজন্য এর থেকে যা দেখা যাচ্ছে তা হল এই যে, বর্তমান পর্যায়ে চীনা বিপ্লবের চরিত্র হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ, আর তার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণী ; কৃষকজনসাধারণ ও শহরে পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কোন কোন সময় অংশগ্রহণ করছে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে অংশগ্রহণ করছে; এর থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রামই হল সংগ্রামের প্রধান রূপ। বাস্তবিকই, আমাদের পার্টির ইতিহাসকে সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস বলেই আখ্যায়িত করা যায়। কমরেড স্তালিন বলেছেনঃ 'চীনদেশে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। চীনা বিপ্লবের এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ সুবিধা'[১]। এ কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। আধা-ঔপনিবেশিক

চীনের নিজস্ব এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পুঁজিবাদী দেশসমূহের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের দ্বারা পরিচালিত বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা যায় না, অথবা দেখা গেলেও ঠিক একইভাবে দেখা যায় না। অতএব, চীনা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দুটো মৌলিক নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : (১) সর্বহারাশ্রেণী হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে একটি বিপ্লবী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠা করছে, অথবা তাকে ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়েছে ; আর (২) বিপ্লবের প্রধান রূপ হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম। এখানে কৃষকজনসাধারণ ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে পার্টির সম্পকর্কে যে মূল নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা চিহ্নিত করছি না, প্রথমতঃ, তা এই কারণে যে, সমগ্র দুনিয়াব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ যেসব সম্পর্কগত প্রশ্নের মোকাবিলা করছে, নীতিগত দিক থেকে এইসব সম্পর্কসমূহও হচ্ছে ঠিক ঐ একই রূপের; আর দ্বিতীয়তঃ, তা এই কারণে যে অন্তর্বস্তুর দিক থেকে, চীনের সশস্ত্র সংগ্রাম হচ্ছে কৃষক-যুদ্ধ এবং কৃষকজনসাধারণের সাথে পার্টির সম্পর্ক ও কৃষক-যুদ্ধের সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক হল যথার্থভাবে একই জিনিস।

এই দুটো মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দরুণ, প্রকৃতপক্ষে ঠিক ঠিক এগুলোর দরুণই আমাদের পার্টির বলশেভিকীকরণ একটা বিশেষ অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পার্টির ব্যর্থতা বা সাফল্য, তার পশ্চাদপসরণ কিংবা অগ্রগমন, তার সঙ্কোচন কিংবা প্রসারণ, তার বিকাশ ও সুসংবদ্ধকরণ অবশ্যম্ভাবীরূপেই বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে তার সম্পর্ক এবং সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে তার সম্পর্কের সাথে সংযুক্ত। বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যুক্তফ্রণ্ট গঠন করার প্রশ্নে, অথবা যখন তা ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়েছে তখন তা ভেঙে ফেলার প্রশ্নে পার্টি যখনই একটি সঠিক রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করেছে, তখনই তার বিকাশ, সুসংবদ্ধকরণ ও বলশেভিকীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি একটা পদক্ষেপ এগিয়ে গেছে; কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে তার সম্পর্কের বিষয়ে পার্টি যখনই বেঠিক লাইন গ্রহণ করেছে, তখনই আমাদের পার্টি একটা পদক্ষেপ পিছিয়ে গেছে। অনুরূপভাবে, বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নকে আমাদের পার্টি যখনই সঠিকভাবে পরিচালনা করেছে, তখনই সে তার বিকাশ, সুসংবদ্ধকরণ ও বলশেভিকীকরণের কাজে একটা পদক্ষেপ এগিয়ে গেছে ; কিন্তু যখনই সে প্রশ্নটিকে বেঠিকভাবে পরিচালনা করেছে, তখনই সে একটা পদক্ষেপ পিছিয়ে গেছে। অতএব, আঠারো বছর ধরেই, পার্টি-গঠন ও পার্টির বলশেভিকীকরণের কাজটি তার রাজনৈতিক লাইনের সাথে, যুক্তফ্রণ্ট ও সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কিত প্রশ্নের সঠিক বা বেঠিক পরিচালনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। আমাদের পার্টির আঠারো

বছরের ইতিহাস এই সিদ্ধান্তকে স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করছে। অথবা বিপরীত দিক দিয়ে বলা যায়, পার্টির বলশেভিকীকরণ যত বেশি হবে, ততই সঠিকভাবে সে তার রাজনৈতিক লাইন নির্ধারিণ করতে পারে এবং ততই যুক্তফ্রণ্ট ও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে। আমাদের পার্টির আঠারো বছরের ইতিহাস এই সিদ্ধান্তকেও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে ।

সুতরাং চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির জন্য তিনটি মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে যুক্তফ্রণ্ট, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং পার্টি গঠন। এই তিনটি প্রশ্ন এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে আয়ত্ত করার অর্থ হল সমগ্র চীনা বিপ্লবকে নির্ভুল নেতৃত্বে দেওয়ার সমতুল্য। আমাদের পার্টির আঠারো বছরের প্রচুর পরিমাণ অভিজ্ঞতার সাহায্যে—আমাদের ব্যর্থতা ও সাফল্য, পশ্চাদপসরণ ও অগ্রগমন, সঙ্কোচন ও প্রসারণের সমৃদ্ধ এবং সুগভীর অভিজ্ঞতার সাহায্যে—এই তিনটি প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা এখন সঠিক সিদ্ধান্ত টানতে সক্ষম হয়েছি। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যুক্তফ্রণ্ট, সশস্ত্র সংগ্রাম ও পার্টি-গঠনের প্রশ্নকে আমরা এখন সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে সক্ষম। এর আরও অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের আঠারো বছরের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দিয়েছে যে, চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রে শত্রুকে পরাজিত করার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির তিনটি 'যাদু অস্ত্র', তিনটি প্রধান যাদু অস্ত্র হচ্ছে ঃ যুক্তফ্রণ্ট, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং পার্টি-গঠন। এটা হচ্ছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা বিপ্লবের এক বিরাট সাফল্য।

এখানে তিনটি যাদু অস্ত্রের প্রত্যেকটি সম্পর্কে, তিনটি প্রশ্নের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

বিগত আঠারো বছর ধরে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অবস্থাধীনে কিংবা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণীগুলোর সাথে চীনা সর্বহারাশ্রেণীর যুক্তফ্রণ্ট বিকাশলাভ করেছে ঃ ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত প্রথম মহান বিপ্লব, ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধ, আর বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ। তিনটি পর্যায়ের ইতিহাস নিম্নলিখিত নিয়মবিধিকে সুনিশ্চিত করেছে ঃ

(১) যেহেতু চীনদেশকে যেসব নিপীড়ন ভোগ করতে হচ্ছে, তার মধ্যে বৈদেশিক নিপীড়নই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নিপীড়ন, সেজন্য সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ত যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আয়োজিত সংগ্রামে চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী নির্দিষ্ট সময়ে অংশগ্রহণ করবে এবং তা নির্দিষ্ট পরিমাণেই করবে। সুতরাং, এরকম সময়ে, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে

সর্বহারাশ্রেণীর যুক্তফ্রন্ট গঠন করা উচিত এবং যতটুকু সম্ভব তা বজায় রাখা উচিত। (২) অন্যান্য ঐতিহাসিক অবস্থায়, তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এদিক-ওদিক দুলতে থাকবে এবং শিবির পরিত্যাগ করবে। সুতরাং, চীনের বিপ্লবী যুক্তফ্রন্টের গঠন সব সময় অপরিবর্তনীয় থাকবে না, বরং তা পরিবর্তিত হতে বাধ্য। কোন কোন সময় জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এতে অংশগ্রহণ করতে পারে, অন্যান্য সময় সে তা নাও করতে পারে। (৩) চীনা বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী—চরিত্রের দিক থেকে যারা হল মুৎসুদ্দি—তারা হচ্ছে এমন একটি শ্রেণী, যারা সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের সেবা করে এবং তার দ্বারা লালিত-পালিত হয়। এই কারণে মুৎসুদ্দি চীনা বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী সব সময়ই বিপ্লবের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু, এই বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা সমর্থিত, তার ফলে এই সমস্ত শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব যখন তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং বিপ্লবের বর্শাফলক যখন একটি নির্দিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধেই প্রধানতঃ পরিচালিত হয়, তখন অন্যান্য শক্তির ওপর নির্ভরশীল বৃহৎ বুর্জোয়া গ্রুপসমূহ ঐ নির্দিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যোগদান করতে পারে। এরকম সময়ে, বিপ্লবের পক্ষে সুবিধাজনক হলে শত্রুকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে এবং নিজের মজুতবাহিনী বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে, এইসব গ্রুপগুলোর সাথে চীনা সর্বহারাশ্রেণী যুক্তফ্রণ্ট গঠন করতে পারে, আর যে পর্যন্ত সম্ভব তা বজায় রাখাই উচিত হবে। (৪) সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর পাশাপাশি মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী যখন যুক্তফ্রন্টে যোগদান করে, এমনকি তখনো তারা সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীলই থেকে যায়। সর্বহারাশ্রেণী ও সর্বহারা পার্টির যে কোন আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অগ্রগতিতে তারা একগুঁয়েমির সাথে বিরোধিতা করে, তাদের ওপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করার চেষ্টা করে এবং বিভেদাত্মক কৌশল, যেমন প্রতারণা, অন্যায় কাজে প্ররোচনা দান, 'অবক্ষয় ঘটানো' এবং তাদের বিরুদ্ধে বর্বর আক্রমণের কৌশল ব্যবহার করে। এছাড়া, শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ এবং যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যই তারা এই সবকিছু করে থাকে। (৫) কৃষকসমাজ হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর দৃঢ় মিত্র। (৬) শহুরে পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী হচ্ছে নির্ভরযোগ্য মিত্র।

প্রথম মহান বিপ্লব ও কৃষি-বিপ্লবের আমলেই এইসব নিয়মবিধির যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল, আর বর্তমান প্রতিরোধ-যুদ্ধেও আবার তা প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং, বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে (বিশেষ করে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে) যুক্তফ্রণ্ট গঠন করতে হলে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টিকে অবশ্যই দুই ফ্রণ্টে কঠোর ও সুদৃঢ় সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। একদিকে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে বুর্জোয়াশ্রেণী যে বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগ দিতে পারে, সেই সম্ভাবনাকে অবহেলা করার ভুলকে মোকাবিলা করা আবশ্যক। চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীকে পুঁজিবাদী দেশসমূহের বুর্জোয়াশ্রেণীর মতো একই রূপের বলে গণ্য করা, আর তার ফলশ্রুতি হিসেবে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যুক্তফ্রণ্ট গঠন করার এবং যতদূর সম্ভব তা বজায় রাখার কর্মনীতিকে অবহেলা করাটা হচ্ছে 'বামপন্থী' রুদ্ধদ্বার নীতির ভুল। অন্যদিকে, বুর্জোয়াশ্রেণীর কর্মসূচী, কর্মনীতি, মতাদর্শ, অনুশীলন, ইত্যাদির সাথে সর্বহারাশ্রেণীর কর্মসূচী, কর্মনীতি, মতাদর্শ, অনুশীলন, ইত্যাদিকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করা এবং তাদের মধ্যেকার নীতিগত পার্থক্যকে অবহেলা করার ভুলকেও মোকাবিলা করা আবশ্যক। এখানে এই সত্যকে অবহেলা করার মধ্যেই এই ভুল নিহিত রয়েছে যে বুর্জোয়াশ্রেণী (বিশেষ করে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী) কেবল পেটি-বুর্জোয়া ও কৃষকসমাজের ওপরেই যে প্রভাব বিস্তার করে তাই নয়, বরং সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার, তাদেরকে বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টির একটি লেজুড়ে পরিণত করার, আর বিপ্লবের ফসল যাতে বুর্জোয়াশ্রেণী নিজে ও তার রাজনৈতিক পার্টিই এককভাবে আহরণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার প্রবল প্রচেষ্টায় সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশ্যে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় ; এই সত্যকেও অবহেলা করার মধ্যে এই ভুল নিহিত রয়েছে যে, যখনই তার নিজস্ব সংকীর্ণ স্বার্থের সাথে কিংবা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টির স্বার্থের সাথে বিপ্লবের সংঘাত ঘটে, তখনই বুর্জোয়াশ্রেণী (আর বিশেষ করে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী) বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। এ সমস্ত বিষয়কে অবহেলা করার অর্থ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ। চেন তু-শিউর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তা বুর্জোয়াশ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থ ও তার রাজনৈতিক পার্টির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার দিকেই সর্বহারাশ্রেণীকে পরিচালিত করেছিল, আর প্রথম মহান বিপ্লবের ব্যর্থতার বিষয়গত কারণ ছিল এটাই। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বৈত চরিত্র আমাদের রাজনৈতিক লাইন ও আমাদের পার্টি-

গঠনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে, আর এই দ্বৈত চরিত্র উপলব্ধি করতে না পারলে আমরা আমাদের রাজনৈতিক লাইন বা পার্টি-গঠনের সমস্যা আয়ত্ত করতে পারব না। বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে ঐক্য ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম —এই উভয় ধরনের কর্মনীতি হচ্ছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রকৃতপক্ষে, পার্টি-গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই হল বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে তার ঐক্য ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টির বিকাশসাধন ও উপযুক্ত মাত্রায় তাকে পরীক্ষিত করে তোলা। এখানে ঐক্য বলতে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যুক্তফ্রন্টের কথাকেই বোঝানো হচ্ছে। আর সংগ্রাম বলতে 'শান্তিপূর্ণ ও 'রক্তপাতহীন' সংগ্রাম, মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংগ্রামকেই বোঝানো হচ্ছে— বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে আমরা ঐক্যবদ্ধ হলে সে সংগ্রাম চলতেই থাকে, আর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হলে তা সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। কোন কোন সময় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে—আমাদের পার্টি যদি এটা না বোঝে, তাহলে সে সামনে এগোতে পারবে না এবং বিপ্লবও বিকাশলাভ করবে না; বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যখন সে ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন তাদের বিরুদ্ধে পার্টিকে অবশ্যই কঠোর ও অবিচল 'শান্তিপূর্ণ' সংগ্রাম চালাতে হবে—আমাদের পার্টি যদি এটা না বোঝে, তাহলে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং বিপ্লব ব্যর্থ হবে ; আর বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে যখন সে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে যদি কঠোর ও অবিচল সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু না করে তাহলে আমাদের পার্টি একইভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং বিপ্লবও একইভাবে ব্যর্থ হবে। বিগত আঠারো বছরের ঘটনাবলী দ্বারা এসব কিছুর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র সংগ্রাম সর্বহারা নেতৃত্বেই কৃষক-যুদ্ধের রূপলাভ করেছে। এই সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসও তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথমটি হচ্ছে সেই পর্যায়, যে পর্যায়ে আমরা উত্তর অভিযানে অংশ নিয়ে—ছিলাম। আমাদের পার্টি ইতিমধ্যেই সশস্ত্র সংগ্রামের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করেছিল, কিন্তু তা করলেও তাকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারেনি—পার্টি এটা বুঝতে পারেনি যে, চীনা বিপ্লবে সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে সংগ্রামের প্রধান রূপ। দ্বিতীয় পর্যায় ছিল কৃষি-বিপ্লবের যুদ্ধকাল। ঐ সময় নাগাদ আমাদের পার্টি তার নিজস্ব স্বাধীন সশস্ত্র বাহিনী আগেই গড়ে তুলেছিল, স্বাধীনভাবে লড়াই চালানোর কলাকৌশল রপ্ত করে ফেলেছিল, আর জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা

ও ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সংগ্রামের অন্যান্য প্রয়োজনীয় রূপের সাথে সংগ্রামের প্রধান রূপ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমন্বয়সাধন অর্জন করতে, অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম, কৃষক-জনগণের সংগ্রাম (যা ছিল মূল বিষয়), যুব-সম্প্রদায়, নারী-সম্প্রদায় ও জনগণের অন্যান্য সমস্ত অংশের সংগ্রাম, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম, অর্থনৈতিক, গুপ্তচর-বিরোধী ও মতাদর্শগত ফ্রন্টের সংগ্রাম এবং অন্যান্য সমস্ত ধরনের সংগ্রামের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামকে সমন্বিত করতে আমাদের পার্টি আগে থেকেই সক্ষম হয়ে উঠেছিল। আর এই সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে কৃষকজনগণের কৃষি-বিপ্লব। তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে প্রতিরোধ-যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়। প্রথম পর্যায়ের সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতাকে, আর সংগ্রামের অন্যান্য সকল ধরনের প্রয়োজনীয় রূপের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামের সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতাকে যথোপযুক্ত ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে আমরা এই পর্যায়ে সক্ষম হয়ে উঠেছি। সাধারণভাবে, বর্তমান সময়ে সশস্ত্র সংগ্রামের অর্থ হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধ।[২] গেরিলাযুদ্ধ কাকে বলে? একটি পশ্চাদ্‌পদ দেশে, একটি সুবিশাল আধা-ঔপনিবেশিক দেশে সশস্ত্র শত্রুকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের নিজস্ব ঘাঁটি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ সময় ধরে জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করার কাজে এটা হচ্ছে সংগ্রামের একটি অপরিহার্য রূপ, আর সেই কারণেই সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। এতদিন পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক লাইন এবং আমাদের পার্টি-গঠনের কাজ—এই উভয়ই সংগ্রামের এই রূপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে, গেরিলাযুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে আমাদের রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে, এবং তার ফলস্বরূপ, আমাদের পার্টি-গঠন সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা লাভ করা অসম্ভব। সশস্ত্র সংগ্রাম হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক লাইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে হবে তা আমাদের পার্টি আঠারো বছর ধরে ধীরে ধীরে শিখেছে এবং তাতে অবিচল থেকেছে। আমরা শিখতে পেরেছি যে, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া চীনদেশে সর্বহারাশ্রেণী, জনগণ বা কমিউনিস্ট পার্টির দাঁড়াবার কোন স্থানই নেই, আর বিপ্লবে বিজয় অর্জনও অসম্ভব। এই বছরগুলোতে আমাদের পার্টির বিকাশ, সংঘবদ্ধতা আর বলশেভিকীকরণ বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে ; সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি আজ যেরকম আছে নিশ্চিতভাবেই তা সেরকম হতে পারত না। সমগ্র পার্টির

কমরেডরা যেন এই অভিজ্ঞতাকে কখনো না ভোলেন, যে অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি রক্তের বিনিময়ে ।

অনুরূপভাবে, পার্টি-গঠন, তার বিকাশ, সংঘবদ্ধতা আর বলশেভিকীকরণের ক্ষেত্রেও তিনটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় ছিল ।

প্রথম পর্যায় ছিল পার্টির শৈশবাবস্থা। এই পর্যায়ের প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী স্তরে পার্টির লাইন ছিল সঠিক, আর পার্টির সাধারণ সারি ও কর্মীবাহিনী উভয়েরই বৈপ্লবিক উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল অত্যধিক মাত্রায় উচ্চস্তরের ; সেজন্যই প্রথম মহান বিপ্লবে বিজয়গুলি অর্জন করা গিয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, আমাদের পার্টি তখনো ছিল একটি শিশু-পার্টি, তিনটি মূল সমস্যা—যুক্তফ্রণ্ট, সশস্ত্র সংগ্রাম ও পার্টি-গঠন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, চীনের ইতিহাস ও চীনের সমাজ সম্পর্কে কিংবা চীনা বিপ্লবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও নিয়মবিধি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান তার ছিল না, আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের মধ্যেকার ঐক্য সম্পর্কে তার ব্যাপক উপলব্ধির অভাব ছিল। সেই কারণে এই পর্যায়ের সর্বশেষ স্তরে, কিংবা এই পর্যায়ের সংকটময় সন্ধিক্ষণে, পার্টির নেতৃত্বদানকারী সংস্থাগুলোতে যাঁরা প্রভুত্ব বিস্তারী অবস্থান দখল করে বসেছিলেন তাঁরা বিপ্লবের বিজয়সমূহ সুসংহত করার ব্যাপারে পার্টিকে নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থ হন, আর তার ফলস্বরূপ, তাঁরা বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা প্রতারিত হন এবং বিপ্লবের পরাজয় ডেকে আনেন। এই পর্যায়ে পার্টি-সংগঠন প্রসারলাভ করেছিল কিন্তু সেগুলো সুসংবদ্ধ ছিল না, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে পার্টি-সভ্য ও কর্মীদের দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরচিত্ত হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করতেও এগুলো ব্যর্থ হয়। প্রচুর পরিমাণে নতুন সভ্য ছিল, কিন্তু তাদেরকে প্রয়োজনীয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা দেওয়া হয়নি। কাজের ক্ষেত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়েছিল, কিন্তু যথাযথভাবে তার সারসংকলন করা হয়নি। পার্টিতে বহু আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, কিন্তু তাদেরকে বেছে বের করা হয়নি। শত্রু ও মিত্র উভয়েরই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের একটি গোলকধাঁধার মধ্যে পার্টি পড়েছিল, কিন্তু সজাগ-সতর্কতার ক্ষেত্রে তার ছিল অভাব। পার্টির অভ্যন্তরে বিপুল সংখ্যায় সক্রিয় কর্মীরা সামনে এগিয়ে আসছিলেন, কিন্তু সঠিক সময়ে তাঁদেরকে পার্টির প্রধান ভিত্তিতে রূপান্তরিত করা হয়নি। পার্টির নির্দেশাধীনে পার্টির কিছু কিছু বিপ্লবী

সশস্ত্র ইউনিট ছিল, কিন্তু তাদের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সে ছিল অক্ষম। এই সবকিছুরই কারণ ছিল অনভিজ্ঞতা, বৈপ্লবিক উপলব্ধি সম্পর্কে অপ্রচুর গভীরতা, আর চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের সাথে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সমন্বয়সাধন করার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ততা। পার্টি-গঠনের প্রথম পর্যায় ছিল এইরকম ।

দ্বিতীয় পর্যায় ছিল কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধের পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার দরুণ, চীনের ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে এবং চীনা বিপ্লবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও নিয়মবিধি সম্পর্কে উত্তম উপলব্ধি থাকার দরুণ, আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ওপর কর্মীদের ভাল দখল থাকার দরুণ এবং সে তত্ত্বকে চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের সাথে সমন্বিত করার ক্ষেত্রে তাদের অধিকতর সক্ষমতা থাকার দরুণ আমাদের পার্টির দশ বছর ধরে একটা সফল কৃষি-বিপ্লবের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও বুর্জোয়াশ্রেণী বিশ্বাসঘাতকেই পরিণত হল, তথাপি আমাদের পার্টি কৃষকসমাজের ওপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করতে সক্ষম হয়। পার্টি-সংগঠন যে শুধুমাত্র নতুনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল তাই নয়, বরং তা সুসংহতও হচ্ছিল। দিনের পর দিন শত্রু আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পার্টি অন্তর্ঘাতকদের তাড়িয়ে দিয়েছে। পার্টির অভ্যন্তরে পুনরায় বিপুল-সংখ্যক কর্মী সামনে এগিয়ে আসে, এবং এ সময় তারা পার্টির প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়। জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার পথিকৃৎ হিসেবে পার্টি পথপ্রদর্শন করে এবং এভাবে সরকার পরিচালনার কলাকৌশল সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে। পার্টি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে, এবং এভাবে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও সাফল্য। তৎসত্ত্বেও, এসব মহান সংগ্রামগুলোর গতিপথে আমাদের কিছু কিছু কমরেড সুবিধাবাদের পংকে নিমজ্জিত হন, অথবা একবারের জন্য হলেও তাতে নিমজ্জিত হন, আর আগের মতোই তার কারণ ছিল এই যে তাঁরা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বিনয়ের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করেননি, চীনের ইতিহাস ও সমাজ এবং চীনা বিপ্লবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও নিয়মবিধি সম্পর্কে তাঁরা একটা উপলব্ধি অর্জন করতে পারেননি, আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের মধ্যেকার ঐক্য সম্পর্কেও তাঁদের কোন উপলব্ধি ছিল না। এই কারণে এই পর্যায়ের

সমগ্র অধ্যায় জুড়ে পার্টির নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত কিছু কিছু ব্যক্তি নির্ভুল রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লাইনের প্রতি অনুগত থাকতে ব্যর্থ হন। কোন সময় কমরেড লি লি-সানের 'বাম' সুবিধাবাদী লাইন, আর অন্য কোন সময় শ্বেত অঞ্চলে বিপ্লবী যুদ্ধ ও কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত 'বাম' সুবিধাবাদ পার্টিও বিপ্লবের ক্ষতিসাধন করে। সুনাই বৈঠকের (১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে কুয়াইচৌর সুনাইতে পলিটব্যুরোর বৈঠক) আগে পর্যন্ত পার্টি নিশ্চিতভাবেই বলশেভিকীকরণের পথে পা বাড়াতে পারেনি এবং চ্যাং কুও-তাওয়ের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে তার পর্যায়ক্রমিক বিজয় ও জার-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি। পার্টির বিকাশের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়।

তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের পর্যায়। বর্তমানে তিন বছর ধরে আমরা এই পর্যায়ের মধ্যে রয়েছি আর সংগ্রামের এই বছরগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী দুটো বিপ্লবী পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে, সাংগঠনিক শক্তি ও সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিকে, সারা দেশের জনগণের মধ্যে উচ্চ রাজনৈতিক মর্যাদাকে, আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের মধ্যেকার ঐক্য সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের পার্টি শুধুমাত্র জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টই প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং জাপানের বিরুদ্ধে মহান প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও পরিচালনা করে আসছে। সাংগঠনিকভাবে পার্টি তার সংকীর্ণ সীমার বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং একটি বৃহত্তর জাতীয় পার্টিতে পরিণত হয়েছে। তার সশস্ত্র বাহিনী আবার গড়ে উঠেছে এবং জাপানী আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে। সমগ্র জনগণের মধ্যে তার প্রভাব ক্রমেই ব্যাপকতর হচ্ছে। এই সবগুলোই হচ্ছে বিরাট বিরাট সাফল্য। তথাপি, এখনো পর্যন্ত আমাদের নতুন পার্টি-সভ্যদের অনেককেই শিক্ষিত করে তোলা যায়নি, নতুন সংগঠনসমূহের অনেকগুলিকেই এখনো সংহত করে তোলা যায়নি, আর নতুন ও পুরানো পার্টি-সভ্য এবং নতুন ও পুরানো পার্টি-সংগঠনগুলোর মধ্যে এখনো বিরাট পার্থক্য থেকে গেছে। নতুন পার্টি-সভ্য ও কর্মীদের অনেকেরই এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা নেই। চীনদেশের ইতিহাস ও সমাজ কিংবা চীনা বিপ্লবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও নিয়মবিধি সম্পর্কে এখনো তারা অল্পই জানে কিংবা মোটেই জানে না। মার্কসবাদী-

লেনিনবাদী তত্ত্ব কিংবা চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের মধ্যেকার ঐক্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ব্যাপকতা অর্জনের চেয়ে অনেক দূরেই রয়েছে। 'সাহসের সাথে পার্টিকে বিস্তৃত কর, কিন্তু অবাঞ্ছিত একটি লোককেও ভেতরে ঢুকতে দেবে না'—এই শ্লোগানের প্রতি যদিও কেন্দ্রীয় কমিটি জোর দিয়েছিল, তথাপি পার্টির সংগঠনসমূহের বিস্তারসাধনের সময় বেশ কিছু-সংখ্যক আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি এবং শত্রুর গুপ্তচর সাফল্যজনকভাবে ভেতরে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়। যদিও যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল এবং বর্তমানে তিন বছর ধরে তা বজায় রাখা হয়েছে, তথাপি বুর্জোয়াশ্রেণী বিশেষ করে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী, বিরামহীনভাবে আমাদের পার্টিকে ধ্বংস করে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে—বৃহৎ বুর্জোয়া আত্মসমর্পণকামীরা এবং গোঁড়াপন্থীরা সমগ্র দেশ জুড়ে গুরুতর সংঘর্ষ উস্‌কে দিয়ে আসছে, আর কমিউনিস্ট-বিরোধী চিৎকার তো অবিরাম লেগেই আছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য, যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে দেবার জন্য এবং চীনদেশকে পেছনে টেনে রাখার জন্য পথ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বৃহৎ বুর্জোয়া আত্মসমর্পণকামী ও গোঁড়াপন্থীরা এই সবকিছুকেই ব্যবহার করছে। মতাদর্শগত দিক দিয়ে, বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী কমিউনিস্ট আদর্শের ক্রমান্বয় ক্ষয়সাধনের অপচেষ্টা চালাচ্ছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক দিক দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি, সীমান্ত অঞ্চল ও পার্টির সশস্ত্র বাহিনীকে বিলুপ্ত করে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সমস্ত অবস্থায় সন্দেহাতীতভাবেই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আত্মসমর্পণ, ভাঙন ও পিছু হঠার বিপদকে কাটিয়ে ওঠা, যতদূর সম্ভব জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট ও কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতাকে বজায় রাখা, জাপানের বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রতিরোধ এবং অব্যাহত ঐক্য ও প্রগতির জন্য কাজ করা, আর একই সাথে সকল সম্ভাব্য ঘটনাবলীর জন্য প্রস্তুত হওয়া, যাতে ঘটনাক্রমে এরকম কিছু ঘটে গেলে পার্টি ও বিপ্লবকে অপ্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে না হয়। এই অভিপ্রায়ে, অতি অবশ্যই পার্টি-সংগঠন ও তার সশস্ত্র বাহিনীকে আমাদের মজবুত করতে হবে, এবং অত্মসমর্পণ, ভাঙন ও পিছু হঠার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রামের জন্য সমগ্র জনগণকে সমবেত করতে হবে। এই কর্তব্য সম্পন্ন করার কাজটি নির্ভর করছে সমগ্র পার্টির প্রচেষ্টার ওপর, সকল স্থানের ও স্তরের সমস্ত পার্টি-সভ্য, কর্মী ও সংগঠনগুলোর কঠোর ও বিরামহীন সংগ্রামের ওপর। আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, আঠারো বছরের অভিজ্ঞতাকে সাথে নিয়ে চীনের

কমিউনিস্ট পার্টি তার অভিজ্ঞ পুরানো সভ্য ও কর্মী এবং তার উৎসাহী ও তারুণ্যেভরা নতুন সভ্য ও কর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায়, তার সুপরীক্ষিত বলশেভিকীকৃত কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার স্থানীয় সংগঠনসমূহের যৌথ প্রচেষ্টায়, এবং তার শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী ও প্রগতিশীল জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় এইসব লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

আমাদের পার্টির আঠারো বছরকালের ইতিহাসের প্রধান প্রধান অভিজ্ঞতা ও প্রধান প্রধান সমস্যাকে আমরা এখানে তুলে ধরলাম।

আমাদের আঠারো বছরের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শত্রুকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে দুটো প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট ও সশস্ত্র সংগ্রাম। যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ারই যুক্তফ্রন্ট। আর শত্রুর অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালানো ও তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য দুটো হাতিয়ারকে, যুক্তফ্রন্ট ও সশস্ত্র সংগ্রামকে, একত্রে সংযুক্ত করার কাজে পার্টি হচ্ছে বীর যোদ্ধা।

আমাদের পার্টি আজ আমরা কিভাবে গড়ে তুলব? 'একটি বলশেভিক ধরনের চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, ব্যাপ্তির দিক দিয়ে জাতীয় এবং ব্যাপক গণচরিত্রের অধিকারী একটা পার্টি, মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে পুরোপুরি সুসংবদ্ধ একটা পার্টি' আমরা কিভাবে গড়ে তুলতে পারি? পার্টির ইতিহাস অধ্যয়ন করে, অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট ও সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে, বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে ঐক্য ও সংগ্রাম এই উভয় সমস্যার সাথে, এবং অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ বাহিনী কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে আয়োজিত গেরিলাযুদ্ধ অনমনীয়তা এবং জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সাথে সংযুক্ত করে পার্টি-গঠনের কাজকে অধ্যয়ন করেই এর উত্তর পাওয়া যাবে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চীনা বিপ্লবের অনুশীলনের মধ্যেকার ঐক্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদের আঠারো বছরের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের বর্তমান নতুন অভিজ্ঞতার সারসংকলন করা, আর পার্টি যাতে ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে ওঠে এবং অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তিকে এড়িয়ে যেতে পারে তার জন্য এই অভিজ্ঞতাকে সমগ্র পার্টিতে ছড়িয়ে দেওয়া—এই-ই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য।

টীকা

১। জে. ভি. স্তালিন ঃ 'চীনে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ', 'রচনাবলী', বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪১।

২। চীনের বিপ্লবে সাধারণভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের অর্থই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধ —এ কথা বলতে গিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথমদিক পর্যন্ত চীনের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার সারসংকলন করেছেন। দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সুদীর্ঘকাল ধরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত সশস্ত্র সংগ্রামই গেরিলাযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ঐ আমলের শেষের দিকে লালফৌজের শক্তি বৃদ্ধি পাবার দরুণ গেরিলাযুদ্ধ রূপান্তরিত হয় গেরিলা চরিত্রবিশিষ্ট চলমান যুদ্ধে—কমরেড মাও সে-তুঙের সংজ্ঞা অনুসারে, যা ছিল উচ্চতর পর্যায়ের গেরিলাযুদ্ধ। কিন্তু ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে আবার গেরিলাযুদ্ধের রূপই ফিরে আসে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথমদিকে, যেসব কমরেড দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের ভুল করেছিলেন, তাঁরা পার্টির নেতৃত্বাধীন গেরিলাযুদ্ধকে ছোট করে দেখেছিলেন এবং কুওমিনতাঙ বাহিনীর যুদ্ধাভিয়ানের ওপরেই আস্থা স্থাপন করেছিলেন। কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর 'জাপ-বিরোধী' গেরিলাযুদ্ধে রণনীতির সমস্যা', 'দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে' ও 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যাবলী' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁদের অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করেন, এবং বর্তমান প্রবন্ধে তিনি গেরিলাযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহকারী চীনা বিপ্লবের দীর্ঘকালব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলির সারসংকলন করেছেন। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে, এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের (১৯৪৫-১৯৪৯) সময়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন গেরিলাযুদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামের মূল রূপ হিসেবে নিয়মিত যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। এটা ছিল বিপ্লবী শক্তির অধিকতর বিকাশ ও শত্রুর পরিস্থিতির পরিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এর আরও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছিল। তখন যুদ্ধাভিযান চালানো হতো বিশালাকার যূথবদ্ধ বাহিনী দ্বারা, এবং তারা ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত শত্রু-অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল।

বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির কর্তব্যসমূহ

১০ই অক্টোবর, ১৯৩৯

১। নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধার পাবার আশায় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। জার্মানদের বা ইঙ্গ-ফরাসীদের—যে-কোন দিক থেকে দেখলেই এই যুদ্ধ হচ্ছে অন্যায় যুদ্ধ, লুণ্ঠনমূলক ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। দুনিয়ার সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে অবশ্যই এই যুদ্ধের দৃঢ় বিরোধিতা করতে হবে, এবং একে সমর্থন করে সোশ্যাল-ডিমোক্র্যাটিক পার্টিগুলি সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার যে জঘন্য অপরাধ করেছে, তারও বিরোধিতা করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আগের মতোই তার শান্তির নীতিতে অটল রয়েছে, বিবদমান দুই পক্ষের প্রতি দৃঢ় নিরপেক্ষতার নীতি বজায় রেখে চলেছে, এবং পোল্যাণ্ডে তার সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে জার্মান আগ্রাসী বাহিনীর পূর্বাভিমুখী অভিযান বন্ধ করে দিয়েছে, পূর্ব ইউরোপে শান্তি জোরদার করেছে, এবং পোল শাসকদের নিপীড়নের হাত থেকে ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ার ভ্রাতৃপ্রতিম জাতিগুলিকে রক্ষা করেছে। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির সম্ভাব্য আক্রমণকে ঠেকাবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রতিবেশী দেশগুলির সংগে বেশ কয়েকটি চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং বিশ্বশান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২। এই নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নীতি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের হঠকারী অভিযানের বিস্তৃতির প্রস্তুতি হিসেবে চীনা প্রশ্নের সমাধানের জন্য চীনের ওপর তার আক্রমণকে তীব্র করে তোলা। চীনা প্রশ্নের সমাধানের জন্য সে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, সেটা হল এইরকমঃ

(ক) সমগ্র চীনদেশকে পরাধীনতার নাগপাশে বন্ধনের প্রস্তুতি হিসেবে অধিকৃত অঞ্চলে তার নীতি হবে তার বন্ধনটিকে আরও দৃঢ় করা। এটি করতে গিয়ে তাকে জাপ-বিরোধী গেরিলা ঘাঁটি অঞ্চলে 'ঝেঁটিয়ে পরিস্কার করার' কাজ শুরু করতে হবে, অর্থনৈতিক সম্পদ শোষণ করতে হবে, পুতুল-সরকারের

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে কমরেড মাও সে-তুঙ এই সিদ্ধান্তটির খসড়া প্রণয়ন করেন।

প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং জনগণের জাতীয়তাবোধের মধ্যে ভাঙন ধরাতে হবে।

(খ) চীনের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে তার নীতি হবে প্রধানতঃ রাজনৈতিক অভিযান চালানো, সংগে সংগে চলবে তার সামরিক অভিযান। রাজনৈতিক অভিযানের অর্থ ব্যাপক সামরিক আক্রমণের ওপর জোর দেওয়া নয়, জোর দেওয়া জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টে ভাঙন ধরাবার ওপর, কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতায় ভাঙন ধরাবার এবং কুওমিনতাঙ সরকারকে আত্মসমর্পণে প্রলুব্ধ করানোর ওপর।

উহানের মতো তারা বর্তমানে বৃহৎ রণনীতিগত অভিযানে সম্ভবতঃ নামবে না, কারণ বিগত দুবছরে চীনের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সামনে সে মার খেয়েছে এবং তার সশস্ত্র শক্তি ও অর্থনৈতিক সম্ভারের অভাবও হয়েছে। এই অর্থে প্রতিরোধ-যুদ্ধ মূলতঃ রণনীতিগত অচলাবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এবং এই রণনীতিগত অচলাবস্থা হচ্ছে আমাদের প্রতি-আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতির পর্যায়। কিন্তু প্রথমতঃ, আমরা যখন বলি যে মূলতঃ একটা অচলাবস্থা উপস্থিত হয়েছে, তখন তা দ্বারা আমরা এ কথা বোঝাতে চাই না যে শত্রুর আক্রমণাভিযানের আর সম্ভাবনা নেই ; চ্যাংশা আক্রান্ত হয়েছে এবং পরে অন্যান্য স্থানেও আক্রমণ হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রণ্টে যতই অচলাবস্থার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, ততই শত্রু গেরিলা ঘাঁটি অঞ্চলে 'ঝেঁটিয়ে পরিস্কার করার' অভিযান তীব্রতর করবে। তৃতীয়তঃ, যে-অঞ্চল শত্রু দখল করেছে সেখানে যদি চীন ভাঙন ধরাতে না পারে, যদি শত্রুকে সেই দখল তীব্রতর করার ও শোষণ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে আমরা সাফল্য অর্জন করতে দিই, যদি চীন শত্রুর রাজনৈতিক অভিযান প্রতিহত করতে না পারে, এবং প্রতিরোধ, একতা ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়, ও এভাবে প্রতি-আক্রমণাভিযানের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হয়, কিংবা কুওমিনতাঙ সরকার যদি নিজের খুশিমত আত্মসমর্পণ করে, তাহলে শত্রু বিরাট আক্রমণ শুরু করতে পারে। অর্থাৎ, যে অচলাবস্থার সূত্রপাত হয়েছে তা শত্রু বা আত্মসমর্পণকারীরা এখনো ভেঙে দিতে পারে।

৩। আত্মসমর্পণের বিপদ, জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে ভাঙনের বিপদ ও পশ্চাদপসরণের বিপদ এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে রয়ে গেছে; এবং বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের বর্তমানের কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ও পশ্চাদপসরণের কার্যকলাপ তাদের আত্মসমর্পণের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবেই চলেছে। প্রতি-আক্রমণের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হলে এখনো আমাদের কর্তব্য হবে সমস্ত চীনা দেশপ্রেমিকদের সহযোগিতায় ৭ই জুলাই তারিখের পার্টি ইস্তাহারে প্রদত্ত তিনটি মহান রাজনৈতিক শ্লোগানের ভিত্তিতে জনগণকে সমাবিষ্ট করে কার্যকরীভাবে সেগুলি প্রয়োগ করা। এই তিনটি শ্লোগান হচ্ছে 'প্রতিরোধে অবিচল থাক ও আত্মসমর্পণের

বিরোধিতা কর', 'একতায় অবিচল থাক ও বিভেদের বিরোধিতা কর', এবং 'অগ্রগমনে অবিচল থাক ও পশ্চাদপসরণের বিরোধিতা কর'। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে সুনিশ্চিতভাবেই শত্রুর পেছনে গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে, শত্রুর 'ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার' অভিযানকে পর্যুদস্ত করে দিতে হবে, শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে হবে, এবং যে জনগণ জাপ-প্রতিরোধযুদ্ধ পরিচালনা করে যাচ্ছেন, তাঁদের সুবিধার্থে প্রগতিমূলক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। ফ্রন্টে সামরিক প্রতিরক্ষা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে এবং শত্রুর আক্রমণাভিযানকে পর্যুদস্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে অবিলম্বে প্রকৃত রাজনৈতিক সংস্কার চালু করতে হবে, কুওমিনতাঙের এক-পার্টি একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে হবে, জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় পরিষদের আহ্বান করতে হবে, তার হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দিতে হবে, একটি সংবিধান রচনা ও গ্রহণ করতে হবে এবং সাংবিধানিক সরকারকে কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে-কোনরকম দোদুল্যমানতা বা দীর্ঘসূত্রতা, বা এই কর্মনীতির বিরোধী সব কিছুই প্রচণ্ড ভুল হবে। একই সময়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টির সর্বস্তরের নেতৃসংস্থা এবং সমস্ত পার্টি-সভ্যকে আরও সতর্ক প্রহরা বজায় রাখতে হবে, এবং চীনা বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর যে-কোন জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকার ও পার্টি ও জনগণের অপ্রত্যাশিত ক্ষতি ঠেকাবার উদ্দেশ্যে পার্টি, সশস্ত্র বাহিনী ও পার্টির নেতৃত্বাধীন সমস্ত সংস্থার মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংহতি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ।

বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সংখ্যায় দলে টেনে আনুন[১]

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৯

১। দীর্ঘ ও নির্মম জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে এবং নতুন চীন গড়ে তোলার মহান সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টিকে অবশ্যই বুদ্ধিজীবীদের দলে টেনে আনার কাজে সুদক্ষ হতে হবে। কারণ, একমাত্র এইভাবেই তা প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য বিরাট শক্তি সমাবেশ করতে পারবে, লক্ষ লক্ষ কৃষককে সংঘবদ্ধ করতে পারবে, বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, এবং বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্ট প্রসারিত করতে পারবে। বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না।

২। গত তিন বছর ধরে আমাদের পার্টি ও সৈন্যবাহিনী বুদ্ধিজীবীদের দলে টেনে আনার বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছে; বহু বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী পার্টি, সেনাবাহিনী, সরকারের বিভিন্ন শাখাসমূহ সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং গণআন্দোলনে সামিল হয়েছেন, এবং এভাবে যুক্তফ্রন্টের প্রসার ঘটেছে। এটা একটা বিরাট সাফল্য। কিন্তু আমাদের বাহিনীর বহু কর্মী এখনো পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। তাঁরা এখনো তাঁদের কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখেন, এমনকি তাঁদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রবণতা দেখান, বা তাঁদের দূরে দূরে রাখতে চান। আমাদের বহু প্রশিক্ষণ-সংস্থা এখনো তরুণ ছাত্রদের ব্যাপক সংখ্যায় ভর্তি করতে ইতস্তত করে। আমাদের বহু স্থানীয় পার্টি-শাখা এখনো পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের যোগদানের বিরোধী। এসবের কারণ হচ্ছে বিপ্লবী স্বার্থে বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্ব বুঝবার ব্যর্থতা; ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বুদ্ধিজীবীদের সংগে পুঁজিবাদী দেশগুলির বুদ্ধিজীবীদের পার্থক্য বুঝবার ব্যর্থতা; এবং যে বুদ্ধিজীবীরা জমিদার ও বুর্জোয়াদের সেবা করে তাদের সংগে যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের সেবা করেন—তাদের পার্থক্য বুঝবার ব্যর্থতা; একই সংগে এটা হচ্ছে সেই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝবার ব্যর্থতা যখন বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টিগুলি বুদ্ধিজীবীদের দলে টানার জন্য আমাদের সংগে আপ্রাণ প্রতিযোগিতায় নেমেছে, এবং যখন জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে চীনা বুদ্ধিজীবীদের কিনে নিতে বা তাদের মনকে কলুষিত করতে চাইছে। বিশেষতঃ, এর

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে কমরেড মাও সে-তুঙ এই সিদ্ধান্তটির খসড়া প্রণয়ন করেন।

কারণ হচ্ছে ঃ আমাদের পার্টি এবং আমাদের সেনাবাহিনী যে ইতিমধ্যেই একদল সুপরীক্ষিত কর্মীদের মূল বাহিনীর বিকাশ ঘটাতে পেরেছে এবং তার সাহায্যে বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব দেবার সামর্থ্য অর্জন করেছে—এই অনুকূল বিষয়টি বুঝবার ব্যর্থতা।

৩। সেই কারণে এখন থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দিতে হবেঃ

(ক) যুদ্ধাঞ্চলের বিভিন্ন পার্টি-সংগঠন এবং পার্টির নেতৃত্বাধীন সমস্ত সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির উচিত আমাদের সেনাবাহিনী, প্রশিক্ষণ-সংস্থা এবং সরকারের শাখাসমূহে ব্যাপক সংখ্যায় বুদ্ধিজীবীদের টেনে আনা। যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী জাপানের সাথে লড়াই করতে চান, এবং যাঁরা মোটামুটিভাবে বিশ্বস্ত, কঠিন শ্রম করতে রাজী এবং কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত, তাঁদের সবাইকে টেনে আনার জন্য বিভিন্ন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাঁদেরকে আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হবে, এবং সাহায্য করতে হবে, যাতে তাঁরা যুদ্ধে এবং কাজে পাকাপোক্ত হতে পারেন এবং সেনাবাহিনী, সরকার ও জনগণের সেবা করতে পারেন। যাঁদের পার্টি-সদস্যপদের যোগ্যতা রয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের গুণাগুণ পৃথকভাবে বিচার করে তাঁদেরকে আমরা পার্টিতে প্রবেশের সুযোগ দেব। যাঁদের সে যোগ্যতা নেই বা যাঁরা পার্টিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক নন, তাঁদের সংগে আমরা ভাল কার্যকরী সম্পর্ক বজায় রাখব এবং আমাদের সংগে তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে পথ দেখাব।

(খ) ব্যাপক সংখ্যায় বুদ্ধিজীবীদের টেনে আনার নীতিকে প্রয়োগ করতে গিয়ে শত্রু এবং বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টিগুলি কর্তৃক প্রেরিত লোকজনের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য অবিশ্বস্ত লোকজনদের দূরে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে আমাদের অতি অবশ্যই বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। এদের দূরে সরিয়ে দেবার ব্যাপারে আমাদের খুবই দৃঢ় হতে হবে। যারা ইতিমধ্যেই পার্টি, সেনাবাহিনী বা সরকারী দপ্তরসমূহে ঢুকে পড়েছে, সন্দেহাতীত প্রমাণের ভিত্তিতে তাদেরকে দৃঢ়তার সংগে, কিন্তু বাছাই করে, বের করে দিতে হবে। কিন্তু সেজন্য আমরা যুক্তিসংগতভাবেই বিশ্বস্ত বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে অতি অবশ্যই কোন সন্দেহ পোষণ করব না, নির্দোষ লোকদের সম্পর্কে প্রতিবিপ্লবীদের দ্বারা আনীত মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে অতি অবশ্যই সতর্ক প্রহরা বজায় রাখব।

(গ) যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বস্ত ও প্রয়োজনীয়, তাঁদেরকে আমাদের যথাযোগ্য কাজ দিতে হবে। সংগ্রামের সুদীর্ঘ পথে তাঁরা যাতে ক্রমে ক্রমে তাঁদের দুর্বলতা কাটাতে পারেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্লবীকরণ ঘটাতে পারেন, জনগণের সংগে একাত্ম হতে পারেন, এবং পুরানো

পার্টি-সদস্য ও কর্মীদের সংগে পার্টির শ্রমিক ও কৃষক-সদস্যদের সাথে মিশে যেতে পারেন, সেজন্য তাঁদেরকে আমরা আন্তরিকভাবে রাজনৈতিক শিক্ষা দেব এবং পথ দেখাব।

(ঘ) আমাদের কাজে বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ যে প্রয়োজনীয়, সে-কথা তাঁদের অংশগ্রহণের বিরোধী সমস্ত কর্মীদের, বিশেষ করে আমাদের সেনাবাহিনীর মূল অংশের সংগে যুক্ত কিছু কর্মীদের, ভালভাবে বোঝাতে হবে। একই সংগে, শ্রমিক ও কৃষক-কর্মীদের কঠোর অধ্যয়ন করার জন্য এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন করার জন্য আমাদের উৎসাহ দিতে হবে, এবং এই উদ্দেশ্যে কার্যকরী প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এভাবে শ্রমিক ও কৃষককর্মীরা একই সংগে বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠবেন, এবং বুদ্ধিজীবীরা একই সংগে শ্রমিক ও কৃষকে পরিণত হবেন ।

(ঙ) ওপরে উল্লিখিত নীতিগুলি মূলগতভাবে কুওমিনতাঙ অঞ্চলসমূহে এবং জাপান কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলসমূহেও প্রযোজ্য হবে। এর ব্যতিক্রম হবে এই যে, বুদ্ধিজীবীদের পার্টিতে প্রবেশাধিকার দেবার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্যের ওপর আরও বেশি দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে ঐসব অঞ্চলে আরও দৃঢ় পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলা যায়। পার্টি-বহির্ভূত যে বিরাটসংখ্যক বুদ্ধিজীবী আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁদের সংগে আমাদের যথাযোগ্য সংযোগ রাখতে হবে, এবং তাঁদের সংগঠিত করতে হবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ও গণতন্ত্রের জন্য মহান সংগ্রামে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং যুক্তফ্রন্টের কাজে।

৪। আমাদের পার্টির সমস্ত কমরেডদের এ কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সঠিক নীতি নির্ধারণ বিপ্লবের বিজয় অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। কৃষি-বিপ্লবের সময়ে বিভিন্ন জায়গায় পার্টি-সংগঠন ও সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি বুদ্ধিজীবীদের প্রতি যে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল, তার পুনরাবৃত্তি হলে চলবে না। বর্তমানে বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য ছাড়া সর্বহারারা নিজেদের বুদ্ধিজীবীদের জন্ম দিতে পারে না। কেন্দ্রীয় কমিটি আশা করে যে, সমস্ত স্তরের পার্টি-কমিটিসমূহ এবং সমস্ত পার্টি-কমরেডরা এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেবেন।

টীকা

১। 'বুদ্ধিজীবী' বলতে বোঝানো হচ্ছে তাঁদের সবাইকে, যাঁরা মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের বা আরও বেশি শিক্ষালাভ করেছেন, এবং যাঁরা এরকম স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রেরা, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা, পেশাদার শিক্ষাজীবীরা, ইঞ্জিনিয়ার এবং যন্ত্রবিদ্‌রা। এঁদের মধ্যে

চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি

ডিসেম্বর, ১৯৩৯

প্রথম অধ্যায়
চীনের সমাজ

১। চীনা জাতি

চীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশগুলির মধ্যে একটি। এ দেশের ভৌগোলিক আয়তন সমগ্র ইউরোপের প্রায় সমান। আমাদের এই বিরাট দেশের উর্বর বিরাট বিরাট এলাকা আমাদের খাদ্য ও বস্ত্রের জোগান দেয় ; দেশের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জুড়ে আছে ছোট-বড় পর্বতমালা, যেখানে বিস্তীর্ণ অরণ্য ও সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় ; বহু নদী ও হ্রদ আছে, যার ফলে জলপথে যাতায়াত ও সেচ ব্যবস্থার সুবিধা হয়েছে ; আর আছে এক দীর্ঘ তটরেখা, যা আমাদের সমুদ্রের পরপারের জাতিগুলির সাথে যোগাযোগের সুবিধা করে দিয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের পুর্বপুরুষেরা এই বিরাট ভুখণ্ডে পরিশ্রম করেছেন, জীবনধারণ করেছেন ও জনসংখ্যার দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছেন।

চীনের উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমের সীমান্ত সোভিয়েত সমাজ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়নের সংগে সংলগ্ন ; উত্তরে মঙ্গোলিয়া গণ-প্রজাতন্ত্র ; দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমে আফগানিস্তান, ভারত, ভুটান ও নেপাল ; দক্ষিণে বার্মা ও ভিয়েতনাম ; পূর্বে কোরিয়া অবস্থিত ; তাছাড়া পূর্বদিকে জাপান এবং ফিলিপাইনও চীনের নিকটবর্তী প্রতিবেশী। চীনদেশের এই ভৌগোলিক অবস্থান চীনের জনসাধারণের বিপ্লবের পক্ষে সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই সৃষ্টি করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকটবর্তী হওয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দূরবর্তী হওয়া এবং আমাদের চতুর্দিকে বহু ঔপনিবেশিক

১৯৩৯ সালের শীতকালে ইয়েনানে কমরেড মাও সে-তুঙ ও অন্য কয়েকজন কমরেড মিলিতভাবে 'চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নামে একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। 'চীনের সমাজ' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়টির খসড়া করেন অন্য কমরেডরা, খসড়াটি কমরেড মাও সে-তুঙ সংশোধন করে দেন। 'চীন বিপ্লব' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়টি কমরেড মাও সে-তুঙ নিজে লেখেন।

অথবা আধা-ঔপনিবেশিক দেশ থাকা একটি সুবিধাজনক ব্যাপার। আর জাপানী সাম্রাজ্যবাদ তার ভৌগালিক নৈকট্যের সুবিধা নিয়ে সবসময় চীনা জাতিগুলির অস্তিত্ব এবং চীনা জনগণের বিপ্লবের পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে—এটা হচ্ছে অসুবিধাজনক দিক।

বর্তমান চীনের জনসংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটি, অর্থাৎ সারা দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এই জনসংখ্যার দশ ভাগের নয় ভাগেরও বেশি 'হান' জাতীয়। এ ছাড়া বহু সংখ্যালঘু জাতিসত্তা আছে—যেমন মঙ্গোল, হুই, তিব্বতী, উইগুর, মিয়াও, ঈ, চুয়াং, চুংচিয়া ও কোরিয়ান প্রভৃতি। এদের সকলেরই দীর্ঘকালের ইতিহাস আছে—যদিও সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক থেকে এরা বিভিন্ন স্তরের। মোটকথা, চীন হচ্ছে বহু জাতিসত্তা নিয়ে গঠিত জনবহুল একটি দেশ।

দুনিয়ার অন্যান্য বহু জাতির বিকাশধারার মতো চীনা জাতি (এখানে আমরা প্রধানতঃ হানদের কথা বলছি) হাজার হাজার বছর ধরে শ্রেণীহীন আদিম কমিউন জীবন যাপন করে এসেছে। আজ থেকে প্রায় হাজার চারেক বছর আগে এই আদিম কমিউনগুলো ভেঙে পড়ে এবং শ্রেণীসমাজের আবির্ভাব ঘটতে থাকে, যা প্রথমে দাস সমাজের ও পরে সামন্ত সমাজের রূপ গ্রহণ করে। চীনা জাতির সভ্যতার ইতিহাসে চীনের কৃষি ও হস্তশিল্প উন্নতমানের জন্য বিখ্যাত ছিল। বহু মহান চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, রাজনীতিবিদ, রণবিশারদ, সাহিত্যিক ও শিল্পী চীনের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর চীনের রয়েছে এক সমৃদ্ধ চিরায়ত সংস্কৃতিভাণ্ডার। বহু যুগ আগে চীনদেশে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল।[১] কাগজ তৈরীর কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে আজ থেকে ১৮০০ বছর আগে[২] চীনদেশেই। ব্লকে ছাপা আবিষ্কৃত হয়েছে ১৩০০ বছর আগে[৩] এবং ৮০০ বছর আগে পরিবর্তনযোগ্য টাইপ আবিস্কৃত হয়[৪]। ইউরোপীয়দের আগেই চীনারা বারুদের ব্যবহার জানত।[৫] অতএব, চীনের সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতগুলির অন্যতম, এবং চীনের প্রায় ৪০০০ বছরের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়।

'পার্টি গঠন' নিয়ে তৃতীয় অধ্যায় লেখার কথা ছিল, কিন্তু যে কমরেডরা লিখছিলেন তাঁরা তা শেষ করতে পারেননি। অধ্যায় দুটি, বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায়টি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কমরেড মাও সে-তুঙ নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, পরে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে লিখিত তাঁর নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে গ্রন্থে তিনি তা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

চীনা জাতি শুধু অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার জন্য নয়, তীব্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং সমৃদ্ধ বিপ্লবী ঐতিহ্যের জন্যও বিশ্ববিখ্যাত। উদাহরণস্বরূপ, হান জাতির ইতিহাসে দেখা যায় যে, চীনা জনগণ কখনো স্বৈরাচারী শাসন মুখ বুজে সহ্য করেনি, বরং ঐ শাসন উৎখাত ও পরিবর্তনের জন্য সর্বদাই সুনিশ্চিতভাবে বিপ্লবী পন্থা গ্রহণ করেছে। হান জাতির কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে জমিদার ও অভিজাতদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে শত শত ছোট-বড় কৃষক-বিদ্রোহ ঘটেছে এবং এই ধরনের কৃষক-বিদ্রোহের ফলেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক বংশ থেকে আর এক বংশে রাজত্বের পরিবর্তন ঘটেছে। চীনের সমস্ত জাতি বিদেশী জাতির অত্যাচার প্রতিরোধ করেছে এবং ঐ অত্যাচার দূর করতে বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেছে। সমানাধিকারের ভিত্তিতে এরা ঐক্যের পক্ষে, কিন্তু এক জাতির দ্বারা অন্য জাতির ওপরে অত্যাচারের এরা বিরোধী। লিখিত ইতিহাসের বিগত কয়েক হাজার বছরে চীনা জাতি বহু জাতীয় নায়ক ও বিপ্লবী নেতার জন্ম দিয়েছে। এইভাবে দেখা যায় যে, চীনা জাতির এক গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবী ঐতিহ্য এবং এক চমৎকার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার রয়েছে।

২। প্রাচীন সমান্ততান্ত্রিক সমাজ

যদিও চীন একটি মহান জাতি এবং যদিও চীন বিরাট লোকসংখ্যা, দীর্ঘ ইতিহাস, সমৃদ্ধ বিপ্লবী ঐতিহ্য এবং অত্যুজ্জ্বল উত্তরাধিকার অধ্যুষিত এক সুবিশাল দেশ, তবুও দাস ব্যবস্থা থেকে সামন্ত ব্যবস্থায় উত্তরণের পর থেকে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ দীর্ঘকাল ধরে মন্থর হয়ে পড়েছিল। চৌ ও চিন বংশের রাজত্বকাল থেকে শুরু করে এই সামন্ত ব্যবস্থা প্রায় ৩০০০ বছর ধরে টিকে ছিল।

চীনের সামন্তযুগের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল এই ঃ

(১) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাভাবিক অর্থনীতিরই ছিল প্রাধান্য। শুধু কৃষিজাত দ্রব্যই নয়, নিজেদের প্রয়োজনের অধিকাংশ হস্তশিল্পজাত দ্রব্যও কৃষকেরা উৎপাদন করত। জমিদারেরা ও অভিজাতেরা কৃষকদের কাছ থেকে জমির খাজনা হিসেবে যা নিয়ে নিত, তাও ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য, বিনিময়ের জন্য নয়। যদিও কালক্রমে বিনিময় প্রথা বিকাশলাভ করেছিল, তবুও সমগ্র অর্থনীতিতে এটা নির্ধারক ভূমিকা পালন করেনি।

(২) জমিদার, অভিজাত ও সম্রাটকে নিয়ে গঠিত সামন্ত শাসকশ্রেণীই ছিল অধিকাংশ জমির মালিক, আর কৃষকদের জমি ছিল সামান্য অথবা মোটেই ছিল

না। কৃষকেরা নিজেদের কৃষিযন্ত্রপাতি দ্বারা জমিদার, অভিজাত ও রাজপরিবারের জমি চাষ করত এবং তাদের উপভোগের জন্য কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, এমনকি ৮০ ভাগ অথবা তারও বেশি দিয়ে দিতে হতো। ফলে কৃষকেরা বাস্তবতঃ তখনো ছিল ভূমিদাস।

(৩) জমিদার, অভিজাত ও রাজপরিবার কৃষকদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত খাজনা দ্বারা শুধু জীবনযাপনই করত না, উপরন্তু একগাদা সরকারী কর্মচারীদের জন্য এবং প্রধানতঃ কৃষকদের দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী পোষার জন্য এই জমিদারী রাষ্ট্র কৃষকদের কাছ থেকে সেলামী, ট্যাক্স ও বেগার-খাটুনি আদায় করত।

(৪) এই সমস্ত শোষণ ব্যবস্থা রক্ষা করার হাতিয়ার ছিল সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী রাষ্ট্র। চিন বংশের রাজত্বের পূর্বযুগে এই সামন্ত রাষ্ট্র ছিল বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রধান প্রধান রাজ্যে বিভক্ত, প্রথম চিন সম্রাট চীনদেশকে ঐক্যবদ্ধ করার পর এই সামন্ত রাষ্ট্র স্বৈরতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত রূপ পরিগ্রহ করল, যদিও কিছু পরিমাণ সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা তখনো বজায় রইল। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্রাটই ছিলেন সর্বেসর্বা এবং তিনি দেশের সমগ্র অঞ্চলে সেনাবাহিনীর, আইন-আদালতের, খাজাঞ্চীখানার এবং শস্যাগারগুলোর কর্মচারী নিয়োগ করতেন, এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসনের প্রধান স্তম্ভ হিসেবে জমিদার বাবুদের ওপর নির্ভর করতেন।

এই ধরনের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক শোষণ ও সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক জুলুমের অধীনে চীনদেশের কৃষকেরা যুগ যুগ ধরে দারিদ্র্য এবং দুঃখকষ্টে ক্রীতদাসের মতো জীবন কাটিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বন্ধনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে তাদের কিছুই ছিল না। তাদের প্রহার করার ও গালাগাল দেওয়ার, এমনকি খুশিমত খুন করার অধিকার পর্যন্ত জমিদারদের ছিল, তাদের আদৌ কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। চীনা সমাজ যে কয়েক হাজার বছর ধরে একই সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরে দাঁড়িয়েছিল, নির্মম জমিদারী শোষণ ও জুলুমের ফলে কৃষকদের চরম দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতাই ছিল তার মূল কারণ।

সামন্ত সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল কৃষকশ্রেণী ও জমিদারশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। কৃষক ও হস্তশিল্পীরাই ছিল এই সমাজের সম্পদ ও সংস্কৃতি সৃষ্টিকারী মূল শ্রেণী।

কৃষকদের ওপর জমিদারশ্রেণীর নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক উৎপীড়নই জমিদারশ্রেণীর শাসনের বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহ করতে কৃষকদের

বাধ্য করেছিল। ছোট-বড় শত শত বিদ্রোহ ঘটেছে, এর সবগুলিই ছিল কৃষকদের প্রতিরোধ-আন্দোলন অথবা কৃষকদের বিপ্লবী যুদ্ধ—চীন বংশের রাজত্বকালে চেন শেং, উ কুয়াং, সিয়াং ইয়ু ও লিউ পাংয়ের বিদ্রোহ[৬] থেকে শুরু করে হান বংশের রাজত্বকালে সিনশি, পিংলিন, লাল ভুরু, ব্রোঞ্জের ঘোড়া[৭] ও হলদে পাগড়ীর[৮] বিদ্রোহ, সুই বংশের রাজত্বকালে লি মি ও তৌ চিয়ান-তে'র বিদ্রোহ[৯], তাং বংশের রাজত্বকালে ওয়াং সিয়ান-চি ও হুয়াং চাওএর বিদ্রোহ[১০], সুং বংশের রাজত্বকালে সুং চিয়াং ও ফাং লা'র বিদ্রোহ[১১] ইউয়ান বংশের রাজত্বকালে চু ইউয়ান-চাংয়ের বিদ্রোহ[১২], মিং বংশের রাজত্বকালে লি জু-চেংয়ের বিদ্রোহ[১৩] এবং চিং বংশের রাজত্বকালে তাই পিং স্বর্গীয় রাজ্যের বিপ্লব[১৪] পর্যন্ত। চীনের ইতিহাসে এইসব কৃষক-বিদ্রোহ ও কৃষক-যুদ্ধ যে রকম ব্যাপকতালাভ করেছিল, অন্য কোথাও তা চোখে পড়ে না। চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কেবলমাত্র এই ধরনের কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রাম, কৃষক-বিদ্রোহ এবং কৃষক-যুদ্ধই ছিল ঐতিহাসিক বিকাশের প্রকৃত চালিকাশক্তি। কারণ প্রত্যেকটি অপেক্ষাকৃত বিরাট কৃষক-বিদ্রোহ ও কৃষক-যুদ্ধ তৎকালীন সামন্ত শাসনের ওপর আঘাত হেনেছিল, ফলে সেগুলো সামাজিক উৎপাদন শক্তিসমূহের বিকাশকে কমবেশি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু ঐ সময়ে নতুন উৎপাদন শক্তি, নতুন উৎপাদন সম্পর্ক, নতুন শ্রেণী-শক্তি বা কোন অগ্রগামী রাজনৈতিক পার্টির অস্তিত্ব ছিল না, সেইহেতু ঐসব কৃষকবিদ্রোহ ও কৃষক-যুদ্ধে আজকের দিনের মতো সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির মতো সঠিক নেতৃত্ব ছিল না, ফলে প্রতিটি কৃষক-বিপ্লবই ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রতিবারই হয় বিপ্লবের মধ্যে কিংবা বিপ্লবের পরে জমিদাররা ও অভিজাতরা রাজবংশের পরিবর্তনের যন্ত্র হিসেবে সেইসব বিপ্লবকে ব্যবহার করেছে। সুতরাং, প্রতিটি বিরাট কৃষক-বিপ্লবী সংগ্রামের পরই কিছু না কিছু সামাজিক অগ্রগতি ঘটে থাকলেও, সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা মূলতঃ অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

মাত্র গত একশ বছরের মধ্যেই একটি নতুন ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে।

৩। বর্তমান ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

উপরে দেখা গেল যে, চীনের সমাজ তিন হাজার বছর ধরে সামন্ততান্ত্রিক ছিল। তাহলে এখনো কি ঐ সমাজ সম্পূর্ণরূপে সামান্ততান্ত্রিক? না, চীনের পরিবর্তন ঘটেছে। ১৮৪০ সালের আফিং যুদ্ধের[১৫] পর চীন ক্রমান্বয়ে একটি

আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা অর্থাৎ জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা যখন চীনের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করেছে, তখন থেকে চীন আবার একটা ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়। আমরা এখন এই পরিবর্তনের গতিপথ আলোচনা করব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে, চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ প্রায় তিন হাজার বছর স্থায়ী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিদেশী পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের ফলে চীনা সমাজে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে যায়।

চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পণ্য-অর্থনীতির বিকাশের ফলে তার ভেতরে পুঁজিবাদের বীজ এসে গিয়েছিল। সুতরাং, বিদেশী পুঁজিবাদের প্রভাব ছাড়াও এমনিতেই চীন ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী সমাজে পরিণত হতো। বিদেশী পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। বিদেশী পুঁজিবাদ চীনের সামাজিক অর্থনীতির বিচ্ছিন্নতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একদিনে তা চীনের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাভাবিক অর্থনীতির বুনিয়াদকে ধ্বংস করল এবং শহরে ও কৃষকদের গৃহে উভয়স্থানেই হস্তশিল্পকে ধ্বংস করল, অন্যদিকে চীনের শহরে ও গ্রামাঞ্চলে পণ্য-অর্থনীতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তুলল।

এইসব ঘটনা শুধু চীনের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে ভেঙে ফেলার ব্যাপারেই ভূমিকা পালন করেনি, উপরন্তু চীন দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের পক্ষেও কতকগুলো বাস্তব অবস্থা এবং সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। কারণ স্বাভাবিক অর্থনীতির ধ্বংস পুঁজিবাদের জন্য পণ্যের বাজার সৃষ্টি করেছিল এবং কৃষক ও হস্তশিল্পীদের দেউলিয়াত্ব পুঁজিবাদকে শ্রমশক্তির বাজারও দিয়েছিল।

বস্তুতঃ, বিদেশী পুঁজিবাদের প্রেরণায় এবং সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় কতকগুলি ফাটল দেখা দেওয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে, অর্থাৎ আজ থেকে ষাট বছর আগেই কিছু ব্যবসায়ী, জমিদার ও আমলা আধুনিক শিল্পে অর্থ লগ্নী করতে শুরু করল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বর্তমান শতাব্দী শুরু হবার মুখে, প্রায় ৪০ বছর আগে চীনের জাতীয় পুঁজিবাদ অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপ ফেলে। তারপর প্রায় বিশ বছর আগে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং অস্থায়ীভাবে চীনের ওপর তাদের জুলুমের মাত্রা লাঘব করেছিল বলে চীনের জাতীয় শিল্প, প্রধানতঃ, বয়নশিল্প ও ময়দাকল, আরও বিস্তৃতিলাভ করেছে।

চীনের জাতীয় পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস একই সময়ে চীনের বুর্জোয়া ও সর্বহারাশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসও বটে। ব্যবসায়ী, জমিদার

ও আমলাদের একাংশ যেমন ছিল চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর পূর্বগামী, তেমনি কৃষক ও হস্তশিল্পীদের একাংশ ছিল চীনা সর্বহারাশ্রেণীর পূর্বগামী, চীনা বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণী স্বতন্ত্র সামাজিক শ্রেণী হিসেবে নবজাত, চীনের ইতিহাসে আগে কখনো এদের অস্তিত্ব ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভ থেকে এরা নতুন সামাজিক শ্রেণীরূপে বেরিয়ে এসেছে, এরা পুরানো (সামন্ততান্ত্রিক) সমাজের দুই যমজ সন্তান, একই সংগে পরস্পর-সংযুক্ত এবং পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু চীনের সর্বহারাশ্রেণী চীনের জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথেই শুধু উদ্ভব ও বিকাশলাভ করেনি, পরন্তু চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে চালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সাথেও বিকাশলাভ করেছিল। সুতরাং চীনা সর্বহারাশ্রেণীর এক বিরাট অংশ চীনা বুর্জোয়াদের চেয়ে বয়সে ও অভিজ্ঞতায় অধিকতর প্রবীণ, তাই এ শ্রেণীর সামাজিক শক্তি ও সামাজিক ভিত্তি আরও বৃহৎ ও আরও ব্যাপক।

কিন্তু চীনে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশের পর থেকে যে পরিবর্তন ঘটেছে, পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ তার একটি দিক মাত্র। আরেকটি দিকও রয়েছে, যা প্রথম দিকটির সঙ্গে থাকলেও তার বাধাস্বরূপ। এই দিকটি হচ্ছে, চীনের পুঁজিবাদের বিকাশ রোধের উদ্দেশ্যে চীনের সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগে সাম্রাজ্যবাদের আঁতাত।

চীনের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আক্রমণের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সামন্ততান্ত্রিক চীনকে পুঁজিবাদী চীনে পরিণত করা ছিল না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ঠিক এর বিপরীত—চীনকে নিজেদের আধা-উপনিবেশ ও উপনিবেশে পরিণত করা।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের ওপর সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অত্যাচারের সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছে ও করে যাচ্ছে, যার ফলে চীন ক্রমান্বয়ে একটি আধা-উপনিবেশ এবং উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। ঐ পদ্ধতিগুলি হল এরকম ঃ

(১) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের বিরুদ্ধে বহু আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন কর্তৃক আফিং যুদ্ধ, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফ্রান্স মিত্রশক্তিগুলির যুদ্ধ[১৬], ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন ফরাসী যুদ্ধ[১৭], ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধ[১৮] এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আটটি মিত্র শক্তির আক্রমণ[১৯]। যুদ্ধের মাধ্যমে চীনকে পরাজিত করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চীনের পার্শ্ববর্তী দেশ, যেগুলি পূর্বে চীনের রক্ষণাধীন ছিল, সেগুলিই শুধু দখল করেনি, চীনের নিজস্ব ভুভাগেরও অংশবিশেষ জবরদখল করেছে বা 'ইজারা নিয়েছে'। উদাহরণস্বরূপ, জাপান তাইওয়ান ও পেংহু দ্বীপপুঞ্জ দখল করেছে এবং লুশুন

বন্দর 'ইজারা নিয়েছিল'। ব্রিটেন হংকং কেড়ে নিয়েছে এবং ফ্রান্স কুয়াংচৌ উপসাগর 'ইজারা নিয়েছিল'। রাজ্যদখল ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিপুল অর্থ আদায় করেছিল। এইভাবে তারা চীনের এই বিরাট সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যে গুরুতর আঘাত হেনেছিল।

(২) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনকে অসংখ্য অসম চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে, এর সাহায্যে তারা চীনে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী মোতায়েন করার ও দূতাবাসের ক্ষমতার এক্তিয়ার খাটানোর অধিকার অর্জন করল[২০] এবং সমগ্র চীনকে কতকগুলি সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রভাবাধীন এলাকায় ভাগ করে নিল[২১]।

(৩) এই অসম চুক্তিগুলির মারফত সাম্রজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বন্দরের নিয়ন্ত্রণলাভ করল এবং এইসব বন্দরের অনেকগুলিতে তারা নিজেদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকাগুলি চিহ্নিত করে নিল[২২]। তারা চীনের শুল্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার (সমুদ্রপথ, স্থলপথ, দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথ ও বিমানপথ) নিয়ন্ত্রণলাভ করল। এইভাবে তারা তাদের পণ্যসামগ্রী চীনদেশে বিপুল পরিমাণে বিক্রি করতে, চীনকে তাদের শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজারে পরিণত করতে এবং সাথে সাথে চীনের কৃষিকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনের অধীনে আনতে সমর্থ হয়েছে।

(৪) চীনের কাঁচামাল এবং শস্তা শ্রম যাতে সেখানেই কাজে লাগানো যায়, সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি হাল্কা ও ভারী শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই বহু প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছে, এইভাবে তারা চীনের জাতীয় শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করছে ও চীনের উৎপাদন শক্তিগুলির বিকাশে বাধা দিচ্ছে।

(৫) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীন সরকারকে ঋণ দিয়ে এবং ব্যাঙ্ক স্থাপন করে চীনের ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক ব্যবস্থায় একচেটিয়া অধিকার কায়েম করেছে। এইভাবে তারা যে শুধু পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চীনের জাতীয় পুঁজিবাদকেই কোণঠাসা করে দিয়েছে তাই নয়, উপরন্তু চীনের ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক ব্যবস্থাকেও কব্জা করে নিয়েছে।

(৬) বাণিজ্যিক বন্দরগুলি থেকে শুরু করে দেশের সুদূর পশ্চাদ্ভূমি পর্যন্ত সারা চীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একটি মুৎসুদ্দি ও কারবারী-সুদখোর শোষণের জাল বিস্তার করেছে এবং নিজেদের সেবাদাসরূপে এমন একটি মুৎসুদ্দি ও কারবারী-সুদখোরশ্রেণী তৈরী করেছে, যাতে চীনের কৃষকসমাজ ও জনগণের অন্যান্য অংশকে শোষণের পথ সুগম হয়।

(৭) মুৎসুদ্দিশ্রেণী ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনের সামন্ততান্ত্রিক

জমিদারশ্রেণীকেও চীনদেশে তাদের শাসনের প্রধান স্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়েছে। তারা 'জনসাধারণের অধিকাংশের বিরুদ্ধে প্রথমে আগের সমাজব্যবস্থার শাসকশ্রেণীর সাথে অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক জমিদার, ব্যবসায়ী ও কারবারী-সুদখোর বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে আতাঁত করে। সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের আগের যুগের শোষণের ঐ সমস্ত রূপকে (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) বজায় রাখতে এবং চিরস্থায়ী করতে চেষ্টা করে--যেগুলি তার প্রতিক্রিয়াশীল মিত্রদের অস্তিত্বের ভিত্তিরূপে কাজ করে।[২৩] 'সাম্রাজ্যবাদ তার সমস্ত আর্থিক ও সামরিক শক্তিসহ চীনদেশে এমন একটি শক্তি, যা চীনের সামন্ততান্ত্রিক অবশিষ্টাংশকে ও তার সমগ্র আমলাতান্ত্রিক-সমরতান্ত্রিক উপরি-কাঠামোকে সমর্থন করে, উৎসাহিত করে, লালনপালন করে ও রক্ষা করে।'[২৪]

(৮) চীনের সমরনায়কদের পরস্পরের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যাপৃত রাখার জন্য এবং চীনা জনগণকে দমন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রতিক্রিয়াশীল চীন সরকারকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও একগাদা সামরিক উপদেষ্টা দেয়।

(৯) তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনা জনসাধারণের মনকে বিষাক্ত করার প্রচেষ্টা কখনো শিথিল করেনি। এটা হচ্ছে তাদের সাংস্কৃতিক আক্রমণের নীতি। মিশনারী কার্যকলাপ, হাসপাতাল এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ এবং চীনা ছাত্রদের বিদেশে পড়াশুনায় উৎসাহ দানের মাধ্যমে ঐ নীতি কার্যকরী করা হয়। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুম তামিল করবে এমন সব বুদ্ধিজীবী তৈরী করা এবং চীনের ব্যাপক জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া।

(১০) ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক আক্রমণ আধা-ঔপনিবেশিক চীনের এক বিরাট অংশকে জাপানী উপনিবেশে পরিণত করেছে।

এই সমস্ত তথ্যই সাম্রাজ্যবাদের চীনদেশে আক্রমণের পরে যে নতুন পরিবর্তন ঘটেছে তার অন্যদিক, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক চীনের আধা-সামন্ত্রতান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক চীনে রূপান্তরের এক রক্তাক্ত চিত্র প্রকাশ করে দিচ্ছে।

তাহলে এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একদিকে চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিচ্ছিন্নতা এবং পুঁজিবাদী উপাদানের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে, এবং সামন্তান্ত্রিক সমাজকে আধা-সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করেছে। অন্যদিকে চীনদেশে তাদের নির্মম শাসন চালিয়ে একটি স্বাধীন দেশকে তারা আধা-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত করেছে।

এই দুটি দিক একসাথে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, চীনের ঔপনিবেশিক,

আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আছেঃ

(১) সামন্তযুগের স্বয়ংসপূর্ণ স্বাভাবিক অর্থনীতির বুনিয়াদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার ভিত্তি অর্থাৎ জমিদারশ্রেণী কর্তৃক কৃষকদের শোষণ শুধু অটুটই থাকেনি, বরং মুৎসুদ্দি ও সুদখোর পুঁজির শোষণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তা স্পষ্টতঃই চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ওপর আধিপত্য করছে।

(২) জাতীয় পুঁজিবাদ কিছুটা পরিমাণে বিকাশলাভ করেছে এবং চীনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু চীনের সামাজিক অর্থনীতিতে সে প্রধান রূপ হয়ে উঠতে পারেনি, বরং তার শক্তি খুবই দুর্বল এবং এর অধিকাংশ অল্প-বিস্তর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী সামন্তবাদের সাথে সংযুক্ত।

(৩) সম্রাটদের ও অভিজাতদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন উচ্ছেদ হয়ে গেছে, কিন্তু তার জায়গায় প্রথমে জমিদারশ্রেণীর সমরনায়ক-আমলাদের শাসন এবং পরে জমিদারশ্রেণীর ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বের উদ্ভব হয়েছে। অধিকৃত এলাকায় রয়েছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের শাসন।

(৪) সাম্রাজ্যবাদ চীনের আর্থিক ও অর্থনৈতিক শিরা-উপশিরাগুলিকে শুধু নিয়ন্ত্রণই করে না, অধিকন্তু তার রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অধিকৃত এলাকার সমস্ত কিছুই জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে।

(৫) চীন বহু সাম্রাজ্যবাদী দেশের সম্পূর্ণ বা আংশিক আধিপত্যের মধ্যে দিয়ে এসেছে, বস্তুতঃ, দীর্ঘকাল ধরে চীন অনৈক্যের অবস্থায় রয়েছে এবং ভৌগোলিক আয়তন বিরাট বলে চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ অত্যন্ত অসম।

(৬) সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের দ্বৈত পীড়নের ফলে এবং বিশেষ করে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক আক্রমণের ফলে ব্যাপক চীনা জনগণের, বিশেষ করে কৃষকরা, ক্রমান্বয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে, এমনকি বিরাট সংখ্যায় নিঃস্ব কাঙালের, পর্যায়ে পৌঁছেছে। তারা অনাহারে ও শীতের যন্ত্রণায় কাল কাটায়, এবং তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার নেই। চীনা জনগণ দারিদ্র্য ও স্বাধীনতার অভাবের তুলনা অন্যত্র খুব কমই পাওয়া যায়।

এইগুলি হচ্ছে চীনের ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য।

এই পরিস্থিতি প্রধানতঃ নির্ধারিত হয়েছে জাপানী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা, এ হচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী সামন্তবাদের আঁতাতের ফল।

সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা জাতির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং সামন্তবাদের ও বিপুল জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হচ্ছে আধুনিক চীনা সমাজের মূল দ্বন্দ্ব। অবশ্য অন্য দ্বন্দ্বও রয়েছে, যেমন বুর্জোয়া ও সর্বহারাশ্রেণীর দ্বন্দ্ব এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীগুলির নিজেদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা জাতির মধ্যেকার দ্বন্দ্বই এসবগুলির মধ্যে প্রধান। এই দ্বন্দ্বগুলির সংগ্রাম ও এদের তীব্রতা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে বিপ্লবী আন্দোলনের অবিরাম অগ্রগতি। এই সমস্ত মৌলিক দ্বন্দ্বগুলির ভিত্তিতেই আধুনিক ও সমকালীন চীনের মহান বিপ্লব আবির্ভূত হয়েছে ও বিকশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চীন বিপ্লব

১। গত একশ বছরের বিপ্লবী আন্দোলন

চীনের সামন্তবাদের সঙ্গে আঁতাত করে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীনকে একটি আধা-উপনিবেশে ও উপনিবেশে রূপান্তরিত করার ইতিহাস একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের সংগ্রামের ইতিহাসও বটে। আফিং যুদ্ধ, তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের বিপ্লব, চীন-ফরাসী যুদ্ধ, চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন[২৫], ই হো তুয়ান আন্দোলন[২৬], ১৯১১-র বিপ্লব[২৭], ৪ঠা মে আন্দোলন, ৩০শে মে'র আন্দোলন[২৮], উত্তর অভিযান[২৯] ও কৃষি-বিপ্লবী যুদ্ধ থেকে বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ পর্যন্ত—সমস্তই সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের কাছে চীনা জনগণ যে নতিস্বীকার করতে চান না, তারই অদম্য মনোবলের পরিচায়ক।

গত একশ বছর ধরে চীনা জনগণের অবিচল ও আপোষহীন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্যই সাম্রাজ্যবাদ আজ পর্যন্ত চীনকে পদানত করতে সক্ষম হয়নি, এবং কখনো হবেও না।

এখন যদিও জাপ-সাম্রাজ্যবাদ তার সর্বশক্তি দিয়ে চীনের ওপর সর্বাত্মক অভিযান চালাচ্ছে এবং যদিও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ওয়াং চিং-ওয়েইদের মতো চীনের বহু বড় বড় বুর্জোয়া ও জমিদার ইতিমধ্যেই শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বা করার জন্য তৈরী হচ্ছে, তথাপি বীর চীনা জনগণ নিশ্চয়ই সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে চীন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত চীনা জনগণের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম থামবে না।

১৮৪০ সালের আফিং যুদ্ধ থেকে ধরলে চীনা জনগণের জাতীয় বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসই পুরো একশ বছরের ; ১৯১১ সালের সিনহাই বিপ্লব থেকে ধরলে ত্রিশ বছরের ইতিহাস রয়েছে। এই বিপ্লবের পুরো গতিপথ অতিক্রম করা এখনো বাকি রয়েছে, তার করণীয় কাজগুলিও উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সাথে সমাধা হয়নি, অতএব চীনা জনগণকে এবং সর্বোপরি চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বহন করতে হবে।

তাহলে, এই বিপ্লবের আক্রমণের লক্ষ্য কি কি? এর করণীয় কাজগুলিই বা কি? এর চালিকাশক্তিগুলি কি কি? এর চরিত্র কি? আর এর পরিপ্রেক্ষিতই-বা কি? আমরা এখন এইসব আলোচনা করব।

২। চীন বিপ্লবের লক্ষ্য

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা জেনেছি যে, বর্তমান চীনা সমাজ একটি ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। চীনা সমাজের স্বরূপ বুঝতে পারলেই আমাদের পক্ষে চীন বিপ্লবের লক্ষ্য, করণীয় কাজগুলি, চালিকাশক্তি, চরিত্র, পরিপ্রেক্ষিতে ও ভবিষ্যৎ উত্তরণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হবে। সুতরাং চীনা সমাজের স্বরূপ অর্থাৎ চীনের অবস্থাকে স্পষ্টভাবে বোঝাই হচ্ছে চীন বিপ্লবের সমস্ত সমস্যাকে স্পষ্টভাবে বোঝার মূল ভিত্তি।

যেহেতু বর্তমান যুগের চীনা সমাজের চরিত্র ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক, সুতরাং চীন বিপ্লবের এ স্তরে প্রধান প্রধান লক্ষ্যকি, অথবা শত্রু কারা ?

সেগুলি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের বুর্জোয়াশ্রেণী এবং আমাদের দেশের জমিদারশ্রেণী। কারণ বর্তমান স্তরের চীনা সমাজে এ দুটি শ্রেণীই হচ্ছে চীনা সমাজের অগ্রগতির প্রধান পীড়নকারী ও প্রধান অন্তরায়। এরা পরস্পরের সঙ্গে আঁতাত করে চীনা জনগণকে উৎপীড়ন চালাচ্ছে, আর সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় পীড়নই সবচাইতে তীব্র, তাই সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে চীনা জনগণের প্রধানতম ও হিংস্রতম শত্রু।

চীনের ওপর জাপানের সশস্ত্র আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে চীন বিপ্লবের প্রধান শত্রু হয়েছে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও তার সঙ্গে আঁতাতকারী সকল দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা, যারা প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণ করেছে অথবা করার জন্য তৈরী হচ্ছে—তারা সবাই।

চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী জুলুমের একটি শিকারও বটে। এই শ্রেণী

একদা ১৯১১-র বিপ্লবের মতো বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে বা তার পরিচালনায় একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে ; উত্তর অভিযান ও বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের মতো বিপ্লবী সংগ্রামেও অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল এই বুর্জোয়াশ্রেণীর ওপরের স্তর, অর্থাৎ কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যে অংশের প্রতিনিধিত্ব করে সেই অংশ, সাম্রাজ্যবাদের সাথে আঁতাত করে ও জমিদারশ্রেণীর সাথে প্রতিক্রিয়াশীল মৈত্রীজোট গঠন করে, যে-বন্ধুরা তাদের সাহায্য করেছিল তাদের প্রতি, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি, সর্বহারাশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া অংশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, চীন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তার পরাজয় ঘটিয়েছিল। সুতরাং, তখন বিপ্লবী জনগণ ও বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি (কমিউনিস্ট পার্টি) এই বুর্জোয়াদেরকে বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ না করে পারেনি। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে বৃহৎ জমিদারশ্রেণীর ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর একাংশ, যাদের প্রতিনিধি হল ওয়াং চিং-ওয়েই, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং দেশদ্রোহীতে পরিণত হয়েছে। কাজেই জাপ-বিরোধী জনসাধারণ এসব বৃহৎ বুর্জোয়াদের, যারা জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদেরকে বিপ্লবের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ না করে পারেনি।

তাহলে স্পষ্টতঃই, দেখা যাচ্ছে, চীন বিপ্লবের শত্রুরা অত্যন্ত শক্তিশালী। তাদের মধ্যে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ ও শক্তিশালী সামন্তশক্তি ছাড়াও সময় সময় থাকে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা, যারা জনগণের বিরোধিতা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে আঁতাত করে। সুতরাং চীনের বিপ্লবী জনসাধারণের শত্রুদের শক্তিকে ছোট করে দেখা ঠিক নয়।

এহেন শত্রুদের মুখে দাঁড়িয়ে চীন বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম না হয়ে পারে না। আমাদের শত্রুরা অত্যন্ত শক্তিশালী বলে অবশেষে তাদের বিপর্যস্ত করতে হলে দীর্ঘকাল ব্যতীত বিপ্লবী শক্তিগুলিকে এই কাজের সমর্থ করে তোলা ও গড়ে তোলা অসম্ভব। শত্রু চীন বিপ্লবকে অত্যন্ত নির্মমভাবে দমন করে বলে বিপ্লবী শক্তিগুলি নিজেদের ইস্পাত-দৃঢ় করে তুলতে এবং কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে লেগে থাকতে বাধ্য, তা না হলে নিজেদের অবস্থান দখল করতে তারা ব্যর্থ হবে। সুতরাং এটা ভাবা ভুল হবে যে, চীনা বিপ্লবী শক্তিগুলিকে চোখের পলকে গড়ে তোলা যায় অথবা চীনের বিপ্লবী সংগ্রাম রাতারাতি জয়যুক্ত হতে পারে।

এহেন শত্রুদের মুখে চীন বিপ্লবের প্রধান পন্থা, চীন বিপ্লবের প্রধান রূপ অবশ্যই হবে সশস্ত্র, শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম নয়। কারণ আমাদের শত্রুরা চীনা জনগণের

পক্ষে শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপ চালানো অসম্ভব করে দিয়েছে এবং সমস্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। স্তালিন বলেছেন ঃ 'চীনদেশে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লববের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, এটা চীন বিপ্লবের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির ও সুবিধাগুলির অন্যতম।'[৩০] এই সূত্র সম্পূর্ণ সঠিক। অথএব, সশস্ত্র, সংগ্রাম, বিপ্লবী যুদ্ধ, ও সেনাবাহিনীর কাজকে ছোট করে দেখা ভুল হবে।

এহেন শত্রুদের মুখে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার প্রশ্নও ওঠে। যেহেতু চীনের প্রধান শহরগুলো দীর্ঘকাল যাবৎ শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ ও তার চীনা প্রতিক্রিয়াশীল মিত্র বাহিনীর দখলে আছে, সেইহেতু যদি বিপ্লবী বাহিনী সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের সাথে আপোষ করতে না চায়, বরং দৃঢ়ভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে চায়, যদি তারা নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করতে ও নিজেদের শক্তিকে পোড় খাইয়ে মজবুত করতে চায়, এবং নিজেদের শক্তি যখন যথেষ্ট নয় তখন যদি শক্তিশালী শত্রুর সাথে জয় পরাজয়ের চূড়ান্ত লড়াই এড়াতে চায়, তাহলে অনগ্রসর গ্রামাঞ্চলগুলোকে অবশ্যই অগ্রসর সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকায় পরিণত করতে হবে, সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিরাট বিপ্লবী দুর্গে পরিণত করতে হবে, যাতে করে তারা সেই হিংস্র শত্রুদের—যারা গ্রামীণ এলাকাগুলোকে আক্রমণের জন্য শহরগুলোকে ব্যবহার করছে, তাদের বিরোধিতা করতে পারে, আর এইভাবেই দীর্ঘকালীন লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে ধাপে ধাপে অর্জন করতে হবে বিপ্লবের পূর্ণ বিজয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, যেহেতু চীনের অর্থনৈতিক বিকাশ অসম (তার অর্থনীতি ঐক্যবদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয়), তার ভুখণ্ড বিস্তৃত (যার ফলে বিপ্লবী শক্তিগুলির চলাফেরা করার জায়গা আছে,) চীনা প্রতিবিপ্লবী শিবির অনৈক্য ও অতর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ এবং চীন বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকদের সংগ্রাম সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়, সেহেতু একদিকে চীন বিপ্লবের বিজয় প্রথমে গ্রামাঞ্চলে অর্জন করা সম্ভব ; অপরদিকে, এইসব অবস্থায় বিপ্লবকে অসম করে তোলে এবং সম্পূর্ণ বিজয়ের কাজকে দীর্ঘস্থায়ী ও কষ্টকর করে তোলে। তাহলে স্পষ্টতঃই, এ ধরনের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাগুলিতে চালিত দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী সংগ্রাম হবে প্রধানতঃ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত কৃষকদের গেরিলাযুদ্ধ। সুতরাং গ্রামাঞ্চলকে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকারূপে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা, কৃষকদের মধ্যে পরিশ্রম সহকারে কাজ করাকে তুচ্ছ করা এবং গেরিলাযুদ্ধ উপেক্ষা করা ভুল হবে।

অবশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের ওপরে জোর দেওয়ার অর্থ সংগ্রামের অন্যান্য রূপগুলিকে বিসর্জন করা নয়। বরং অন্যান্য ধরনের সংগ্রামের সাথে সমন্বয় না ঘটালে সশস্ত্র সংগ্রাম সফল হতে পারে না। গ্রাম্য ঘাঁটি এলাকাগুলিতে কাজের ওপর জোর দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, শহরগুলিতে ও যে বিশাল গ্রাম্য এলাকা এখনো শত্রুর শাসনাধীনে রয়েছে সেখানে আমাদের কাজ বর্জন করে দিতে হবে। বরং শহরগুলিতে ও অন্যান্য গ্রাম্য এলাকায় যদি কাজ না করা যায়, তাহলে আমাদের নিজেদের গ্রাম্য ঘাঁটি এলাকাগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং বিপ্লবের পরাজয় ঘটবে। এছাড়া বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুর প্রধান ঘাঁটি হিসেবে শহরগুলিকে দখল করা আর শহরগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে কাজ ছাড়া এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব হবে।

এটাও সুস্পষ্ট যে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শত্রুর প্রধান হাতিয়ার অর্থাৎ তার সৈন্যবাহিনীর ধ্বংস ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে ও শহরে কোথাও বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না। সুতরাং, যুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করা ছাড়া তাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে।

এটাও সুস্পষ্ট যে, দীর্ঘকাল ধরে শত্রু-অধিকৃত প্রতিক্রিয়াশীল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন শহরগুলিতে ও গ্রামাঞ্চলে প্রচার ও সাংগঠনিক কাজে কমিউনিস্ট পার্টিকে কিছুতেই অধীর ও হঠকারী হলে চলবে না, বরং পার্টির নিম্নোক্ত নীতি অবলম্বন করা উচিত ঃ পার্টির নিশ্চয়ই সুনির্বাচিত কর্মী থাকবে, যারা আত্মগোপন করে কাজ করবে, শক্তি সঞ্চয় করবে এবং সেখানে সুযোগের প্রতীক্ষা করবে। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে পরিচালিত করতে গিয়ে পার্টিকে যে কৌশল অবলম্বন করতে হবে তা হচ্ছে ঃ সমস্ত প্রকাশ্য ও বৈধ আইন, হুকুম ও সামাজিক রীতিনীতির অনুমোদিত আওতার মধ্যে কাজকর্ম চালিয়ে ন্যায্য, সুবিধাজনক ও সুসংযত নীতিকে ভিত্তি করে এক-পা এক-পা করে ধীরে ধীরে ও সুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হওয়া ঃ শূন্যগর্ভ চিৎকার ও বেপরোয়া পদ্ধতিতে সাফল্য আনা অসম্ভব।

৩। চীন বিপ্লবের করণীয় কাজ

এই স্তরে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণী যখন চীন বিপ্লবের প্রধান শত্রু, তখন চীন বিপ্লবের বর্তমান করণীয় কাজ কি ?

নিঃসন্দেহে প্রধান করণীয় কাজ হচ্ছে এই দুই শত্রুর উপর আঘাত হানা, অর্থাৎ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পীড়নকে উচ্ছেদ করে জাতীয় বিপ্লব সমাধা করা এবং দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর পীড়নকে উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক বিপ্লব

সমাধা করা, আর সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে জাতীয়বিপ্লব সমাধা করা।

চীন বিপ্লবের এই বিরাট কাজ দুটি পরস্পর সম্পর্কিত। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদ না হলে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর শাসনের অবসান ঘটানো অসম্ভব, কারণ সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে ঐ শ্রেণীর প্রধান অবলম্বন। বিপরীতক্রমে, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামে যদি কৃষকদের সহায়তা করা না হয়, তাহলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদ করার জন্য শক্তিশালী বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলা অসম্ভব হবে, কারণ চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রধান সামাজিক ভিত্তি হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার শ্রেণী এবং কৃষকশ্রেণী হচ্ছে চীন বিপ্লবের প্রধান শক্তি। সুতরাং এই দুটি মৌলিক কাজ—জাতীয় বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব একই সময়ে পৃথক ও ঐক্যবদ্ধ।

যেহেতু চীনের জাতীয় বিপ্লবের আশু প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জাপ-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের প্রতিহত করা, এবং যেহেতু যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যই সমাধা করতে হবে, সুতরাং বিপ্লবী কাজ দুটি ইতিপূর্বেই সংযুক্ত হয়ে গেছে। জাতীয় বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিপ্লবের দুটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন স্তর রূপে মনে করা ভুল হবে।

৪। চীন বিপ্লবের চালিকাশক্তি

পূর্বোল্লিখিত বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞা অনুসারে চীনের সমাজের চরিত্র, চীন বিপ্লবের বর্তমান লক্ষ্যগুলি এবং চীন বিপ্লবের করণীয় কাজগুলি কি, তা জানা গেল। তাহলে চীন বিপ্লবের চালিকাশক্তি কি?

যেহেতু চীনের সমাজ ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক, যেহেতু চীন বিপ্লবের আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে প্রধানতঃ চীনে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও দেশীয় সামন্তবাদ এবং যেহেতু চীন বিপ্লবের করণীয় কাজ হচ্ছে এই দুই জুলুমবাজকে উচ্ছেদ করা, সেইহেতু চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী শক্তি হতে সমর্থ? এটা হচ্ছে বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবের চালিকাশক্তির প্রশ্ন। চীন বিপ্লবের মূল রণকৌশলের সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য এ প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে বোঝা অপরিহার্য।

বর্তমান যুগে চীনা সমাজে কি কি শ্রেণী আছে? জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী ; জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর উপরিস্তরই হচ্ছে চীনা সমাজের শাসকশ্রেণী। আর আছে সর্বহারাশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণী ছাড়া বিভিন্ন ধরনের পেটি-বুর্জোয়া ; চীনদেশের সুবিস্তীর্ণ এলাকায় এই তিনটি শ্রেণী এখনো পরাধীন শ্রেণী।

চীন বিপ্লবের প্রতি এসব শ্রেণীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয়। এভাবে চীনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্রই বিপ্লবের লক্ষ্য ও করণীয় কাজগুলি নির্ধারণ করার সংগে সংগে বিপ্লবের চালিকাশক্তিও নির্ধারণ করে দেয়।

চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী এখন বিশ্লেষণ করা যাক।

(ক) জমিদারশ্রেণী ঃ জমিদারশ্রেণী হচ্ছে চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রধান সামাজিক ভিত্তি; এই শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের শোষণও পীড়ন করে, চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চীনা সমাজের বিকাশের পথ রুদ্ধ করে এবং আদৌ কোন প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে না।

অতএব শ্রেণী হিসেবে জমিদারশ্রেণী বিপ্লবের আক্রমণের লক্ষ্য, বিপ্লবের কোন চালিকাশক্তি নয়।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে বৃহৎ জমিদারদের এক অংশ বৃহৎ বুর্জোয়াদের এক অংশের (আত্মসমর্পণপন্থী) সংগে একযোগে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং দেশদ্রোহীতে পরিণত হয়েছে ; বৃহৎ জমিদারদের আরেক অংশ বৃহৎ বুর্জোয়াদের আরেকটি অংশের (গোঁড়াপন্থী) সংগে একযোগে ক্রমেই বেশি করে দোদুল্যমানতা দেখাচ্ছে, যদিও এখনো তারা জাপ-বিরোধী শিবিরেই রয়েছে। কিন্তু আলোকপ্রাপ্ত ভদ্রলোকদের বেশ কিছু সংখ্যক, যারা মাঝারি ও ছোট জমিদারের স্তর থেকে আসে এবং যাদের কিছুটা পুঁজিবাদের চরিত্র আছে, প্রতিরোধ-যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দেখাচ্ছে এবং জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এদের সাথে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।

(খ) বুর্জোয়াশ্রেণী ঃ মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য আছে।

মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়া এমন একটি শ্রেণী, যারা সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পুঁজিপতিদের জন্য কাজ করে এবং তাদের দ্বারা প্রতিপালিত হয় ; গ্রামাঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগে তারা অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাই চীন বিপ্লবের ইতিহাসে এ শ্রেণী কখনো চালিকাশক্তি হয়নি বরং সে হয়েছে চীন বিপ্লবের একটি লক্ষ্যস্থল।

তবু মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রতি অনুগত, ফলে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং বিপ্লব প্রধানতঃ একটি বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে চালিত

হয়, তখন অন্য সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির স্বার্থবাহী মুৎসুদ্দি শ্রেণী অংশগুলির পক্ষে কিছুটা পরিমাণে ও কিছু সময়ের জন্য তখনকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে যোগদান করা সম্ভব হয়। কিন্তু তাদের প্রভুরা যে মুহূর্তে চীন বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সেই মূহুর্তে তারাও বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে জাপ-সমর্থক বৃহৎ বুর্জোয়ারা আত্মসমর্পণপন্থীরা) (আত্মসমর্পণ করেছে, বা করার জন্য তৈরী হচ্ছে। ইউরোপের সমর্থক ও মার্কিন-সমর্থক বৃহৎ বুর্জোয়ারা (গোঁড়াপন্থী) যদিও এখনো পর্যন্ত জাপ বিরোধী শিবিরে আছে, তবু ক্রমান্বয়েই তারা অধিকতর দোদুল্যমান হচ্ছে এবং একই সময়ে জাপানকে প্রতিরোধ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করার দ্বিমুখী খেলা খেলছে। বৃহৎ বুর্জোয়া আত্মসমর্পণপন্থীদের সম্পর্কে আমাদের নীতি হচ্ছে তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করা ও তাদের দৃঢ়ভাবে উৎখাত করা। আর বৃহৎ বুর্জোয়া গোঁড়াপন্থীদের প্রতি আমাদের নীতি হবে বিপ্লবী দ্বৈত নীতি ; অর্থাৎ একদিকে আমরা তাদের সংগে ঐক্যবদ্ধ হব, কারণ তারা এখনো জাপ-বিরোধী, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বগুলিকে আমরা কাজে লাগাব ; অন্যদিকে আমরা দৃঢ়ভাবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব, কারণ তারা প্রতিরোধ ও ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কমিউনিস্ট বিরোধী ও জনগণ-বিরোধী দমননীতি অনুসরণ করে চলেছে ; এবং এ ধরনের সংগ্রাম না করলে প্রতিরোধ ও ঐক্য দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী হচ্ছে দ্বৈত চরিত্রবিশিষ্ট একটি শ্রেণী।

একদিকে এরা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক অত্যাচারিত এবং সামন্তবাদ দ্বারা শৃংখলিত, কাজেই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ উভয়ের সাথেই তাদের দ্বন্দ্ব আছে। এদিক থেকে এরা বিপ্লবী শক্তিগুলির অন্যতম। চীন বিপ্লবের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং আমলা ও সমরনায়কদের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এরাও একদা কিছু পরিমাণে উৎসাহ দেখিয়েছে।

কিন্তু অন্যদিকে যেহেতু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এরা দুর্বল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সংগে এদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক এখনো সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়নি, সেহেতু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা করার পূর্ণ সাহস এদের নেই। জনসাধারণের বিপ্লবী শক্তিগুলো যখন শক্তিশালী হয়, তখন এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জাতীয় বুর্জোয়াদের এই দ্বৈত চরিত্রের ফলে কোন নির্দিষ্ট সময়ে ও কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে এরা সাম্রাজ্যবাদ এবং বিপ্লবী শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার

অন্য সময়ে তারা মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুগামী হতে পারে ও প্রতিবিপ্লবে তাদের সহচর হতে পারে, সে বিপদও রয়েছে।

চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী প্রধানতঃ মাঝারি বুর্জোয়া ; প্রকৃতপক্ষে এরা কখনো রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়নি, এবং ক্ষমতাসীন বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির দ্বারা এরা বাধাপ্রাপ্তই হয়েছে, যদিও ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত (১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার আগে) বিপ্লবের বিরোধিতা করার ব্যাপারে এরা বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী অনুসরণ করেছিল। বর্তমান যুদ্ধে বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মসমর্পণকারীদের সাথেই শুধু এদের পার্থক্য নেই, অধিকন্তু বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী গোঁড়াপন্থীদের সাথেও এদের পার্থক্য আছে ; এখনো পর্যন্ত এরা আমাদের মোটামুটি ভাল মিত্র। সুতরাং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি বিচক্ষণ পন্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

(গ) কৃষক ছাড়া পেটি-বুর্জোয়াদের অন্যান্য অংশ ঃ কৃষক ছাড়া যে পেটি বুর্জোয়ারা, তার মধ্যে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, ছোট ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী এবং স্বাধীন পেশাদারেরা।

এইসব পেটি-বুর্জোয়াদের অবস্থান কিছু পরিমাণে মাঝারি কৃষকদের মতো। তারা সকলেই সাম্রাজ্যবাদ , সামন্তবাদ ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর নিপীড়ন ভোগ করে ; ক্রমান্বয়ে তারা দেউলিয়া ও নিঃস্ব হবার দিকে চলেছে।

অতএব, পেটি-বুর্জোয়াদের এইসব অংশ বিপ্লবের অন্যতম চালিকাশক্তি এবং সর্বহারাশ্রেণীর নির্ভরযোগ্য মিত্র। শুধু সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই তারা তাদের মুক্তি অর্জন করতে পারে।

এখন আমরা কৃষক বাদে পেটি-বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ করব।

প্রথমতঃ, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-যুব। এরা কোন আলাদা শ্রেণী বা স্তর নয়। কিন্তু পারিবারিক উৎপত্তি, জীবনযাত্রার অবস্থা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে বর্তমান চীনে এদের অধিকাংশই পেটি-বুর্জোয়া স্তরের আওতায় পড়ে। গত কয়েক দশকে চীনে একটি বিরাট বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-যুব সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়েছে। এদের মধ্যে যে অংশটি সাম্রাজ্যবাদীদের ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের পক্ষে কাজ করে এবং জনগণের বিরোধিতা করে তারা ছাড়া অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা অত্যাচারিত, এবং বেকারত্বের ভয়ে অথবা লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার আশংকায় কাল কাটায়। অতএব, তাদের বেশ প্রবণতা রয়েছে বিপ্লবী হওয়ার দিকে। এদের

কমবেশি বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে, তীব্র রাজনৈতিক বোধ আছে এবং চীন বিপ্লবের বর্তমান স্তরে এরা সচরাচর অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করে ও জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ-সেতু হিসেবে কাজ করে। এর জ্বলন্ত প্রমাণ, ১৯১১ সালের বিপ্লবের আগে বিদেশস্থ চীনা ছাত্রদের আন্দোলন, ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র আন্দোলন, ১৯২৫ সালের ৩০শে মে'র আন্দোলন, ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন। বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত গরিব বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী শ্রমিকদের ও কৃষকদের সঙ্গে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে ও তার সমর্থন করতে পারে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শ চীনে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবিষ্ট ও গৃহীত হয় সর্বপ্রথম বুদ্ধিজীবী ও তরুণ ছাত্রদের মধ্যেই। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সাফল্যের সাথে সংগঠিত করা এবং বিপ্লবী কাজ সাফল্যের সাথে চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামে কায়মনোবাক্যে ঝাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত, অথবা জনসাধারণের স্বার্থের সেবা করতে এবং তাঁদের সঙ্গে মিশে যেতে দৃঢ়সংকল্প না হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীরা প্রায়শঃই আত্মমুখীবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী হবার প্রবণতা দেখায় ; তখন তাদের চিন্তাধারা প্রায়ই বাস্তববিমুখ হয়ে থাকে এবং তাদের কার্যকলাপও হয়ে থাকে দ্বিধাগ্রস্ত। তাই চীনের ব্যাপক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী যদিও অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করতে পারে এবং জনসাধরণের সঙ্গে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতে পারে, তবুও এইসব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবাই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী থাকবে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিপ্লবের জরুরী মুহূর্তে বিপ্লবী বাহিনী থেকে সরে পড়তে পারে এবং নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করতে পারে ; আবার কিছু সংখ্যক লোক বিপ্লবের শত্রুতে পরিণত হতে পারে। কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বুদ্ধিজীবীরা এই ত্রুটি স্খালন করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ। এরা ছোট দোকান চালায়, এরা সাধারণতঃ কোন সহকারীই নিযুক্ত করে না বা কেবল অল্প কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত করে। সাম্রাজ্যবাদ, বৃহৎ বুর্জোয়া ও সুদখোরদের শোষণের ফলে এরা দেউলিয়া হওয়ার আশংকায় দিন কাটায়।

তৃতীয়তঃ, হস্তশিল্পীরা। এদের সংখ্যা প্রচুর। এদের নিজেদের উৎপাদনের উপকরণ আছে। এরা কোন মজুর ভাড়া করে না ; বা কেবলমাত্র দু একজন শিক্ষানবীশ অথবা সাহায্যকারী রাখে। এদের অবস্থান মাঝারি কৃষকদের মতো।

চতুর্থতঃ, স্বাধীন পেশাদাররা। এদের মধ্যে রয়েছে ডাক্তারসহ বিভিন্ন পেশার লোক। এরা অন্যদের শোষণ করে না, করলেও খুব কম মাত্রায়। এদের অবস্থান

হস্তশিল্পীদের মতো।

পেটি-বুর্জোয়া স্তরের এই অংশগুলি নিয়ে জনসমষ্টির এক বিরাট অংশ গঠিত, এরা সাধারণতঃ বিপ্লবে যোগ দিতে পারে কিংবা বিপ্লব সমর্থন করতে পারে, এবং এরা বিপ্লবের সাচ্চা মিত্র। কাজেই আমরা অবশ্যই এদের স্বপক্ষে টেনে আনব এবং এদের স্বার্থ আমরা রক্ষা করব। এদের দুর্বলতা হচ্ছে, এদের মধ্যে কেউ কেউ সহজেই বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব এদের মধ্যে মনোযোগের সংগে আমাদের বিপ্লবী প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ চালাতে হবে।

(ঘ) কৃষকশ্রেণী ঃ চীনের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই কৃষক, এবং বর্তমানে তারা চীনের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান শক্তি।

কৃষকশ্রেণীর মধ্যে এক তীব্র স্তরবিভাগের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রথমতঃ, ধনী কৃষক। এরা গ্রাম্য জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫ ভাগ (জমিদারসহ প্রায় শতকরা ১০ ভাগ) এবং এরাই হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়া শ্রেণী। চীনের অধিকাংশ ধনী কৃষক নিজেদের জমির একাংশ ভাড়া দেয়, সুদখোরী কারবার করে এবং ক্ষেতমজুরদের নির্মমভাবে শোষণ করে, তাই এরা আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রবিশিষ্ট। কিন্তু সাধারণতঃ এরা নিজেরা পরিশ্রম করে এবং সেদিক থেকে কৃষকশ্রেণীরই অংশ। ধনী কৃষকদের উৎপাদনের রূপ কিছু নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত প্রয়োজনে লাগবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কৃষকসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে এরা কিছু পরিমাণে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষি-বিপ্লবের সংগ্রামে এরা নিরপেক্ষও থাকতে পারে। সুতরাং ধনী কৃষক ও জমিদারদের অভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করা আমাদের উচিত হবে না, এবং ধনী কৃষকদের উৎখাতের নীতি অকালে গ্রহণ করাও উচিত হবে না।

দ্বিতীয়তঃ, মাঝারি কৃষক। এরা চীনের গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। এরা সচরাচর অন্যদের শোষণ করে না, অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংনির্ভর (ফসল ভাল হলে এদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকতে পারে এবং মাঝে মাঝে এরা কিছু মজুর ভাড়া খাটায় অথবা অল্পস্বল্প টাকা সুদে ধার দেয়)। এরা সাম্রাজ্যবাদ, জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা শোষিত হয়। এদের কোন রাজনৈতিক অধিকার থাকে না। এদের অনেকেরই যথেষ্ট জমি নেই, কেবলমাত্র কিছু সংখ্যকের (অবস্থাপন্ন মাঝারি কৃষকদের) সামান্য উদ্বৃত্ত জমি আছে। মাঝারি কৃষকরা যে শুধু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবে ও কৃষি-বিপ্লবে যোগ দিতে পারে তাই নয়, এরা সমাজতন্ত্রও গ্রহণ করতে পারে। অতএব, সমস্ত মাঝারি কৃষকই

সর্বহারাশ্রেণীর নির্ভরযোগ্য মিত্র হতে পারে এবং হতে পারে বিপ্লবের চালিকাশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাঝারি কৃষকদের ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব হচ্ছে বিপ্লবের জয় অথবা পরাজয় নির্ধারণের অন্যতম উপাদান এবং কৃষি-বিপ্লবের পরে যখন এরা গ্রাম্য জনসাধারণের অধিকাংশে পরিণত হয়, তখন এটা বিশেষভাবে সত্য।

তৃতীয়তঃ, গরিব কৃষক। চীনের গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুর মিলে গ্রাম্য জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ। এরা হচ্ছে ব্যাপক কৃষকসাধারণ, যাদের জমি নেই বা যথেষ্ট জমি নেই। এরা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের আধা-সর্বহারাশ্রেণী, চীন বিপ্লবের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি, সর্বহারাশ্রেণী, স্বাভাবিক ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র এবং চীন বিপ্লবী বাহিনীর প্রধান শক্তি। শুধু সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই গরিব ও মাঝারি কৃষকরা নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে পারে ; কেবল-মাত্র গরিব ও মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী গঠন করেই তবে সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার নেতৃত্ব দিতে পারে, অন্যথায় এর কোনটিই সম্ভব নয়। 'কৃষক' শব্দটিতে প্রধানতঃ গরিব ও মাঝারি কৃষকদেরই বোঝানো হয়েছে।

(ঙ) সর্বহারাশ্রেণী ঃ চীনের সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে আধুনিক শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ, শহরের ছোটখাট শিল্পে ও হস্তশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক এবং দোকানের কর্মচারীর মোট সংখ্যা প্রায় ১২০ লক্ষ, তা ছাড়া রয়েছে বিরাট সংখ্যক গ্রাম্য সর্বহারা (ক্ষেতমজুর) এবং শহরের ও গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য সম্পত্তিহীন মানুষ।

অর্থনীতির সবচেয়ে উন্নত রূপের সঙ্গে সংযোগ, সবল সংগঠন ও শৃঙ্খলাবোধ এবং ব্যক্তিগত উৎপাদন-উপকরণের অভাব—সব দেশের সর্বহারাশ্রেণীর এই মৌলিক গুণগুলি চীনা সর্বহারাশ্রেণীরও রয়েছে, কিন্তু তা ছাড়াও চীনা সর্বহারা শ্রেণীর অন্যান্য অনেক বিশেষ গুণ রয়েছে।

সেগুলি কি কি ?

প্রথমতঃ, চীনের সর্বহারা ত্রিবিধ অত্যাচারের সম্মুখীন (সাম্রাজ্যবাদী, বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক) এবং তীব্রতা ও নিষ্ঠুরতার দিক থেকে এই ধরনের অত্যাচার পৃথিবীর সকল দেশে বিরল বলে এরা অন্যান্য যে-কোন শ্রেণীর চেয়ে বিপ্লবী সংগ্রামে বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে সবচেয়ে বদ্ধপরিকর। যেহেতু ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক চীনে ইউরোপের মতো সমাজ-সংস্কারবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই, সেইহেতু অল্পসংখ্যক দালাল বাদে সমগ্র সর্বহারাশ্রেণীই সর্বাধিক বিপ্লবী।

দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের মুহূর্ত থেকেই চীনের সর্বহারাশ্রেণী তার নিজস্ব বিপ্লবী পার্টি—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে চীনা সমাজের সবচেয়ে চেতনাসম্পন্ন শ্রেণী হয়ে ওঠে।

তৃতীয়তঃ, উৎপত্তির দিক থেকে চীনের সর্বহারাদের অধিকাংশই দেউলিয়া কৃষক দ্বারা গঠিত বলে কৃষকসাধারণের সঙ্গে তার স্বাভাবিক বন্ধন রয়েছে, ফলে তার পক্ষে কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীস্থাপনে সুবিধে হয়েছে।

তাই, কতকগুলি অপরিহার্য দুর্বলতা, যেমন সংখ্যালঘিষ্ঠতা (কৃষকদের তুলনায়), অল্প বয়স (পুঁজিবাদী দেশগুলির সর্বহারাদের তুলনায়) ও শিক্ষার নিচু মান (বুর্জোয়াদের তুলনায়) সত্ত্বেও চীনের সর্বহারাশ্রেণী চীন বিপ্লবের সবচেয়ে মূল চালিকাশক্তি। সর্বহারাশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত না হলে চীন বিপ্লব অবশ্যই জয়যুক্ত হতে পারে না। অতীতের একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ১৯১১ সালের সিনহাই বিপ্লব অকালে মৃত সন্তান প্রসব করেছে, কারণ সর্বহারাশ্রেণী সচেতনভাবে ঐ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেনি এবং কমিউনিস্ট পার্টির তখন অস্তিত্ব ছিল না। আরও সম্প্রতিকালে, ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লব কিছুদিনের জন্য বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল, তার কারণ তখন সর্বহারাশ্রেণী সচেতন ভাবেই এতে যোগ দিয়েছিল ও নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং কমিউনিস্ট পার্টির ইতিমধ্যেই জন্ম হয়েছে। কিন্তু পরে আবার বৃহৎ বুর্জোয়ারা সর্বহারার সাথে প্রতিষ্ঠিত মৈত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ও সাধারণ বিপ্লবী কর্মসূচী পরিত্যাগ করেছিল এবং একই সময় তৎকালীন চীনের সর্বহারাশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টি যথেষ্ট বিপ্লবী অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি, ফলে এই বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। আজকের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের কথাই ধরা যাক, যেহেতু জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেইহেতু গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে, মহান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু করা সম্ভব হয়েছে ও দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

চীনের সর্বহারাশ্রেণীকে অবশ্যই এ কথা বুঝতে হবে যে, শ্রেণী হিসেবে যদিও তার সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক চেতনা ও সাংগঠনিক বোধ রয়েছে, তথাপি সে নিজের শক্তিতে একাকী জয়লাভ করতে পারে না। বিজয়ী হতে হলে তাকে বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে পারে এমন সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট সংগঠিত করতে হবে। চীনা সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে কৃষকশ্রেণীই শ্রমিকশ্রেণীর সুদৃঢ় মিত্রবাহিনী, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া ও নির্ভরযোগ্য মিত্রবাহিনী, এবং কোন কোন সময়ে ও কিছু পরিমাণে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী একটি মিত্রবাহিনী হতে

পারে। এটি হচ্ছে আধুনিক চীন বিপ্লবের ইতিহাসের প্রমাণিত মৌলিক নিয়মগুলির একটি।

(চ) **ভবঘুরে :** উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশরূপে চীনের অবস্থা বিরাট সংখ্যক গ্রাম্য ও শহুরে বেকার সৃষ্টি করেছে। জীবনধারণের উপযুক্ত উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে এদেরই অনেককে বাধ্য হয়ে বে-আইনী পথ গ্রহণ করতে হয়েছে; সেইজন্যই এত দস্যু, গুণ্ডা ভিখারী, বেশ্যা ও নানা কুসংস্কারজীবী দেখা যায়। এই সামাজিক স্তর হচ্ছে অস্থায়ী ; এদের একাংশকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সহজেই কিনে নিতে পারে, বাকিরা বিপ্লবে যোগ দিতে পারে। এদের মধ্যে গঠনমূলক গুণাবলীর অভাব এবং গঠনের থেকে ধ্বংস করার দিকেই এদের প্রবণতা বেশি। বিপ্লবে যোগদানের পর তারা বিপ্লবী বাহিনীতে ভ্রাম্যমাণ বিদ্রোহী ও নৈরাজ্যবাদী মতাদর্শের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, এদের চরিত্র কিভাবে সংশোধন করতে হবে তা আমাদের জানা উচিত এবং এদের ধ্বংসমূলক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

উপরে আমরা চীন বিপ্লবের চালিকাশক্তির বিশ্লেষণ করলাম।

৫। চীন বিপ্লবের চরিত্র

আমরা এখন চীনা সমাজের প্রকৃতি অর্থাৎ চীনের বিশেষ অবস্থা বুঝতে, পেরেছি, চীনের সমস্ত বিপ্লবী সমস্যা সমাধানের জন্য এই জ্ঞান হল মূল ভিত্তি। চীন বিপ্লবের লক্ষ্য, করণীয় কাজ ও চালিকাশক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও পরিষ্কার হয়েছে। এগুলি হচ্ছে চীনা সমাজের বিশেষ প্রকৃতি অর্থাৎ চীনের বিশেষ অবস্থা থেকে উদ্ভুত চীন বিপ্লবের বর্তমান স্তরের মৌলিক সমস্যা। এগুলো বুঝবার পর বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবের অন্য একটি মৌলিক বিষয়, অর্থাৎ চীন বিপ্লবের চরিত্র আমরা এখন বুঝতে চেষ্টা করব।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবের চরিত্র কি? এটা কি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, না সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব? স্পষ্টতঃই শেষেরটি নয়, প্রথমটি।

যেহেতু চীনা সমাজ ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক, যেহেতু চীন বিপ্লবের প্রধান শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ, যেহেতু চীন বিপ্লবের করণীয় কাজ হচ্ছে এই দুই প্রধান শত্রুকে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করা, যে বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণী সময় সময় অংশগ্রহণ করে, বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপ্লবের শত্রু হয়ে দাঁড়ালেও এই বিপ্লবের গতি সাধারণভাবে পুঁজিবাদের ও পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে চালিত নয়, চালিত সাম্রাজ্যবাদের ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে এবং যেহেতু

এর সবগুলিই সত্য--সেইহেতু বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লবের চরিত্র সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক নয়, বরং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক।[৩১]

কিন্তু আজকের চীনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর পুরানো সাধারণ ধরনের নয়--তা এখন অচল হয়ে গেছে, বরং এ এক নতুন বিশেষ ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই ধরনের বিপ্লব এখন চীনে ও সকল ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিকাশলাভ করে চলেছে, আমরা একে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে অভিহিত করি। এ ধরনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্ব সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই-অংশ, কারণ এ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের দৃঢ় বিরোধী। রাজনৈতিক দিক থেকে এ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের ওপরে কয়েকটি বিপ্লবীশ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্ব স্থাপন করতে চায় এবং চীনের সমাজকে বুর্জোয়া একনায়কত্বাধীন সমাজে রূপান্তরের বিরোধিতা করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তা সাম্রাজ্যবাদীদের এবং দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বড় বড় পুঁজি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে এবং জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে ; একই সময় তা সাধারণ ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান রক্ষা করে এবং ধনী কৃষকদের অর্থনীতিকে উৎখাত করে না। এইভাবে এই নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব একদিকে পুঁজিবাদের জন্য রাস্তা সাফ করে এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের জন্য পূর্বাবস্থার সৃষ্টি করে। চীন বিপ্লবের বর্তমান স্তর হচ্ছে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিলুপ্তি ও একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠার অন্তর্বর্তীকালীন স্তর অর্থাৎ একটি নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পর এবং চীনে এর সূত্রপাত হয় ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনে। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লব। কেবলমাত্র এই বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই চীনা সমাজ সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে পারে, এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।

ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির সঙ্গে এই ধরনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরাট পার্থক্য রয়েছে, এই বিপ্লবের পরিণতি বুর্জোয়া একনায়কত্ব নয়, বরং সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্তফ্রন্টের একনায়কত্ব। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন প্রতিটি ঘাঁটি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা হল জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতা, এটা বুর্জোয়া অথবা সর্বহারা কোন এক শ্রেণীর একনায়কত্ব নয়, বরং সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে

সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্ব। পার্টি-আনুগত্য নির্বিশেষে যারা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী, তারা সকলেই এই ক্ষমতায় অংশগ্রহণের অধিকারী।

এই ধরনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকেও পৃথক। এই বিপ্লব কেবলমাত্র চীনে সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের শাসন উৎখাত করে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিতে সমর্থ পুঁজিবাদের কোন অংশকে ধ্বংস করে না।

১৯২৪ সালে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক সমর্থিত তিন গণ-নীতিতে যে বিপ্লবের কথা আলোচিত হয়েছে, এই ধরনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলতঃ সেই বিপ্লবের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ। ঐ বছরেই 'চীনের কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে' ডঃ সান ইয়াৎ-সেন বলেছিলেন ঃ

> আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাধারণতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার ও নিছক সাধারণ লোকদের ওপর অত্যাচারের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কুওমিনতাঙ-এর গণতন্ত্রের নীতির অর্থ এমন এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা সমস্ত সাধারণ লোকের হাতে থাকে, মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া অধিকারে নয়।

তিনি আরও বলেছিলেন ঃ

> মালিকানা চীনদেশীয়ই হোক অথবা বিদেশীয়ই হোক—যে প্রতিষ্ঠানগুলি একচেটিয়া চরিত্রের অথবা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার পক্ষে অত্যন্ত বড়—যেমন ব্যাঙ্ক, রেলপথ, বিমানপথের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ—সেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও শাসিত হবে, যাতে ব্যক্তিগত পুঁজি জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য না করতে পারে ; এই হচ্ছে পুঁজি নিয়ন্ত্রণের মৌলিক নীতি।

আবার তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক মূলনীতি সম্পর্কে বলে গেছেন ঃ 'জনসাধারণকে জাগাতে হবে এবং পৃথিবীর সেইসব জাতির সংগে সাধারণ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যারা আমাদেরকে সমকক্ষ বলে গণ্য করে।' এইভাবে পুরানো আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থানুযায়ী উদ্ভুত পুরানো গণতান্ত্রিক তিন গণ-নীতিকে নতুন আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থানুযায়ী নয়া গণতান্ত্রিক তিন গণ-নীতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তার ১৯৩৭ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বরের ইস্তাহারে যখন ঘোষণা করেছিল যে, 'চীনের বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে

তিন গণ-নীতি, আর আমাদের পার্টি তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত্', তখন শেষোক্ত তিন গণ-নীতির কথাই বলেছিল, অন্য কোন তিন গণ-নীতি নয়। এই তিন গণ-নীতির মধ্যে রয়েছে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের তিন মহান নীতি, অর্থাৎ রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক-শ্রমিকদের সাহায্য। নতুন আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থায় এই তিন মহান নীতি থেকে বিচ্যুত অন্য কোন তিন গণ-নীতি বিপ্লবী হতে পারে না (সাম্যবাদ ও তিন গণ-নীতির গণতান্ত্রিক বিপ্লবী মূল রাজনৈতিক কর্মসূচীতে মতৈক্য থাকলেও, অন্য কোন ব্যাপারেই তাদের মতৈক্য নেই, এ সম্পর্কে এখানে আমরা আলোচনা করছি না)।

এইভাবে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সংগ্রামের জন্য শক্তিসমাবেশে (অর্থাৎ, যুক্তফ্রন্ট) বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সংগঠনে যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, সর্বহারাশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়াদের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা যায় না। যদি কেউ এই শ্রেণীগুলিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, তাহলে নিশ্চয়ই সে চীনা জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সমস্যা অথবা চীনের কোন সমস্যাই সমাধান করতে সমর্থ হবে না। বর্তমান স্তরে চীন বিপ্লব যে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনের চেষ্টা করবে, এতে অবশ্যই শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়ারা সকলেই নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করবে ও নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করবে। অন্য কথায়, এটি হবে অবশ্যই শ্রমিক, কৃষক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়া এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী অন্যান্য সকলেরই বিপ্লবী মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এই ধরনের প্রজাতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে পরিণত করা কেবলমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বেই সম্ভব।

৬। চীন বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত

বর্তমান স্তরে চীনা সমাজের চরিত্র এবং চীন বিপ্লবের লক্ষ্য, করণীয় কাজ চালিকাশক্তি ও চরিত্র—এইসব মৌলিক সমস্যা পরিস্কারভাবে আলোচিত হওয়ার পর চীন বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেকার সম্পর্ক অথবা চীন বিপ্লবের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্তরের সম্পর্কও সহজে বোঝা যায়।

যেহেতু বর্তমান স্তরে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর সাধারণ পুরানো ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, তা এক নতুন বিশেষ ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব—নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ; যেহেতু এই বিপ্লব ঘটছে বিংশ শতাব্দীর ৩০-৪০-এর দশকের নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের উত্থান ও পুঁজিবাদের পতনের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এবং এটা ঘটছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

যুগে ও বিপ্লবের যুগে, সেইহেতু চীন বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিপ্রেক্ষিত পুঁজিবাদ নয়, বরং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ। এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমান স্তরে যেহেতু চীন বিপ্লবের উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকের ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে রূপান্তরিত করা, অর্থাৎ নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করা, সেইজন্য বিপ্লব জয়ী হওয়ার পর পুঁজিবাদের বিকাশপথের বাধাগুলি দূরীভূত হয়ে যাওয়ার চীনা সমাজের মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বেশ পরিমাণে বিকাশলাভ করবে, এটা সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ও আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল হবে বেশ পরিমাণে পুঁজিবাদী বিকাশ। কিন্তু এটা চীন বিপ্লবের ফলাফলের একটি দিক মাত্র, সম্পূর্ণ চিত্র নয়। চীন বিপ্লবের সম্পূর্ণ চিত্র হচ্ছে, একদিকে পুঁজিবাদী উপাদানের অগ্রগতি দেখা যাবে অন্যদিকে দেখা যাবে সমাজতান্ত্রিক উপাদানের অগ্রগতি। এই সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলি কি কি? সমগ্র দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান আপেক্ষিক গুরুত্ব, সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব-ক্ষমতা যা কৃষকেরা, বুদ্ধিজীবীরা ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়ারা ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে বা স্বীকার করার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতি ও মেহনতী জনসাধারণের সমবায় মালিকানাধীন অর্থনীতি; এ সমস্তই সমাজতান্ত্রিক উপাদান। আবার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে এটাও সম্ভব যে, চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী ভবিষ্যৎ এড়িয়ে যেতে এবং সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ অর্জন করতে পারে।

৭। চীন বিপ্লবের দ্বিবিধ কাজ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি

এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে যা বলা হল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে চীন বিপ্লবের হবে দ্বিবিধ কাজ, অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব (নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব) ও সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বর্তমান স্তর ও ভবিষ্যৎ স্তরের বিপ্লব—এই দ্বিবিধ কাজ। এই দ্বিবিধ বিপ্লবী কাজের নেতৃত্বভার ন্যস্ত হয়েছে চীনের সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কাঁধে, যার নেতৃত্ব ছাড়া কোন বিপ্লব সফল হতে পারে না।

চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে (নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে) সম্পন্ন করা এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তের সৃষ্টি হলে এই বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করা—এই হচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মহান, গৌরবময় ও সামগ্রিক বিপ্লবী কাজ। প্রত্যেকটি পার্টি-সদস্যকে এই কাজ সম্পাদন করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই মাঝপথে পিছ-পা হলে চলবে না।

কিছু সংখ্যক অপরিণত পার্টি-সদস্য মনে করেন যে, বর্তমান স্তরের গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ করলেই আমাদের কাজ শেষ হবে এবং ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করা আমাদের কাজ নয় ; অথবা বর্তমান বিপ্লব বা কৃষি-বিপ্লবই আসলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এটা গুরুত্বের সাথে বলা প্রয়োজন যে, এইসব ধারণা ভুল। প্রত্যেকটি পার্টি-সদস্যের একথা জানা দরকার যে, সামগ্রিক বিচারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের বিপ্লবী আন্দোলনটার মধ্যে দুটি পর্যায় অন্তর্ভুক্ত—একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অপরটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ; এ হল দুটি ভিন্ন প্রকৃতির বিপ্লবী প্রক্রিয়া, প্রথম বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে শেষ করেই কেবল দ্বিতীয়টিকে সম্পন্ন করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি। সকল কমিউনিস্টদেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো। কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেকার পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কাররূপে বুঝলেই চীন বিপ্লবে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হবে।

গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—চীনের এই দুটি মহান বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিয়ে পূর্ণ পরিণতিতে নিয়ে যেতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক পার্টি (বুর্জোয়া অথবা পেটি-বুর্জোয়া পার্টি) সমর্থ হবে না। জন্মের দিন থেকেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই দ্বিবিধ কাজ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে এবং এটা সম্পাদন করার জন্য ১৮ বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে।

এটি এমন একটি কাজ যা একই সময়ে অতি গৌরবময় এবং খুবই কষ্টকর। একটি বলশেভিক চরিত্রসম্পন্ন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া—যে পার্টি সমগ্র জাতির মধ্যে বিস্তৃত, যে পার্টি ব্যাপক গণ-চরিত্রসম্পন্ন এবং যে পার্টি মতাদর্শ, রাজনীতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সংহত—এ কাজ সমাধা করা অসম্ভব। সুতরাং এই ধরনের একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করা প্রত্যেক পার্টি-সদস্যেরই কর্তব্য।

টীকা

১। পরম্পরাগত জনশ্রুতি অনুসারে দিগদর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার চীনে বহুকাল পূর্বেই হয়েছিল। খ্রীঃ, পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ল্যু পু-ওয়েই তাঁর 'দেওয়ালপঞ্জীতে' চুম্বক পাথরের আকর্ষণ শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, চুম্বক পাথর যে লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে, এই কথা তখন চীনাদের জানা ছিল। খ্রীঃ প্রথম

শতাব্দীর গোড়ার দিকে ওয়াং ছোং তাঁর 'লুন হেং' পুস্তকে মন্তব্য করেছেন যে, চুম্বক পাথর দক্ষিণের দিক নির্দেশ করে, এতে বোঝা যায় যে তখন চৌম্বক মেরুপ্রবণতা সম্পর্কে তাদের জানা ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, চু ইয়ু কর্তৃক লিখিত 'ক্যান্টন সম্পর্কে আলোচনা' ও স্যু চিং কর্তৃক লিখিত 'স্যুয়ান হো যুগে কোরিয়ায় প্রেরিত রাষ্ট্রদূতের ভ্রমণ বৃত্তান্ত' গ্রন্থে দেখা যায় যে জহাজে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ব্যবহৃত হতো, এতে বোঝা যায় তখন দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল।

২। পূর্ব হান বংশের (খ্রীঃ ২৫-২২০) সাই লুন নামক একজন খোজা গাছের ছাল, শন, ছেঁড়া ন্যাকড়া ও ছেঁড়া মাছ ধরা জাল দিয়ে প্রথম কাগজ তৈরী করেন। খ্রীঃ ১০৫ সালে অর্থাৎ সম্রাট হো তির রাজত্বের শেষ বছরে সাই লুন তাঁর আবিষ্কার সম্রাটকে উপহার দেন। তখন থেকে গাছের আঁশ থেকে কাগজ তৈরীর পদ্ধতি সারা চীনে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে বলা হয় 'খোজা সাই কাগজ'।

৩। শুই বংশের রাজত্বকালে, খ্রীঃ ৬০০ অব্দের কাছাকাছি ব্লকে ছাপা আবিষ্কৃত হয়।

৪। খ্রীঃ ১০৪১-১০৪৮ সময়কালে পরিবর্তনযোগ্য টাইপ আবিষ্কার করেন পি শেং।

৫। কিংবদন্তী অনুসারে চীনে বারুদ আবিষ্কৃত হয় নবম শতাব্দীতে এবং একাদশ শতাব্দীতে কামান দাগার জন্য বারুদ ব্যবহৃত হয়।

৬। চেন শেং, উ কুয়াং সিয়াং ইয়ু ও লিউ পাং ছিলেন চিন বংশের রাজত্বকালে প্রথম বিরাট কৃষক বিদ্রোহের নেতা। খ্রীঃ পূঃ ২০৯ সালে চিন বংশের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে চেন শেং ও উ কুয়াং রক্ষীসেনাবাহিনীর ৯০০ লোকদের নেতৃত্ব দিয়ে সীমান্ত ঘাঁটিতে যাওয়ার পথে, ছীশিয়ান জেলায় (বর্তমান আনহুই প্রদেশের সুসিয়ান জেলা) বিদ্রোহ করেছিলেন, সংগে সংগে এতে সারা দেশ সাড়া দিয়েছিল। সিয়াং ইয়ু ও তাঁর কাকা সিয়াং লিয়াং উসিয়ান জেলায় (আজকের কিয়াংসু প্রদেশের উসিয়ান জেলা) এবং লিউ পাং পেইসিয়ান জেলায় (আজকের শানতুং প্রদেশের পেইসিয়ান জেলা) এ বিদ্রোহের সমর্থনে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটান। সিয়াং বাহিনী চিন সেনাবাহিনীর প্রধান শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে এবং লিউ বাহিনী সর্বপ্রথমে কুয়ান চোং অঞ্চল ও চিন বংশের রাজধানী দখল করে। এরপর লিউ পাং ও সিয়াং ইয়ুর মধ্যে যুদ্ধ হয়, এতে সিয়াং পরাজিত হয়ে মারা গেলেন এবং লিউ পাং চিন সম্রাটের পরিবর্তে সম্রাট হয়ে হান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

৭। পশ্চিম হান বংশের রাজত্বকালের শেষ কয়েক বছরে সর্বত্রই কৃষকদের অসন্তোষ ও বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ ঘটে। খ্রীঃ ৮ সালে হান বংশের পতন ঘটিয়ে ওয়াং মাং সম্রাট হলেন। তিনি কৃষকদের অসন্তোষ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টায় কতকগুলি সংস্কার প্রচলন করেন। তখন দেশের দক্ষিণে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ছিল, সিনশি-এর (আজকের হুপেই প্রদেশের চিংশানসিয়ান জেলা) লোক ওয়াং খুয়াং ও ওয়াং ফেংকে ক্ষুধার্ত জনতা তাঁদের

নেতা করে বিদ্রোহ করেন ; কৃষকদের এই বাহিনী 'সিনশি সৈন্যবাহিনী' নামে আখ্যায়িত হয়ে লড়তে লড়তে নানা ইয়াংয়ে পৌঁছে। পিংলিন-এর (আজকের হুপেই প্রদেশের সুইসিয়ান জেলার উত্তর-পূর্ব) ছেন মু সহস্রাধিক জনতাকে নেতৃত্ব দিয়ে বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল, তারা 'পিংলিন সৈন্যবাহিনী' নামে খ্যাত। 'লাল ভুরু' ও 'ব্রোঞ্জের ঘোড়া' সবই ওয়াং মাং যুগের কৃষকদের বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর নাম। 'ব্রোঞ্জের ঘোড়া' বিদ্রোহ ঘটে মধ্য হোপেইয়ে ; 'লাল ভুরু' বিদ্রোহ ঘটে মধ্য শানতুং প্রদেশে। 'লাল ভুরু' বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ফান ছোং, বিদ্রোহীরা সবাই তাদের ভ্রু লাল রঙে রাঙ্গিয়ে রাখতো বলে লোকে তাদের 'লাল ভুরু' এই আখ্যা দিয়েছিল। 'লাল ভুরু' ছিল তৎকালীন কৃষকদের সবচেয়ে বড় বিদ্রোহী বাহিনী।

৮। খ্রীঃ ১৮৪ সালে পূর্ব হান বংশের আমলে চ্যাং চিয়াও কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়ে বিদ্রোহ করেন, এর সৈন্যরা সবাই হলদে পাগড়ী পরত বলে লোকে তাদের এই নামে ডাকত।

৯। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে, সুই বংশের শেষাশেষি কৃষকরা একটার পর একটা বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল, লি মি ও তৌ চিয়ান-তে ছিলেন তৎকালীন বিদ্রোহের নেতা। লি মি হোনান প্রদেশে এবং তৌ চিয়ান-তে হোপেই প্রদেশে ছিলেন, তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহী বাহিনী তখন শক্তির দিক থেকে খুবই বিরাট ছিল।

১০। ওয়াং সিয়ান-চি ও হুয়াং চাও ছিলেন তাং রাজবংশের শেষের দিকে কৃষক বিদ্রোহের নেতা। খ্রীঃ ৮৭৪ সালে ওয়াং সিয়ান-চি শানতুং প্রদেশে বিদ্রোহ সংগঠিত করেন, পরের বছর হুয়াং ছাও তার সমর্থনে লোকদের সমাবেশ করে বিদ্রোহ ঘটালেন। খ্রীঃ ৮৭৮ সালে ওয়াং নিহত হলেন। হুয়াং চাও ওয়াংয়ের অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে নিজেকে 'স্বর্গ বিধ্বংসী সেনাপতি' বলে আখ্যায়িত করেন। হুয়াং চাও তাঁর বিদ্রোহী বাহিনীকে পরিচালনা করে দুবার শানতুং থেকে বের হয়ে চলমান লড়াই করেছেন। প্রথমবার শানতুং থেকে হোনানে, তারপর আনহুই ও হুপেই পৌঁছে, ওখান থেকে শানতুংয়ে ফিরে আসেন। দ্বিতীয়বার শানতুং থেকে হোনানে, তারপর কিয়াংসীতে পৌঁছে, চেকিয়াংয়ের পূর্বাঞ্চলের মধ্য দিয়ে ফুকিয়ান ও কুয়াংতুংয়ে পৌঁছে, তারপর কুয়াংসী হয়ে হুনানের মধ্য দিয়ে হুপেইয়ে পৌঁছে যান ; আবার হুপেই থেকে পূর্বের দিকে গিয়ে আনহুই ও চেকিয়াংয়ে পৌঁছান, তারপর হোয়াংহো নদী পার হয়ে হোনানে প্রবেশ করে লুওইয়াং শহর দখল করেন। তারপর তুংকুয়ানকে অধিকার করে চাং আন শহর হাতে নিয়ে ছিলেন। হুয়াং চাও সেখানে চি নামক রাষ্ট্র গড়ে তুলে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। পরে আভ্যন্তরীণ বিভক্তির ফলে (সেনাপতি চু ওয়েন থাং বংশের কাছে আত্মসমর্পণ) এবং শাথু উপজাতির সর্দার লি খেইয়োংয়ের পরিচালনাধীন সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের ফলে হুয়াং চাও চাং-আন শহর পরিত্যাগ করে আবার হোনানে যান, সেখান থেকে শানতুংয়ে ফিরে আসেন। অবশেষে তিনি পরাজিত

হয়ে আত্মহত্যা করেন। তিনি যে দশ বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, তার ফলেই তিনশ বছর ধরে জনগণের ওপর শাসনের পরে থাং রাজবংশের উচ্ছেদ হয়েছে। এটা হচ্ছে চীনের ইতিহাসে বিখ্যাত কৃষক যুদ্ধের মধ্যে অন্যতম।

১১। সুং চিয়াং ও ফাং লা ছিলেন খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুং রাজত্বকালে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের দুজন নামজাদা নেতা। সুং চিয়াং সক্রিয় ছিলেন পিংয়ুয়ান, শানতুং, হোপেই, হোনান ও কিয়াংসু প্রদেশের সীমান্ত এলাকায়। আর ফাং লা সক্রিয় ছিলেন চেকিয়াং ও আনহুই প্রদেশে।

১২। খ্রীঃ ১৩৫১ সালে ইউয়ান বংশের রাজত্বকালে সর্বত্রই জেগেছে গণ-অভ্যুত্থান। আনহুই প্রদেশের ফেংইয়াংয়ের লোক চু ইউয়ান-চাং যোগ দিলেন কুও জু-সিংয়ের পরিচালনাধীন বিদ্রোহী বাহিনীতে। কুও-এর মৃত্যুর পরে তিনি ঐ বাহিনীর সেনানায়ক হন, শেষ পর্যন্ত তিনি মঙ্গোল বংশকে উৎখাত করেন এবং মিং বংশের প্রতিষ্ঠা করে প্রথম সম্রাট হন।

১৩। লি জু-চেং ছিলেন মিং রাজবংশের শেষের দিকে কৃষক-বিদ্রোহের নেতা। তিনি ছিলেন শেনসী প্রদেশের মিচির অধিবাসী। খ্রীঃ ১৬২৮ সালে শেনসীর উত্তরাঞ্চলে দেখা দিয়েছে কৃষক-বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গ। লিং জু-চেং যোগ দিলেন কাও ইং-সিয়াংয়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী বাহিনীতে, সে বাহিনী শেনসী থেকে হোনান তারপর আনহুইয়ে পৌঁছে, ওখান থেকে শেনসীতে ফিরে এল। ১৬৩৬ সালে কাও ইং-সিয়াং মারা গেলেন, তাঁর স্থানে লিকে 'নির্ভীক রাজা' বলে অভিষিক্ত করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর প্রচলিত প্রধান শ্লোগান হল 'নির্ভীক রাজাকে স্বাগত জানালে শস্যের খাজনা আদায় করা হবে না'। তাঁর বাহিনীর মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখতে আরেকটি শ্লোগান ছিল, 'কাউকে হত্যা করার অর্থ আমার পিতাকে হত্যা করা, কাউকে ধর্ষণের মানে আমার মাকে ধর্ষণ করা।' এইভাবে অনেকেই তাঁকে সমর্থন করে, আর আন্দোলন তৎকালীন কৃষক-বিদ্রোহের প্রধান স্রোতে পরিণত হয়। কিন্তু তিনি কোন সময়ই অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করেননি, কেবলমাত্র ইতস্তত ঘুরে বেড়ান। তিনি 'নির্ভীক রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার পর নিজের সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করে সেজুয়ানে প্রবেশ করেন, ওখান থেকে শেনসীর দক্ষিণাঞ্চলে ফিরে আবার হুপেইয়ের মধ্য দিয়ে হোনানে পৌঁছান, আবার হুপেইয়ে ফিরে সিয়াংইয়াং দখল করেন, তারপর আবার হোনানের মধ্য দিয়ে শেনসীর ওপর আক্রমণ করে সীআন শহর দখল করেন ; ১৬৪৪ সালে শানসীর মধ্য দিয়ে আক্রমণ করে পিকিং অধিকার করেন। এর অল্প সময়ের পর মিং বংশের সেনাপতি উ সান-কুই ছিং বাহিনীর সাথে আঁতাত করে যুক্তভাবে তাঁকে পরাজিত করেছিল।

১৪। তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের বিপ্লব ছিল ১৯ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত চিং রাজবংশের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিপ্লবী যুদ্ধ।

১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসে কুয়াংসী প্রদেশের কুইপিং জেলার চিনথিয়ান গ্রামে এই বিপ্লবের নেতা হোং সিউ-ছুয়ান, ইয়াং সিউ-চিং প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন আর ঘোষণা করেছিলেন 'তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের' প্রতিষ্ঠা। ১৮৫২ সালে তাইপিং বাহিনী কুয়াংসী প্রদেশ থেকে অভিযান শুরু করল, আর হুনান, হুপেই, কিয়াংসী ও আনহুই প্রদেশের ভেতর দিয়ে অভিযান চালিয়ে নানকিং দখল করল ১৮৫৩ সালে। তারপরে তাইপিং বাহিনীর একটা অংশ নানকিং থেকে উত্তর অভিমুখে অভিযান চালিয়ে যেতে যেতে তিয়েনসিন শহরের নিকটে পৌঁছেছিল। কিন্তু তাইপিং বাহিনী তার দখলীকৃত স্থানগুলিতে কোন সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকাই স্থাপন করেনি। উপরন্তু, নানকিংয়ে রাজধানী স্থাপন করার পরে এ বাহিনীর নেতৃস্থানীয় গ্রুপ অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ভুল করে বসেছিল। সেইসব কারণেই এ বাহিনী চিং সরকারের প্রতিবিপ্লবী বাহিনী এবং ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী হামলাকারীদের মিলিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে অসমর্থ হয়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত ১৮৬৪ সালে এই বাহিনী পরাজিত হল।

১৫। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে কয়েক দশক ধরে ব্রিটেন ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণ আফিং চীনে রপ্তানি করত। এই আফিং বাণিজ্য চীনা জনগণকে শুধু গুরুতরভাবে নেশাগ্রস্তই করেনি, উপরন্তু বিপুল পরিমাণে চীনের রৌপ্যও লুণ্ঠন করেছিল। চীন এই আফিং বাণিজ্যের বিরোধিতা করেছিল। ১৮৪০ সালে বাণিজ্যকে সুরক্ষিত করার অজুহাতে ব্রিটেন চীনের ওপরে এক সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। লিন জু-স্যুর নেতৃত্বে চীনা সৈন্যবাহিনী সে আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ করে, আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুয়াংচৌ-এর জনগণ 'ব্রিটিশদেরকে দমন করার বাহিনী' সংগঠিত করে, যা আগ্রাসী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। কিন্তু ১৮৪২ সালে দুর্নীতিপরায়ণ চিং সরকার আগ্রাসী ব্রিটিশদের সংগে 'নানকিং চুক্তি' স্বাক্ষর করল। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, ব্রিটেনকে হংকং হস্তান্তর এবং শাংহাই, ফুচৌ, সিয়ামেন, নিংপো আর কুয়াংচৌকো ব্রিটেনের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা হল, আর স্থির হল যে, চীনে আমদানি করা ব্রিটিশ পণ্যের ওপরে ধার্য শুল্কের হার চীন ও ব্রিটেন মিলিতভাবে নির্ধারণ করবে।

১৬। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুক্তভাবে চীনের ওপর আক্রমণ চালায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জারের রাশিয়া পাশ থেকে তাদের সাহায্য করে। ঐ সময় চিং সরকার তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের কৃষক-বিদ্রোহ দমন করতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করছিল এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করছিল। ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রবাহিনী পর পর কুয়াংচৌ, তিয়েনসিন ও পিকিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিকে দখল করে নিয়েছিল। তারা পিকিংয়ের ইউয়ান মিং ইউয়ান প্রাসাদ লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করেছিল এবং চিং সরকারকে 'তিয়েনসিন চুক্তি' ও 'পিকিং চুক্তি' স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। এই চুক্তিগুলির প্রধান শর্তের মধ্যে

অন্তর্ভুক্ত ছিল তিয়েনসিন, নিউচুয়াং, তেংচৌ, তাইওয়ান, তানশুই, ছাওচৌ, নানকিং চেনকিয়াং, চিউকিয়াং ও হানখৌ প্রভৃতি জায়গা বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে উন্মুক্ত করা, বিদেশীদের ভ্রমণ ও মিশনারী কাজকর্মের বিশেষ অধিকার থাকা এবং চীনের অভ্যন্তরভাগে নৌ-চলাচলের বিশেষ অধিকার থাকা। তখন থেকে বিদেশী আক্রমণকারী শক্তিগুলি চীনের সমস্ত উপকূলবর্তী প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করল।

১৭। ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৫ সালে ফরাসী আক্রমণকারীরা ভিয়েতনাম, কুয়াংসী, ফুকিয়ান, তাইওয়ান ও চেকিয়াং প্রভৃতি জায়গায় সশস্ত্র আক্রমণ করেছিল। ফেং জু-চাই ও লিউ ইয়োং-ফুয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত চীনা সেনাবাহিনী সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিল এবং পর পর বিজয় অর্জন করেছিল। যুদ্ধে জয়লাভ সত্ত্বেও দুর্নীতিপরায়ণ চিং সরকার অপমানজনক 'তিয়েনসিন চুক্তি' স্বাক্ষর করল।

১৮। ১৮৯৪ সালে চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে জাপান কর্তৃক কোরিয়ার ওপর আক্রমণ করার এবং চীনের স্থলবাহিনী ও নৌ-বাহিনীর ওপর উস্কানি দেওয়ার জন্য। এই যুদ্ধে চীনের সৈন্যবাহিনী বীরত্বের সাথে লড়াই করেছে, কিন্তু চিং সরকারের দুর্নীতি ও দৃঢ় প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যর্থতার ফলে চীন পরাজিত হয় ফলে চিং সরকার জাপানের সাথে অপমানকর সিমোনোসেকি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

১৯। ১৯০০ সালে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, ইতালী ও অস্ট্রিয়া এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ চীনা জনগণের হামলা-বিরোধী ইহোথুয়ান আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার জন্য যুক্ত বাহিনী পাঠিয়ে চীনকে আক্রমণ করে। চীনের জনগণ বীরত্বের সঙ্গে এর প্রতিরোধ করেন। এই আটটি মিত্রশক্তি তাকু অধিকার করে তিয়েনসিন ও পিকিং দখল করে। ১৯০১ সালে চিং সরকার আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির প্রধান শর্তগুলির মধ্যে চীন ঐ সমস্ত দেশকে ৪৫ কোটি ট্যয়েল রৌপ্যের বিরাট পরিমাণ অর্থ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দানের এবং এইসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পিকিংয়ে ও পিকিং থেকে তিয়েনসিন আর শানহাইকুয়ান পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীকে মোতায়েন করার বিশেষ অধিকারের ব্যবস্থা ছিল।

২০। দূতাবাসের ক্ষমতার এক্তিয়ার—১৮৪৩ সালে চীন- ব্রিটিশের দ্বারা স্বাক্ষরিত হুমেন চুক্তি ও ১৮৪৪ সালে চীন-মার্কিনের দ্বারা স্বাক্ষরিত ওয়াংসিয়া চুক্তি থেকে শুরু করে পুরানো চীন সরকারগুলির ওপর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া অসম চুক্তিগুলিতে ব্যবস্থিত বিশেষ অধিকারের অন্যতম। এই অধিকারের অর্থ হচ্ছে, এই অধিকারের ভোগী কোন দেশের কোন নাগরিক চীনে যদি কোন ফৌজদারী অথবা দেওয়ানী কোন মামলার আসামী হয় তাহলে চীনা আদালত তার বিচার করতে পারবে না, তার বিচার করবে তার নিজ দেশের কন্সাল।

২১। উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদী

দেশগুলি চীনে তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাবান্বিত এলাকাগুলিকে নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকা বলে চিহ্নিত করে নেয়। যেমন, ইয়াংসী উপত্যকার নিম্ন ও মধ্যবর্তী প্রদেশগুলি ব্রিটিশ প্রভাবাধীন এলাকারূপে চিহ্নিত হয়, ইয়ুনান এবং কুয়াংতুং ও কুয়াংসী প্রদেশ ফরাসী প্রভাবাধীন এলাকা, শানতুং প্রদেশ জার্মান প্রভাবাধীন এলাকা, ফুকিয়ান হয় জাপানের এবং উত্তর-পূর্ব তিনটি প্রদেশ (আজকের লিয়াওতুং, লিয়াওসী, চীলিন হেইলোংকিয়াং ও সোংকিয়াং পাঁচটি প্রদেশ) প্রথমে জারের রাশিয়ার প্রভাবাধীন এলাকা নির্দিষ্ট হয়েছিল। ১৯০৫ সালে জাপান-রুশ যুদ্ধের পর থেকে উত্তর-পূর্ব তিনটি প্রদেশের দক্ষিণ অংশ জাপানের প্রভাবাধীন এলাকায় পরিণত হল।

২২। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চিং সরকারকে নদী ও সমুদ্রের উপকূলবর্তী কোন কোন এলাকাকে বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য করার পর, ঐসব এলাকার মধ্যে, যা তারা মনে করে নিজেদের দখল করার উপযোগী, সেইসব অঞ্চলকে তাদের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা বলে ঘোষণা করেছে। ঐ এলাকাগুলিতে চীনের প্রশাসন ও চীনের আইন থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র অন্য একটি শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়। ঐ এলাকাগুলির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের সামন্ততান্ত্রিক মৎসুদ্দিশ্রেণীর শাসনের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চালাত। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালের বিপ্লবের সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী জনসাধারণ ঐসব এলাকা তুলে দেওয়ার আন্দোলন শুরু করেন এবং ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে হানখৌ ও চিউকিয়াংস্থিত ব্রিটিশের 'বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা' পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক বিপ্লবের বিশ্বাসঘাতকতার পরে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চীনের বিভিন্ন স্থানে তাদের 'বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা' অব্যাহতভাবে বজায় রেখে চলেছিল।

২৩। ষষ্ঠ কমিনটার্ন (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক) কংগ্রেসে গৃহীত 'ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কিত থিসিস' দ্রষ্টব্য।

২৪। জে. ভি. স্তালিন ঃ ২৪শে মে, ১৯২৭ সালে কমিনটার্নের কার্যকরী কমিটির অষ্টম পূর্ণাংগ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ 'চীন বিপ্লব ও কমিনটার্নের কর্তব্য'।

২৫। এখানে ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। উদারপন্থী বুর্জোয়া ও আলোকপ্রাপ্ত জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এই আন্দোলন। খাং ইয়ৌ-ওয়েই, লিয়াং চী-চাও ও থান সি-থোং প্রমুখ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এ আন্দোলন যুবসম্রাট কুয়াং স্যু-এর আনুকূল্য ও সমর্থনলাভ করেছিল। কিন্তু এর কোন গণভিত্তি ছিল না। সে সময়ে ইউয়ান শি-খাইয়ের অধীনে নিজস্ব সশস্ত্র শক্তি ছিল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে গোঁড়া রক্ষণশীলদের নেত্রী বিধবা সম্রাজ্ঞী চি সীর কাছে সংস্কারকদের গুপ্ত পরিকল্পনাকে ফাঁস করে দিয়েছিল ; ফলে বিধবা সম্রাজ্ঞী আবার ক্ষমতা জোর করে দখল করে নিল, যুবসম্রাট কুয়াং সুকে বন্দী

করল, আর থান সি-থোং ও অন্যান্য পাঁচজনের শিরশ্ছেদ করল। এইভাবে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল শোচনীয় পরাজয়ে।

২৬। ই হো তুয়ান আন্দোলন—১৯০০ সালে উত্তর চীনের কৃষক ও হস্তশিল্পী-সাধারণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত একটি বিরাট আন্দোলন। এই আন্দোলনে তাঁরা রহস্যময় পদ্ধতিতে গুপ্ত সমিতি গঠন করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালান। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, ইতালী ও অস্ট্রিয়া এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ যৌথভাবে সশস্ত্র শক্তি দিয়ে পিকিং ও তিয়েনসিন দখল করেছিল এবং অবর্ণনীয় বর্বরতার সাথে এই আন্দোলন দমন করেছিল।

২৭। সিনহাই বিপ্লব—১৯১১ সালের বিপ্লব চিং রাজবংশীয় স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়। এই বছরের ১০ই অক্টোবর তারিখে, চিং সরকারের নয়া সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী সংস্থাগুলির প্রেরণায় উচাং শহরে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। এর পরে বিভিন্ন প্রদেশে পর পর বিদ্রোহ ঘটে এবং অনতিবিলম্বেই ভেঙে পড়ে চিং রাজবংশের শাসন। ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে নানকিং শহরে স্থাপিত হল চীন প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার, আর সান ইয়াৎ-সেন নির্বাচিত হলেন এর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট। কৃষক, শ্রমিক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের সংগে বুর্জোয়াদের মৈত্রীর ভেতর দিয়ে জয়লাভ করল এই বিপ্লব। কিন্তু যে চক্র এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করেছিল তারা ছিল আপোষপন্থী, আর তারা কৃষকদের প্রকৃত হিতসাধন করেনি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের চাপে আপোষ করেছিল বলে রাষ্ট্রক্ষমতা এসে পড়ল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ—ইউয়ান শি-কাইয়ের হাতে, আর বিপ্লব হল ব্যর্থ।

২৮। ১৯২৫ সালের ৩০শে মে শাংহাইয়ে ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক চীনা জনগণকে হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সারা দেশের জনগণ যে সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিল, এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৫ সালের মে মাসে চিংতাও ও শাংহাইয়ের জাপানী সূতাকলগুলোতে পরপর ধর্মঘট হয়, এই ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল; জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের পদলেহী কুকুর—উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজরা এটা দমন করতে আসে। ১৫ই মে শাংহাইয়ের জাপানী সূতাকলের মালিক কু চেং-হোং নামক একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং দশ জনেরও বেশি শ্রমিক আহত হয়। ২৮শে মে তারিখে ছিংতাওয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার আট জন শ্রমিককে হত্যা করে। ৩০শে মে শাংহাইয়ে দু'হাজারেরও বেশি ছাত্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বিদেশীদের এলাকাগুলোতে শ্রমিকদের সমর্থনে প্রচার চালায় এবং এইসব এলাকা ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানায়। এর পরেই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ এলাকায় পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সম্মুখে দশ হাজারেরও অধিক লোক জমায়েত হয় এবং বজ্রনির্ঘোষে 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!', 'সমগ্র চীনা জনগণ, এক হও!' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালায়, ফলে

বহু ছাত্র হতাহত হয় এই ঘটনাই '৩০শে মে'র হত্যাকাণ্ড' বলে পরিচিত। এই বিরাট হত্যাকাণ্ডে সমগ্র দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, দেশের সর্বত্রই বিক্ষোভ-মিছিল ও হরতাল এবং ছাত্র, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট শুরু হয় যা বিরাটাকারের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

২৯। উত্তর অভিযানের যুদ্ধ হচ্ছে ১৯২৬—১৯২৭ সালে চীনা জনগণের দ্বারা চালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী মহান বিপ্লবী যুদ্ধ। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে, কুয়াংতুংয়ের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা একীকরণ করার পর, উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শাসন উচ্ছেদ করার জন্য জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী কুয়াংতুং থেকে উত্তর অভিযান শুরু করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বে ও ব্যাপক শ্রমিক-কৃষকসাধারণের আন্তরিক সমর্থনে ১৯২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ও ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে দ্রুতভাবে ইয়াংসী নদীর অববাহিকা ও হোয়াংহো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে পৌঁছেছিল এবং অর্ধেক চীন দখল করে নিয়েছিল। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির ওপরে মোক্ষম আঘাত হেনেছিল। যখন উত্তর অভিযান বিজয়ের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন চিয়াং কাই-শেকের প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত কুওমিনতাঙের দক্ষিণপন্থীরা (যারা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী, বড় বড় জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে) সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটায়; তাছাড়া চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ছেন তু-সিউর প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা পার্টির নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে কমরেড মাও সে-তুঙের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী লাইনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর আত্মসমর্পণবাদী লাইন অবলম্বন করে বিপ্লবের নেতৃত্বক্ষমতা পরিত্যাগ করেছিল, বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্বক্ষমতা ত্যাগ করেছিল, ফলে এবারকার বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়।

৩০। জে. ভি. স্তালিন ঃ 'চীন বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ'। 'রচনাবলী', ৮ম খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫।

৩১। ভি. আই. লেনিন ঃ '১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কৃষিসংক্রান্ত কর্মসূচী'। 'সংকলিত রচনাবলী', ১৩ শ খণ্ড, ইংরেজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৬২, পৃঃ ২১৯-৪২৯।

চীন জনগণের বন্ধু স্তালিন

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯

২১শে ডিসেম্বর তারিখে কমরেড স্তালিন ষাট বছরে পা দিচ্ছেন। আমরা নিশ্চিত যে, সমগ্র দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণ যাঁরা এ কথা জানেন, তাঁদের সবার হৃদয়েই তাঁর জন্মদিন উষ্ণ ও আবেগময় অভিনন্দন জাগিয়ে তুলবে ।

স্তালিনকে অভিনন্দন জানানো কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারমাত্র নয়। স্তালিনকে অভিনন্দন জানানো মানেই হচ্ছে তাঁকে ও তাঁর আদর্শকে সমর্থন জানানো, সমাজতন্ত্রের বিজয়কে এবং মানবজাতির অগ্রগতির যে পথ তিনি নির্দেশ করেছেন তাকে সমর্থন করা, এর অর্থ হচ্ছে একপ্রিয় বন্ধুকে সমর্থন করা। কারণ, মানবজাতির বৃহত্তর অংশই আজ কষ্টভোগ করছেন, এবং কেবলমাত্র স্তালিন কর্তৃক নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়ে এবং তাঁর সাহায্যেই মানবসমাজ সেই দুঃখভোগের অবসান ঘটাতে পারে।

আমাদের ইতিহাসের তিক্ততম কষ্টভোগের যুগে বাস করে আমরা চীনের লোকের সবচেয়ে জরুরীভাবে অন্যের কাছ থেকে সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করছি। **কাব্য সংকলন** গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'বন্ধুর সাড়া পাবার আশায় পাখি করে গান ।' এতে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির যথার্থ বর্ণনাই পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু আমাদের বন্ধু কারা ?

চীনা জনগণের এমন কিছু তথাকথিত স্ব-ঘোষিত বন্ধু আছে, যাদেরকে কিছু কিছু চীনা ভাবনাচিন্তা না করেই বন্ধু বলে গ্রহণ করে। কিন্তু এসব বন্ধুদেরকে শুধু তাং রাজত্বের সময়কার প্রধানমন্ত্রী লি লিন-ফুর[১] সংগেই তুলনা করা যেতে পারে, যার 'মুখে ছিল মধু, কিন্তু মনে ছিল খুন'। বস্তুতঃ, এইসব 'বন্ধুদের' সত্যসত্যই 'মুখে আছে মধু কিন্তু মনে আছে খুন'। এরা কারা ? এরা হচ্ছে চীনের প্রতি সহানুভূতির ঘোষণায় মুখর সাম্রাজ্যবাদীরা।

কিন্তু আর এক ধরনের বন্ধুও আছেন যাঁদের রয়েছে আমাদের প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতি, যাঁরা আমাদেরকে দেখেন ভাইয়ের মতো। তাঁরা কারা? তাঁরা হচ্ছেন সোভিয়েত জনগণ ও স্তালিন।

কোন দেশই চীনের ওপর তাদের বিশেষ অধিকারগুলো পরিত্যাগ করেনি, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই এটা করেছে।

সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীরাই আমাদের প্রথম মহান বিপ্লবের সময় বিরোধিতা করেছে, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই আমাদের সাহায্য করছে।

কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের সরকারই জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার পর আমাদেরকে সত্যিকারের সাহায্য দেয়নি, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই বিমান ও সাজসরঞ্জাম দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছে।

বিষয়টি কি যথেষ্ট স্পষ্ট নয়?

কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের দেশ, তার নেতৃবৃন্দ ও জনগণ, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদগণ, রাষ্ট্রনেতা ও শ্রমিকেরাই চীন জাতি ও চীনা জনগণের মুক্তির স্বার্থে সত্যিকারের সাহায্য দিতে পারেন, এবং তাঁদের সাহায্য ছাড়া আমাদের আদর্শ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারে না।

স্তালিন হচ্ছেন চীনা জনগণের মুক্তির প্রকৃত বন্ধু। মতবিরোধ ঘটাবার কোন প্রচেষ্টা, কোন মিথ্যা কথা বা কুৎসা প্রচারই স্তালিন সম্পর্কে চীনা জনগণের সর্বান্তঃকরণ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাকে বা সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত বন্ধুত্বকে প্রভাবিত করতে পারবে না।

টীকা

১। লি লিন-ফু (অষ্টম শতাব্দী) ছিল তাং বংশের সম্রাট শুয়ান সুং-এর প্রধানমন্ত্রী। যারাই সামর্থ্যে বা খ্যাতিতে তাকে ছাড়িয়ে যেত বা সম্রাটের ভাল নজরে পড়ত, সে বন্ধুত্বের ভান করে তাদের ধ্বংস করার চক্রান্ত করত। এই কারণেই সে তার সমসাময়িকদের কাছে পরিচিত ছিল এমন একজন লোক হিসেবে, যার 'মুখে ছিল মধু, কিন্তু মনে ছিল খুন'।

নর্ম্যান বেথুনের স্মরণে

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯

কমরেড নর্ম্যান বেথুন[১] কানাডা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁর পঞ্চাশ বছরের বেশি বয়সে জাপান-বিরোধী যুদ্ধে চীনকে সাহায্য করার জন্য কানাডা ও আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তিনি হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে চীনে আসতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। গত বসন্তে তিনি উপস্থিত হন ইয়েনানে, পরে কাজ করতে যান উতাই পার্বত্য অঞ্চলে, এবং সেখানে কাজে নিয়োজিত থাকাকালে দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি শহীদ হন। বিদেশী হয়েও তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে চীনা জনগণের মুক্তির কাজকে নিজের কাজ বলে মনে করতেন, এটা কী ধরনের ভাবমানস ? এটা হচ্ছে কমিউনিজমের ভাবমানস। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সদস্যকেই এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। লেনিনবাদের মতেঃ ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের জনগণের মুক্তি-সংগ্রামকে সমর্থন করা উচিত, আবার উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণীরও ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্ত-সংগ্রামকে সমর্থন করা উচিত ; শুধুমাত্র তাহলেই বিশ্ববিপ্লব জয়ী হতে পারে।[২] কমরেড বেথুন এই লেনিনবাদী নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন। আমাদের চীনা কমিউনিস্টদেরও অবশ্যই এই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা উচিত। সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত; জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, ইতালী ও অন্যান্য সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। শুধু এভাবেই সাম্রাজ্যবাদকে নিপাত করা যাবে, আমাদের জাতি ও জনগণ এবং বিশ্বের সমস্ত জাতি ও জনগণের মুক্তি অর্জন করা যাবে। এই হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ—সেই আন্তর্জাতিকতাবাদ, যা দিয়ে আমরা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণ দেশ-প্রেমের বিরোধিতা করি ।

কমরেড বেথুন নিজের প্রতি লেশমাত্রও মনোযোগ না দিয়ে অপরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর এই ভাবমানস এখানেই অভিব্যক্ত হয় যে, তিনি কাজের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ছিলেন এবং কমরেড ও জনগণের সংগে অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করতেন। প্রত্যেক কমিউনিস্টেরই তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা

উচিত। বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের কাজে দায়িত্বজ্ঞানহীন, তারা ভারী কাজকে ভয় করে, হাল্কাটা গ্রহণ করে, ভারী ভারগুলো অন্যদের কাঁধে ঠেলে দেয়, নিজেরা হাল্কাটা বহন করে। যদি তাদের সামনে কোন কাজ এসে পড়ে, তাহলে প্রথমে তারা নিজেদের কথা ভাবে, তার পরে অন্যদের। সামান্য একটা কাজ করলেই তারা আত্ম-অহমিকায় মেতে ওঠে, নিজেদের সম্পর্ক বড়াই করতে তারা ভালবাসে, তারা এই ভয় করে যে, তাদের কাজ সম্পর্কে হয়তো অপরে জানতে পারবে না। তারা কমরেড ও জনগণের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করে না, বরং নিরুত্তাপ, যত্নহীন ও নির্দয় ব্যবহার করে। আসলে, এই ধরনের লোক কমিউনিস্ট নয়, অন্ততঃপক্ষে তাদের প্রকৃত কমিউনিস্ট বলে ধরা যায় না। ফ্রন্ট থেকে আগতদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি বেথুনের কথা বলার সময় তাঁর প্রশংসা করেন না এবং তাঁর ভাবমানসের দ্বারা মুগ্ধ হননি। শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত এলাকার যেসব সৈন্য ও জনসাধারণের চিকিৎসা ডাঃ বেথুন নিজ হাতে করেছিলেন এবং যাঁরা বেথুনের কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারেননি। প্রত্যেক কমিউনিস্টকে অবশ্যই কমরেড বেথুনের কাছ থেকে এই ধরনের প্রকৃত কমিউনিস্টের ভাবমানস দেখা উচিত।

কমরেড বেথুন একজন ডাক্তার ছিলেন, চিকিৎসা করাই ছিল তাঁর পেশা। তিনি প্রতিনিয়তই নিজের দক্ষতার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করতেন ; সমগ্র অষ্টম রুট বাহিনীর মেডিক্যাল সার্ভিসে তাঁর চিকিৎসার দক্ষতা অত্যন্ত উচ্চমানের ছিল। যারা ভিন্নতর কিছু দেখলেই নিজের কাজের পরিবর্তন চায় এবং যারা টেকনিক্যাল কাজকে অর্থহীন কাজ অথবা ভবিষ্যৎহীন কাজ বলে অবজ্ঞা করে, তাদের জন্যও এটা একটা চমৎকার শিক্ষা।

কমরেড বেথুনের সংগে আমার শুধুমাত্র একবার দেখা হয়েছিল। তারপর তিনি আমাকে অনেক পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু, ব্যস্ত থাকার জন্য আমি শুধু একটিমাত্র পত্রের উত্তর দিয়েছি, তাও তিনি পেয়েছেন কিনা জানি না। তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এখন আমরা সবাই তাঁকে স্মরণ করছি ; এতেই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর ভাবমানস প্রত্যেককে কত গভীরভাবে অভিভূত করেছে। আমাদের সবারই তাঁর সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবমানস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এই ভাবমানস গ্রহণ করলে সকলেই জনগণের পক্ষে খুবই হিতকর হবেন। একজন মানুষের যোগ্যতা বেশি অথবা কম হতে পারে, কিন্তু এই ভাবমানস থাকলেই তিনি হতে পারেন মহাপ্রাণ লোক, প্রকৃত লোক, নৈতিক-চরিত্রসম্পন্ন লোক, নীচ রুচি থেকে মুক্ত লোক ও জনগণের জন্য হিতকর লোক।

টীকা

১। প্রখ্যাত সার্জন নর্ম্যান বেথুন ১৯৩৬ সালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের প্রতিরোধ-যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ১৯৩৮ সালে একটি মেডিক্যাল টিমের নেতা হিসেবে ইয়েনানে আসেন। গভীর আন্তর্জাতিকতাবোধ ও কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দুবছর ধরে মুক্তাঞ্চলে সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে সেবার কাজ চালান। আহত সৈনিকদের অস্ত্রোপচার করার সময়ে রক্তে বিষক্রিয়ার ফলে ১৯৩৬ সালে ১২ই নভেম্বর তিনি হোপেই প্রদেশের ত্যাং-সিয়েনে প্রাণত্যাগ করেন ।

২। জে. ভি. স্তালিন ঃ 'লেনিনবাদের ভিত্তি', **লেনিনবাদের সমস্যা**। 'রচনাবলী', ৬ষ্ঠ খণ্ড, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য ।

নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে

জানুয়ারি, ১৯৪০

১। চীন কোন্ পথে ?

প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে দেশব্যাপী একটা প্রাণবন্ত আবহাওয়া দেখা দিয়েছিল। এই মনোভাব দেখা দিয়েছিল যে, আমাদের জাতি শেষ পর্যন্ত অচল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ খুঁজে পেয়েছে। লোকে আর সংশয়ে ভুরু কুঁচকে থাকত না। কিন্তু সম্প্রতি আপোষ করার ও কমিউনিজ্ম-বিরোধিতার কলরবে আবার আকাশ-বাতাস ভরে ফেলেছে এবং জনসাধারণকে আবার একবার বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সাংস্কৃতিক কর্মী ও তরুণ ছাত্রেরা সর্বাপেক্ষা অনুভূতিপ্রবণ বলে তারাই সর্বপ্রথমে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। 'কি করা যায় ?' 'চীন কোন্ পথে ?' প্রভৃতি প্রশ্ন আবার উত্থাপিত হচ্ছে। এই জন্যই **চীনা সংস্কৃতি**[১] নামক সাময়িক পত্রিকার প্রকাশনার সুযোগ চীনের রাজনীতি ও চীনের সাংস্কৃতিক ধারা সম্পর্কে কয়েকটা কথা বললে হয়ত কিছু উপকার হতে পারে। সাংস্কৃতিক সমস্যার ব্যাপারে আমি অনভিজ্ঞ, এ সম্পর্কে আমি অধ্যয়ন করার আশা রাখি এবং সবেমাত্র সে কাজ আমি শুরু করেছি। এটা ভাল ব্যাপার যে এই বিষয় নিয়ে ইয়েনানের অনেক কমরেড ইতিপূর্বেই বহু বিশদ ও বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখেছেন। আমরা এই সাদামাঠা কথাগুলি নাট্যানুষ্ঠানের আগে ঘণ্টা বাজানোর যে উদ্দেশ্য সেইরকম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। আমাদের মন্তব্য সমূহ জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রগামী কর্মীদের জন্য কিছু কিছু সত্যের সন্ধান দিতে পারে এবং তাঁরা যাতে তাঁদের মূল্যবান অবদানসমূহ নিয়ে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ হন সে ব্যাপারে এগুলি কিছু প্রেরণা যোগাতে পারে। আমরা আশা করি, তাঁরা আলোচনায় অংশ নেবেন এবং এমন নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে, যা আমাদের জাতির প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারবে। 'বাস্তব তথ্যাবলী থেকে সত্যের সন্ধান করাই' হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব; 'আমি সবসময়েই নির্ভুল', 'আমি তোমাদের বলছি' প্রভৃতির মতো অহঙ্কারী মনোভাব নিয়ে সমস্যার সমাধান কোনদিনই করা যায় না। আমাদের জাতি গভীর বিপদে নিমজ্জিত। কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্মত ও দায়িত্বশীল মনোভাবই আমাদের জাতিকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। সত্য একটিমাত্রই আছে এবং কেউ তার সন্ধান পেয়েছে

কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসা আত্মমুখীন অহমিকার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বাস্তবমুখী অনুশীলনের ওপর। লক্ষ কোটি জনগণের বিপ্লবী অনুশীলনই সত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। আমি মনে করি, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে চীনা সংস্কৃতি প্রকাশ করার মনোভাব হিসেবে গণ্য করা যায়।

২। আমরা এক নতুন চীন গড়ে তুলতে চাই

আজ বহু বছর ধরে আমরা কমিউনিস্টরা চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের জন্য লড়াই করে আসছি, এবং সংগে সংগে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্যও আমরা লড়ছি। আর আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে চীনা জাতির জন্য এক নতুন সমাজ ও নতুন দেশ গড়ে তোলা—যেখানে এক নতুন রাজনৈতিক ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া এক নতুন সংস্কৃতিও থাকবে। এর অর্থ এই যে, আমরা শুধু যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিপীড়িত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষিত চীনকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধশালী চীনে রূপান্তরিত করতে চাই তাই নয়, আমরা আরও চাই পুরানো সংস্কৃতির প্রভাবে অজ্ঞ ও অনগ্রসর চীনকে নতুন সংস্কৃতির প্রভাবাধীন এক সভ্য ও অগ্রসর চীনে পরিণত করতে। সংক্ষেপে, আমরা এক নতুন চীন গড়ে তুলতে চাই। চীনা জাতির নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলাই আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজের লক্ষ্য।

৩। চীনের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য

আমরা এক নতুন সংস্কৃতি গড়তে চাই। কিন্তু সেই সংস্কৃতির রূপ কি হবে ?

কোন নির্দিষ্ট সংস্কৃতি (মতাদর্শগত রূপ হিসেবে) নির্দিষ্ট সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতিফলন। সেই সংস্কৃতি আবার সেই নির্দিষ্ট সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এবং সেগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ; আর অর্থনীতি হচ্ছে ভিত্তি, এবং রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতিরই ঘনীভূত প্রকাশ[২]। সংস্কৃতির সংগে রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে এটাই আমাদের মূল দৃষ্টকোণ। অতএব, নির্দিষ্ট রূপের রাজনীতি ও অর্থনীতিই প্রথমে নির্দিষ্ট রূপের সংস্কৃতিকে নির্ধারণ করে ; এবং শুধু তারপরেই সেই নির্দিষ্ট রূপের সংস্কৃতি আবার নির্দিষ্ট রূপের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে ও ঐগুলির মধ্যে

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মার্কস বলেছেন ঃ 'মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, বরং বিপরীতপক্ষে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে।'[৩] তিনি আরও বলেছেন, 'দার্শনিকেরা নানাভাবে বিশ্বকে শুধু ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে বিশ্বের **পরিবর্তন সাধন করা**।'[৪] মানব ইতিহাসে এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলিই সর্বপ্রথম চেতনা ও অস্তিত্বের মধ্যেকার সম্পর্কের সমস্যার সঠিক সমাধান করে, এবং এগুলিই হচ্ছে বাস্তবের প্রতিফলন হিসেবে জ্ঞানের গতিশীল বিপ্লবী তত্ত্বের মৌলিক ধারণা। পরবর্তীকালে লেনিন এই তত্ত্বকে আরও গভীরভাবে বিকশিত করেছেন। চীনের সাংস্কৃতিক সমস্যার আলোচনায় এই মূল ধারণাগুলিকে আমাদের একান্তভাবে মনে রাখতে হবে।

কাজেই এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, চীনা জাতির পুরাতন সংস্কৃতির মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে আমরা বর্জন করতে চাই সেটা চীনা জাতির পুরানো রাজনীতি ও পুরানো অর্থনীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য ; আর চীনা জাতির যে নতুন সংস্কৃতি আমরা গড়ে তুলতে চাই সেটাও আমাদের নতুন রাজনীতি, নতুন অর্থনীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য। চীনা জাতির পুরানো রাজনীতি ও পুরানো অর্থনীতি হচ্ছে চীনা জাতির পুরানো সংস্কৃতির ভিত্তি ; আর চীনা জাতির নতুন রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতি হচ্ছে চীনা জাতির নতুন সংস্কৃতির ভিত্তি।

চীনা জাতির পুরানো রাজনীতি এবং পুরানো অর্থনীতি কি ? এবং তার পুরানো সংস্কৃতিই-বা কি ?

চৌ ও চিন রাজবংশের আমল থেকেই চীনা সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। তার রাজনীতি ও অর্থনীতির চরিত্রও ছিল সামন্ততান্ত্রিক। ঐ রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতিফলন হিসেবে প্রধান সংস্কৃতিও ছিল সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি।

চীনদেশের ওপর বিদেশী পুঁজিবাদের আক্রমণ এবং চীনের সমাজে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী উপাদানের জন্ম ও বিকাশের পরিণতিতে চীনের সমাজ ক্রমান্বয়ে একটি ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান চীনে জাপানীদের অধিকৃত এলাকার সমাজ ঔপনিবেশিক ; কুওমিনতাঙ শাসিত এলাকায় সেটা মূলতঃ আধা-ঔপনিবেশিক ; এবং উভয় অঞ্চলের সমাজে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থারই প্রাধান্য রয়েছে। এটাই হল বর্তমান চীনের সমাজের চরিত্র, এটাই হল চীনদেশের বর্তমান অবস্থা। এই সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতি হচ্ছে প্রধানতঃ ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ; আর তাদের প্রতিফলন হিসেবে প্রধান সংস্কৃতিও হচ্ছে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা সামন্ততান্ত্রিক।

মূলতঃ এই প্রধান রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাই হল আমাদের বিপ্লবের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। এ ধরনের ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক পুরানো রাজনীতি, পুরানো অর্থনীতি এবং সেগুলির সেবায় নিয়োজিত পুরানো সংস্কৃতিকে আমরা নির্মূল করতে চাই; প্রতিষ্ঠা করতে চাই সেগুলির ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ চীনা জাতির এক নতুন রাজনীতি, নতুন অর্থনীতি ও এক নতুন সংস্কৃতি ।

তাহলে, চীনা জাতির নতুন রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতি কি? এবং চীনা জাতির নতুন সংস্কৃতিই-বা কি ?

চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক ধারাকে দুটি পর্বে ভাগ করতে হবে ; প্রথমে গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তারপরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই দুটি বিপ্লবী প্রক্রিয়ার চরিত্র ভিন্ন। এখানে উল্লিখিত গণতন্ত্র পুরানো রকমের গণতন্ত্রের অর্ন্তভুক্ত নয়,—এটা পুরানো গণতন্ত্র নয়, বরং এটা নতুন ধরনের গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত—এটা হচ্ছে নয়া গণতন্ত্র।

সুতরাং, এ কথা জোর দিয়েই বলা চলে যে, চীনা জাতির নতুন রাজনীতি নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি ; তার নতুন অর্থনীতি নয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি এবং নতুন সংস্কৃতি নয়া গণতন্ত্রের সংস্কৃতি।

এই হল বর্তমান চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। চীনে বিপ্লবী কাজে নিযুক্ত যে-কোন রাজনৈতিক পার্টি, গ্রুপ বা ব্যাক্তি যদি এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে না পারে, তাহলে তারা বিপ্লব পরিচালনা করতে পারবে না, পারবে না বিপ্লবকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। বরং তারা জনসাধারণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হবে এবং শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্গ হতাশার মধ্যে তাদের নিমজ্জিত হতে হবে।

৪। চীনের বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের অংশ

চীনের বিপ্লবের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই বিপ্লব দুটি পর্বে বিভক্ত, গণতন্ত্রের পর্ব ও সমাজতন্ত্রের পর্ব। প্রথম পর্বের এই গণতন্ত্র এখন আর সাধারণ ধরণের গণতন্ত্র নয়, এ এক চীনা কায়দার, এক বিশেষ ও নতুন ধরনের গণতন্ত্র--নয়া গণতন্ত্র। তাহলে কি করে এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য দেখা দিল ? বিগত একশ বছর ধরেই কি তা বিদ্যমান ছিল, না সম্প্রতিই শুধু তার উদ্ভব ঘটেছে?

চীনের ও দুনিয়ার ঐতিহাসিক বিকাশকে মোটামুটিভাবে বিচার করে দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আফিং যুদ্ধের অব্যবহিত পরের যুগে এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ছিল না, বরং আরও পরে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পরেই শুধু এই বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন দেখা যাক কি করে এই বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হল।

এটা খুবই স্পষ্ট যে, চীনের বর্তমান সমাজের চরিত্র যেহেতু ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক, তাই চীনের বিপ্লবকে অবশ্যই দুই পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বের কাজ হল সমাজের এই ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক রূপকে একটা স্বাধীন, গণতান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তিত করা ; দ্বিতীয় পর্বের কাজ হল বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এখন যে কাজ আমরা করছি, তা চীন বিপ্লবের প্রথম পর্বের কাজ।

এই প্রথম পর্বের প্রস্তুতির পর্যায় শুরু হয়েছে ১৮৪০ সালের আফিং যুদ্ধের সময় থেকে। অর্থাৎ, যখন চীনের সমাজ তার সামন্ততান্ত্রিক রূপ বদলে আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে, সেই সময় থেকে। তারপর ঘটে এক এক করে তাইপিং স্বর্গীয় রাজ্যের আন্দোলন, চীন ফরাসী যুদ্ধ, চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন, ১৯১১ সালের বিপ্লব, ৪ঠা মে'র আন্দোলন, উত্তর অভিযান, কৃষি বিপ্লবের যুদ্ধ ও বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ—এসবগুলি সংঘটিত হতে পুরো এক শতাব্দী লেগেছে। একটা নির্দিষ্ট অর্থে বিচার করলে এই সমস্ত আন্দোলনই চীন বিপ্লবের প্রথম পর্বের কাজ সম্পাদনের প্রয়াস। চীনের জনগণ এইসব বিভিন্ন আন্দোলনের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিপ্লবের প্রথম পর্বের কাজ সম্পাদনের প্রয়াস চালিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শক্তির বিরোধিতা করেছেন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং প্রথম পর্বের বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। আরও পূর্ণ অর্থে ১৯১১ সালের বিপ্লব এই বিপ্লবের শুরু। সামাজিক চরিত্রের দিক থেকে এই বিপ্লব হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। এ বিপ্লব আজও সম্পন্ন হয়নি, তা সম্পন্ন করতে আরও বিরাট প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কারণ এ বিপ্লবের শত্রুরা এখনো দারুণ শক্তিশালী। 'বিপ্লব এখনো সাফল্যমণ্ডিত হয়নি, কমরেডদের অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে' ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের এই উক্তি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকেই বোঝায়।

কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার এবং ১৯১৭ সালের রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের ফলে দুনিয়ার ছয় ভাগের একভাগে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হবার পর চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে একটা পরিবর্তন ঘটে।

এর আগে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল পুরানো ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অন্তর্ভুক্ত এবং পুরানো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিশ্ব-বিপ্লবেরই একটি অংশ।

ঐ সময় থেকে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্রের রূপান্তর ঘটেছে, তা নতুন ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আওতায় চলে এসেছে। বিপ্লবী ফ্রন্ট গঠনের দিক থেকে দেখলে তা তখন থেকে সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেন এমন হল? কারণ প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ও প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—অক্টোবর বিপ্লব—দুনিয়ার ইতিহাসের গোটা ধারায় পরিবর্তন এনেছে এবং দুনিয়ার ইতিহাসে নতুন এক যুগের সূচনা করেছে।

এই যুগে পৃথিবীর এক অংশে (অংশটি সারা দুনিয়ার ছয় ভাগের একভাগ) বিশ্ব পুঁজিবাদী ফ্রন্ট চূর্ণ হয়েছে, আর বাকি সব জায়গাতেই তার ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্নগুলো পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে ; এই যুগে পুঁজিবাদী দুনিয়ার বাকি অংশকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্রমেই বেশি বেশি করে উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে ; এই যুগে গঠিত হয়েছে এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে যে, সমস্ত উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের মুক্তি-আন্দোলনের সমর্থনের জন্য সে সংগ্রাম করতে চায় ; এই যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সর্বহারাশ্রেণী সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিগুলোর প্রভাব থেকে দিনের পর দিন মুক্ত হচ্ছে এবং উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলোর মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছে—এমন একটি যুগে সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণী ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে-কোন ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবই আর পুরানো ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের আওতায় পড়ে না, পড়ে নতুন ধরনের বিপ্লবের আওতায়। এ বিপ্লব এখন আর পুরানো বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদী বিশ্ববিপ্লবের অংশ নয় ; এ বিপ্লব এখন নতুন এক বিশ্ববিপ্লবের অংশ, অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের বিপ্লবী উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশসমূহকে আর বিশ্ব পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবী ফ্রন্টের মিত্র হিসেবে দেখা চলবে না, এগুলি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ফ্রন্টের মিত্রে পরিণত হয়েছে।

যদিও সামাজিক চরিত্রের বিচারে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের এই বিপ্লবের প্রথম পর্যায় বা প্রথম পর্ব এখনো মূলতঃ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকই রয়েছে এবং তার বাস্তব দাবি যদিও হচ্ছে পুঁজিবাদের বিকাশের পথ পরিষ্কার করা, তবু এই বিপ্লব আর সেই পুরানো ধরনের বিপ্লব নয়—যা বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হতো এবং যার লক্ষ্য ছিল এক পুঁজিবাদী সমাজ ও বুর্জোয়া একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা। বরং এই বিপ্লব এক নতুন ধরনের বিপ্লব,

যা সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত এবং যার লক্ষ্য বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে এক নয়া-গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং এই বিপ্লবই আবার সমাজতন্ত্রের বিকাশের জন্য আরও বিস্তৃত পথ পরিষ্কার করবে। অগ্রগতির পথে তার শত্রুদের অবস্থার পরিবর্তন এবং তার মিত্রদের পরিবর্তনের কারণে এই বিপ্লবকে আবার কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। কিন্তু তার মূল চরিত্রের কোনও পরিবর্তন হবে না।

এই ধরনের বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের একেবারে মূলে আঘাত করে, তাই সাম্রাজ্যবাদ একে সহ্য করে না, বরং এর বিরোধিতা করে। কিন্তু অন্যদিকে সমাজতন্ত্র একে সহ্য করে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী একে সাহায্য করে।

তাই, এই ধরনের বিপ্লব অনিবার্যভাবে সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অংশে পরিণত হয় ।

'চীনের বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের অংশ—১৯২৪-১৯২৭ সালে চীনের প্রথম মহাবিপ্লবের সময়কালেই এই নির্ভুল বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। পেশ করে ছিলেন চীনা কমিউনিস্টরা, এবং তখনকার দিনের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই একে সমর্থন জানিয়েছিলেন। শুধু এই তত্ত্বের অর্থটা তখনো খুব বেশি স্পষ্ট করে তোলা হয়নি, তাই লোকের মনে প্রশ্নটি সম্পর্কে কেবলমাত্র একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল।

এই 'বিশ্ববিপ্লব' আর পুরানো বিশ্ববিপ্লব নয়, পুরানো বুর্জোয়া বিশ্ববিপ্লব বহু দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে ; এ বিপ্লব নতুন বিশ্ববিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লব। ঠিক এইভাবেই এই ধরনের 'অংশ' বলতে পুরানো বুর্জোয়া বিপ্লবের অংশ বোঝায় না, বোঝায় নতুন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ। এ এক বিরাট পরিবর্তন। পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় পরিবর্তন এর আগে আর হয়নি।

স্তালিনের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই চীনের কমিউনিস্টরা এই নির্ভুল বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে লেখা একটি প্রবন্ধে ১৯১৮ সালেই স্তালিন বলেছিলেন ঃ

অক্টোবর বিপ্লবের দুনিয়াব্যাপী মহান তাৎপর্য প্রকাশ পাচ্ছে প্রধানতঃ এই তথ্যগুলোর মধ্যে ঃ

(১) এই বিপ্লব জাতীয় সমস্যার পরিধিকে বিস্তৃত করে দিয়েছে—তাকে ইউরোপে জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আংশিক সমস্যা থেকে রুপান্তরিত করেছে সাম্রাজ্যবাদের কবল হতে নিপীড়িত জাতিসমূহ, উপনিবেশ ও আধা-

উপনিবেশগুলোর মুক্তির সাধারণ সমস্যায় ঃ

(২) এটা তাদের এই মুক্তির বিপুল সম্ভাবনাকে ও সেইদিকে অগ্রসর হবার পথ খুলে দিয়েছে ; এইভাবে এটা পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিগুলোর মুক্তির কাজকে অনেকটা সহজতর করেছে এবং তাদেরকে টেনে এনেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের সাধারণ ধারায় ;

(৩) এইভাবে এটা সমাজতান্ত্রিক পাশ্চাত্ত্য ও দাসত্বশৃংখলে আবদ্ধ প্রাচ্যের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে এবং রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্যের সর্বহারাশ্রেণী থেকে শুরু করে প্রাচ্যের অত্যাচারিত জাতিগুলি পর্যন্ত সর্বত্র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের **বিরুদ্ধে** এক নতুন বিপ্লবী ফ্রন্ট সৃষ্টি করেছে।[৫]

এই প্রবন্ধ রচনার পর থেকে স্তালিন বারবার নিম্নোক্ত তত্ত্বকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন যে, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের বিপ্লব পুরানো প্রকারের বিপ্লব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশে পরিণত হয়েছে। তখনকার দিনের যুগোশ্লাভ জাতীয়তাবাদীদের সংগে বিতর্ক প্রসঙ্গে লেখা ১৯২৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে স্তালিন এই তত্ত্বের সবচেয়ে স্পষ্ট ও যথার্থ ব্যাখ্যা দেন। এই প্রবন্ধটি চ্যাং চোং-শির দ্বারা অনূদিত **জাতীয় সমস্যা প্রসঙ্গে স্তালিন নামক** পুস্তকের অন্তর্ভূক্ত ; প্রবন্ধটির নাম 'জাতীয় সমস্যা প্রসঙ্গে আর একবার'। এই প্রবন্ধটিতে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি রয়েছে ঃ

> ১৯১২ সালের শেষের দিকে লেখা স্তালিনের **মার্কসবাদ ও জাতীসমস্যা** নামক পুস্তিকার একটি অংশের কথা সেমিচ উল্লেখ করেছেন। সেখানে লেখা আছে ঃ '**উদীয়মান** পুঁজিবাদের অবস্থায় জাতীয় সংগ্রাম বুর্জোয়াশ্রেণীগুলোর নিজেদের মধ্যেকার সংগ্রাম।' এই নজির দেখিয়ে সেমিচ, স্পষ্টতঃ, এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, বর্তমান ঐতিহাসিক অবস্থায় জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার যে সূত্র তিনি খাড়া করেছেন তা নির্ভুল। কিন্তু স্তালিনের পুস্তিকাখানি লেখা হয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে ; তখনো জাতীয় সমস্যা মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপী তাৎপর্যসম্পন্ন সমস্যা ছিল না, তখন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে মার্কসবাদীদের মূল দাবী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ হিসেবেই বিবেচিত হতো— সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের অংশ হিসেবে নয়। তারপর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, একদিকে যুদ্ধ ও অন্যদিকে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব জাতীয় সমস্যাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ থেকে সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশে রূপান্তরিত করেছে। এটা লক্ষ্য করতে না পারা হাস্যকর। ১৯১৬ সালের অক্টোবর

মাসে লেখা 'আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনার সারসংকলন' নামক প্রবন্ধেই লেনিন বলেছেন, জাতীয় সমস্যার মূল বিষয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আর সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ নয়, তা এখন সাধারণ সর্বহারা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অংশে পরিণত হয়েছে। জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে লেনিন ও রুশ কমিউনিজ্‌মের অন্যান্য প্রতিনিধিদের পরবর্তী রচনাগুলোর উল্লেখমাত্রও আমি করছি না। এতসবের পরে, বর্তমানে যখন নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ফলে আমরা এক নতুন যুগে—সর্বহারা বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছি, তখন সেমিচ আবার রাশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আমলে লেখা স্তালিনের পুস্তিকার অংশবিশেষের যে উল্লেখ করেছেন, তার কী তাৎপর্য থাকতে পারে ? এর শুধু এইটুকু তাৎপর্য থাকতে পারে যে, সেমিচ যে উধৃতি দিয়েছেন তাতে তিনি স্থান, কাল, ও জীবন্ত ঐতিহাসিক অবস্থার কথা মনে রাখেননি। এর দ্বারা তিনি দ্বন্দ্ববাদের সবচেয়ে মৌলিক দাবিই অগ্রাহ্য করে বসেছেন। তিনি এটা বিবেচনা করেননি যে, একটি ঐতিহাসিক অবস্থায় যা সত্য, অন্য ঐতিহাসিক অবস্থায় তা ভুলও হতে পারে।[৬]

এ থেকে জানা যায় যে, দু'ধরনের বিশ্ববিপ্লব আছে। প্রথম ধরনের বিশ্ববিপ্লব হচ্ছে বুর্জোয়া অথবা পুঁজিবাদী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের বিশ্ববিপ্লবের যুগ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ১৯১৪ সালে যখন প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ বেধে উঠল, আরও বিশেষ করে ১৯১৭ সালে যখন রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হল, তখনই এই যুগের সমাপ্তি ঘটেছে। তখন থেকেই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ধরনের বিশ্ববিপ্লব—সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রধান শক্তি হচ্ছে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সর্বহারাশ্রেণী ; আর মিত্র হচ্ছে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের নিপীড়িত ও জাতিগুলি। নিপীড়িত জাতির যে কোন শ্রেণী, পার্টি, বা ব্যক্তি বিপ্লবে যোগাদান করুক না কেন এ ব্যাপারে তারা নিজেরা সচেতন হোক বা না হোক কিংবা বুঝুক বা না বুঝুক, যতদিন তারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী থাকবে ততদিন তাদের বিপ্লব সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অংশ হবে, আর তারা নিজেরাও ঐ বিশ্ববিপ্লবের মিত্র হবে।

চীন বিপ্লবের তাৎপর্য আজ ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে। এখন এমন এক সময় এসে পড়েছে, যখন পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটগুলো দুনিয়াকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাপে ধাপে টেনে নিয়ে চলেছে ; যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজ্‌মের দিকে উত্তরণের যুগে এসে পৌঁছেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা ও পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়ার ওপর আঘাত হানার

জন্য সারা দুনিয়ার সর্বহারাশ্রেণী ও নিপীড়িত জাতিগুলিকে পরিচালিত ও সাহায্য করার শক্তি অর্জন করেছে ; যখন বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের সর্বহারাশ্রেণীর পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ; এবং যখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনা সর্বহারাশ্রেণী, কৃষকসাধারণ, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়ারা একটা মহান স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আজ এমন একটি যুগে বাস করে আমরা কি উপলব্ধি করব না যে, চীনের বিপ্লবের বিশ্বতাৎপর্য আরও বিরাট হয়েছে ? আমি মনে করি, আমাদের তাই করা উচিত। চীনের বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে।

সামাজিক চরিত্রের বিচারে চীনের বিপ্লবের এই প্রথম পর্যায় (এই পর্যায়ে আবার বহু উপ-পর্যায়ে বিভক্ত) একটা নতুন ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, এখনো সেটা সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। তবে বহু আগেই এই বিপ্লব সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অংশে পরিণত হয়েছে ; অধিকন্তু, আজ তা ওই বিশ্ববিপ্লবের এক মহান অংশে এবং এক মহান মিত্রে পরিণত হয়েছে। এই বিপ্লবের প্রথম পর্ব বা পর্যায় নিশ্চয়ই চীনা বুর্জোয়া একনায়কত্বের অধীনে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা নয়—তা হতেও পারে না; এর ফলে হবে চীনা সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বের অধীনে নয়া-গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা। তারপর বিপ্লবকে অগ্রসর করিয়ে নেওয়া হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে, যে পর্যায়ে চীনের সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এই হচ্ছে বর্তমান চীনের বিপ্লবের সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য, এই কুড়ি বছরের (৪ঠা মে'র আন্দোলন থেকে শুরু করে) নতুন বিপ্লবী ধারা। এই হচ্ছে তার জীবন্ত বাস্তব মর্মবস্তু।

৫। নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি

চীনের বিপ্লবের নতুন ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হল এই বিপ্লব দুটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে বিভক্ত ; প্রথম পর্যায়টি হল নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে এই নতুন বৈশিষ্ট্যের বাস্তব অভিব্যক্তি কিভাবে ঘটে ? এটা আমরা এখন ব্যাখ্যা করব।

১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র আন্দোলনের (১৯১৪ সালের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের ও ১৯১৭ সালের রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পরে তা ঘটেছিল) আগে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক পরিচালকের ভূমিকা পালন করেছিল চীনের পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণী (তাদের বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে)

তখনো পর্যন্ত চীনের সর্বহারাশ্রেণী সচেতন ও স্বাধীন শ্রেণীশক্তি হিসেবে রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়নি ; তারা শুধু পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুগামী হিসেবে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল। যেমন, ১৯১১ সালের বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীরও ছিল এইরকম অবস্থা।

৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর, যদিও চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী অব্যাহত ভাবেই বিপ্লবে যোগদান করতে থাকে, তবু তখন বুর্জোয়াশ্রেণী আর চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক পরিচালক ছিল না, পরিচালক ছিল চীনা সর্বহারাশ্রেণী। নিজেদের বিকাশের ফলে ও রুশ বিপ্লবের প্রভাবে চীনের সর্বহারাশ্রেণী তখন দ্রুত সচেতন ও স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'—এই শ্লোগান এবং চীনের গোটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ কর্মসূচীটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টিই উপস্থাপিত করে ; আর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একাই কৃষি-বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী হল একটি ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী, এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা অত্যাচারিত। অতএব, সাম্রাজ্যবাদী যুগেও তারা নির্দিষ্ট সময়কালে ও নির্দিষ্ট মাত্রায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও স্বদেশের আমলাতান্ত্রিক যুদ্ধবাজ সরকারের বিরোধিতা করার বিপ্লবী চরিত্র বজায় রাখতে পারে (যুদ্ধবাজ সরকারের প্রতি তাদের বিরুদ্ধতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৯১১ সালের বিপ্লব এবং উত্তর অভিযানের সময়কালে), এবং যাদের তারা বিরোধিতা করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে তারা সর্বহারাশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে। চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী এবং পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যের বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে এখানেই তফাৎ। যেহেতু পুরাতন রুশ সাম্রাজ্য ছিল একটা সামরিক সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশ—যে দেশ অন্য দেশের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ চালাত— সেইজন্য রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে কোন বিপ্লবী চরিত্রই ছিল না। সেখানকার সর্বহারাশ্রেণীর কর্তব্য ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরোধিতা করা, তার সংগে হাত মেলানো নয়। কিন্তু চীন একটি ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, এবং সে হচ্ছে আগ্রাসী আক্রমণের শিকার, তাই নির্দিষ্ট সময়কালে ও নির্দিষ্ট মাত্রায় চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর একটা বিপ্লবী চরিত্র আছে। এখানে সর্বহারাশ্রেণীর কর্তব্য হল জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর এই বিপ্লবী চরিত্রকে অবহেলা না করে সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক যুদ্ধবাজ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সংগে যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

এদিকে আবার ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়া হবার কারণে চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত

দুর্বল, এইজন্য এদের চরিত্রে আর একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—বিপ্লবের শত্রুর সংগে আপোষ করার প্রবণতা। চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপ্লবে অংশগ্রহণের সময়েও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় না এবং জমির খাজনা গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলকে শোষণ করার সংগে তারা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকে ; তাই সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাদের নেই, সামন্তবাদী শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাদের থাকা তো আরও দূরের কথা। অতএব, চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দুটি মৌলিক সমস্যার সমাধান করা বা দুটি মৌলিক কর্তব্য সম্পন্ন করা চীনা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব নয়। চীনের বৃহৎ বুর্জোয়াদের--যাদের প্রতিনিধিত্ব করে কুওমিনতাঙ—সম্পর্কে বলতে গেলে, তারা ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কালে সাম্রাজ্যবাদীদের কোলে মাথা গুঁজেছে, এবং সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধে বিপ্লবী জনগণের বিরোধিতা করেছে। ১৯২৭ সালে ও তার পরবর্তীকালের একটি নির্দিষ্ট সময়ে চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীও প্রতিবিপ্লবের পক্ষ নিয়েছে। বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে বৃহৎ বুর্জোয়াদের একটা অংশ—ওয়াং চিং-ওয়েই যার প্রতিনিধি—শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর বেইমানির এক নতুন পরিচয় দিয়েছে। চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে অতীতের ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোর, বিশেষতঃ ফ্রান্সের বুর্জোয়াশ্রেণীর এ হল আর একটা পার্থক্য। ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে, বিশেষতঃ ফ্রান্সে বুর্জোয়াশ্রেণী যখন তার বিপ্লবী যুগে ছিল, তখন সেখানকার বুর্জোয়া বিপ্লব তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণাঙ্গ ছিল, কিন্তু চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে সেই পরিমাণের সম্পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব করার ক্ষমতা নেই।

একদিকে বিপ্লবে যোগদান করার সম্ভাবনা, অন্যদিকে বিপ্লবের শত্রুর সঙ্গে আপোষ করার মনোভাব--চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্রের এই হল দ্বৈত চরিত্র—'তার মুখ উভয় দিকেই ফেরানো'। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসে দেখা যায়, সেখানকার বুর্জোয়াদের এইরকম দ্বৈত চরিত্র ছিল। যখন তারা শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হয়, তখন শ্রমিক ও কৃষকদের সাথে হাত মিলিয়ে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ; আবার শ্রমিক ও কৃষকেরা যখন জেগে ওঠে তখন তারা শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের বিরোধিতা করে। বিশ্বের সকল দেশের বুর্জোয়াদের পক্ষে এই হল সাধারণ নিয়ম। তবে চীনের বুর্জোয়াদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য একটু বেশি পরিমাণে দেখা যায়।

চীনে এটা স্পষ্ট যে, যে-কেউ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শক্তিগুলিকে উৎখাত করতে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারবে—সে-ই জনগণের আস্থা অর্জন করতে

পারবে, কারণ জনগণের মারাত্মক শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শক্তি, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ। আজ যে-কেউ জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করতে এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তন করতে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারবে সে-ই হবে জনগণের ত্রাণকর্তা। ইতিহাস এটা প্রমাণ করেছে যে, এই দায়িত্ব সম্পন্ন করতে চীনা বুর্জোয়াশ্রেণী অক্ষম, এই দায়িত্ব সর্বহারাদের কাঁধেই এসে পড়তে বাধ্য।

অতএব পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, চীনের সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক, বুদ্ধিজীবি ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়ারাই হচ্ছে মূল শক্তি যা দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। এই শ্রেণীগুলোর কোন কোনটি ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে, বাকিরা জাগছে ; চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কাঠোমোয় এরা অনিবার্যভাবেই মৌলিক অংশ হয়ে উঠবে, আর সর্বহারাশ্রেণী হবে নেতৃত্বের শক্তি। যে চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আজ আমরা গঠন করতে চাই, তা সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী জনগণের যুক্ত একনায়কত্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই কেবল হতে পারে। এটাই হবে নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, খাঁটি বিপ্লবী তিনটি মহান কর্মনীতি-সহ নতুন তিন গণ-নীতির প্রজাতন্ত্র।

এই ধরণের নয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র একদিকে যেমনি প্রাচীন ইউরোপ আমেরিকার বুর্জোয়া একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী প্রজাতন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র, তাই সেগুলি হচ্ছে প্রাচীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং ইতিমধ্যেই তা সেকেলে হয়ে গেছে। অন্যদিকে তেমনি তা সোভিয়েত ধরনের সর্বহারা একনায়কত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকেও স্বতন্ত্র, যে প্রজাতন্ত্র ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিকশিত হয়ে উঠেছে, এবং যা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হবে। সমস্ত শিল্পোন্নত দেশের রাষ্ট্রিয় ও সরকারী কাঠামোয় এটাই নিঃসন্দেহে হবে সর্বপ্রধান রূপ। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কালে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবের জন্য এই ধরনের প্রজাতন্ত্র উপযুক্ত নয়। তাই একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কালে সমস্ত ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবে তৃতীয় ধরনের রাষ্ট্ররূপই কেবল গ্রহণ করা যায়, আর সেই রাষ্ট্ররূপই, হল নয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এটা এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কালের রাষ্ট্ররূপ, তাই এটা হচ্ছে অন্তর্বর্তী রূপ ; কিন্তু এটা অপরিহার্য রূপ, এটাকে বাদ দেওয়া যায় না।

অতএব, দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে দুনিয়ার বিবিধ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মূলতঃ এই তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে— (১) বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন প্রজাতন্ত্র, (২) সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন

প্রজাতন্ত্র, এবং (৩) কয়েকটি বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বাধীন প্রজাতন্ত্র।

প্রথমগুলি হচ্ছে পুরানো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আজ, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বেধে ওঠার পর, বহু পুঁজিবাদী দেশে গণতন্ত্রের চিহ্ন আর নেই, সেগুলি বুর্জোয়াশ্রেণীর রক্তাক্ত সামরিক একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে বা পরিণত হচ্ছে। জমিদার ও বুর্জোয়াদের যুক্ত একনায়কত্বাধীন কতকগুলো দেশকেও এই রকমের রাষ্ট্র হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে।

দ্বিতীয় ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে এইরকম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার অবস্থা পরিপক্ক হয়ে উঠেছে; ভবিষ্যতের এক নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে এই হবে দুনিয়ার প্রধান রাষ্ট্ররূপ।

তৃতীয়টি হচ্ছে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলোর বিপ্লবের অন্তর্বর্তী রাষ্ট্ররূপ। এইসব বিপ্লবের প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তা হবে মৌলিক অভিন্নতার মধ্যে গৌণ পার্থক্য মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিপ্লব হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলির রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কাঠামো অবশ্যই মূলতঃ একইরকমের হবে, অর্থাৎ তা হবে কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বাধীন নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আজকের চীনে এই নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপ হল জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রূপ। এটা জাপান-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ; এটা আবার কয়েকটি বিপ্লবী শ্রেণীর মৈত্রীবন্ধন এবং একটি যুক্তফ্রন্টও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চীনে আজ দীর্ঘদিন ধরে প্রতিরোধের লড়াই চলা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাগুলি ছাড়া দেশের অধিকাংশে গণতন্ত্রীকরণের কাজ মূলতঃ এখনো পর্যন্ত আরম্ভই হয়নি। এই মূল দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। যদি এই নীতির পরিবর্তন করা না হয়, তাহলে আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ গুরুতরভাবে বিপন্ন হবে।

আমরা এখানে যে সমস্যার আলোচনা করছি, সেটা 'রাষ্ট্রব্যবস্থার' সমস্যা। চিং রাজবংশের শাসনকালের শেষভাগ থেকে শুরু করে কয়েক দশক ধরে এই সমস্যা নিয়ে বিবাদ বিসংবাদ চলে আসছে, কিন্তু এখনো এর সমাধান হয়নি। আসলে প্রশ্নটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমাজিক শ্রেণীর কোন্‌টি কোন্‌ অবস্থানে থাকবে—তা নির্ণয় করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বদাই এই শ্রেণীগত অবস্থানের সত্যকে গোপন রেখে 'জাতীয়' কথাটি ব্যবহার করে তারই এককশ্রেণীর একনায়কত্বকে বাস্তবায়িত করতে চায়। এইভাবে গোপন রাখায় বিপ্লবী জনগণের কোন উপকার হয় না, তাই একে সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত করতে হবে। 'জাতীয়' কথাটি অবশ্য ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু প্রতিবিপ্লবী ও দেশদ্রোহীদেরকে

এর অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। যে ধরনের রাষ্ট্র আজ আমরা চাই তা হচ্ছে প্রতিবিপ্লবী ও দেশদ্রোহীদের ওপর সমস্ত বিপ্লবীশ্রেণীর একনায়কত্ব।

> আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাধারণতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার ও নিছক সাধারণ লোকদের ওপর অত্যাচারের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কুওমিনতাঙের গণতন্ত্রের নীতির অর্থ হচ্ছে এমন এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা সমস্ত সাধারণ লোকের হাতে থাকে, মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া অধিকারে নয়।

এটা হল কুওমিনতাঙের সংগে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার যুগে ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত ইস্তাহার থেকে উধৃত মহান বিবৃতি। ষোল বছর ধরে কুওমিনতাঙ নিজেই নিজের এই বিবৃতি লংঘন করে চলেছে, ফলে আজকের এই গভীর জাতীয় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এটা হল কুওমিনতাঙের একটা সাংঘাতিক ভুল ; আমরা আশা করি, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে কুওমিনতাঙ এই ভুল সংশোধন করবে।

এবার 'সরকারের ব্যবস্থার' প্রশ্ন। এটা হচ্ছে কীভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা সংগঠিত হবে, অর্থাৎ শত্রুর বিরোধিতা করার ও আত্মরক্ষার জন্য এক বা অন্য সামাজিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার যন্ত্রটিকে কোন্‌রূপে বিন্যস্ত করবে, তার প্রশ্ন। এমন কোন রাষ্ট্র হতে পারে না যা রাজনৈতিক ক্ষমতার এক যথোপযুক্ত রূপের সংস্থা হিসেবে প্রতিফলিত হয় না। চীনে এখন আমরা জনগণের কংগ্রেস সমন্বিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারি। এই কংগ্রেস থাকবে জাতীয় গণ-কংগ্রেস থেকে নিয়ে নীচের দিকে প্রদেশ, জেলা, মহকুমা ও থানার গণ-কংগ্রেস পর্যন্ত সর্বস্তরে; প্রত্যেক স্তরে সেগুলি নিজের সরকারী সংস্থাসমূহ নির্বাচন করবে। কিন্তু নরনারী নির্বিশেষে, ধর্মবিশ্বাস, সম্পত্তির পরিমাণ ও শিক্ষাগত মান প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রকৃত সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কেবল এমন ব্যবস্থাই হবে রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন বিপ্লবী শ্রেণীর যথাযথ অবস্থানের, জনগণের সত্যিকার মত প্রকাশের, বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার এবং নয়া-গণতন্ত্রের মানসিকতার পক্ষে উপযুক্ত। এই ব্যবস্থাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ব্যবস্থা। শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারই সমস্ত বিপ্লবী জনগণের অভিমতকে পূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পারে এবং বিপ্লবের শত্রুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে সংগ্রাম করতে পারে। মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া অধিকারে নয়'—এই মনোভাব সরকারের মধ্যে ও সৈন্যবাহিনীতে থাকতেই হবে ; খাঁটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না এবং সরকারের শাসনপ্রণালী ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না।

রাষ্ট্রব্যবস্থা হল সকল বিপ্লবী শ্রেণীগুলির মিলিত একনায়কত্ব এবং সরকারের শাসনপ্রণালী হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এই হল নয়া-গণতন্ত্রের রাজনীতি, নয়া-গণতন্ত্রের প্রজাতন্ত্র, জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের প্রজাতন্ত্র, তিনটি মহান কর্মনীতিসহ নয়া তিন গণ-নীতির প্রজাতন্ত্র, নামে ও কাজে সত্যিকার চীনা প্রজাতন্ত্র। বর্তমানে আমাদের দেশ কেবলমাত্র নামেই চীনা প্রচাতন্ত্র, কাজে নয়; নামের সংগে সঙ্গতি রেখে বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করাই আমাদের বর্তমান কাজের লক্ষ্য।

এই হচ্ছে সেই আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সম্পর্ক, যা এক বিপ্লবী চীনে—জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীনে—প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্র গঠনের কাজের এই হল একমাত্র নির্ভুল দিক্‌নির্দেশ।

৬। নয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি

যদি এমন একটা প্রজাতন্ত্র চীনদেশে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাকে নয়া-গণতান্ত্রিক হতেই হবে।

এই প্রজাতন্ত্রে বড় বড় ব্যাঙ্ক, বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের মালিকানাধীনে থাকবে।

> 'মালিকানা চীনদেশীয়ই হোক অথবা বিদেশীয়ই হোক—যে প্রতিষ্ঠানগুলি একচেটিয়া চরিত্রের অথবা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার পক্ষে অত্যন্ত বড়—যেমন ব্যাঙ্ক, রেলপথ, বিমানপথের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ—সেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও শাসিত হবে, যাতে ব্যক্তিগত পুঁজি জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য না করতে পারে; এই হচ্ছে পুঁজি নিয়ন্ত্রণের মৌলিক নীতি।

এটাও হল কুওমিনতাঙের সংগে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার যুগে কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত ইস্তাহার থেকে উধৃত মহান বিবৃতি। এটাই হল নয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনের নির্ভুল কর্মনীতি। সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত নয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন হবে। এবং এটাই হবে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পরিচালিকাশক্তি। কিন্তু এই প্রজাতন্ত্র অন্যান্য ধরনের পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে না, এবং যে পুঁজিবাদী উৎপাদন 'জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য' করতে পারে না—তার বিকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করবে না, কারণ চীনের অর্থনীতি এখনো অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ স্তরে রয়েছে।

জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে তা ভূমিহীন কৃষক ও অল্প জমির মালিক কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেবার, ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শ্লোগান 'কৃষকের হাতে জমি দাও'—কার্যকরী করার, গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বিলুপ্ত করার এবং জমিকে কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য এই প্রজাতন্ত্র

কতকগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যেমন আছে তেমনই চলতে দেওয়া হবে এটাই হল 'ভূমিস্বত্ব সমীকরণের' নীতি। এই নীতির সঠিক শ্লোগান হচ্ছে 'কৃষকের হাতে জমি দাও।' এই পর্যায়ে সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা স্থাপন করা হবে না, কিন্তু 'কৃষকের হাতে জমি দাও'—এই নীতির ভিত্তিতে বিকশিত নানাধরনের সমবায়-অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উপদানও থাকবে।

'পুঁজি নিয়ন্ত্রণ' এবং 'ভূমিস্বত্ব সমীকরণের' পথ ধরে চীনের অর্থনীতিকে চলতে হবে এবং কোনমতেই তাকে 'মুষ্টিমেয় লোকেরা একচেটিয়া অধিকারে' থাকতে দেওয়া হবে না ; আমরা কিছুতেই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও জমিদারদের 'জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য করতে' দিতে পারি না ; আমরা কোনমতেই ইউরোপ-আমেরিকার পদ্ধতিতে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে দেব না, কিংবা উল্টোদিকে পুরাতন আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজকেও টিকে থাকতে দেব না। এই ধারার বিরুদ্ধে কাজ করার সাহস যদি কারও থাকে, তবে সে কখনো কৃতকার্য হতে পারবে না, এবং নিজেই সে দেওয়ালে মাথা ঠুকে বসবে।

বিপ্লবী চীনে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীনে, এই আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত এবং নিশ্চিতরূপেই তা গড়ে তোলা হবে।

এটাই হল নয়া-গণতন্ত্রের অর্থনীতি।

আর নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি হচ্ছে এই নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থনীতিরই কেন্দ্রীভূত অভিব্যক্তি।

৭। বুর্জোয়া একনায়কত্বের তত্ত্ব খণ্ডন

নয়া-গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতি সমন্বিত এই ধরনের প্রজাতন্ত্র চীনের জনগণের শতকরা নব্বই জনের বেশি ব্যক্তির সমর্থনলাভ করবে। এর বিকল্প কোন পথ নেই।

আমরা কি বুর্জোয়া-একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ গঠনের পথে যেতে পারি ? এ পথ যে ইউরোপ ও আমেরিকার বুর্জোয়াদের পুরানো পথ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অথবা আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কোনটাই চীনকে এ পথ অবলম্বন করতে দিচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যায়, এ পথ কানাগলির পথ। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল কথা এই যে, এখন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম চলছে, পুঁজিবাদ পতনের দিকে চলছে আর সমাজতন্ত্র উন্নতিসাধন ও বিকাশলাভ করছে। চীনেদেশে বুর্জোয়া নায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠাকে প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ সহ্য করবে না। চীনের ওপর সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ এবং চীনের স্বাধীনতা ও চীনের পুঁজিবাদী বিকাশের প্রতি তার বিরোধিতার ইতিহাসই হল চীনের আধুনিক ইতিহাস। চীনে একের পর

এক বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে, কারণ সাম্রাজ্যবাদ তাদের টুঁটি টিপে মেরেছে। সেইজন্য অসংখ্য বিপ্লবী শহীদ তাঁদের উদ্দেশ্য অপূর্ণ রয়ে গেল এই আক্ষেপ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এমন শক্তিশালী জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ চালিয়ে চীনের ভেতরের ঢুকেছে, সে চীনকে তার উপনিবেশে পরিণত করতে চায় ; জাপানীরা আজ চীনে তাদের নিজস্ব পুঁজিবাদকে বিকশিত করে তুলেছে, কিন্তু চীনের নিজের পুঁজিবাদ বিকাশলাভ করছে না ; চীনে এখন জাপানী বুর্জোয়াশ্রেণী তার একনায়কত্ব চালু করছে, চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব নয়। এ কথা খুবই সত্য যে, বর্তমান যুগ সাম্রাজ্যবাদের মরণপণ সংগ্রামের যুগ এবং সাম্রাজ্যবাদ শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। 'সাম্রাজ্যবাদ হল মুমূর্ষ পুঁজিবাদ'।[৭] কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ মরণোন্মুখ বলেই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সে উপনিবেশগুলির ওপর আরও বেশি করে নির্ভরশীল হচ্ছে, এবং নিশ্চয়ই সে কোন উপনিবেশ অথবা আধা-উপনিবেশকেই তাদের নিজেদের বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না। যেহেতু জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এক গুরুতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে, যেহেতু সে মুমূর্ষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, সেইহেতু সে নিশ্চয়ই চীনকে আক্রমণ করার এবং এই দেশকে তাঁর উপনিবেশে পরিণত করার অপচেষ্টা করবে ; আর এইভাবে সে চীনের বুর্জোয়া-একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ও চীনের নিজস্ব জাতীয় পুঁজিবাদ বিকাশের পথ বন্ধ করে দেবে।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রও চীনকে ঐ পথে যেতে দেবে না। পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই আমাদের শত্রু। চীন যদি স্বাধীনতালাভ করতে চায়, তবে সে কোনমতেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণীর সাহায্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য থেকে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারি না ; জাপান এবং ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালীর সর্বহারাশ্রেণী তাদের নিজ নিজ দেশে পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করে তার মাধ্যমে আমাদেরকে যে সাহায্য করে থাকে, তা থেকে আমরা আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। যদিও এ কথা আমরা বলতে পারি না যে, জাপান এবং ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালী— এইসব দেশে অথবা এগুলির দু-একটিতে বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পরেই কেবল চীনে বিপ্লব জয়যুক্ত হবে, তবু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আমরা ঐ সমস্ত দেশের সর্বহারাশ্রেণীর অতিরিক্ত সহযোগিতা ছাড়া জয়লাভ করতে পারব না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। চীনের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পক্ষে এই সাহায্য এক অপরিহার্য বিষয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলে বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। ১৯২৭ সালের পরবর্তীকালের সোভিয়েত-বিরোধী আন্দোলনের[৮] শিক্ষা থেকে এ কথা কি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি ? বর্তমান দুনিয়া অগ্রসর হচ্ছে

বিপ্লব ও যুদ্ধের এক নবযুগের মধ্য দিয়ে, অগ্রসর হচ্ছে পুঁজিবাদের নিশ্চিত মৃত্যু ও সমাজতন্ত্রের নিশ্চিত সমৃদ্ধিলাভের যুগের মধ্য দিয়ে। এমতাবস্থায় চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিজয়ের পর বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারা যাবে, এমন আশা করা কি একেবারে স্বপ্ন দেখার সামিল নয়?

যদিও বিশেষ অবস্থায় (যে অবস্থা ছিল তুরস্কের, যেখানে বুর্জোয়াশ্রেণী গ্রীক আক্রমণ প্রতিহত করে দিয়েছিল, অথচ যেখানে সর্বহারাশ্রেণীর শক্তি ছিল খুব দুর্বল) একটা পেটি-কামালবাদী বুর্জোয়া-একনায়কত্বাধীন তুরস্কের[৯] জন্ম হয়েছিল প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ও অক্টোবর বিপ্লবের পর, তাহলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক গঠন সম্পন্ন হওয়ার পরে দ্বিতীয় আর এক তুরস্কের জন্ম অসম্ভব, ৪৫ কোটি লোকসংখ্যা বিশিষ্ট 'তুরস্ক' সৃষ্টি করা তো আরও অসম্ভব। চীনের বিশেষ অবস্থার জন্য (অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর ঢিলেঢালাভাব, আপোষপ্রবণতা এবং সর্বহারাশ্রেণীর শক্তি ও তার বৈপ্লবিক সম্পূর্ণাঙ্গতা), তুরস্কের সেই সহজ সফলতার মতো ব্যাপার এদেশে কখনো ঘটেনি। ১৯২৭ সালে চীনের প্রথম মহাবিপ্লব ব্যর্থ হবার পর চীনের বুর্জোয়ারা কি তারস্বরে কামালবাদের গান গায়নি ? কিন্তু কোথায় চীনের কামাল? এবং চীনের বুর্জোয়া-একনায়কত্ব ও পুঁজিবাদী সমাজই-বা কোথায় ? এই প্রসঙ্গে এটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কামালের তুরস্ককেও শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল, আর এইভাবে তুরস্ক ক্রমান্বয়ে একটি আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল দুনিয়ার অংশে পরিণত হয়েছে। আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের যে-কোন 'বীর যোদ্ধাকে' হয় সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টে দাঁড়িয়ে নিজেকে বিশ্ব-প্রতিবিপ্লবী শক্তির অংশে পরিণত করতে হবে, না হয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রণ্টে দাঁড়িয়ে নিজেকে বিশ্ববিপ্লবী শক্তির অংশে পরিণত করতে হবে। এ দুয়ের একটিকে বেছে নিতেই হবে। তৃতীয় কোন পথ নেই।

আভ্যন্তরীণ পরিবেশ থেকে চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর এতদিনে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল। সর্বহারাশ্রেণী এবং কৃষক ও অন্যান্য পেটি বুর্জোয়ার মিলিত শক্তির বলে ১৯২৭ সালের বিপ্লব জয়যুক্ত হবার মুহূর্তেই বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী এইসব জনসাধারণকে পদাঘাতে সরিয়ে দিয়ে বিপ্লবের ফল নিজে আত্মসাৎ করেছে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সংগে প্রতিবিপ্লবী জোটে মিলিত হয়েছে, এবং দশ বছর ধরে সর্বশক্তি দিয়ে চালিয়েছে 'কমিউনিস্ট-বিরোধী' দমন অভিযান কিন্তু তার ফল কি হয়েছে ? আজ যখন এক প্রবল শত্রু আমাদের দেশের গভীরে প্রবেশ করেছে, আর দু'বছর ধরে আমরা জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে আসছি, তখন কি তোমরা

ইউরোপ ও আমেরিকার বুর্জোয়াদের সেই পুরানো অচল কর্মসূচী নকল করতে ইচ্ছুক ? অতীতের 'দশ বছরের কমিউনিস্ট-বিরোধী দমন অভিযানের' ফলে কোন বুর্জোয়া-একনায়কত্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ জন্মলাভ করেনি, এ ব্যাপারে তোমরা কি আর একবার চেষ্টা করে দেখতে চাও ? এ কথা ঠিক যে 'দশ বছরের কমিউনিস্ট-বিরোধী দমন অভিযানের ফলে জন্ম নিয়েছে একটি 'একদলীয় একনায়কত্ব', কিন্তু এটা হল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক একনায়কত্ব 'কমিউনিস্ট-বিরোধী দমন অভিযানের' প্রথম চার বছরের (১৯২৭ থেকে ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) পরেই 'গায়ের জোরে জন্ম' নিয়েছে একটি 'মাঞ্চুকুও' ; আরও ছয় বছর এরকম 'দমন অভিযানের' ফলে ১৯৩৭ সালে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের বিরাট প্রাচীরের দক্ষিণ অংশে ঢুকে পড়ে। আজ যদি কেউ আরও দশ বছর ধরে এই ধরনের 'দমন অভিযান' চালাতে চায়, তবে এই 'কমিউনিস্ট-বিরোধী দমন অভিযান' হবে পুরানো অভিযান থেকে আলাদা এক নতুন ধরনের অভিযান। কিন্তু এই নতুন ধরনের 'কমিউনিস্ট-বিরোধী দমন অভিযানের' কার্যভার সাহসভরে গ্রহণ করেছে এমন দ্রুতগামী ব্যক্তি কি ইতিমধ্যেই দেখা দেয়নি? হ্যাঁ, দিয়েছে। এই ব্যক্তি হল ওয়াং চিং-ওয়েই ; সে ইতিমধ্যেই একজন খ্যাতনামা নতুন ধরনের কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। কেউ যদি ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের উপদলে যোগ দিতে চায়, তবে সে তা করতে পারে ; কিন্তু এর পরেও যদি সে বুর্জোয়া-একনায়কত্ব, পুঁজিবাদী সমাজ, কামালবাদ, আধুনিক রাষ্ট্র, একদলীয় একনায়কত্ব, 'একটি মতবাদ' ইত্যাদি সম্পর্কে কপট বুলি আওড়ায়, তবে সেটা কি আগের চেয়েও বেশি লজ্জাজনক হবে না ? কেউ যদি ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের উপদলে যোগ না দিয়ে 'জাপ-বিরোধী' শিবিরে যোগ দিতে চায়, কিন্তু অন্যদিকে সে যদি আবার জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিজয়ের পর জাপ-বিরোধী জনগণকে এক পদাঘাতে সরিয়ে দিয়ে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের বিজয়লব্ধ ফলটি আত্মসাৎ করতে এবং 'চিরস্থায়ী একদলীয় একনায়কত্ব' কায়েম করতে চায়, তবে সেটা কি নিতান্তই দিবাস্বপ্ন হবে না ? 'জাপানকে প্রতিরোধ কর !' 'জাপানকে প্রতিরোধ কর !' কিন্তু আসলে প্রতিরোধ করছে কে ? শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়াদের ছাড়া তোমরা এক পাও এগোতে পারবে না। স্পর্ধাভরে যারা এঁদের পদাঘাত করবে, তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা কি একটা সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার নয় ? বুর্জোয়াশ্রেণী গোঁড়া ব্যক্তিরা (আমি গোঁড়া ব্যক্তিদের কথাই কেবল বলছি) মনে হয় এই কুড়ি বছরে কিছুই শিক্ষালাভ করেনি। শুনতে পাচ্ছেন না, তারা এখনো চেঁচিয়ে মরছে, 'কমিউনিজমকে গণ্ডিবদ্ধ কর', 'কমিউনিজমকে ক্ষয় কর', 'কমিউনিজমের বিরোধিতা কর' ? দেখতে পাচ্ছেন না, তাদের 'অন্যান্য দলের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করণের বিধিব্যবস্থা, ঘোষণার পর আবার এসেছে "অন্যান্য দলের সমস্যার

মোকাবিলার বিধিব্যবস্থা', এবং তারও পরে এসেছে 'অন্যান্য দলের সমস্যার মোকাবিলা করার নির্দেশাবলী'? হায় রে! যদি এই 'সীমাবদ্ধকরণ' ও 'মোকাবিলা' না থেমে চলতেই থাকে, তবে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎকে তারা কোথায় নিয়ে যাবে? নিজেদের ভবিষ্যৎ তারা কিভাবে প্রস্তুত করতে যাচ্ছে? এইসব ভদ্র মহোদয়গণের কাছে আমাদের একান্ত আন্তরিক উপদেশ—তোমরা চোখ খোল, চীনের দিকে ও দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখ দেশে-বিদেশে এখন আসল পরিস্থিতিটা কী; দোহাই তোমাদের, বারবার একই ভুল কর না। যদি এই ভুল চলতেই থাকে তবে জাতির ভবিষ্যৎ তো বিপদগ্রস্ত হবেই, তাছাড়া আমি মনে করি, তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎও ভাল হবে না। এ কথা সুনিশ্চিত, সন্দেহাতীত ও সত্য। চীনের বুর্জোয়াশ্রেণীর গোঁড়া ব্যক্তিরা যদি এখনো সচেতন না হয়, তবে তাদের ভবিষ্যৎ মোটেই শুভ হবে না, তারা নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনবে। এই জন্যই আমাদের আশা, চীনের জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট অটলভাবে বেঁচে থাকবে, এবং কোন একটি চক্রের একচেটিয়া কারবারের মধ্য দিয়ে নয়, বরং সকলের সহযোগিতার মধ্য দিয়েই জাপ-বিরোধী সংগ্রামকে বিজয় পর্যন্ত চালিয়ে নেওয়া যাবে। এটাই শুধু এটাই হচ্ছে হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি; আর বাকি সবই খারাপ নীতি। এই হল তোমাদের প্রতি আমাদের—কমিউনিস্টদের—আন্তরিক হিতোপদেশ। আগে থেকে সতর্ক করে দিইনি বলে আমাদের যেন দোষ দিও না।

'যদি খাদ্য থাকে তবে সবাই মিলে তা ভাগ করে নিক'—এটা হল চীন দেশের একটি পুরানো কথা। এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। যেহেতু আমরা সবাই আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নিচ্ছি, সেইজন্য আমাদের খাদ্য, আমাদের কাজ বা আমাদের বই পুস্তক আমরা সবাই ভাগ করে নেব; এটাই ন্যায়সঙ্গত হবে। 'আমি এবং কেবলমাত্র আমিই সবকিছু হস্তগত করব' আর 'কেউই আমার অনিষ্ট করতে পারবে না',—এইসব মনোভাব সামন্তপ্রভুদের পুরানো চাল মাত্র, বিংশ শতাব্দীর ৪০-এর দশকে এইসব একেবারেই অচল।

যারা বিপ্লবী তাদের কাউকেই আমরা কমিউনিস্টরা কখনোই দূরে সরিয়ে দিই না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক এমন সমস্ত শ্রেণী, স্তর, রাজনৈতিক পার্টি, রাজনৈতিক সংগঠন ও ব্যক্তির সংগে আমরা যুক্তফ্রণ্টে লেগে থাকব, দীর্ঘ সময়ের জন্য তাদের সংগে সহযোগিতা করে চলব। কিন্তু আমরা কাউকেই কমিউনিস্ট পার্টিকে দূরে সরিয়ে দিতে দেব না এবং যুক্তফ্রণ্টে ফাটল ধরাতে দেব না। চীনকে অবশ্যই জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতেই হবে এবং অবশ্যই ঐক্য ও প্রগতির পথে এগিয়ে চলতেই হবে। যারা আত্মসমর্পণ করতে চাইছে, যারা ভাঙন ধরাতে বা পিছু হটতে চাইছে, তাদের আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

৮। 'বামপন্থী' বুলি-কপচানির খণ্ডন

বুর্জোয়া-একনায়কত্বের পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সর্বহারা-একনায়কত্বের সমাজতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করা কি সম্ভব?

না, তাও অসম্ভব।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, বর্তমান বিপ্লব হল প্রথম ধাপ মাত্র, ভবিষ্যতে তা দ্বিতীয় ধাপে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের ধাপে বিকশিত হবে। চীন সমাজতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করলেই শুধু প্রকৃত সুখ লাভ করবে। কিন্তু এখনো সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের সময় আসেনি। চীনে বিপ্লবের বর্তমান কর্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা করা। এ কর্তব্য সম্পন্ন হবার আগে সমাজতন্ত্রের কথা বলা বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু নয়। চীনের বিপ্লবকে দুই ধাপে ভাগ করতেই হবে, প্রথম ধাপ নয়া-গণতন্ত্রের, দ্বিতীয় ধাপ সমাজতন্ত্রের। তাছাড়া প্রথম ধাপ সম্পূর্ণ হতে বেশ দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে, এটা কোনমতেই রাতারাতি ঘটে যাবার ব্যাপার নয়। আমরা কল্পনাবিলাসী নই, এবং আমাদের যে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা আমরা এড়াতে পারি না।

কোন কোন কুচক্রী প্রচারক ইচ্ছাকৃতভাবেই এই দুই ভিন্ন ধরনের বিপ্লবী পর্যায়কে একসাথে গুলিয়ে ফেলে তথাকথিত 'একটিমাত্র বিপ্লবের তত্ত্বের' পক্ষে ওকালতি করে। এভাবে এরা এটা প্রমাণ করতে চায় যে, তিন-গণনীতি সমস্ত বিপ্লবের পক্ষেই প্রযোজ্য, কাজেই কমিউনিজমের অস্তিত্বের কোন যৌক্তিকতা নেই। এই 'তত্ত্বের' সাহায্যে এরা প্রাণপণে কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করে, এবং অষ্টম রুট বাহিনী, নতুন চতুর্থ বাহিনী ও শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের বিরোধিতা করে। এদের উদ্দেশ্য সমস্ত বিপ্লবকে সমূলে খতম করা, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার বিরোধিতা করা। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার বিরোধিতা করা এবং জাপানী আক্রমণকারীদের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য জনমত প্রস্তুত করা। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা সুপরিকল্পিতভাবেই এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কারণ উহান শহর দখলের পরে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছে যে, শুধুমাত্র সামরিক শক্তির দ্বারা চীনকে পদানত করতে তারা সমর্থ হবে না; তাই তারা রাজনৈতিক আক্রমণ ও অর্থনৈতিক প্রলোভনের কৌশল অবলম্বন করেছে। তাদের এই রাজনৈতিক আক্রমণের উদ্দেশ্য হল জাপ-বিরোধী শিবিরের ভেতরকার দোদুল্যমান ব্যক্তিদের প্রলুব্ধ করা, যুক্তফ্রণ্টে ভাঙন ধরানো এবং কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতাকে বানচাল করার চেষ্টা করা। তাদের অর্থনৈতিক প্রলোভন হল তথাকথিত যৌথ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। মধ্য ও দক্ষিণ চীনে জাপানী আক্রমণকারীরা ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চীনা পুঁজিপতিদেরকে পুঁজির শতকরা ৫১ ভাগ বিনিয়োগ করতে দেয়, বাকি ৪৯ ভাগ জাপানীরা বিনিয়োগ করে; উত্তর চীনে জাপানী

আক্রমণকারীরা চীনা পুঁজিপতিদেরকে পুঁজির শতকরা ৪৯ ভাগ বিনিয়োগ করতে দেয়, বাকি ৫১ ভাগ জাপানীরা বিনিয়োগ করে। তাছাড়া জাপানী আক্রমণকারীরা চীনা পুঁজিপতিদেরকে তাদের পূর্ব-বিনিয়োজিত পুঁজি ফিরিয়ে দেবার এবং ঐগুলোকে পুঁজির শেয়ার হিসেবে গণ্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। কাজেই, কোন কোন বিবেকহীন পুঁজিপতি মুনাফার লোভে নৈতিক নিয়মবিধি ভুলে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য উসখুস করছে। ওয়াং চিং-ওয়েই পুঁজিপতিদের যে অংশটির প্রতিনিধিত্ব করে, তারা ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছে। পুঁজিপতিদের আর এক অংশ এখন জাপ-বিরোধী শিবিরে লুকিয়ে আছে, তারাও ঐ দিকে পা বাড়াতে ইচ্ছুক। কিন্তু চোরের মতো তারা ভয়ে ভয়ে ভাবছে যে, কমিউনিস্টরা তাদের পথরোধ করে দাঁড়াবেন ; তাদের কাছে এর চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার এই যে, জনসাধারণ তাদেরকে চীনা দেশদ্রোহী বলে অভিহিত করবেন। তাই তারা একত্রিত হয়ে সলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিক মহলগুলোতে আগে থাকতেই তারা কিছু প্রস্তুতির কাজ করে রাখবে। এই কর্মনীতি স্থির করার পর সংগে সংগেই সময় নষ্ট না করে তারা কাজে লেগে গেছে ঃ কিছু 'অধিবিদ্যাবাগীশ শয়তানকে'[১০] ভাড়া করা হয়েছে ; তাছাড়া কিছু ট্রটস্কিপন্থীকেও কাজে লাগানো হয়েছে। এইসব লোক তাদের কলমকে বল্লমের মতো ঘোরায়, সেটাকে তারা সকল দিকে চালিত করে এবং পাগলা-গারদের হট্টগোল সৃষ্টি করে। এমনি করে তারা অনেক কুযুক্তি উপস্থাপিত করেছে ; যেমন 'একটিমাত্র বিপ্লবের তত্ত্ব' যেমন, চীনদেশের পরিস্থিতিতে কমিউনিজম খাপ খায় না ; যেমন, চীনে কমিউনিস্ট পার্টি থাকার কোন দরকার নেই ; যেমন, অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের ক্ষতি করেছে এবং যুদ্ধ না করে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে ; যেমন, শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকার হল সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাবাদী ; যেমন, কমিউনিস্ট পার্টি অবাধ্য, বিভেদসৃষ্টিকারী, ষড়যন্ত্রকারী এবং গণ্ডগোল সৃষ্টিকারী। এই সবকিছুর উদ্দেশ্য হল যারা চারিদিকে কী হচ্ছে তা বোঝে না তাদের চোখে ধুলো দেওয়া, যাতে সুযোগ উপস্থিত হলেই পুঁজিপতিরা শতকরা ৪৯ অথবা ৫১ ভাগ শেয়ার ভোগ করার এবং শত্রুর কাছে সমগ্র জাতির স্বার্থ বিকিয়ে দেবার উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারে। এর অর্থ হল 'কড়িকাঠ ও থাম চুরি করে তার জায়গায় পচা কাঠ বসানো'— অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করার আগে মতাদর্শগত প্রস্তুতি ও জনমতের প্রস্তুতি। এইসব ভদ্রমহোদয়গণ আপাতঃদৃষ্ট ঐকান্তিকতার সহিত 'একটিমাত্র বিপ্লবের তত্ত্বের' ওকালতি করছে এবং কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করছে, কিন্তু আসলে তাদের মতলব ঐ শতকরা ৪৯ ভাগ অথবা ৫১ ভাগ শেয়ারের সুযোগ লাভ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আহা! তারা কতোই না মাথা খাটিয়েছে ! 'একটিমাত্র

বিপ্লবের তত্ত্ব' হল সোজাসুজি আদৌ কোন বিপ্লব না করার তত্ত্ব। এটাই হল বিষয়টির মর্মকথা।

কিন্তু এমন কিছু লোকও আছে, যাদের আপাতঃদৃষ্টিতে কোন খারাপ উদ্দেশ্য না থাকলেও তারা 'একটিমাত্র বিপ্লবের তত্ত্বে' মুগ্ধ হয়ে রয়েছে এবং তথাকথিত 'একটিমাত্র আঘাতেই রাজনৈতিক বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব উভয়কেই সমাপ্ত করার' নিছক আত্মগত ধ্যানধারণায় বিভোর হয়ে রয়েছে ; তারা বোঝে না যে, বিপ্লব বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত এবং আমাদের পক্ষে শুধু এক বিপ্লব থেকে আর এক বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়াই সম্ভব, 'একটিমাত্র আঘাতেই উভয়কেই সমাপ্ত করা' অসম্ভব। তাদের ঐ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিপ্লবের বিভিন্ন ধাপগুলো গুলিয়ে ফেলে এবং বর্তমান কর্তব্য সাধনের কর্মপ্রচেষ্টাকে দুর্বল করে ; তাই এটাও অত্যন্ত ক্ষতিকর। দুটি বৈপ্লবিক পর্যায়ের মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির জন্য পূর্বশর্ত প্রস্তুত করে, একটি পর্যায়ের ঠিক পেছনেই দ্বিতীয় পর্যায়টি আসবে এবং দুয়ের মধ্যে কোন বুর্জোয়া-একনায়কত্বের পর্যায় থাকতে পারে না—এই বক্তব্যই সঠিক ; এটা হল বিপ্লবের বিকাশ সম্বন্ধে মার্কসবাদী তত্ত্বসম্মত। অন্যদিকে যদি বলা হয় ঃ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নিজস্ব কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য নেই এবং নিজের কোন নির্দিষ্ট যুগ নেই, আর যে কর্তব্য শুধু অন্য যুগে সমাপ্ত হতে পারে—যেমন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য—সেই রকম কর্তব্যকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যেরই অন্তর্ভূক্ত করে সমাপ্ত করা যায়—তবে এটা হল তাদের 'একটিমাত্র আঘাতেই উভয়কেই সমাপ্ত করার তত্ত্ব ; এটা কল্পনাবিলাস মাত্র। প্রকৃতি বিপ্লবীরা এই মতবাদ বর্জন করেছে।'

৯। গোঁড়া ব্যক্তিদের যুক্তি খণ্ডন

বুর্জোয়া গোঁড়া ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে বলে ঃ 'বেশ, তোমরা কমিউনিস্টরা যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পরবর্তী পর্যায়ের জন্য স্থগিত রেখেছে এবং ঘোষণা করেছে "চীনের বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তিন-গণনীতি, আর আমাদের পার্টি তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত"[১১] কাজেই তোমরা তোমাদের কমিউনিজম আপাততঃ শিকেয় তুলে রাখ। 'এক মতবাদ' তত্ত্বের রূপে এই যুক্তির অবতারণা করে সম্প্রতি তারা পাগলের মতো চিৎকার শুরু করেছে। এই চিৎকার হল প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্রের প্রতি গোঁড়া ব্যক্তিদের সমর্থন। আমরা অবশ্য ভদ্রতার খাতিরে এটাকে কাণ্ডজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব বলে অভিহিত করতে পারি।

কমিউনিজম হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর মতাদর্শের একটা পূর্ণাংগ ব্যবস্থা এবং একই সময়ে তা একটা নতুন সমাজব্যবস্থাও বটে। অন্য যে-কোন মতাদর্শগত ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা থেকে এটা ভিন্ন ; মানব ইতিহাসে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সম্পূর্ণাংগ,

প্রগতিশীল, বিপ্লবী ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা। সামন্ততন্ত্রের মতাদর্শগত ব্যবস্থা এ সমাজব্যবস্থা ইতিহাসের যাদুঘরের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদের মতাদর্শগত ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাও পৃথিবীর এক অংশে (সোভিয়েত ইউনিয়নে) যাদুঘরে স্থান নিয়েছে; অন্যান্য দেশেও এর অবস্থা হয়ে উঠেছে 'পশ্চিম পাহাড়ের ওপারে অস্তগামী সূর্যের মতো, দ্রুত নিমজ্জমান মুমূর্ষু ব্যক্তির মতো', এবং শীঘ্রই যাদুঘরে এর স্থান হবে। কেবলমাত্র কমিউনিস্ট মতাদর্শের ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাই যৌবন ও প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ; তা হিমানী-সম্প্রপাতের মতো প্রচণ্ডবেগে ও প্রচণ্ড বজ্রের শক্তিতে সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলছে। চীনদেশে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম প্রবর্তন করার ফলে জনগণের জন্য নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে এবং চীন বিপ্লবের রূপও বদলে গেছে। কমিউনিজমের পথনির্দেশ ছাড়া চীনা গণতান্ত্রিক বিপ্লব নিশ্চয়ই সফল হতে পারে না, বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায় তো আরও দূরের কথা। এইজন্যই চীনের বুর্জোয়া গোঁড়া ব্যক্তিরা এত হৈ-চৈ করে কমিউনিজমকে 'শিকেয় তুলে রাখার' দাবী জানাচ্ছে। আসলে, কমিউনিজমকে 'শিকেয় তুলে রাখা' চলবে না, কারণ একবার যদি তা শিকেয় ওঠে, তবে চীন ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াবে। সারা পৃথিবী আজ তার মুক্তির জন্য কমিউনিজমের ওপর নির্ভর করছে; চীনে তার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না।

প্রত্যেকেই জানে, সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির একটি বর্তমানের ও একটি ভবিষ্যতের কর্মসূচী ও বা একটি ন্যূনতম কর্মসুচী ও একটি ব্যাপকতম কর্মসূচী আছে। বর্তমানে নয়া গণতন্ত্র, ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র—এই দুটি এক সমগ্র অবয়বের অঙ্গ; সমগ্রভাবে কমিউনিস্ট মতাদর্শগত ব্যবস্থার দ্বারা এরা পরিচালিত। কমিউনিস্ট পার্টির ন্যূনতম কর্মসূচীর সাথে তিন-গণনীতির রাজনৈতিক নীতি যখন মূলতঃ মিলে যাচ্ছে, তখন কমিউনিজমকে 'শিকেয় তুলে রাখার' জন্য চিৎকার করাটা কি চরম উদ্ভট ব্যাপার নয়? কমিউনিস্টদের দিক থেকে, যেহেতু তিন-গণনীতির রাজনৈতিক নীতির সংগে কমিউনিস্ট পার্টির ন্যূনতম কর্মসূচীর মূলতঃ মিল আছে, সেইহেতুই 'তিন-গণনীতি হল জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ভিত্তি'—এ কথা স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব, এবং এও আমাদের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব যে, 'চীনের বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তিন-গণনীতি, আর আমাদের পার্টি তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত'; তা না হলে ঐ ধরনের সম্ভাবনার কথা উঠত না। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে এই হচ্ছে কমিউনিজম ও তিনগণনীতির মধ্যেকার যুক্তফ্রন্ট। এই ধরনের যুক্তফ্রন্টের কথা বলতে গিয়েই ডঃ সান ইয়াৎ-সেন বলেছিলেন, 'কমিউনিজম তিন-গণনীতির ভাল বন্ধু'।[১২] কমিউনিজমকে অস্বীকার করার অর্থ কার্যতঃ যুক্তফ্রন্টকেই অস্বীকার করা। গোঁড়া ব্যক্তিরা তাদের একদলের মতবাদ কার্যে পরিণত করতে এবং যুক্তফ্রন্টকে অস্বীকার করতে চায়

বলেই তারা কমিউনিজমকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে ওই উদ্ভট যুক্তিগুলো আবিষ্কার করেছে।

'এক মতবাদের' তত্ত্বও ধোপে টেকে না। যতদিন বিভিন্ন শ্রেণী থাকবে, ততদিন যতগুলো শ্রেণী ততগুলো মতবাদও থাকবে ; এমনকি একই শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন উপদলেরও নিজ নিজ মতবাদ থাকতে পারে। বর্তমানে সামন্তশ্রেণীর সামন্তবাদ, বুর্জোয়াশ্রেণীর পুঁজিবাদ, বৌদ্ধদের বৌদ্ধমতবাদ, খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টীয় মতবাদ, কৃষকদের বহু-দেবতাবাদ আছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিছু কিছু লোক কামালবাদ, ফ্যাসীবাদ, প্রাণবাদ[১৩], 'শ্রম অনুযায়ী বণ্টনের মতবাদ[১৪] প্রভৃতি প্রচার করছে। সর্বহারাশ্রেণীর কেন তবে কমিউনিজম-এর মতবাদ থাকতে পারবে না? আর যখন অসংখ্য মতবাদের অস্তিত্ব আছে, তখন শুধু কমিউনিজমকে দেখেই হৈ-চৈ করে তাকে 'শিকেয় তুলে রাখার' দাবি তোলা কেন ? সোজা কথা, কমিউনিজমকে 'শিকেয় তুলে রাখা' চলবে না ; বরং আসুন আমরা এক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই এই প্রতিযোগিতায় যদি কমিউনিজম পরাজিত হয়, তাহলে সেই পরাজয়কে আমরা কমিউনিস্টরা ভদ্রলোকের মতো স্বীকার করে নেব। তা যদি না, হয়, তাহলে বরং তোমরাই তোমাদের গণতন্ত্রবিরোধী 'এক মতবাদের' তত্ত্বটিকে যথাসম্ভব চটপট 'শিকেয় তুলে রাখ'।

যাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে এবং যাতে গোঁড়া ব্যক্তিদের চোখ খুলতে পারে, তাই তিন-গণনীতির সংগে কমিউনিজমের সাদৃস্য এবং বৈসাদৃস্য পরিস্কারভাবে দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

তিন-গণনীতির সঙ্গে কমিউনিজমের তুলনা করলে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি দেখা যায়।

প্রথমতঃ, সাদৃশ্যের কথাই ধরা যাক। চীনদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে উভয় মতবাদের মূল রাজনৈতিক কর্মসূচীতে মিল আছে। ১৯২০ সালে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক নতুন করে ব্যাখ্যা করা তিন-গণনীতির অন্তর্ভুক্ত বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্রের নীতি এবং গণকল্যাণের নীতি—এই তিনটি রাজনৈতিক নীতি চীনদেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে কমিউনিস্টদের গৃহীত রাজনৈতিক কর্মসূচীর সংগে মূলতঃ অভিন্ন। এই সাদৃশ্যের ফলে এবং তিন-গণনীতিকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলেই দুটি মতবাদের এবং দুটি পার্টির যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। এই দিকটি উপেক্ষা করা ভুল।

দ্বিতীয়তঃ, বৈসাদৃশ্যের কথা আলোচনা করা যাক। (১) গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে দুটি কর্মসূচীর মধ্যে আংশিক পার্থক্য বিদ্যমান। কমিউনিস্টদের পূর্ণাংগ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জনগণের অধিকারের সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন, দৈনিক ৮ ঘণ্টা কার্যকাল এবং পূর্ণাংগ কৃষি-বিপ্লব ; অথচ ঐগুলি তিন-

গণনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি ঐগুলিকে তিন-গণনীতির অন্তর্ভুক্ত করা না হয় এবং কার্যে পরিণত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা না হয়, তাহলে বলতে হবে, এই দুটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচী মূলতঃ এক হলেও সম্পূর্ণ এক নয়। (২) আর একটি পার্থক্য হচ্ছে এই যে, একটার ভেতরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায় আছে, অপরটার মধ্যে তা নেই। কমিউনিজমে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায় ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা পর্যায় রয়েছে ; অতএব ন্যূনতম কর্মসূচী ছাড়াও তার একটা ব্যাপকতম কর্মসূচী— সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কর্মসূচী রয়েছে। তিন-গণনীতির মধ্যে কেবল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ের কথাই আছে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ের কথা নেই : তাই এর ভেতর ন্যুনতম কর্মসূচীই কেবল আছে, ব্যাপকতম কর্মসূচী নেই, অর্থাৎ এর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কর্মসূচী নেই। (৩) বিশ্বদৃষ্টি সর্ম্পকে পার্থক্য। কমিউনিস্ট বিশ্বদৃষ্টি হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ; তিন-গণনীতির বিশ্বদৃষ্টি হচ্ছে গণকল্যাণের মাপকাঠিতে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা; আসলে এটা হচ্ছে দ্বৈতবাদ ও ভাববাদ। দুটি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর-বিরোধী। (৪) বিপ্লবী সম্পূর্ণাঙ্গতা সম্পর্কে পার্থক্য। কমিউনিস্টদের তত্ত্ব ও অনুশীলন অভিন্ন অর্থাৎ তাদের বিপ্লবী সম্পূর্ণাঙ্গ-তা আছে। অপরপক্ষে তিন-গণনীতির অনুসারীদের মধ্যে যারা বিপ্লব এবং সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত তারা ছাড়া অন্যদের তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে সঙ্গতি নেই, তাদের কথা এবং কাজ পরস্পর-বিরোধী, অর্থাৎ তাদের বিপ্লবী সম্পূর্ণাঙ্গতার অভাব আছে। উপরোল্লিখিত সবগুলি হচ্ছে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য। এ পাথর্ক্যগুলিই তিন-গণনীতির অনুসারীদের থেকে কমিউনিস্টদেরকে আলাদা করেছে। এ পার্থক্যগুলো উপেক্ষা করে শুধু তাদের ঐক্যটুকুই দেখা এবং বিরোধটুকু না দেখা নিঃসন্দেহে নিতান্তই ভুল।

এটুকু বুঝলে আমরা বুঝতে পারি, বুর্জোয়া গোঁড়া ব্যক্তিরা কেন কমিউনিজমকে 'শিকেয় তুলে রাখার' দাবি জানাচ্ছে। এ দাবির অর্থ কী ? এর অর্থ যদি বুর্জোয়াদের স্বৈরতন্ত্র না হয়, তবে বুঝতে হবে এর আদৌ কোন অর্থ নেই।

১০। পুরানো ও নতুন তিন-গণনীতি

ঐতিহাসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বুর্জোয়া গোঁড়া ব্যক্তিদের কোন ধারণাই নেই। এ ব্যাপারে তাদের জ্ঞান প্রায় শূন্যের কোঠায়। তারা না জানে তিন-গণনীতি এবং কমিউনিজমের মধ্যেকার পার্থক্য, না জানে পুরানো ও নতুন তিন-গণনীতির মধ্যেকার পার্থক্য।

আমরা কমিউনিস্টরা স্বীকার করি যে, 'তিন-গণনীতি হল জাপ-বিরোধী জাতীয়

যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ভিত্তি' ;আমরা স্বীকার করি যে, 'চীনের বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তিন-গণনীতি, আর আমাদের পার্টি তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত' ;আমরা স্বীকার করি যে, কমিউনিজমের ন্যূনতম কর্মসূচী ও তিন-গণনীতির রাজনৈতিক নীতি মূলতঃ এক। কিন্তু আমরা কমিউনিস্টরা যাকে স্বীকার করি সে কোন্ তিন গণনীতি ? সেটা অন্য ধরনের কোন তিন-গণনীতি নয়, বরং তা হল সেই তিন-গণনীতি, যাকে 'কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে' ডঃ সান ইয়াৎ-সেন পুনরায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমি আশা করি যে গোঁড়া ভদ্রলোকরা তাঁদের 'কমিউনিজমকে গণ্ডিবদ্ধ করা', 'কমিউনিজমকে ক্ষয় করা' ও 'কমিউনিজমের বিরোধিতা করার' যে কাজে আনন্দের সংগে ডুবে আছেন, তার মধ্য থেকে কিছুটা সময় ব্যয় করে এই ইস্তাহারটি একবার পড়ে দেখবেন। ইস্তাহারে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন বলেছেন, 'এই হচ্ছে কুওমিনতাঙের তিন-গণনীতির আসল ব্যাখ্যা'। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, শুধু এটাই হচ্ছে আসল তিন-গণনীতি, অন্যসব তিন-গণনীতি ভুয়া। আর 'কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে' তিন-গণনীতির ঐ ব্যাখ্যাই হচ্ছে একমাত্র 'আসল ব্যাখ্যা', অন্য সব ব্যাখ্যাই হচ্ছে ভুয়া। বোধহয় এটা কমিউনিস্টদের রটানো একটা গুজব নয়, কারণ কুওমিনতাঙের বহু সভ্য ও আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেই এই ঘোষণা গৃহীত হতে দেখেছিলাম।

ওই ইস্তাহার তিন-গণনীতির ইতিহাসকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। এর আগে তিন-গণনীতি ছিল পুরানো ধরনের অন্তর্গত তিন-গণনীতি, আধা-ঔপনিবেশিক দেশের পুরাতন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তিন-গণনীতি, পুরানো গণতন্ত্রের তিন-গণনীতি, পুরানো তিন-গণনীতি।

তারপর তিন-গণনীতি হল নতুন ধরনের অন্তর্গত তিন-গণনীতি, আধা ঔপনিবেশিক দেশের নয়া বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তিন-গণনীতি, নয়া গণতন্ত্রের তিন-গণনীতি, নতুন তিন-গণনীতি। শুধু এই ধরনের তিন-গণনীতিই হচ্ছে নতুন যুগের বিপ্লবী তিন-গণনীতি।

নতুন যুগের এই বিপ্লবী তিন-গণনীতি, এই নতুন তিন গণনীতি বা প্রকৃত তিন-গণনীতি হচ্ছে সেই তিন-গণনীতি, যার মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্য করার তিনটি মহান কর্মনীতি। এই তিনটি মহান কর্মনীতি না থাকলে, অথবা এর কোন একটি না থাকলে, এই নতুন যুগে সেই তিন-গণনীতি হবে ভুয়া অথবা অসম্পূর্ণ।

প্রথমতঃ, বিপ্লবী তিন-গণনীতি, নতুন তিন-গণনীতি, বা প্রকৃত তিন-গণনীতির মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর নীতি। কারণ বর্তমান অবস্থায় এটা সুস্পষ্ট যে, রাশিয়ার সঙ্গে অথবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীর নীতি বাদ দিলে তার অর্থ

হবে অপরিহার্যরূপেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মৈত্রীর নীতি গ্রহণ করা, অপরিহার্যরূপেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। ১৯২৭ সালের পরে ঠিক এই অবস্থাটাই কি আপনারা দেখেননি ? সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সংগ্রাম যখনই তীব্রতর হয়ে উঠবে, তখনই চীনকে তাদের যে কোন এক পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে। ঘটনাবলীর মোড় অনিবার্যভাবে সেই দিকেই নিয়েছে। কোন এক পক্ষের সমর্থনে চলে যাওয়াটা পরিহার করা কি সম্ভব? না—সম্ভব নয় ; সেটা একটা মরীচিকা। গোটা পৃথিবীর প্রতিটি দেশকেই এই দুই ফ্রন্টের একটি না একটির অন্তর্ভূক্ত হতেই হবে, এবং 'নিরপেক্ষতা' শুধু একটা ভাঁওতাবাজী শব্দে পর্যবসিত হবে। বিশেষ করে, চীন আজ এমন এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগে সংগ্রামে লিপ্ত, যা চীনদেশের গভীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ছাড়া চীনের চুড়ান্ত জয়লাভ কল্পনাও করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদের সংগে মৈত্রীর খাতিরে, যদি রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীকে বিসর্জন দেওয়া হয়, তাহলে তিন-গণনীতি থেকে 'বিপ্লবী' কথাটিকে বাদ দিতে হবে, তখন তা হয়ে পড়বে প্রতিক্রিয়াশীল। চুড়ান্ত বিশ্লেষণে 'নিরপেক্ষ' তিন-গণনীতি বলে কিছু নেই, আছে কেবল বিপ্লবী তিন-গণনীতি অথবা প্রতিবিপ্লবী তিন-গণনীতি। এয়াং চিং-ওয়েই একসময় বলেছিল 'উভয় দিক থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর'[১৫], তেমনটা করা এবং এই সংগ্রামের উপযোগী এক তিন-গণনীতি গ্রহণ করা কি খুব সাহসের কাজ হয় না ? কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বয়ং আবিষ্কারক ওয়াং চিং-ওয়েইও ইতিমধ্যেই ঐ তিন-গণনীতি পরিত্যাগ করে (অথবা 'শিকেয় তুলে রেখে') সাম্রাজ্যবাদের সংগে মৈত্রীর তিন-গণনীতি গ্রহণ করেছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, তাহলে যে, ওয়াং চিং-ওয়েই নিজে প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদের সংগে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তার বিপরীতে গিয়ে আমরা যখন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের একটি গ্রুপের সংগে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পূর্বদিকে অভিযান আর আক্রমণ চালিয়ে যাব, তখন সেটা কি একটা অভিনব খাঁটি বৈপ্লবিক কাজ হবে না? কিন্তু তোমরা চাও বা না চাও, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিজমের বিরোধিতা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; যদি তোমরা তাদের সংগে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হও, তাহলে তারা তোমাদেরকে উত্তরদিকে অভিযান ও আক্রমণ চালাতে বলবে, এবং এইভাবে তোমাদের বিপ্লব শেষ পর্যন্ত বিফল হবে। এইসব থেকে এটাই বেরিয়ে আসছে যে, বিপ্লবী, নতুন বা প্রকৃত তিন-গণনীতির মধ্যে রাশিয়ার সাথে মৈত্রীর নীতি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে ; তার মধ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সংগে মৈত্রীর নীতি কোনমতেই থাকতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবী, নতুন বা প্রকৃত তিন-গণনীতির মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতার নীতিকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যদি তুমি কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সহযোগিতা না কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি তার বিরোধিতা করবে। কমিউনিজম-বিরোধিতাই হল জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের নীতি ; তুমি যদি কমিউনিজমের বিরোধিতা করতে চাও, 'ঠিক আছে, তাহলে তারা তোমাকে আমন্ত্রণ জানাবে তাদের কমিউনিস্ট বিরোধী জোটে যোগদান করতে। কিন্তু তা কি দেশদ্রোহিতার সন্দেহ সৃষ্টি করবে না? তুমি হয়ত বলবে, 'আমি তো জাপানকে অনুসরণ করছি না, করছি অন্য কোন দেশকে'। এটাও একটা হাস্যকর কথা। তুমি যাকেই অনুসরণ কর না কেন, যতক্ষণ তুমি কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী, ততক্ষণ তুমি দেশদ্রোহী, কারণ তখন তুমি আর জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে পার না। তুমি হয়ত বলবে, 'আমি স্বাধীনভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করছি।' এ হল স্বপ্ন দেখা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর নির্ভর না করে এত বড় প্রতিবিপ্লবী কাজ করা উপনিবেশের বা আধা-উপনিবেশের 'বীরদের' পক্ষে কি করে সম্ভব ? দুনিয়ার প্রায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমাবেশ করে দশটি বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হয়েছিল ; ফল হয়েছে ব্যর্থতা। আজ তুমি হঠাৎ কেমন করে 'স্বাধীনভাবে' তার বিরুদ্ধে লড়তে সমর্থ হবে ? শোনা যায় সীমান্ত এলাকার বাইরে কেউ কেউ এমন কথা বলে বেড়ায় ঃ 'কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করা ভাল কাজ, কিন্তু তোমরা কখনই তাতে সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।' এই কথা যদি কেবলমাত্র জনশ্রুতি না হয়, তাহলে তার অর্ধেক অংশই শুধু ভুল। কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতার মধ্যে 'ভাল' কি থাকতে পারে ? কিন্তু কথাটার অপর অর্ধেকটা ঠিক, কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে 'কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করে' 'তোমরা কখনই সাফল্য অর্জন করতে পারবে না'। তার মূল কারণ কমিউনিস্টদের মধ্যে নিহিত নেই, আছে জনসাধারণের মধ্যে, যে জনাসাধারণ কমিউনিস্ট পার্টিকে পছন্দ করে, তার 'বিরোধিতা' করাটা তারা পছন্দ করে না। এক জাতীয় শত্রু যখন দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে তখন যদি তুমি কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই কর, তাহলে জনগণ তোমার চামড়া খুলে নেবে ; তোমাকে তারা দয়া দেখাবে না। এটা নিশ্চিত। যে-ই কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করতে উদ্‌গ্রীব, তাকে অবশ্যই ধুলিসাৎ হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তুমি যদি নিজেকে ধুলোয় পরিণত করার জন্য উন্মত্ত না হও, তাহলে এই বিরোধিতা তোমার পক্ষে বন্ধ করাই ভাল, সকল কমিউনিস্ট-বিরোধী 'বীরদের' প্রতি এই হচ্ছে আমাদের আন্তরিক উপদেশ। এ থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আজকের তিনগণনীতিকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করতেই হবে, অন্যথায় তিনগণনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এটা হল তিন-গণনীতির জীবনমরণের

সমস্যা। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করলে তা বাঁচবে, বিরোধিতা করলে তা ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে। কে এ কথাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারে?

তৃতীয়তঃ, বিপ্লবী নতুন বা প্রকৃত তিন-গণনীতিতে কৃষক এবং শ্রমিকদের সাহায্য করার নীতি অবশ্যই থাকতে হবে। এই নীতি ত্যাগ করা, অকপটভাবে এবং সর্বান্তঃকরণে কৃষক ও শ্রমিককে সাহায্য করার নীতি বর্জন করা অথবা ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রের অন্তর্ভুক্ত 'জনসাধারণকে জাগাবার' নির্দেশটি পালন না করার অর্থই হল বিপ্লবের পরাজয়ের এবং নিজেরও পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করা। স্তালিন বলেছেন যে, 'জাতীয় সমস্যা আসলে হল কৃষক সমস্যা।'[১৬] অর্থাৎ চীনের বিপ্লব আসলে একটি কৃষক-বিপ্লব, আর বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ আসলে কৃষকদেরই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ। নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি আসলে হচ্ছে কৃষককে ক্ষমতাদান করা। নতুন এবং প্রকৃত তিন গণনীতি আসলে কৃষকের বিপ্লবী নীতি। গণ-সংস্কৃতির অর্থ আসলে কৃষকদের সংস্কৃতির স্তর উন্নত করা। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ আসলে কৃষকদেরই যুদ্ধ। এখন 'পাহাড়ে যাওয়ার নীতি'[১৭] অনুসরণ করার সময়, পাহাড়ের ওপরে আমরা সভা করি, কাজ করি, ক্লাশে যোগদান করি, সংবাদপত্র প্রকাশ করি, বই লিখি, নাট্যানুষ্ঠান করি—সমস্তই করি আসলে কৃষকের জন্যই। আর অবশেষে যা দিয়ে আমরা জাপানকে রুখি, যা দিয়ে আমরা প্রাণধারণ করি—সবই আসলে কৃষকদের দেওয়া। আমরা এখানে 'আসলে' বলতে 'মূলতঃ', বোঝাচ্ছি, এতে জনসাধারণের অন্যান্য অংশকে উপেক্ষা করা হচ্ছে না। স্তালিন নিজে এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রও এ কথা জানে যে, চীনের লোকসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগই কৃষক। সুতরাং কৃষক সমস্যাই চীন বিপ্লবের মূলগত সমস্যা এবং কৃষকদের শক্তিই চীন বিপ্লবের প্রধান শক্তি। চীনের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে কৃষকদের পরেই দ্বিতীয় স্থান শ্রমিকদের। চীনে আছে কয়েক নিযুত শিল্প-শ্রমিক, আর আছে কয়েক কোটি হস্তশিল্প-শ্রমিক ও কৃষিশ্রমিক। বিভিন্ন ধরনের শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ছাড়া চীন বাঁচতে পারে না, কারণ অর্থনীতির শিল্প বিভাগে এরাই উৎপাদনকারী। আধুনিক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না, কারণ এরাই হচ্ছে চীন বিপ্লবের নেতা এবং সবচেয়ে বিপ্লবী। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী, নতুন বা প্রকৃত তিন-গণনীতিতে অবশ্যই কৃষক এবং শ্রমিকদের সাহায্য করার নীতি থাকতে হবে। যদি এমন কোন তিন-গণনীতি থাকে যার মধ্যে এই নীতি নেই, যা অকপটভাবে ও সর্বান্তঃকরণে কৃষক এবং শ্রমিকদের সাহায্য করতে চায় না এবং জনসাধারণকে জাগাবার' কাজ করতে চায় না,—তবে সেই তিন-গণনীতির ধ্বংস অনিবার্য।

কাজেই এটা স্পষ্ট যে, যে তিন-গণনীতি-তে রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্য করা—এই তিনটি মহান কর্মনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন, তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। তিন-গণনীতির সকল বিবেকসম্পন্ন অনুগামীকে এ কথা গভীরভাবে ভেবে দেখতেই হবে।

তিনটি মহান কর্মনীতি সমন্বিত এই তিন-গণনীতি, অন্য কথায়, বিপ্লবী, নতুন এবং প্রকৃত তিন-গণনীতি হল নয়া গণতন্ত্রের তিন-গণনীতি, এটা পুরানো তিন-গণনীতির বিকাশের ফল; ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের এ এক মহান অবদান, এবং চীন বিপ্লব যে যুগে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্লবের অংশ বলে গণ্য হয়েছে সেই যুগই একে জন্ম দিয়েছে। একমাত্র এই ধরনের তিন-গণনীতিকেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টি 'আজকের চীনের প্রয়োজন' বলে স্বীকার করে, এবং 'তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত' এই কথা ঘোষণা করেছে। শুধু এই ধরনের তিন-গণনীতিই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ের জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচীর সংগে, অর্থাৎ তার ন্যূনতম কর্মসূচীর সংগে, মূলগতভাবে খাপ খায়।

পুরানো তিন-গণনীতি ছিল চীন বিপ্লবের পুরানো যুগের সৃষ্টি। তখন রাশিয়া ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়ার সাথে মৈত্রীর নীতি গ্রহণ করার কথা উঠত না। চীনে তখনো কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না এবং স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করার কথাও উঠত না। তাছাড়া শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব তখনো সম্পূর্ণভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি, তাই লোকেরা ঐ আন্দোলনকে বিবেচনার বিষয় বলেই মনে করত না; এবং স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিক ও কৃষকদের সাথে মৈত্রীর নীতি গ্রহণের কথা উঠত না। অতএব, ১৯২৪ সালে কুওমিনতাঙের পুর্নগঠনের আগে যে তিন-গণনীতি, তা ছিল পুরানো ধরনের তিন-গণনীতি; তা আজ অচল হয়ে গেছে। যদি তাকে নতুন তিন-গণনীতিতে বিকশিত করা না যায়, তবে কুওমিনতাঙ আর অগ্রসর হতে পারবে না। বিচক্ষণ ডঃ সান ইয়াৎ-সেন তা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যলাভ করেছিলেন এবং তিন-গণনীতির এমনভাবে পুর্নব্যাখ্যা করেছিলেন, যাতে করে তার নতুন আরোপিত বৈশিষ্ট্য সময়ের সংগে খাপ খায়। এর ফলে তিন-গণনীতি এবং কমিউনিজমের মধ্যে যুক্তফ্রণ্ট স্থাপিত হয়েছিল, এই প্রথম কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছিল সমগ্র দেশের জনগণের সহানভূতি অর্জিত হয়েছিল এবং ১৯২৪-১৯২৭ সালের বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল।

পুরানো তিন-গণনীতি পুরানো যুগে বিপ্লবী ছিল এবং ঐ যুগের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলো তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু নতুন যুগে যখন নতুন তিন-

গণনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন যদি আবার সেই পুরানো মতবাদ, পেশ করা হয়, অথবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরও যদি রাশিয়ার সাথে মৈত্রীর বিরোধিতা করা হয়, অথবা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার পরও যদি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতার বিরোধিতা করা হয়, অথবা শ্রমিক-কৃষকদের জাগরণ এবং তাদের রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শিত হওয়ার পরও যদি কৃষক-শ্রমিকদের সাহায্য করার নীতির বিরোধিতা করা হয়, তা হল প্রতিক্রিয়াশীল এবং তাতে যুগ সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। ১৯২৭ সালের পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়ার যুগটা ছিল এই ধরনের অজ্ঞতারই পরিণতি। প্রবাদ আছে—'যারা যুগের লক্ষণ অনুধাবন করতে পারে তাঁরাই মহান ব্যক্তি।' আশা করি তিন-গণনীতির অনুগামীরা আজ এ কথাটি স্মরণে রাখবেন।

তিন-গণনীতি যদি পুরানো ধরনের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে কমিউনিস্টদের ন্যূনতম কর্মসূচীর সংগে মৌলিক বিষয়ে তার কোন মিল থাকত না, কারণ তখন সেগুলি অতীতের অন্তর্ভুক্ত হতো এবং অচল হয়ে পড়ত। এমন যদি কোন তিন-গণনীতি থাকে, যা রাশিয়ার বিরোধী, কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী, কৃষক-শ্রমিকের বিরোধী, তবে তা প্রতিক্রিয়াশীল ; কমিউনিস্টদের ন্যূনতম কর্মসূচীর সংগে তার মিল তো নেই-ই, উপরন্তু তা হল কমিউনিজমের শত্রু ;তাই সে-সম্পর্কে বলার কিছুই নেই। এ কথাটাও তিন-গণনীতির অনুগামীদের গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত।

যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধিতার কাজ মূলগতভাবে সম্পন্ন হওয়ার আগে যাদের বিবেক আছে তারা কেউই নতুন তিন-গণনীতিকে পরিত্যাগ করবে না। কেবল ওয়াং চিং-ওয়েইয়ের মতো লোকগুলোই তা পরিত্যাগ করে। রাশিয়া-বিরোধী, কমিউনিস্ট পার্টি-বিরোধী, কৃষক-শ্রমিক-বিরোধী ভুয়া তিন-গণনীতিকে তারা যত উৎসাহ নিয়েই চালাতে থাকুক না কেন, যাদের বিবেক বা ন্যায়বুদ্ধি আছে তারাই ডঃ সান ইয়াৎ সেনের প্রকৃত তিন-গণনীতিকে সমর্থন করতে থাকবে। প্রকৃত তিন গণনীতির বহু অনুগামী ১৯২৭ সালের প্রতিক্রিয়ার পরও চীন বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। আজ যখন এক জাতীয় শত্রু দেশের অভ্যন্তরে গভীরভাবে ঢুকে পড়ছে, তখন এই সত্যিকার অনুগামীর সংখ্যা বেড়ে নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ হবে। তিন-গণনীতির অনুগামীদের সাথে আমরা কমিউনিস্টরা অবিচলিতভাবে দীর্ঘকাল ধরে সহযোগিতা করব। দেশদ্রোহী ও একেবারেই অনুশোচনাবিহীন গোঁড়া কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করব, কিন্তু কোন বন্ধুকেই আমরা কোনমতেই পরিত্যাগ করব না।

১১। নয়া গণতন্ত্রের সংস্কৃতি

ওপরে আমরা নতুন যুগে চীনা রাজনীতিকরা ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ও নয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রশ্ন ব্যাখ্যা করেছি। এখন আমরা সাংস্কৃতিক প্রশ্নে যেতে পারি।

একটা নির্দিষ্ট সংস্কৃতি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির মতাদর্শগত প্রতিফলন। চীনে যে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি রয়েছে, তা হচ্ছে চীনের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শাসন বা আংশিক শাসনের প্রতিফলন। সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে প্রত্যক্ষভাবে তাদের দ্বারা পরিচালিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মারফৎ এ ধরনের সংস্কৃতি প্রচার করে ; তা ছাড়া কিছু কিছু নির্লজ্জ চীনা লোকও এই সংস্কৃতি প্রচার করে। দাসসুলভ মতাদর্শসম্পন্ন সমস্ত সংস্কৃতিই এই শ্রেণীতে পড়ে। চীনে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিও আছে ; দেশের আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতি এই সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিফলিত। যারা কনফুসিয়াসের পুজো, শাস্ত্রচর্চা, পুরানো নীতিবিদ্যা ও পুরানো ভাবধারার সপক্ষে ওকালতি করে এবং নতুন সংস্কৃতি ও নতুন ভাবধারার বিরোধিতা করে—তারাই এই ধরনের সংস্কৃতির প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি আধা-সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি হল অন্তরঙ্গ দুই ভাই; চীনের নতুন সংস্কৃতির বিরোধিতা করার জন্য তারা একটি প্রতিক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক মৈত্রীজোট স্থাপন করেছে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত, সতুরাং তাকে উচ্ছেদ করতেই হবে। তার উচ্ছেদ করা না হলে কোন রকমের নয়া সংস্কৃতি গড়ে তোলা যাবে না। ধ্বংস ছাড়া গঠন হয় না, না আটকালে প্রবাহ হয় না, এবং স্থিতি ছাড়া গতির অস্তিত্ব নেই ; এ দুয়ের লড়াই জীবন-মরণের লড়াই।

নতুন সংস্কৃতি হচ্ছে নতুন রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতির ভাবাদর্শগত প্রতিফলন। নতুন রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতির সেবা করাই এর কাজ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, চীনে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভবের পর ক্রমে ক্রমে চীনা সমাজের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। তা আর সম্পূর্ণরূপে সমান্ততান্ত্রিক সমাজ নয় ; তা পরিণত হয়েছে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, যদিও সে সমাজে এখনো সমান্ততান্ত্রিক অর্থনীতিরই প্রাধান্য। সমান্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সংগে তুলনা করলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এক নতুন অর্থনীতি। এই পুঁজিবাদী নতুন অর্থনীতির সংগে আবির্ভূত হয়েছে ও বেড়ে উঠেছে নতুন রাজনৈতিক শক্তি—বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া ও সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তি। নতুন সংস্কৃতি এই নতুন অর্থনৈতিক ও নতুন রাজনৈতিক শক্তিরই মতাদর্শগত প্রতিফলন ; এদের সেবা করাই নতুন সংস্কৃতির কাজ। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ছাড়া, বুর্জোয়াশ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর অস্তিত্ব ছাড়া, এই শ্রেণীগুলোর রাজনৈতিক

শক্তি ছাড়া, তথাকথিত নতুন মতাদর্শ বা নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারত না।

এই সমস্ত নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তিই চীনের বিপ্লবী শক্তি, এগুলি পুরানো রাজনীতি, পুরানো অর্থনীতি ও পুরানো সংস্কৃতির বিরোধী। ঐসব পুরানো জিনিসের দুটি অংশ, একটি চীনের নিজস্ব আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি এবং অপরটি সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ; এই দুয়ের মৈত্রীজোটের মধ্যে শেষোক্তটিরই প্রাধান্য। এগুলো সবই খারাপ জিনিস। এদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে। চীনের সমাজে পুরানো ও নতুনের যে সংগ্রাম, তা হল জনসাধারণের (বিভিন্ন বিপ্লবী শ্রেণীর) নতুন শক্তি সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ত শ্রেণীগুলোর পুরানো শক্তির মধ্যেকার সংগ্রাম। এটা বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মধ্যেকার সংগ্রাম। আফিং যুদ্ধের সময় থেকে হিসেব করলে পুরোপুরি একশ বছর ধরে এ সংগ্রাম চলে আসছে ; আর ১৯১১ সালের বিপ্লবের সময় থেকে হিসেব করলেও প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এই সংগ্রাম চলছে।

তবে আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিপ্লবকেও নতুন ও পুরানো এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং এক ঐতিহাসিক যুগে যা নতুন অন্য আর এক যুগে তা পুরানো হয়ে পড়ে। চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একশ বছরকে দুটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে—প্রথম আশি বছর একটি পর্যায়, বাকি বিশ বছর দ্বিতীয় পর্যায়। প্রত্যেক পর্যায়েরই নিজস্ব মৌলিক ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য আছেঃ প্রথম আশি বছরের চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল পুরানো ধরনের অন্তর্ভুক্ত, এবং আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে শেষের বিশ বছরে ঐ বিপ্লব নতুন ধরনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। পুরানো গণতন্ত্র—প্রথম আশি বছরের বৈশিষ্ট্য। নয়া গণতন্ত্র—শেষের বিশ বছরের বৈশিষ্ট্য। রাজনীতির মতো সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য সত্য।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পার্থক্য কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে? এখন তা আমরা ব্যাখ্যা করব।

১২। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য

চীনের সাংস্কৃতিক বা মতাদর্শগত ফ্রন্টে ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পূর্ববর্তী কাল এবং তার পরবর্তী কাল হল দুটি পৃথক পৃথক ঐতিহাসিক যুগ।

৪ঠা মে'র আন্দোলনের আগে চীনের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সংগ্রাম ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর নতুন সংস্কৃতি ও সামন্তশ্রেণীর পুরানো সংস্কৃতির মধ্যেকার সংগ্রাম

আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী ও রাজকীয় পরীক্ষা-প্রণালীর মধ্যে[১৮], নতুন শিক্ষা ও পুরানো শিক্ষার মধ্যে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চীনা শিক্ষার মধ্যে যে সংগ্রাম—সেসব ওই একই প্রকৃতির। তখনকার দিনের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী বা নতুন শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষা মূলতঃ মনোনিবেশ করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিদের প্রয়োজন অনুসারে গঠিত প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও বুর্জোয়াশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানের প্রতি (এখানে আমরা 'মূলতঃ' বলছি, কারণ তখনো এসবের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণে চীনা সামন্তবাদের বিষ অবশিষ্ট ছিল)। সেই আমলে এই নতুন শিক্ষার ভাবধারা চীনা সামন্ত ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং পুরানো আমলের চীনা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থসাধন করেছিল। কিন্তু চীনা বুর্জোয়াদের দুর্বলতার দরুণ এবং বিশ্ব ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী যুগে পৌঁছে যাবার দরুণ কয়েক দফা সংগ্রামের পরেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দাসসুলভ মতাদর্শের সংগে চীনের সামন্তবাদের 'প্রাচীন যুগে ফিরে চল'—এই ভাবধারার প্রতিক্রিয়াশীল মৈত্রীজোট ঐ বুর্জোয়া মতাদর্শকে দ্রুত পরাভূত করে ফেলল, এই প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শগত জোটের সামান্য পাল্টা-আক্রমণের সামনেই এই তথাকথিত নতুন শিক্ষা পতাকা ও ঢাক গুটিয়ে রণে ভঙ্গ দিল এবং পশ্চাদপসরণ শুরু করল ; এতে করে তার মর্মবস্তু গেল উড়ে, শুধু পড়ে রইল তার কঙ্কাল। সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুরানো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি পচে গেছে ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এর পরাজয় অনিবার্য।

৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর অবস্থা অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। এই আন্দোলনের পরে চীনে সম্পূর্ণ এক নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির উদ্ভব হয়েছে। তা হল চীনা কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত কমিউনিজমের সাংস্কৃতিক ভাবধারা অর্থাৎ কমিউনিস্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক বিপ্লবের তত্ত্ব। ৪ঠা মে'র আন্দোলন ঘটে ১৯১৯ সালে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ও চীনের শ্রমিকআন্দোলনের সত্যিকার সূচনা হয় ১৯২১ সালে। এ সবগুলোই ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ এমন এক সময়ে যখন দুনিয়ায় জাতীয় সমস্যা ও ঔপনিবেশিক বিপ্লবী আন্দোলনসমূহের পুরানো রূপ বদলাতে শুরু করেছে। এতে চীন বিপ্লব ও বিশ্ববিপ্লবের মধ্যেকার যোগাযোগ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চীনের নতুন রাজনৈতিক শক্তি অর্থাৎ চীনা সর্বহারাশ্রেণী ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তখন চীনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে, এবং এর ফলে এই নতুন সাংস্কৃতিক শক্তি তার নতুন বেশে ও নতুন অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে, সম্ভাব্য সকল মিত্রের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং নিজের শক্তিকে বৃহদাকারে বিন্যস্ত করে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী সংস্কৃতির ওপর বীরোচিত আক্রমণ চালায়। সকল ক্ষেত্রে—দর্শনে, অর্থবিজ্ঞানে, রাষ্ট্র

বিজ্ঞানে, সামরিক বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, সাহিত্যে অথবা শিল্পে (নাটকে, সিনেমায়, সঙ্গীতে, ভাস্কর্যে অথবা চিত্রাঙ্কনে) অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্যশিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রেই এই নতুন শক্তি প্রভুত অগ্রগতি সাধন করেছে। এই বিশ বছরে এই নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির সঙ্গীন যতদূর গিয়েছে ততদূর পর্যন্ত কী ভাবধারা, কী রূপের ক্ষেত্রে (যেমন, লিখিত ভাষা ইত্যাদিতে) একটা বিরাট বিপ্লব ঘটে গেছে। তার শক্তি এত বিরাট, তার গতি এত প্রচণ্ড যে, যেখানেই সে যায় সেখানেই সে জয়যুক্ত হয়। একে কেন্দ্র করে যে সমাবেশ ঘটেছে তা এত ব্যাপক যে, চীনের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। লু স্যুন ছিলেন এই নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির মহত্তম ও নির্ভীকতম পতাকাবাহক। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি। তিনি শুধু একজন মহান সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি একজন মহান চিন্তাবিদ ও মহান বিপ্লবীও ছিলেন। লু স্যুন ছিলেন পাথরের মতো দৃঢ়, সকল রকমের মোসাহেবি ও আজ্ঞানুবর্তিতা থেকে মুক্ত। তাঁর এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের এক অমূল্য সম্পদ। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে, সমগ্র জাতির বিরাট সংখ্যাধিক্যের প্রতিনিধি হিসেবে লু স্যুন শত্রুর দুর্গ বিদীর্ণ করে তার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিলেন ; এতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে নির্ভুল, সবচেয়ে নির্ভীক, সবচেয়ে দৃঢ়, সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ, সবচেয়ে উৎসাহী জাতীয় বীর, আমাদের ইতিহাসে এমন বীরের কোন তুলনা নেই। লু স্যুনের পথ চীনা জাতির নতুন সংস্কৃতির পথ।

৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর চীনের নতুন সংস্কৃতি ছিল পুরানো গণতান্ত্রিক চরিত্রের সংস্কৃতি, তা ছিল বিশ্ববুর্জোয়াশ্রেণীর পুঁজিবাদী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অংশ। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর চীনের নতুন সংস্কৃতি নয়া-গণতান্ত্রিক চরিত্রের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে, এবং এই সংস্কৃতি এখন বিশ্বসর্বহারাশ্রেণীর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অংশ।

৪ঠা মে'র আন্দোলনের আগে চীনের নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিত বুর্জোয়াশ্রেণী ;তখনো বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করত। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর বুর্জোয়াশ্রেণীর সংস্কৃতি ও মতাদর্শ তার রাজনীতির চেয়েও বেশি পিছিয়ে পড়ল ;এই সংস্কৃতি ও মতাদর্শ কোনমতেই আর নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে না। এই সংস্কৃতি ও মতাদর্শ বড়জোর শুধু বিপ্লবী যুগে নির্দিষ্ট পরিমাণে মৈত্রীজোটের সভ্য হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এই জোটের নেতৃত্ব অবশ্যই থাকবে সর্বহারাশ্রেণীর সংস্কৃতি ও মতাদর্শের হাতে। এ সত্যকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী সংস্কৃতিই হল নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ;এই সংস্কৃতি আজ জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি পরিচালিত হতে পারে, একমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর সংস্কৃতি ও মতাদর্শ অর্থাৎ

কমিউনিজমের মতাদর্শের দ্বারা ; অন্য কোন শ্রেণীর সংস্কৃতি ও মতাদর্শের দ্বারা এই সংস্কৃতি পরিচালিত হতে পারে না। এক কথায়, নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হল সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদ-বিরোধী সংস্কৃতি।

১৩। চার যুগ

সাংস্কৃতিক বিপ্লব হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবেরই ভাবাদর্শগত প্রতিফলন, এবং তাদের সেবায় নিয়োজিত। চীনদেশে রাজনৈতিক বিপ্লবে যেমন যুক্তফ্রন্ট আছে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবেও তেমনি একটি যুক্তফ্রন্ট বিদ্যমান।

বিগত বিশ বছরের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যুক্তফ্রন্টের ইতিহাস ৪টি যুগে বিভক্ত। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত এই দুই বছর হল প্রথম যুগ ; ১৯১১ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত এই ছয় বছর হল দ্বিতীয় যুগ ; ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত এই দশ বছর হল তৃতীয় যুগ ; এবং ১৯৩৭ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এই তিন বছর হল চতুর্থ যুগ।

প্রথম যুগ ছিল ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র আন্দোলন থেকে ১৯২১ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। ৪ঠা মে'র আন্দোলন ছিল এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৪ঠা মে'র আন্দোলন ছিল যেমন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, তেমনি তা ছিল সামন্তবাদ-বিরোধী আন্দোলন। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের লক্ষণীয় ঐতিহাসিক তাৎপর্য হচ্ছে এইখানেই যে, তার এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল যা ১৯১১ সালের বিপ্লবের ছিল না, অর্থাৎ এ আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে এবং আপোষহীনভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্য থাকার কারণ এই যে, চীনের পুঁজিবাদী অর্থনীতি তখন তার বিকাশের পথে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং তখনকার চীনের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা নিজের চোখের সামনে দেখেছে রাশিয়া, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী—এই তিনটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশের ভাঙন, আর দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশ—ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শক্তিহ্রাস, রাশিয়ার সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং জার্মানি, হাঙ্গেরী ও ইতালী—এই তিনটি দেশের বুকে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের আলোড়ন। এই সমস্ত ঘটনা তাদের মনে চীনা জাতির মুক্তির নতুন আশা জাগিয়েছিল। ৪ঠা মে'র আন্দোলন ঘটেছিল সেই সময়ের বিশ্ববিপ্লবের আহ্বানে, রুশ বিপ্লবের আহ্বানে, লেনিনের আহ্বানে। ৪ঠা মে'র আন্দোলন ছিল সেদিনের সর্বহারাশ্রেণীর বিশ্ববিপ্লবের অংশ। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের সময়ে যদিও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না, তথাপি এমন বহু বুদ্ধিজীবী ছিলেন যাঁরা রুশ বিপ্লবকে

সমর্থন করেছিলেন এবং প্রাথমিক কমিউনিস্ট ভাবধারার সাথে পরিচিত ছিলেন। ৪ঠা মে'র আন্দোলন তার সূচনাতে ছিল কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী, বিপ্লবী পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী (এঁরা ছিলেন তৎকালীন আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী অংশ)—এই তিনটি অংশ যুক্তফ্রন্টের বিপ্লবী আন্দোলন। এর ত্রুটি ছিল এই যে, এটা কেবল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, শ্রমিক ও কৃষকরা এতে যোগ দেয়নি। কিন্তু যখনই এই আন্দোলন বিকশিত হয়ে ৩রা জুনের আন্দোলনের[১৯] পরিণত হল, তখন কেবল বুদ্ধিজীবীরা নয়, ব্যাপক সর্বহারাশ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণীও এতে যোগ দিল এবং এ আন্দোলন দেশব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত হল। ৪ঠা মে'র আন্দোলন যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালিয়ে ছিল, তা ছিল সামন্তবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপোষহীন আন্দোলন। চীনের ইতিহাসের শুরু থেকে এত মহান এবং সম্পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক বিপ্লব আর কখনো ঘটেনি। এই আন্দোলন সেই সময়ে 'পুরানো নীতিবোধের বিরোধিতা করে নতুন নীতিবোধকে এগিয়ে নাও !' এবং 'পুরানো সাহিত্যের বিরোধিতা করে নতুন এক সাহিত্যকে সামনে নিয়ে এস !'—সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই দুটি মহান পতাকা বহন করে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের মধ্যে তখনো এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়নি। এ আন্দোলন 'সাধারণ মানুষের জন্য সাহিত্য'—এই শ্লোগান তুলেছিল, কিন্তু 'সাধারণ মানুষ' বলতে তখন প্রকৃতপক্ষে শহুরে পেটিবুর্জোয়া ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদেরই বোঝাত, অর্থাৎ তা শহরবাসী বুদ্ধিজীবীদেরই বোঝাত। চিন্তাধারা ও কর্মীসৃষ্টির দিক দিয়ে ৪ঠা মে'র আন্দোলন ১৯২১ সালের চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করেছিল এবং ৩০শে মে'র আন্দোলন ও উত্তর অভিযানের পথও প্রশস্ত করেছিল। তৎকালীন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা ছিল ৪ঠা মে'র আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী অংশ, দ্বিতীয় যুগে তাদের অধিকাংশই শত্রুর সংগে আপোষ করেছিল এবং প্রতিক্রিয়ার পক্ষে চলে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, ৩০শে মে'র আন্দোলন এবং উত্তর অভিযান। এই যুগে ৪ঠা মে'র আন্দোলনকালের তিন শ্রেণীর যুক্তফ্রন্টকে অব্যাহত রাখা হয় এবং আরও বিকশিত করা হয়, কৃষকদেরকে এই ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় এই সমস্ত শ্রেণীর যুক্তফ্রন্ট, অর্থাৎ এই সর্বপ্রথম কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা স্থাপিত হয়। ডঃ সান ইয়াৎ-সেন মহৎ ছিলেন শুধু ১৯১১ সালের মহান বিপ্লবের (যদিও এটা ছিল পুরানো যুগের গণতান্ত্রিক বিপ্লব)

নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলেই নয়, উপরন্তু তিনি 'দুনিয়ার গতিধারার সাথে খাপ খাইয়ে এবং জনগণের দাবি মেনে নিয়ে' রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্য করা—এই তিনটি মহান বিপ্লবী কর্মনীতি উপস্থিত করেছিলেন, তিন-গণনীতি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং এইভাবে তিনটি মহান কর্মনীতি সমন্বিত নয়া তিন-গণনীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর আগে শিক্ষামহল, বিদগ্ধসমাজ ও যুবসমাজের সাথে তিনগণনীতির বিশেষ কোন সম্পর্কই ছিল না, কারণ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা অথবা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অথবা সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের বিরোধিতার শ্লোগান এতে তোলা হয়নি। এর আগে এটা ছিল পুরানো তিনগণনীতি, লোকে এটাকে মনে করত সরকারী ক্ষমতা দখল করতে অর্থাৎ সরকারী পদ লাভ করতে উদ্‌গ্রীব কতকগুলো লোকের সামরিক স্বার্থসিদ্ধির পতাকা মাত্র, নির্ভেজাল রাজনৈতিক কারসাজির পতাকা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পরে তিনটি মহান কর্মনীতি সমন্বিত নয়া তিনগণনীতির আবির্ভাব ঘটেছে। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সহযোগিতা ও দুই পার্টির বিপ্লবী সভ্যদের প্রচেষ্টার ফলে এই নয়া তিনগণনীতি সমগ্র চীনে, শিক্ষামহল ও বিদগ্ধসমাজের একাংশের মধ্যে এবং ব্যাপক যুব-ছাত্রদের মধ্যে বিস্তারলাভ করেছে। এটা ঘটেছে সম্পূর্ণ এই কারণেই যে, আগের তিনগণনীতি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সমান্তবাদ-বিরোধী তিনটি মহান কর্মনীতি সমন্বিত নয়া-গণতান্ত্রিক তিনগণনীতিতে বিকশিত হয়েছে; এই বিকাশ না ঘটলে তিনগণনীতির চিন্তাধারার প্রসারলাভ অসম্ভব হতো।

এই যুগে এই ধরনের বিপ্লবী তিনগণনীতি কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির এবং সকল বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়; যেহেতু 'কমিউনিজম তিনগণনীতির ভাল বন্ধু' সেজন্য দুটি মতবাদকে একটি যুক্তফ্রন্টে সংহত করা হল। শ্রেণীর বিচারে এ ছিল সর্বহারাশ্রেণী, কৃষকসমাজ, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর যুক্তফ্রন্ট। তখন কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'উইকলি গাইড' শাংহাই থেকে প্রকাশিত কুওমিনতাঙের দৈনিক পত্রিকা 'রিপাবলিকান ডেইলী নিউজ' এবং বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত অন্যান্য সংবাদপত্রগুলো মারফৎ দুটি পার্টি যুক্তভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার আদর্শ প্রচার করে, কনফুসিয়াসের পুজো ও শাস্ত্রচর্চা-ভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষায় বিরোধিতা করে, এবং সামন্ততান্ত্রিক সেকেলে কায়দায় সৃষ্ট পুরানো সাহিত্য ও সাধু ভাষার বিরোধিতা করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিষয় নিয়ে লিখিত নতুন সাহিত্য ও চলিত ভাষা চালু করার সপক্ষে প্রচার চালায়। কোয়াংতুং

যুদ্ধ ও উত্তর অভিযানের সময়ে চীনের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী মতাদর্শের প্রবর্তন হয় এবং এভাবে চীনা সৈন্যবাহিনীর রূপান্তর সাধন করা হয়। সেই সময় লক্ষ কোটি কৃষকসাধারণের মধ্যে 'দুনীর্তিপরায়ণ কর্মচারী নিপাত যাক' এবং 'স্থানীয় উৎপীড়ক ও বদ ভদ্রলোকরা নিপাত যাক'—এই শ্লোগান তোলা হয়েছিল এবং বিরাট বিপ্লবী কৃষক-সংগ্রাম গড়ে তোলা হয়েছিল। এইসব কারণে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় উত্তর অভিযান জয়যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু বৃহৎ বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে এই বিপ্লবের অবসান ঘটাল এবং এইভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হল।

তৃতীয় যুগ হল ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত এক নতুন বিপ্লবী যুগ। কারণ পূববর্তী যুগের শেষের দিকে বিপ্লবী শিবিরে একটা পরিবর্তন ঘটে। চীনের বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ ও সমান্তবাদী শক্তির প্রতিবিপ্লবী শিবিরে যোগ দেয়, আর জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর সংগে চলে যায়; আগে বিপ্লবী শিবিরে চারটি অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন রইল কেবল তিনটি—সর্বহারা শ্রেণী, কৃষকসমাজ ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া (বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা এর অন্তর্ভুক্ত), তাই চীনের বিপ্লবকে এক নতুন যুগে পা দিতে হল, এই বিপ্লবে এখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এককভাবে জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিল। এই যুগে একদিকে চলেছে প্রতিবিপ্লবী 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান এবং অন্যদিকে গভীরতা পেয়েছে বিপ্লব। এই যুগে প্রতিবিপ্লবী 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযান দুই ধরনের ছিল—সামরিক ও সাংস্কৃতিক। আর বিপ্লবের গভীরতাপ্রাপ্তিও ছিল দুই ধরনের— গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের গভীরতাপ্রাপ্তি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের গভীরতাপ্রাপ্তি। ঐ দুধরনের প্রতিবিপ্লবী 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় সমগ্র চীনের তথা সমগ্র দুনিয়ার প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহকে সমবেত করা হয়েছিল, পুরো দশটি বছর ধরে এই অভিযান চলেছিল এবং তুলনাবিহীন নির্মমতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। এতে কয়েক লক্ষ কমিউনিস্ট ও তরুণ ছাত্রকে হত্যা করা হয়, কয়েক নিযুত শ্রমিক ও কৃষকজনতার ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়। এই সবকিছুর জন্য যারা দায়ী তারা হয়ত মনে করেছিল যে, কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টিকে নিঃসন্দেহেই 'চিরকালের মতো পর্যুদস্ত ও নির্মূল করা' যাবে। কিন্তু ফল হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। দুটি 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। সামরিক অভিযানের ফল দাঁড়িয়েছিল জাপানীদের প্রতিরোধের জন্য লালফৌজের উত্তরাভিমুখী অভিযান; আর সাংস্কৃতিক

অভিযানের ফলে ঘটল ১৯৩৫ সালের বিপ্লবী যুবকদের ৯ই ডিসেম্বরে আন্দোলন। আর উভয় অভিযানের সাধারণ ফল দাঁড়িয়েছিল সমগ্র দেশব্যাপী জনগণের জাগরণ। এই তিনটিই হল ইতিবাচক ফললাভ। এসবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল এই যে, কুওমিনতাঙ-শাসিত এলাকাগুলিতে সমস্ত সাংস্কৃতিক সংস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা একেবারে অসহায় হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কুওমিনতাঙের সাংস্কৃতিক 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এমনটা ঘটল কেন ? এটা কি দীর্ঘ সময়ব্যাপী গভীর চিন্তার বিষয় নয় ? আর এই 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের মধ্যেই কমিউনিজমে বিশ্বাসী লু স্যুন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মহামানব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

প্রতিবিপ্লবী 'পরিবেষ্টন ও দমন' অভিযানের নেতিবাচক ফল হল এই যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এটিই হল প্রধান কারণ, যেজন্য এখনো পর্যন্ত সমগ্র দেশের জনগণ ঐ দশ বছরের কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকে তীব্রভাবে ঘৃণা করে।

এই যুগের সংগ্রামে বিপ্লবী শিবির দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছে জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী নয়া-গণতন্ত্র এবং নয়া তিনগণনীতিকে ; আর প্রতিবিপ্লবী শিবির অনুসরণ করেছে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা পরিচালিত জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর মিলিত স্বৈরতন্ত্রকে। এই স্বৈরতন্ত্র রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সান ইয়াৎ-সেনের তিনটি মহান কর্মনীতিকে কোতল করেছে, তাঁর নয়া তিন-গণনীতিকে কোতল করেছে এবং এভাবে চীনা জাতির জীবনে গুরুতর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

চতুর্থ যুগ হচ্ছে বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগ। আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে এই যুগ চীন বিপ্লবের সেই চারটি শ্রেণীর যুক্তফ্রন্ট আবার গঠিত হয়েছে, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের পরিধি এবার আরও প্রসারিত হয়েছে। কারণ এই যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ওপরের শ্রেণীর অনেক শাসক, মধ্যশ্রেণীর জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়া এবং নিম্নশ্রেণীর সমগ্র সর্বহারা। এইভাবে সমগ্র দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর এই মৈত্রীজোটের অর্ন্তভুক্ত হয়েছে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেছে। এ যুগের প্রথম পর্যায় ছিল উহান শহরের পতনের পূর্ব পর্যন্ত। এই পর্যায়ে সমগ্র দেশে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা স্ফূর্তি ও উদ্দীপনা ছিল, রাজনৈতিক দিক দিয়ে গণতন্ত্রীকরণের দিকে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও শক্তি সমাবেশ ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে। উহানের পতনের পর এল দ্বিতীয় পর্যায়। ঐ সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল ; বৃহৎ বুর্জোয়াদের একটা অংশ শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং অপর একটা অংশ প্রতিরোধ-যুদ্ধের আশু সমাপ্তি চাইল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই অবস্থা

প্রতিফলিত হল ইয়ে চিং[২০], চ্যাং চুন-মাই প্রমুখ লোকদের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মতৎপরতায় এবং বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের মধ্যে ।

এই সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে প্রতিরোধ, ঐক্য ও প্রগতির বিরোধী সমস্ত মতাদর্শের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালাতে হবে। এইসব প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শকে যদি ধ্বংস করা না হয়, তাহলে প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের জয়লাভের কোন আশা থাকবে না। এই সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কি ? সমগ্র দেশের জনগণের মনে এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায়, প্রতিরোধ-যুদ্ধের পথে যত বাধাই থাকুক না কেন, চীনের জনগণ জয়লাভ করবেই। চীনের ইতিহাসের সমগ্র গতিপথে, ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পরের বিশ বছরে যে প্রগতি সাধিত হয়েছে তা আগেকার আশি বছরের প্রগতিকেই যে শুধু ছাড়িয়ে গেছে তাই নয়, এমনকি তা অতীতের হাজার হাজার বছরের অগ্রগতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। আগামী বিশ বছরে চীনের আরও কতটা অগ্রগতি হবে, তা কি আমরা কল্পনা করতে পারি না ? দেশী, বিদেশী সমস্ত করাল শক্তির বল্গাহীন হিংস্রতা আমাদের জাতীয় জীবনে এনেছে বিপর্যয় ; কিন্তু এই হিংস্রতাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এইসব করাল শক্তির এখনো কিছু ক্ষমতা বর্তমান থাকলেও ইতিমধ্যেই তাদের মরণ-যন্ত্রণা শুরু হয়েছে এবং জনসাধারণ ক্রমান্বয়ে জয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এ কথা শুধু চীন সম্পর্কে নয়, সমগ্র প্রাচ্য সম্পর্কে এবং সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কেই সত্য।

১৪। সংস্কৃতির প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি ভুল ধারণা

কঠিন এবং তিক্ত সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য থেকেই নতুন সবকিছু বেরিয়ে আসে। এটা নয়া সংস্কৃতি সম্পর্কেও সত্য। এই নয়া সংস্কৃতি বিগত বিশ বছরে তিনবার বাঁক পরিবর্তন করে আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হয়েছে, এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভালমন্দ সমস্তরকমের বস্তুই পরীক্ষিত ও যাচাই হয়েছে।

বুর্জোয়া গোঁড়া ব্যক্তিরা যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে তেমনি সংস্কৃতির প্রশ্নেও সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। তারা চীনের নতুন যুগের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য জানে না, তারা মানে না জনসাধারণের নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে। তারা শুরু করে বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্রকে স্বীকার করে নিয়ে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই স্বৈরতন্ত্র পরিণত হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্রে। তথাকথিত ইউরোপীয়-মার্কিনপন্থী সাংস্কৃতিক পণ্ডিতদের[২১] একটা অংশ (আমি একটা অংশের কথাই বলছি) কার্যতঃ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কুওমিনতাঙ সরকারের 'কমিউনিস্ট দমন' অভিযানকে সমর্থন করেছিল এবং মনে হয় বর্তমানে তারা 'কমিউনিজমকে গণ্ডিবদ্ধ করা' ও কমিউনিজমকে ক্ষয় করার' কর্মনীতি সমর্থন করছে। তারা শ্রমিক ও কৃষককে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিতে চায় না। বুর্জোয়া গোঁড়া ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্রের

এই পথ কানাগলির পথ ; রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে যেমন সাংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্রের ক্ষেত্রেও তেমনি—এর সাফল্যের জন্য যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পূর্বশর্তের প্রয়োজন তা নেই। সুতরাং, এই সাংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্রকেও 'শিকেয় তুলে রাখাই' ভাল।

জাতীয় সংস্কৃতির কর্মপন্থা সম্পর্কে বলতে গেলে, কমিউনিস্ট মতাদর্শ পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করছে ; আর আমাদের উচিত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজবাদ ও কমিউনিজম প্রচার করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং কৃষক ও অন্যান্য জনসাধারণকে যথাযথভাবে ও ধাপে ধাপে সমাজবাদে শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি সামগ্রিকভাবে এখনো সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি নয়।

নয়া গণতন্ত্রের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সবই সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন বলে সেই সবকিছুর মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক উপাদান আছে ; এটা সাধারণ উপাদান নয়, বরং নির্ধারক উপাদান। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এখনো সমাজতান্ত্রিক নয়, বরং নয়া-গণতান্ত্রিক। কারণ বর্তমান পর্যায়ে বিপ্লবের মূল কর্তব্য প্রধানতঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ; এটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, এবং এখনো এটা পুঁজিবাদের উচ্ছেদকারী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গেলে, বর্তমানে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি সামগ্রিকভাবেই সমাজতান্ত্রিক অথবা তা-ই হওয়াই উচিত, এমন মনে করলে ভুল হবে। এ ধারণার অর্থ কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচারকে আশু কর্মসূচীর বাস্তব প্রয়োগ হিসাবে গ্রহণ করা। এর অর্থ সমস্যার অনুসন্ধান, গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ, কাজকর্ম পরিচালনা ও কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির প্রয়োগকে চীন বিপ্লবের গণতান্ত্রিক পর্যায়ের সামগ্রিক জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় সংস্কৃতির কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করা। সমাজতান্ত্রিক উপাদান সমন্বিত জাতীয় সংস্কৃতিতে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রতিফলিত হবে। আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উপাদান, আছে, তাই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতেও সমাজতান্ত্রিক উপাদান প্রতিফলিত হয় ; কিন্তু গোটা সমাজের কথা বলতে গেলে, আমাদের এখনো সামগ্রিক সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতি গড়ে ওঠেনি ; তাই আমাদের এখনো সামগ্রিক সমাজতান্ত্রিক জাতীয় সংস্কৃতি থাকতে পারে না। যেহেতু চীনের বর্তমান বিপ্লব বিশ্ব সর্বহারা-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ, সেইহেতু বর্তমানকালে চীনের নতুন সংস্কৃতিও বিশ্ব সর্বহারা-সমাজতান্ত্রিক নয়া সংস্কৃতিরই অংশ ও তার মহান মিত্র ; যদিও এই অংশটির মধ্যে নিহিত রয়েছে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তবু সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি বিশ্ব সর্বহারা-সমাজতান্ত্রিক নতুন সংস্কৃতির ধারায় এক পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি হিসেবে যুক্ত হয় না, যুক্ত হয় ব্যাপক জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হিসেবে। বর্তমান চীনের বিপ্লবকে যেমন

চীনের সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি বর্তমান চীনের নয়া সংস্কৃতিকেও চীনের সর্বহারা-শ্রেণীর সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, অর্থাৎ কমিউনিস্ট মতাদর্শের নেতৃত্ব থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে এই নেতৃত্বের কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদবিরোধী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে চালিয়ে যাবার কাজে জনসাধারণকে নেতৃত্বদান করা। তাই বর্তমানে সামগ্রিকভাবে চীনের নয়া জাতীয় সংস্কৃতির বিষয়বস্তু এখনো নয়া-গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নয়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এখন কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচার আমাদের বাড়াতে হবে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়নে আমাদের আরও বেশি করে শক্তি নিয়োগ করতে হবে ; তা না হলে চীনের বিপ্লবকে আমরা যে শুধু ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না তাই নয়, বর্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে জয়লাভের পথে পরিচালিত করতেও আমরা পারব না। কিন্তু কমিউনিস্ট মতাদর্শের ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার প্রচারকে আমাদের নয়া-গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর বাস্তব প্রয়োগ থেকে পৃথক করতে হবে ; সমস্যার অনুসন্ধান, গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ, কাজকর্ম পরিচালনা ও কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কমিউনিস্ট তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে আমাদের সামগ্রিক জাতীয় সংস্কৃতির নয়া-গণতান্ত্রিক কর্মপন্থা থেকে পৃথক করতে হবে। নিঃসন্দেহে এই দুটিকে মিশিয়ে ফেলা যথার্থ নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বর্তমান পর্যায়ে চীনের নতুন জাতীয় সংস্কৃতির বিষয়বস্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর সাংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্রও নয়, কিংবা বিশুদ্ধ ধরনের সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতন্ত্রও নয় ; তা হচ্ছে সর্বহারা-সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মতাদর্শের নেতৃত্বে জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী নয়া গণতন্ত্র।

১৫। জাতীয়, বিজ্ঞানসম্মত ও জনসাধারণের একটি সংস্কৃতি

নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হল জাতীয়। এই সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়নের বিরোধিতা করে এবং চীনা জাতির মর্যাদা ও স্বাধীনতার দাবি জানায়। এটা আমাদের জাতিরই সংস্কৃতি, আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্যই এতে থাকবে। এই সংস্কৃতি অন্যান্য সমস্ত জাতির সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত, তাদের সাথে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও বিকাশের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের সাথে একসংগে গড়ে তোলে দুনিয়ার নতুন সংস্কৃতি। কিন্তু এ সংস্কৃতি অন্য কোন জাতির সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির সাথে কিছুতেই যুক্ত হতে পারে না, কারণ আমাদের এ সংস্কৃতি বিপ্লবী জাতীয় সংস্কৃতি। নিজস্ব সংস্কৃতির পুষ্টিসাধনের জন্য প্রচুর পরিমাণে

বিদেশী প্রগতিশীল সংস্কৃতি গ্রহণ করা চীনের উচিত। এক্ষেত্রে অতীতে যা করা হয়েছে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। যা আজ আমাদের কাজে লাগে তা-ই আমাদের গ্রহণ করা উচিত ; শুধু বর্তমানকালের সমাজতান্ত্রিক ও নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে নয়, বিদেশের প্রাচীন সংস্কৃতিগুলো থেকেও, যেমন বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের জ্ঞানালোকপ্রাপ্তির যুগের সংস্কৃতি থেকেও আমাদের গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু খাদ্য সম্পর্কে আমরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করি, এইসব বিদেশী সামগ্রী সম্পর্কেও সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ খাদ্য আমরা চিবানোর জন্য মুখে দিই, হজমের জন্য পাকস্থলী ও অন্ত্রে পাঠাই, তার সাথে লালা, পাচক রস ও অন্ত্রের অন্যান্য রস মিশ্রিত হয়, এমনি করে খাদ্যকে সারবস্তু ও বর্জনীয় অংশে ভাগ করে দিই, তারপর পুষ্টির জন্যে সারবস্তু গ্রহণ করি ও বর্জনীয় অংশ পরিত্যাগ করি। শুধু এইভাবেই আমাদের স্বাস্থ্যের উপকার হবে ; কোন কিছুকেই সবশুদ্ধ গলাধঃকরণ করা অথবা কোন বিচার-বিবেচনা বা সমালোচনা না করে গ্রহণ করা কোনমতেই চলবে না। 'সর্বতোভাবে পশ্চিমীকরণের'[২২] ধারণা ভুল। যান্ত্রিকভাবে বিদেশী জিনিস গ্রহণ করে অতীতে চীনকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। অনুরূপভাবে, চীনদেশে মার্কসবাদ প্রয়োগের ব্যাপারেও চীনা কমিউনিস্টদের অবশ্যই মার্কসবাদের সার্বজনীন সত্যকে চীন বিপ্লবের বাস্তব অনুশীলনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ও যথাযথভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হবে ; অর্থাৎ মার্কসবাদের সার্বজনীন সত্যকে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সংগে সমন্বিত করতে ও নির্দিষ্ট জাতীয় রূপদান করতে হবে। শুধু এইভাবেই তা কাজে লাগবে ; আত্মগতভাবে ও ফর্মুলার মতো যান্ত্রিকভাবে তাকে প্রয়োগ করা আমাদের কোনমতেই উচিত নয়। ফর্মুলাবাদী মার্কসবাদীরা শুধু মার্কসবাদ ও চীন বিপ্লব নিয়ে ছেলেখেলা করেছে ; চীনের বিপ্লবীদের সারিতে তাদের স্থান নেই। চীনের সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ থাকা উচিত, এবং সে রূপ হবে জাতীয়। জাতীয় রূপ ও নয়া-গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তু—এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের নতুন সংস্কৃতি।

এই নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিজ্ঞান সম্মত। এটা একদিকে যেমন সমস্ত সামন্তবাদী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার বিরোধী, অপর দিকে তেমনি এটা বাস্তব ঘটনা থেকে সত্যের সন্ধান, বাস্তব সত্য এবং তত্ত্ব ও অনুশীলনের ঐক্যের সমর্থনে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে চীনা সর্বহারাশ্রেণীর বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা চীনের যেসব বুর্জোয়া বস্তুবাদী ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী এখনো প্রগতিশীল, তাঁদের সাথে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী' সামন্তবাদ-বিরোধী ও কুসংস্কার-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে পারে ; কিন্তু কোন মতেই সে কোন প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদের সংগে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে পারে না। কমিউনিস্টরা কোন ভাববাদী এমনকি ধর্মানুসারী ব্যক্তির সংগেও রাজনৈতিক কার্যকলাপে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই তাদের ভাববাদ অথবা ধর্মীয় তত্ত্বের সমর্থন করতে পারেন না। সুদীর্ঘকাল

স্থায়ী চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এক উজ্বল প্রাচীন সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই প্রাচীন সংস্কৃতির বিকাশের ধারাটির বিশ্লেষণ করা, তার সামন্তবাদী আবর্জনাগুলো ঝেড়ে ফেলে দেওয়া, তার গণতান্ত্রিক সারবস্তুটুকু গ্রহণ করা জাতীয় নয়া সংস্কৃতির বিকাশ ও জাতীয় আত্মবিশ্বাসের বৃদ্ধির পক্ষে এক অবশ্যকীয় শর্ত ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণ না করে সমস্ত কিছু চোখ বুজে গ্রহণ করা কোনমতেই উচিত হবে না। প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ গণ-সংস্কৃতি থেকে, অর্থাৎ সংস্কৃতির যে অংশগুলোর প্রকৃতি কমবেশি গণতান্ত্রিক বা বিপ্লবী, সেগুলো থেকে প্রাচীন সামন্ত শাসকশ্রেণীর সমস্ত পচা জিনিসকে পৃথক করতে হবে। চীনের বর্তমান নতুন রাজনীতি ও নতুন অর্থনীতি যেমন প্রাচীনকালের পুরানো রাজনীতি ও পুরানো অর্থনীতি থেকে বিকাশলাভ করেছে, তেমনি চীনের বর্তমানকালের নতুন সংস্কৃতিও প্রাচীনকালের পুরানো সংস্কৃতি থেকে বিকাশলাভ করেছে। অতএব আমাদের অবশ্যই নিজেদের ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করতে হবে ; ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সূত্র ছিন্ন করা কোনমতেই উচিত হবে না। কিন্তু এখানে ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করার অর্থ হল ইতিহাসকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে তার যথাযোগ্য স্থান দেওয়া এবং ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিকাশকে শ্রদ্ধা করা ; তার দ্বারা বর্তমানকে উপেক্ষা করে প্রাচীনের প্রশংসা অথবা কোন বিষাক্ত সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের গুণগান করা বোঝায় না। জনসাধারণ এবং তরুণ ছাত্রদেরকে অবশ্যই প্রধানতঃ সামনের দিকে তাকাতে শেখাতে হবে, পেছনের দিকে নয়।

এই নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি জনসাধারণের সংস্কৃতি এবং সেজন্য তা গণতান্ত্রিক। এই সংস্কৃতিকে সমগ্র জাতির জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জনেরও বেশি যে মেহনতী শ্রমিক-কৃষকসাধারণ, তাঁদের সেবায় নিয়োজিত হওয়া উচিত, এবং তাকে ক্রমান্বয়ে তাঁদের একেবারে নিজস্ব সংস্কৃতিতে পরিণত হতে হবে। বিপ্লবী কর্মীদের শিক্ষাদানের জন্য যে জ্ঞানের দরকার এবং বিপ্লবী জনসাধারণকে শিক্ষাদানের জন্য যে জ্ঞানের দরকার—এই দুই জ্ঞানের মধ্যে যেমন মাত্রাগত পার্থক্য নিরূপণ প্রয়োজন, তেমনি তাদের পারস্পারিক সংযোগসাধনও প্রয়োজন; সংস্কৃতির মানের উন্নতিসাধনের সংগে তার ব্যাপক জনপ্রিয়করণের পার্থক্য নিরূপণ এবং সংযোগসাধনও প্রয়োজন। বিপ্লবী সংস্কৃতি ব্যাপক জনসাধারণের হাতে শক্তিশালী বিপ্লবী হাতিয়ার। বিপ্লব শুরু হবার আগে বিপ্লবী সংস্কৃতি মতাদর্শের দিক থেকে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে বিপ্লবের সময়ে এই বিপ্লবী সংস্কৃতি সাধারণ বিপ্লবী ফ্রন্টের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্য প্রয়োজনীয় ফ্রন্ট। বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীরা হচ্ছেন এই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে বিভিন্ন স্তরের সেনাধ্যক্ষ। 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব নয়'[২৩]—এ থেকে দেখা যায় বাস্তব বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলন কত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও বাস্তব আন্দোলন উভয়ই জনসাধারণেরই আন্দোলন। কাজেই, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধে সমস্ত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক

বাহিনী থাকা উচিত। ব্যাপক জনসাধারণই এক সাংস্কৃতিক বাহিনী। যে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মী জনগণের ঘনিষ্ঠ নয়, সে একজন সেনাবিহীন সেনাপতির মতো, যার অস্ত্রবল কখনো শত্রুকে ধরাশায়ী করতে পারে না। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত পূরণ করে নিয়ে চীনা ভাষার লিপির সংস্কার করতে হবে, আমাদের ভাষাকে জনসাধারণের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে; বুঝতে হবে, জনসাধারণই বিপ্লবী সংস্কৃতির অফুরন্ত উৎস।

জাতীয়, বিজ্ঞানসম্মত ও জনসাধারণের সংস্কৃতি হচ্ছে ব্যাপক জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং চীনা জাতীর নতুন সংস্কৃতি।

নয়া-গণতান্ত্রিক রাজনীতি, নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং নয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সমন্বয়সাধনই নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ; এটা নামেও বাস্তবে যথার্থ চীন প্রজাতন্ত্র। এটা সেই নয়া চীন, যার প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, নয়া চীন দেখা যাচ্ছে। আসুন, আমরা সকলে তাকে অভিনন্দন জানাই!

দিগন্তের ওপারে দেখা যাচ্ছে নয়া চীনের মাস্তুল। আসুন, আমরা তাকে হর্ষধ্বনি করে স্বাগত জানাই!

আপনার দুহাত উঁচুতে তুলে ধরুন। নয়া চীন আমাদেরই।

টীকা

১। 'চীনা সংস্কৃতি' হল একটি সাময়িক পত্রিকা ;১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে ইয়েনান থেকে প্রকাশিত হয়। 'নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায়।

২। দ্রষ্টব্য ঃ ভি. আই. লেনিন, 'ট্রেড ইউনিয়ন, বর্তমান পরিস্থিতি এবং ট্রটস্কি ও বুখারিনের ভুল সম্পর্কে আরও একবার', 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরাজী সংস্করণ, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৩, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪।

৩। কার্ল মার্কস ঃ "রাজনৈতিক অর্থবিজ্ঞানের সমালোচনার" ভূমিকা', 'মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৮, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩।

৪। কার্ল মার্কস ঃ 'ফয়েরবাখ সম্পর্কে থিসিস', ঐ, ২য় খণ্ড, পৃ ৪০৫।

৫। স্তালিন ঃ 'অক্টোবর বিপ্লব ও জাতিসমস্যা', 'রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৪, পৃঃ ১৫১-৫৫।

৬। জে. ভি. স্তালিন ঃ 'আবার জাতিগত প্রশ্ন', 'রচনাবলী', ৪র্থ খণ্ড, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫, ২০২-২১০।

৭। ভি. আই. লেনিন ঃ 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়', 'নির্বাচিত রচনাবলী', ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫০, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৬৬।

৮। বিপ্লবের প্রতি চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতার পর কুওমিনতাঙ সরকার যে অনেকগুলো সোভিয়েত-বিরোধী কাজ করে তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। ১৯২৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর কুওমিনতাঙ কুয়াংচৌ শহরের সোভিয়েত ভাইস কন্সালকে হত্যা করে, পরের দিনই নানকিং-এ কুওমিনতাঙ সরকার রুশ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার নির্দেশ জারী করে, বিভিন্ন প্রদেশস্থ সোভিয়েত কন্সালদের ওপর থেকে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় এবং চীনের বিভিন্ন প্রদেশস্থ সমস্ত সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম দেয়। সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে চিয়াং কাই-শেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে উত্তর-পূর্ব চীনে প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ চালায় এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।

৯। কামাল ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের তুরস্কের বণিক-বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের তাঁবেদার দেশ গ্রীস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় তুরস্কের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায় ; ১৯২২ সালে সোভিয়েত সাহায্য পেয়ে তুরস্কের জনগণ গ্রীক বাহিনীকে পরাজিত করে। ১৯২৩ সালে কামাল তুরস্কের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। স্তালিন বলেছিলেন ঃ

> কামালবাদী বিপ্লব হচ্ছে জাতীয় বণিক-বুর্জোয়াদের উপরিস্তরের বিপ্লব। এই বিপ্লব ঘটেছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামের মধ্যে। কিন্তু তার পরবর্তীকালে বিকাশের ধারা অপরিহার্যরূপে কৃষক ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চলে যায়, এবং কৃষি-বিপ্লবের সম্ভাবনারই পথরোধ করে দাঁড়ায়। 'সান ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগে আলোচনা', 'রচনাবলী', ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৪, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৬১, দ্রষ্টব্য।

১০। 'অধিবিদ্যাবাগীশ শয়তান' বলতে কমরেড মাও সে-তুঙ চ্যাং চুন-মাই প্রমুখদের কথা উল্লেখ করেছেন। ৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর চ্যাং চুন-মাই প্রকাশ্যে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে, তারস্বরে তথাকথিত 'মানসিক সংস্কৃতির' 'আধিবিদ্যক মতবাদ' প্রচার করে ; সেই সময়ে তাকে 'অধিবিদ্যাবাগীশ শয়তান' বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে চিয়াং কাইশেকের উস্কানিতে চ্যাং চুন-মাই 'মিঃ মাও সে-তুঙের নিকট খোলা চিঠি' প্রকাশ করে এতে অষ্টম রুট বাহিনী, নতুন চতুর্থ বাহিনী ও শেনসী-কানসু নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের বিলোপসাধন করার জন্য উন্মত্তভাবে প্রচার চালায়। এমনি করেই সে জাপানী আক্রমণকারী ও চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করে।

১১। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রকাশিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণাপত্র দ্রষ্টব্য।

১২। ১৯২৪ সালে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের 'গণ-কল্যাণের নীতি সম্পর্কে বক্তৃতামালার' দ্বিতীয় পাঠ দ্রষ্টব্য।

১৩। চিয়াং কাই-শেক চক্রের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সর্দার ছেন লি-ফুর ভাড়া করা কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীল লেখক 'প্রাণবাদ' নামক একটা বই লিখেছিল। এই বইয়ে বহু আজগুবী কথা বলা হয়েছিল ; এতে কুওমিনতাঙের ফ্যাসিবাদকে তারস্বরে প্রচার করা হয়। বইটা ছেন লি-ফুর নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৪। 'শ্রম অনুযায়ী বণ্টনের মতবাদ—এই শ্লোগানটি নির্লজ্জভাবে উপস্থাপিত করেছিল শানসী প্রদেশের বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ মুৎসুদ্দিদের প্রতিনিধি যুদ্ধবাজ ইয়ান সীন-সান।

১৫। ১৯২৭ সালে ওয়াং চিং-ওয়েই বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। প্রবন্ধটির শিরোনামা ছিল 'উভয় দিক হতে আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম'।

১৬। ১৯২৫ সালের ৩০শে মার্চ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির যুগোশ্লাভ কমিশনে স্তালিন 'যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে' একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ

> ...কৃষকরা হচ্ছে জাতীয় আন্দোলনের মূল সেনাবাহিনী। কৃষকদের এই সেনাবাহিনী ছাড়া শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের কোন অস্তিত্ব নেই, থাকতেও পারে না।...জাতীয় সমস্যা আসলে একটি কৃষক সমস্যা ('রচনাবলী', ৭ম খণ্ড, বাংলা সংস্করণ, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য)।

১৭। কমরেড মাও সে-তুঙ গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর কিছু সংখ্যক গোঁড়ামিবাদীরা এটাকে 'পাহাড়ে যাওয়ার নীতি' বলে বিদ্রূপ করে। কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে গোঁড়ামিবাদীদের এই বিদ্রূপাত্মক ভাষা ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

১৮। 'আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী' ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা। 'রাজকীয় পরীক্ষাপ্রণালী' ছিল সমাজতান্ত্রিক চীনের পুরানো পরীক্ষাব্যবস্থা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনের জাগ্রত বুদ্ধিজীবীরা রাজকীয় পরীক্ষাপ্রণালী বিলোপ করার ও আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব পেশ করেন।

১৯। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র দেশপ্রেমমূলক আন্দোলন জুন মাসের গোড়ায় এক নতুন স্তরে প্রবেশ করে। ১৯১৯ সালের ৩রা জুন তারিখে সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশের দমনমূলক কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করার জন্য পিকিং-এর ছাত্ররা গণসমাবেশ করে ভাষণ দেয়। ছাত্ররা যে ধর্মঘট শুরু করে তা ক্রমান্বয়ে শাংহাই, নানকিং, তিয়েনসিন, হাংচৌ, উহান কিউকিয়াং, আর শানতুং, আনহুই প্রদেশের শ্রমিক ও বণিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ৫ঠা

মে'র আন্দোলন তখন থেকে ব্যাপক জনসাধারণের আন্দোলনে পরিণত হয় যাতে সর্বহারাশ্রেণী, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সকলেই অংশগ্রহণ করে।

২০। ইয়ে চিং ছিল একজন কমিউনিস্ট দলত্যাগী। সে কুওমিনতাঙ গোয়েন্দাবাহিনীর একজন ভাড়াটে গুপ্তচরে পরিণত হয়েছিল।

২১। ইউরোপীয় মার্কিনপন্থী সাংস্কৃতিক পণ্ডিত বলতে বোঝায় সেইসব লোককে, যাদের প্রতিনিধি ছিল প্রতিবিপ্লবী হুশি।

২২। 'সর্বতোভাবে পশ্চিমীকরণ' ছিল কিছু বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের অভিমত। তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সেকেলে পাশ্চাত্ত্য বুর্জোয়া সংস্কৃতির নির্বিচার প্রশংসা করত। তারা চীনের সবকিছুতেই ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলির নকল করার পক্ষে ওকালতি করত। এটাকেই তারা 'সর্বতোভাবে পশ্চিমী জিনিস গ্রহণ' বা 'সর্বতোভাবে পশ্চিমীকরণ' নামে অভিহিত করত।

২৩। ভি. আই. লেনিন ঃ 'কী করতে হবে ?', 'সংকলিত রচনাবলী, ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৬১, ৫ম খণ্ড, পৃ ঃ ৩৬৯।

আত্মসমর্পণের বিপদকে জয় কর, এবং ভালর দিকে মোড় ঘোরাবার চেষ্টা কর

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪০

বর্তমান ঘটনাবলী কেন্দ্রীয় কমিটির বিশ্লেষণের সঠিকতাকেই প্রমাণ করছে। বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের অনুসৃত আত্মসমর্পণের লাইন সর্বহারাশ্রেণী, কৃষক, শহরের পেটি-বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াদের অনুসৃত সশস্ত্র প্রতিরোধের লাইনের তীব্র বিরোধী এবং এই দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলছে। বর্তমানে দুটি লাইনই বিরাজ করছে, এবং ভবিষ্যতে এ দুটির মধ্যে একটিই বিজয়ী হবে। এ প্রসংগে আমাদের সমস্ত পার্টি-কমরেডদের এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, বিভিন্ন জায়গায় আত্মসমর্পণ, কমিউনিজম-বিরোধিতা ও পশ্চাদপসরণের যেসব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখাটা ঠিক হবে না। এগুলির গুরুত্বকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, দৃঢ়ভাবে এগুলির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, এবং এগুলির ফলশ্রুতিতে বিহ্বল হয়ে পড়লে চলবে না। দৃঢ়ভাবে এসব ঘটনার মোকাবিলা করার মানসিকতা বা সঠিক কর্মনীতি যদি আমাদের না থাকে, গোঁড়াপন্থী কুওমিনতাঙদের যদি আমরা তাদের 'কমিউনিস্ট পার্টির সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে সীমাবদ্ধকরণের' কাজ চালিয়ে যেতে দিই, এবং প্রতিনিয়ত যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে যাবার আশংকায় ভীত হয়ে থাকি, তবে প্রতিরোধ-যুদ্ধই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সারা দেশে আত্মসমর্পণ ও কমিউনিজম বিরোধিতা ছড়িয়ে পড়বে, এবং সত্যিসত্যিই যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে যাবার বিপদ দেখা দেবে। কিন্তু এটাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আমাদের সংগ্রামে অব্যাহত প্রতিরোধ, ঐক্যও প্রগতির অনুকূল বাস্তব শর্তাবলী দেশে ও বিদেশে এখনো বিরাজ করছে। যেমন, চীনের প্রতি জাপানের কর্মনীতি এখনো আগের মতোই কঠোর রয়েছে। একদিকে জাপান ও অন্যদিকে ব্রিটেনে, মার্কিন ও ফ্রান্সের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের তীব্রতা কিছু কমে গেলেও তাদের মধ্যে প্রকৃত সমঝওতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ইউরোপের যুদ্ধের ফলে প্রাচ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অবস্থান কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সক্রিয়ভাবে চীনকে সাহায্য করছে। এসবের ফলে জাপানের পক্ষে দূর প্রাচ্যে একটা মিউনিক

এই রচনাটি কমরেড মাও সে-তুঙ লিখেছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে পার্টির ভেতরকার একটি নির্দেশ হিসেবে।

সম্মেলন তৈরী করাটা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। এই হচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়, যা কুওমিনতাঙের পক্ষে আত্মসমর্পণ করা বা সমঝওতায় যাওয়া, কিন্তু সমগ্র দেশব্যাপী কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে নামা দুষ্কর করে দিয়েছে। দেশের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী আত্মসমর্পণের কর্মনীতির দৃঢ় বিরোধিতা করছে, প্রতিরোধ ও ঐক্যের কর্মনীতিকে তুলে ধরে রাখছে ; মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহও আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে; এবং আত্মসমর্পণবাদীরা ও গোঁড়াপন্থীরা ক্ষমতাশীল হলে কুওমিনতাঙের মধ্যে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ। এইসব হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরের বাস্তব বিষয়সমূহ যা কুওমিনতাঙের পক্ষে আত্মসমর্পণ করা বা সমঝওতায় যাওয়া, কিংবা সমগ্র দেশব্যাপী কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে নামা দুষ্কর করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টির কর্তব্য হচ্ছে দুটি। একদিকে যেমন তাকে দৃঢ়-সংকল্প হয়ে আত্মসমর্পণবাদী ও গোঁড়াপন্থীদের সামরিক ও রাজনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযানগুলোর বিরোধিতা করতে হবে, অপরদিকে তেমনি তাকে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে বিকাশ ঘটাতে হবে রাজনৈতিক পার্টিসমূহ, সরকারী বিভাগসমূহ, সামরিক বাহিনী, অসামরিক নাগরিক ও বুদ্ধিজীবীদের যুক্তফ্রণ্টকে ; কুওমিনতাঙের সংখ্যাগরিষ্ঠদেরকে, জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মধ্যপন্থী শ্রেণীসমূহকে ও সামরিক বাহিনীর মধ্যেকার সমর্থকদের নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য তাকে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, গণ-সংগ্রামকে আরও গভীরতর করে তুলতে হবে, নিজেদের পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আসতে হবে, জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলগুলিকে সুসংগঠিত করে তুলতে হবে, জাপ-বিরোধী সামরিক বাহিনী ও জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির কাঠামোগুলোকে বিস্তৃত করে তুলতে হবে। আমরা যদি যুগপৎ এই দুটি কর্তব্য সম্পাদন করি, তাহলে আমরা বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের আত্মসমর্পণের বিপদকে পরাভূত করতে ও পরিস্থিতিকে উন্নতির দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারব। সুতরাং পার্টির বর্তমান সাধারণ কর্মনীতিই হচ্ছে উন্নতির দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো এবং সেই একই সংগে যে-কোন আকস্মিক ঘটনার (এখনো পর্যন্ত যা আছে সীমিত ও স্থানিক পর্যায়ে) মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা।

ওয়াং চিং-ওয়েই এখন যখন তার বিশ্বাসঘাতকতার চুক্তির[১] কথা ঘোষণা করেছে এবং চিয়াং কাই-শেক জাতির প্রতি তাঁর বাণী প্রকাশ করেছেন, তখন এতে কোন সন্দেহ নেই যে শান্তির পক্ষের আন্দোলনে অন্তরায় সৃষ্টি হবে এবং প্রতিরোধের পক্ষের শক্তিসমূহের বৃদ্ধি ঘটবে ;অপরপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টিকে সীমিত করে রাখার জন্য সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা’ চলতে থাকবে, আরও অনেক স্থানীয় ঘটনাবলী সৃষ্টি করা হবে, এবং কুওমিনতাঙ আমাদের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য

তথাকথিত 'বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে একতার' ওপর জোর দেবে। কেননা, প্রতিরোধের ও প্রগতির সমর্থক শক্তিসমূহ আত্মসমর্পণকামী ও পশ্চাদপসরণের শক্তিকে ভাসিয়ে দেবার মতো শক্তি এক্ষুণি তৈরী করে ফেলতে পারছে না। আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে দেশের যেখানেই কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন আছে, সেখানেই ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিশ্বাসঘাতকতার চুক্তির বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান তীব্রতর করে তোলা। তাঁর বাণীতে চিয়াং কাই-শেক বলেছেন যে, তিনি প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন, কিন্তু জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি জোর দেননি, প্রতিরোধ ও প্রগতি রক্ষা সম্বন্ধেও তিনি কিছু উল্লেখ করেননি, যা বাদ দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করাই অসম্ভব। সুতরাং ওয়াং চিং-ওয়েইর বিরুদ্ধে অভিযানে আমাদের জোর দিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বলতে হবে ঃ (১) ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিশ্বাসঘাতকতার চুক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, প্রতিরোধ যুদ্ধ শেষ ধাপ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার জাতীয় কর্মনীতিকে সমর্থন কর ; (২) বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চিং-ওয়েই ও তার পুতুল কেন্দ্রীয় সরকারকে উৎখাত কর, সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ কর ; (৩) ওয়াং চিং-ওয়েই'র কমিউনিস্ট-বিরোধিতাকে ধুলিসাৎ করে দাও, কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতার প্রতি সমর্থন জানাও ; (৪) ওয়াং চিং-ওয়েই মার্কা গোপন বিশ্বাসঘাতকরা নিপাত যাক, জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য যার চক্রান্তই হচ্ছে কমিউনিজমের বিরোধিতা করা; (৫) জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী কর, আভ্যন্তরীণ 'সংঘর্ষ' দূর কর ; (৬) রাজনৈতিক সংস্কার চালু কর ; সাংবিধানিক শাসন-ব্যবস্থাদির জন্য আন্দোলন কর, গণতন্ত্র কায়েম কর ; (৭) রাজনৈতিক পার্টিগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নাও, জাপ-বিরোধী পার্টি ও গ্রুপের মর্যাদার আইনগত স্বীকৃতি দাও ; (৮) জাপানী ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য জনগণের বক্তব্য রাখার ও সমাবেশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দাও ; (৯) জাপ -বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চল সংহত করে গড়ে তোল, ওয়াং চিং-ওয়েই মার্কা বিশ্বাসঘাতকদের ভাঙ্গন ধরানোর ষড়যন্ত্রের বিরোধিত কর ; (১০) যুদ্ধে যারা প্রকৃতই ভালভাবে লড়ছে সেই সেনাদের প্রতি সমর্থন জানাও, ফ্রন্টে যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ পাঠাও : এবং (১১) প্রতিরোধের সমর্থনে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি কর, প্রগতিবাদী যুবকদের রক্ষা কর, এবং শত্রুর সংগে সহযোগিতামূলক সমস্ত প্রচার নিষিদ্ধ কর। উল্লিখিত শ্লোগানগুলো বহু বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত। বহু সংখ্যক প্রবন্ধাবলী, ইস্তাহার, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশ করতে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে, সেই সংগে স্থানীয় পরিস্থিতি বুঝে তার সংগে প্রয়োজনীয় শ্লোগান যোগ করতে হবে।

ইয়েনানে ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিশ্বাসঘাতকতার চুক্তিকে নিন্দা করার জন্য একটি গণসমাবেশ হতে যাচ্ছে। শত্রুর সংগে সহযোগিতার বিরুদ্ধে,

'সংঘর্ষের' বিরুদ্ধে সমস্ত রকমের ব্যক্তিদের নিয়ে, কুওমিনতাঙের জাপ-বিরোধী সভ্যদের নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে কিংবা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে এই ধরনের গণ-সমাবেশ আমরা সংগঠিত করব, যাতে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশব্যাপী এক বিরাট গণজাগরণ সৃষ্টি হয়।

টীকা

১। ওয়াং চিং-ওয়েই ১৯৩৯ সালের শেষদিকে জাপানী আক্রমণকারীদের সংগে গোপনে 'চীন-জাপান সম্পর্ক পুনঃসংশোধনের কর্মসূচী' নামে একটি বিশ্বাসঘাতকতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে। তার প্রধান ধারাগুলো ছিল ঃ (১) উত্তর-পূর্ব চীন জাপানকে ছেড়ে দিতে হবে এবং 'মঙ্গোলিয়া অঞ্চল' (সে সময়ে যা ছিল সুইয়ুয়ান, চাহার ও উত্তর শানসী নিয়ে গঠিত), উত্তর চীন, ইয়াংসি উপত্যকার নিম্ন-অববাহিকা অঞ্চল ও দক্ষিণ চীনের দ্বীপগুলিকে 'চীন-জাপান সহযোগিতার এলাকা' নামে চিহ্নিত করা হবে, অর্থাৎ সেগুলি স্থায়ীভাবে জাপানী বাহিনীর অধিকারে থাকবে। (২) কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকার পর্যন্ত তাঁবেদারদের শাসন জাপানী উপদেষ্টা ও আমলাদের পর্যবেক্ষণে থাকবে। (৩) পুতুল সরকারের সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ জাপানী সামরিক প্রশিক্ষকদের কাছে ট্রেনিং পাবে এবং জাপান তাদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করবে। (৪) পুতুল সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক কর্মনীতি, তার শিল্পগত ও কৃষি-সংগঠন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা জাপানের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, এবং চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ জাপান ইচ্ছামত শোষণ করতে পারবে। (৫) জাপ-বিরোধী সমস্ত কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হবে।

সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ কর এবং গোঁড়া কমিউনিস্ট-বিরোধীদের প্রতিহত কর

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

আমরা, ইয়েনানের সমস্ত স্তরের লোকেরা, আজ এখানে কেন সমবেত হয়েছি? আমরা এখানে এসেছি বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চিং-ওয়েইকে নিন্দা করার জন্য, এসেছি সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, এবং গোঁড়া কমিউনিস্ট বিরোধীদের প্রতিহত করার জন্য।

বারবার আমরা কমিউনিস্টরা দেখিয়েছি যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কর্মনীতিই হচ্ছে চীনকে পদানত করা। জাপানের মন্ত্রিসভায় যত রদবদলই হোক না কেন, চীনকে পদানত করা ও তাকে একটি উপনিবেশে পরিণত করা সম্পর্কে তার মূল কর্মনীতিতে কোন পরিবর্তন আসবে না। চীনের বৃহৎ বুর্জোয়াদের জাপপন্থী অংশের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ওয়াং চিং-ওয়েই এইসব ঘটনায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং চীনকে জাপানের কাছে বিকিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতামূলক একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। তদুপরি সে জাপ-বিরোধী সরকার ও সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি দালাল সরকার ও সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে চাইছে। সম্প্রতি সে চিয়াং কাই-শেকের তেমন বিরোধিতা করছে না, এবং বলা হচ্ছে, সে নাকি 'চিয়াং-এর সংগে মোর্চা' গড়ার দিকে এগোচ্ছে। জাপান ও ওয়াং চিং-ওয়েই—দুজনেরই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিজমের বিরোধিতা করা। তারা এটা বুঝেছে যে, কমিউনিস্ট পার্টিই হচ্ছে জাপানকে রুখবার ব্যাপারে সবচেয়ে দৃঢ়-সংকল্প এবং কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতার অর্থই হচ্ছে প্রতিরোধের শক্তিবৃদ্ধি, এবং সে কারণেই তারা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে এই সহযোগিতায় ভাঙ্গন ধরাতে, বা আরও বেশি চেষ্টা করছে তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে। সেইজন্যই তারা কুওমিনতাঙদের মধ্যেকার গোঁড়াপন্থীদের দিয়ে সর্বত্র গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলছে। হুনানে পিংকিয়াং হত্যাকাণ্ড[1] সংঘটিত হয়েছে; হোনানে চুয়েশান হত্যাকাণ্ড[2]; শানসীতে পুরানো সৈন্যরা নতুন সৈন্যদের আক্রমণ করেছে[3]; হোপেইতে চাং ইন-য়ু অষ্টম রুট বাহিনীকে

ইয়েন্নানে ওয়াং চিং-ওয়েইর প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন করার জন্য সংগঠিত একটি জনসভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই ভাষণটি প্রদান করেন।

আক্রমণ করেছে[৪] ; শানতুঙে চিন-জুং গেরিলাদের আক্রমণ করেছে[৫], পুর্ব হুপেতে চেং জু হুয়াই পাঁচশ থেকে ছ'শ কমিউনিস্টকে খুন করেছে[৬], এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে গোঁড়াপন্থীরা ভেতর থেকে একটা গুপ্তচর চক্র গড়ে তোলার এবং বাইরে থেকে 'অবরোধ' সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে এবং সশস্ত্র হামলা করার প্রস্তুতি গড়ে তুলছে[৭]। অধিকন্তু, তারা এক বিরাটসংখ্যক প্রগতিশীল তরুণদের গ্রেপ্তার করে তাদের বন্দীশিবিরে আটকে রেখেছে,[৮] এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে বিলুপ্ত করার জন্য, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে ভেঙে দেবার জন্য এবং অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে ভেঙে ফেলার জন্য তারা সেই আধিবিদ্যক দার্শনিকপ্রবর চ্যাং চুন-মাইকে ভাড়া করেছে ; এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে গালাগালি দিয়ে প্রবন্ধ লেখার জন্য তারা ট্রটস্কিপন্থী ইয়ে চিং ও অন্যান্য দালালদের নিয়োগ করেছে। এ সবকিছুর একটাই উদ্দেশ্য—জাপ-বিরোধী প্রতিরোধে ভাঙন ধরানো এবং চীনা জনগণকে ঔপনিবেশিক ক্রীতদাসে পরিণত করা।[৯]

এইভাবে ওয়াং চিং-ওয়েই চক্র ও কুওমিনতাঙের কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়া কুচক্রীরা একসংগে যোগসাজসে কাজ করছে—কেউ সেটা করছে ভেতর থেকে, কেউ করছে বাইরে থেকে এবং তারা একটা বিশৃংখলার সৃষ্টি করেছে।

এইরকম ঘটনায় বেশ কিছু ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন এবং ভাবছেন, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এখন শেষ হয়ে গেছে। কুওমিনতাঙের সদস্যরা সবাই বদমাস এবং তাদের বিরোধিতা করাই সমীচীন। আমাদের এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, তাঁদের এই বিক্ষোভ খুবই সঙ্গত, কারণ এইরকম অবস্থায় কেউ কি বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারে? কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এখনো শেষ হয়নি এবং কুওমিনতাঙের সকলেই বদমাস নয়। কুওমিনতাঙের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি বিভিন্নরকম নীতি গ্রহণ করতে হবে। যেসব বিবেকহীন বদমাসরা অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে পেছন থেকে ছুরি মারার, পিংকিয়াং ও চুয়েশানে বিপর্যয় ঘটানোর, সীমান্ত অঞ্চলকে ভেঙে ফেলার এবং প্রগতিশীল সৈন্যবাহিনী, সংগঠন ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ওপর হামলা চালানোর ঔদ্ধত্য রাখে তাদের কোনক্রমেই সহ্য করা হবে না,—বরং তাদের পাল্টা মার দিতে হবে ;তাদের প্রতি সহানুভূতির কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তারা এমন ধরনের বিবেকহীন যে, আমাদের জাতীয় শত্রু আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অনেক গভীরে ঢুকে পড়ার পরেও তারা দলাদলির সৃষ্টি করছে, বিপর্যয় ঘটাচ্ছে, ভাঙন ধরাচ্ছে। তাদের চিন্তাভাবনা যাই হোক না কেন, তারা কার্যতঃ জাপান ও ওয়াং চিং-ওয়েইকে সাহায্য করছে এবং তাদের কিছু লোক গোড়া থেকেই মুখোস-পরা বেইমান, তাদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হলে ভুল করা হবে ; সেটা হবে শত্রুর দোসর ও

দেশদ্রোহীদের উৎসাহ দেওয়া, সেটা হবে জাতীয় প্রতিরোধ ও মাতৃভূমির প্রতি অনুগত না থাকা, সেটা হবে যুক্তফ্রণ্ট ভাঙার জন্য বদমাসদের আহ্বান করা। সেটা হবে আমাদের পার্টির নীতি ভঙ্গ করা। যাই হোক, আপোষপন্থী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়া কুচক্রীদের আঘাত করার একমাত্র উদ্দেশ্যই হবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া এবং জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টকে রক্ষা করা। সুতরাং কুওমিনতাঙের সেইসব সদস্যদের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা থাকবে যাঁরা আপোষপন্থী বা কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থী নন, বরং প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রতি যাঁরা অনুগত; আমাদের উচিত হবে তাঁদের সংগে ঐক্য গড়ে তোলা, তাঁদের শ্রদ্ধা করা এবং তাঁদের সংগে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা করার ইচ্ছা রাখা, যাতে আমাদের দেশের শৃংখলা বজায় থাকে। যে এর বিপরীত কিছু করবে, সে পার্টির নীতির বিরুদ্ধেই কাজ করবে।

আমাদের পার্টির নীতির দুটি দিক আছে ঃ একদিকে সমস্ত প্রগতিশীল ও জাপ-প্রতিরোধে বিশ্বস্ত লোকজনকে ঐক্যবদ্ধ করা, এবং অপরদিকে আত্মসমর্পণকারী ও কমিউনিস্ট বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের—যারা হল হৃদয়হীন বদমাস—তাদের বিরোধিতা করা। আমাদের নীতির উভয়দিকের উদ্দেশ্য হল একটি— আরও ভালর দিকে মোড় ফেরানো এবং জাপানকে পরাস্ত করা। কমিউনিস্ট পার্টি ও সারাদেশের জনগণের কাজ হল প্রতিরোধকামী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা, আপোষপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে প্রতিহত করা এবং বর্তমানের খারাপ অবস্থাকে ঠেকানো ও পরিস্থিতিকে আরও ভাল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এটা হল আমাদের মূল নীতি। আমরা আশাবাদী, আমরা কখনো নৈরাশ্যবাদী হব না বা মুষড়ে পড়ব না। আমরা আপোষপন্থী বা কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের কোন হামলাকেই ভয় পাই না। আমরা তাদের অবশ্যই ধ্বংস করব—নিশ্চয়ই এটা আমাদের করতে হবে। চীন নিশ্চয়ই জাতীয় মুক্তি অর্জন করবে; চীন কখনো ধ্বংস হবে না চীন অবশ্যই উন্নতিলাভ করবে, তার বর্তমান অবনতি নিছক একটি সাময়িক ঘটনা মাত্র।

আমাদের আজকের সভায় আমরা সারাদেশের জনগণের কাছে এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চাই যে প্রতিরোধ-যুদ্ধের পক্ষে গোটা জাতির ঐক্য ও উন্নতি একান্তই প্রয়োজন। কিছু লোক শুধুমাত্র প্রতিরোধের ওপরে জোর দিয়ে থাকেন এবং ঐক্য ও উন্নতির ওপর মোটেই গুরুত্ব দিতে চান না, বা তার উল্লেখ পর্যন্ত করেন না। এটা ভুল। সাচ্চা ও দৃঢ় ঐক্য ছাড়া, দ্রুত ও দৃঢ় উন্নতি ছাড়া কিভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালানো যেতে পারে? কুওমিনতাঙের মধ্যেকার কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীরা ঐক্যের উপর জোর দেয়, কিন্তু তাদের তথাকথিত ঐক্য সাচ্চা নয়, লোক-দেখানো; তা যুক্তিসম্মত ঐক্য নয়, তা হল যুক্তিহীন ঐক্য; সে-ঐক্যে সারবস্তু নেই, আছে শুধু

ভঙ্গী। তারা ঐক্যের জন্য গলাবাজী করে, অথচ তারা আসলে কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে বরবাদ করে দিতে চায় ;এবং সেটা এই অজুহাতে যে, এগুলির অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন চীনকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না । তারা সবকিছুই কুওমিনতাঙের হাতে তুলে দিতে চায়, তারা তাদের একদলীয় একনায়কত্বকে শুধু যে বজায় রাখতে চায় তাই নয়, তারা সেটাকে আরও বাড়তে চায়। এই সবই যদি ঘটতে থাকে, তাহলে কোন্ ধরনের ঐক্য গড়ে উঠতে পারে? সত্য কথা বলতে কি, যদি কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল এগিয়ে না আসত এবং গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য জাপ-প্রতিরোধের প্রয়োজনে ঐক্য গড়ার জন্য আন্তরিকভাবে যুক্তফ্রন্ট গড়ার, অথবা সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উদ্যোগ না নিত, তাহলে জাপানকে প্রতিরোধ করার কোন সম্ভাবনাই থাকত না । এবং যদি আজ কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট বাহিনী, নয়া চতুর্থ বাহিনী, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল এবং জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাগুলি না এগিয়ে আসত এবং আন্তরিকভাবে জাপানকে প্রতিরোধ না করত, যদি আত্মসমর্পণের, ভাঙনের ও পিছিয়ে যাওয়ার বিপজ্জনক ঝোঁকগুলিকে না ঠেকাত, তাহলে পরিস্থিতি একটা ভয়াবহ অবস্থায় গিয়ে পড়ত। অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীর কয়েকশ হাজার ফৌজ জাপানী সৈন্যদের চল্লিশটি ডিভিসনের মধ্যে সতেরোটি ডিভিসনের সংগে লড়াই বাধিয়ে শত্রুসৈন্যের পাঁচ ভাগের দুই ভাগকে আটকে রেখেছে[১০] ঐই ফৌজগুলিকে ভেঙে দেওয়া হবে কেন ? শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত এলাকা দেশের সবচেয়ে প্রগতিশীল এলাকা, এটা হল গণতান্ত্রিক জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা । এখানে প্রথমতঃ, কোন দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী নেই; দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় কোন দুর্বৃত্ত ও মদ অভিজাতরা নেই ; তৃতীয়তঃ, কোন জুয়াখেলা নেই ; চতুর্থতঃ. কোন বেশ্যা নেই ; পঞ্চমতঃ, কোন উপপত্নী নেই ; ষষ্ঠতঃ, কোন ভিক্ষুক নেই ; সপ্তমতঃ, কোন সংকীর্ণ আত্মসর্বস্ব গোষ্ঠী নেই ; অষ্টমতঃ, কুঁড়েমি ও ঢিলেমির আবহাওয়া নেই ; নবমতঃ, কোনো পেশাদার বিভেদকামী নেই ; এবং দশমতঃ, কোন যুদ্ধবাজ মুনাফাখোর নেই। তাহলে সীমান্ত অঞ্চলকে বিলুপ্ত করা হবে কেন ? কেবলমাত্র একবারে নির্লজ্জ লোকেরাই এরকম লজ্জাকর প্রস্তাব দিতে পারে। এইসব গোঁড়াপন্থীরা কোন্ অধিকারে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে? না, কমরেড ! যেটা প্রয়োজন তা হল সীমান্ত অঞ্চলকে বিলুপ্ত করা নয়, বরং গোটা দেশকে ওই রাস্তায় নিয়ে যাওয়া, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে ভেঙে ফেলা নয়, বরং গোটা দেশকে সেইদিকে নিয়ে যাওয়া, কমিউনিস্ট পার্টিকে উঠিয়ে দেওয়া নয় বরং সমস্ত দেশকে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ

করা, অগ্রণী জনগণকে পেছিয়ে থাকা জনগণের দিকে ঠেলে দেওয়া নয়, বরং পেছিয়ে থাকা স্তরের জনগণকে প্রথম স্তরের জনগণের স্তরে পৌঁছে দেওয়া। আমরা কমিউনিস্টরা ঐক্য গড়ার সবচেয়ে দৃঢ় প্রবক্তা, আমরাই যুক্তফ্রন্ট গড়েছি এবং তাকে বজায় রেখেছি, আমরাই ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্লোগান তুলেছি। আর কারা এইসব আওয়াজ তুলতে পারত ? আর কারা এগুলিকে কাজে পরিণত করতে পারত? আর কারা মাসিক মাত্র পাঁচ ইউয়ান ভাতায় সন্তুষ্ট থাকত?[১১] আর কারা এরকম একটি সুষ্ঠু ও সৎ সরকার গড়তে পারত? ঐক্যের বুলি কপচানি ঢের হয়েছে। আত্মসমর্পণকামীদের ঐক্যের এরকম ধারণা রয়েছে, তারা আমাদের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের আত্মসমর্পণের রাস্তায় নিয়ে যেতে চায় ; কমিউনিস্ট বিরোধী গোঁড়াপন্থীরা তাদের ঐক্যের ধারণা অনুযায়ী আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে ভাঙনের ও অবনতির দিকে নিয়ে যেতে চায়। আমরা কি কখনো তাদের এইসব ধারণাকে গ্রহণ করতে পারি ? যে ঐক্য প্রতিরোধ সংহতি ও প্রগতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, তাকে কি সাচ্চা অথবা যুক্তিযুক্ত অথবা আসল ঐক্য বলা যায়? কি আজগুবি স্বপ্ন ! ঐক্য প্রসঙ্গে আমাদের যা ধারণা সেটা বলার জন্যই আমরা আজ এখানে মিলিত হয়েছি। ঐক্য সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণার সংগে চীনের সমস্ত জনগণের, বিবেকবান প্রতিটি নরনারীর ধ্যানধারণার মিল রয়েছে। প্রতিরোধ, মিলন ও প্রগতির ভিত্তিতে এটা গড়ে উঠেছে । প্রগতির মধ্য দিয়েই আমরা ঐক্যে আসতে পারি ; ঐক্যের মধ্য দিয়েই আমরা জাপানকে রুখতে পারি ;এবং প্রগতি ঐক্য ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই সারাদেশ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। ঐক্য প্রসঙ্গে এই হচ্ছে আমাদের ধ্যানধারণা—যা হচ্ছে খাঁটি, বিচারবুদ্ধি সম্মত ও আসল ঐক্য। মেকী, যুক্তিহীন ও বাহ্যিক ঐক্যের ধ্যানধারণা দেশকে পরাধীনতার পথে নিয়ে যায় ।চুড়ান্তরকম বিবেকহীন লোকেরাই ঐক্য প্রসঙ্গে এইরকম ধারণা পোষণ করে থাকে । এইসব লোকেরা কুওমিনতাঙের নেতৃত্বে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাগুলিকে ধ্বংস করতে এবং সমস্ত জাপ-বিরোধী স্থানীয় শক্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এটা হল একটা চক্রান্ত, ঐক্যের নামে স্বৈরচারী শাসনকে চিরস্থায়ী করার ভেঁড়ার মাথায় লেবেল এঁটে কুকুরের মাংস বিক্রি করার মতো ঐক্যের নামে একদলীয় একনায়কত্ব চালানোর একটা অপচেষ্টা ; যারা সমস্তরকম লজ্জার মাথা খেয়েছে, এটা হল সেইসব মেনীমুখো হামবড়াদের চক্রান্ত। সংক্ষেপে, আমরা তাদের এইসব কাগুজে বাঘদের বেলুন চুপসে দেবার জন্যই এখানে মিলিত হয়েছি। আসুন, আমরা অক্লান্তভাবে এইসব কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের প্রতিহত করি।

টীকা

১। পিংকিয়াং হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এই খণ্ডে প্রকাশিত 'প্রতিক্রিয়াশীলদের শাস্তি দিতে হবে' শীর্ষক প্রবন্ধের ১নং টীকা দ্রষ্টব্য ।

২। ১৯৩৯-এর ১১ই নভেম্বর তারিখে চুয়েশান হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়, কুওমিনতাঙের ১৮০০ সাদা পোশাকের গোয়েন্দা পুলিস ও সৈন্য হোনান প্রদেশের চুয়েশান পরগণার চুকৌ শহরে অবস্থিত নয়া চতুর্থ বাহিনীর যোগাযোগ দপ্তরের ওপর হামলা করে। ২০০ লোক খুন হয়, জাপ-বিরোধী যুদ্ধে আহত নয়া চতুর্থ বাহিনীর অফিসার এবং সৈন্যরা ও তাদের পরিবারবর্গও খুন হয় ।

৩। পুরানো সৈন্যবাহিনী বলতে বোঝাচ্ছে শানসীর যুদ্ধবাজ ভূস্বামী ইয়েন শি-শানের বাহিনী ; নতুন বাহিনী হচ্ছে জাপ-বিরোধী জীবন-পণ করে যুদ্ধ করা সৈনিকরা জাপ-বিরোধী গণফৌজ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে-বাহিনী গড়ে উঠেছে। ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে চিয়াং ও ইয়েন শি-শান ছয় কোর সৈন্য পশ্চিম শানসীতে আক্রমণ পরিচালনার জন্য জমায়েত করে, কিন্তু পরাজিত হয়। সেইসময়ে ইয়েনের বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব শানসীর ইয়াংচেং-ছিনচেঙে অবস্থিত জাপ বিরোধী সরকারী সংস্থাসমূহ ও গণ-সংগঠনগুলোর ওপর আক্রমণ চালায় এবং বহু কমিউনিস্ট ও প্রগতিপন্থীকে খুন করে।

৪। হোপেইতে কুওমিনতাঙী গুণ্ডাদের শান্তিরক্ষা বাহিনীর অধিনায়ক চ্যাঙ ইন-যু ১৯৩৯-এর জুন মাসে হঠাৎ অষ্টম রুট বাহিনীর হোপেইর শেনসিয়েনে অবস্থিত দপ্তরের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ৪০০-র বেশি কর্মী ও সৈন্যকে খুন করে।

৫। ১৯৩৯-এর এপ্রিলে কুওমিনতাঙী গভর্নর শেন হুং-লিয়ের নির্দেশে চিন-চি-জুঙের গুণ্ডাবাহিনী পেশোনে অবস্থিত অষ্টম রুট বাহিনীর শানতুং কলামের তৃতীয় গেরিলা বাহিনীর ওপর হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে অফিসারসহ প্রায় ৪০০ জনকে খুন করে।

৬। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে পূর্ব হুপেইর কুওমিনতাঙের সামরিক অফিসার চেঙ জু-হুয়াই'র নেতৃত্বে নয়া চতুর্থ বাহিনীর যোগাযোগ দপ্তরের ওপর আক্রমণ পরিচালিত হয় এবং ৫/৬শ কমিউনিস্ট নিধন হয়।

৭। ১৯৩৯-এর শীতকাল থেকে ১৯৪০-এর বসন্তকাল পর্যন্ত কুওমিনতাঙী বাহিনী শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের পরগণা শহর চুনহুয়া, সুনাই, চেংনিং, নিঙচিয়েন ও চেনয়ুয়ান দখল করে রাখে।

৮। জার্মান ও ইতালীর ফ্যাসিস্টদের অনুকরণে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াপন্থীরা উত্তর-পশ্চিমের লানচৌ ও সিয়ান থেকে দক্ষিণ-পূর্বে কানচৌ ও শ্যাংজাও পর্যন্ত অঞ্চলে বহুস্থানে বন্দীশিবির স্থাপন করে। বহুসংখ্যক কমিউনিস্ট, দেশব্রতী জনগণ ও প্রগতিশীল যুবকবৃন্দ এইসব বন্দীশিবিরে আবদ্ধ থাকতেন।

৯। ১৯৩৮ এর অক্টোবরে উহানের পতনের পর কুওমিনতাঙ তার কমিউনিস্ট বিরোধিতা আরও তীব্রতর করে । ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারিতে চিয়াং গোপনভাবে 'কমিউনিস্ট সমস্যাবলী মোকাবিলা করার ব্যবস্থাসমূহ' ও 'জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে কমিউনিস্ট কার্যাবলী থেকে রক্ষার ব্যবস্থাবলী' নামক দুটি নির্দেশনামা প্রেরণ করে এবং কুওমিনতাঙ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে দলন তীব্রতার করে ও তার সামরিক বাহিনী মধ্য ও উত্তর চীনে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আক্রমণ করতে থাকে । এই তীব্র আক্রমণ তীব্রতম হয়ে ওঠে ১৯৩৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪০-এর মার্চের মধ্যবর্তী সময়ে।

১০। অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী পরবর্তীকালে আরও বেশি সংখ্যায় জাপ-বাহিনীর মোকাবিলা করে। ১৯৪৩-এর মধ্যে মোট জাপ-হানাদার বাহিনীর শতকরা ৬৪ ভাগ ও পুতুল বাহিনীর শতকরা ৯৫ ভাগকে মোকাবিলা করতে থাকে।

১১। কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন জাপ-বিরোধী সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী ও জাপ-বিরোধী সরকারের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মাসিক ব্যয় বাবদ দেওয়া হতো মাত্র ৫ ইউয়ান করে মুদ্রা ।

কুওমিনতাঙের কাছে দশ দফা দাবি

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯

ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিরুদ্ধে ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে ইয়েনানে অনুষ্ঠিত এই জনসভা যথার্থ ক্ষোভের সংগে সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াং চিং-ওয়েই'র বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসমর্পণকে নিন্দা করার এবং শেষ পর্যন্ত জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। বর্তমান সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে তোলার জন্য এবং দেশকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে দশটি প্রধান বিষয় তুলে ধরছি, এবং আশা করছি যে, জাতীয় সরকার, সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপ, প্রতিরোধ যুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত অফিসার ও যোদ্ধা, এবং আমাদের সমস্ত স্বদেশবাসী এগুলিকে গ্রহণ ও কার্যকরী করবেন।

১। **সমগ্র জাতি ওয়াং চিং-ওয়েইদের নিন্দা করুক।** এখন বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চিং-ওয়েই যখন তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে জোট বেঁধেছে, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, শত্রুর সংগে গাঁটছড়া বেঁধেছে এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক চুক্তি সম্পাদন করেছে, বাঘের পেছনে ফেউয়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তখন সমগ্র দেশবাসীই তার মৃত্যু দাবি করছে। কিন্তু এভাবে শুধু প্রকাশ্য ওয়াং চিং-ওয়েইদেরকেই শায়েস্তা করা যাবে, গোপন ওয়াংরা এতে রেহাই পেয়ে যাবে। এই শেষোক্তরা ধূর্ততার সংগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দখল করে গা ঢাকা দিয়ে আছে, লুকিয়ে চুরিয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছে। বস্তুতঃ দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা ওয়াং চিং-ওয়েইরই দলের লোক, আর সমস্ত বিভেদকামীরা হচ্ছে তার ভাড়াটে লোক। সারা দেশ জুড়ে, শহরে ও গ্রামে এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল, সরকারী সংস্থা, সৈন্যবাহিনী, বেসামরিক সংস্থা, সংবাদপত্র ও শিক্ষায়তনসহ যেখানেই সবাই সমবেত হয়, তার ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ওয়াং চিং ওয়েইদের নিন্দা করার অভিযান যদি না চালানো হয়, তবে ওয়াং চিং-ওয়েই চক্রকে দূর করা যাবে না, বরং তারা

ওয়াং-চিং-ওয়েইকে নিন্দা করার জন্য ইয়েনানে অনুষ্ঠিত জনসভার পক্ষে কমরেড মাও সে-তুঙ এই খোলা তারবার্তাটি রচনা করেন।

তাদের জঘন্য কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারবে এবং বাইরে থেকে শত্রুকে দরজা খুলে দিয়ে ও ভেতর থেকে অন্তর্ঘাতিমূলক কাজ চালিয়ে প্রভূত ক্ষতিহসাধন করবে। সরকারের উচিত হচ্ছে ওয়াং চিং-ওয়েইদের ধিক্কার দেওয়ার জন্য সমস্ত জনগণকে আহ্বান জানিয়ে নির্দেশ জারী করা। যেখানেই এই নির্দেশ পালিত না হবে, সেখানেই কর্মচারীদের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হবে। ওয়াং চিং-ওয়েই'র দলবলকে অবশ্যই শায়েস্তা করতে হবে। এটা হচ্ছে প্রথম দফা ; একে মেনে নেওয়ার জন্য ও তদনুযায়ী কাজ করার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি।

২। **ঐক্যকে জোরদার কর**। আজকাল কিছু লোক ঐক্যের কথা না বলে একীকরণের কথা বলতে শুরু করেছে। এর অর্থ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করা, অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে বরবাদ করা, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে বিলুপ্ত করা। এবং প্রতিটি জায়গায় জাপ-বিরোধী শক্তিকে বিনষ্ট করা। এই ধরনের বক্তব্য কিন্তু একটা বিষয়কে চেপে যাচ্ছে এবং তা হচ্ছে এই যে, কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট ও নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলটিই আজ গোটা চীন জুড়ে সাচ্চা একীকরণের সবচেয়ে দৃঢ় প্রবক্তা। এরাই কি সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রস্তাব করেনি? এরাই কি তারা নয়, যারা জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে, ঐক্যবদ্ধ চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাব রেখেছে এবং এই দুয়ের জন্য প্রকৃতই কঠোর পরিশ্রম করেছে ? জাতিকে রক্ষার, শত্রুসৈন্যের সতেরটি ডিভিসনকে প্রতিরোধের, কেন্দ্রীয় সমতলভূমি ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অবরোধের উত্তর চীন ও ইয়াংসীর নিম্নাঞ্চলের দক্ষিণ দিকের এলাকাগুলির প্রতিরক্ষায় এবং তিন-গণনীতি, সশস্ত্র প্রতিরোধ ও জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী দৃঢ়তার সংগে রূপায়ণের পুরোভাগে যারা রয়েছে, তারা কি এরাই নয় ? তথাপি যে মুহূর্তে ওয়াং চিং-ওয়েই খোলাখুলি কমিউনিস্টদের বিরোধিতায় নামল এবং জাপানীদের সংগে ভিড়ে পড়ল, অমনি চ্যাং চুন-মাই ও ইয়ে চিঙের মতো ধড়িবাজরা তালে তাল মিলিয়ে অভিসন্ধিমূলক প্রবন্ধ লিখতে লাগল এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী ও গোঁড়া কুচক্রীদের দলবল 'সংঘর্ষ' বাধিয়ে তাদের সংগে যোগ দিল। ইতিমধ্যে একীকরণের নামে স্বৈরাচারী শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐক্যের নীতিকে বাতিল করা হয়েছে, বিভেদের তীক্ষ্ণ ফলা ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সৃজুমা চাও কৌশলটি রাস্তার প্রতিটি লোকেরই জানা।[১] কমিউনিস্ট পার্টি অষ্টম রুট ও নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং সীমান্ত অঞ্চল দৃঢ়ভাবে রয়েছে মেকী একীকরণের বিপক্ষে ও সাচ্চা একীকরণের সপক্ষে, যুক্তিসম্মত একীকরণের

সপক্ষে ও অযৌক্তিক একীকরণের বিপক্ষে, সারবস্তুসম্পন্ন একীকরণের পক্ষে এবং ভঙ্গিসর্বস্ব একীকরণের বিপক্ষে। তারা একীকরণের কথা বলে প্রতিরোধের জন্য—আত্মসমর্পণের জন্য নয়, ঐক্যের জন্য— বিভেদের জন্য নয়, এগিয়ে যাবার জন্য—পেছিয়ে যাওয়ার জন্য নয় । প্রতিরোধ, ঐক্য ও প্রগতি— এই তিনটির ওপর ভিত্তি করেই কেবল সাচ্চা, যুক্তিসম্মত ও প্রকৃত একীকরণ হতে পারে। অন্য কোন ভিত্তির ওপর একীকরণ করতে গেলে, তারজন্য যে ছলচাতুরীই করা হোক না কেন, সেটা হবে উত্তরে 'গাড়ি চালিয়ে দক্ষিণে যাওয়ার' মতো। এরকম ব্যাপারে আমরা সায় দিতে রাজী নই। সমস্ত স্থানীয় জাপ-বিরোধী শক্তিকে একই নজরে দেখতে হবে, কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো বা কারোর প্রতি বিরূপ হওয়া চলবে না। তাদের সকলকেই বিশ্বাস করতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে, সমর্থন করতে হবে এবং পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে। জনগণের সংগে আচার-আচরণে ভণ্ডামি নয়—চাই আন্তরিকতা সংকীর্ণতা নয়—চাই মনের ঔদার্য। সত্যিই যদি এইভাবে কাজ করা যায় তাহলে অসদুদ্দেশ্যপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া সকলেই ঐক্যবদ্ধ হবে এবং জাতীয় একীকরণের পথে চলবে। একীকরণের ভিত্তি হবে ঐক্য এবং ঐক্যের নিজের ভিত্তি হবে প্রগতি, একমাত্র প্রগতিই ঐক্য আনতে পারে আর কেবলমাত্র ঐক্যই আনতে পারে একীকরণ। এটা হচ্ছে একটা অপরিবর্তনীয় সত্য। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দফা যেটা গ্রহণ করার ও কাজে পরিণত করার জন্য আমরা আপনাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

৩। **সাংবিধানিক সরকারকে কার্যকরী কর**। দীর্ঘদিন ধরে 'রাজ-নৈতিক মাতব্বরী' কোন কিছুই দেয়নি। 'কোন জিনিসকে খুব বেশি করে ধাক্কা দিলে সে তার বিপরীত দিকে ঘুরে যায়', আর তাই সাংবিধানিক সরকার আজকের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোন বাক্-স্বাধীনতা নেই, রাজনৈতিক দলগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়নি এবং প্রত্যেক জায়গাতেই সাংবিধানিক ব্যবস্থাদি লংঘিত হচ্ছে। এই পথেই যদি সংবিধান রচনা করা হয় তাহলে তা হবে নেহাতই একটা কাগুজে ব্যাপার । একদলীয় একনায়কত্বের চেয়ে এই ধরনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা আলাদা কিছু হবে না। এখন যেহেতু গুরুতর এক জাতীয় সংকট চলছে, জাপানীরা ও ওয়াং চিং-ওয়েইরা বাইরে থেকে আমাদের বিব্রত করছে এবং বিশ্বাসঘাতকরা ভেতর থেকে আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরাচ্ছে, সেহেতু যদি নীতির পরিবর্তন না ঘটে তাহলে জাতি ও জনগণ হিসেবে আমাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়বে। সরকার যে আন্তরিকভাবে সাংবিধানিক ব্যবস্থাদি কার্যকরী করতে চায়, সেটা প্রমাণের জন্য তাকে

রাজনৈতিক দলগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। জনগণের ও জাতির ভাগ্য নতুনভাবে নির্ধারণের জন্য এর চেয়ে জরুরী কাজ আর কিছু নেই। এটা হচ্ছে তৃতীয় দফা, যা গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য আমরা আপনাদের কাছে আহ্বান রাখছি।

৪। **'সংঘর্ষ' বন্ধ কর।** গত বছর মার্চ মাসে 'বিদেশী দলগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা' চালু হওয়ার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে 'নিয়ন্ত্রণ করা', 'দূষিত করে ফেলা' ও 'প্রতিহত করার' গর্জন সারা দেশ জুড়ে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে, একটার পর একটা বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে, যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে। এসবও যেন যথেষ্ট নয়, তাই গত বছর অক্টোবরে 'বিদেশী পার্টির সমস্যা মোকাবিলার ব্যবস্থা' নামে অতিরিক্ত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এরও পরে উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য চীনে রয়েছে 'বিদেশী পার্টির সমস্যা মোকাবিলার নির্দেশ'। জনগণ ন্যায্যভাবেই বলছেন, কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে 'রাজনৈতিক বিধিনিষেধ'-এর পর 'সামরিক বিধিনিষেধ' চালু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার অর্থ হল কমিউনিজমের বিরোধিতা করা । চীনকে পদানত করার জন্য জাপানীরা এবং ওয়াং চিং-ওয়েই কমিউনিজম বিরোধিতার ধূর্ত ও ক্ষতিকারক পরিকল্পনা নিয়েছে। এই কারণেই জনগণ সন্দিগ্ধ ও বেদনাহত এবং এ সম্বন্ধে পরস্পর আলোচনা করছে, তাদের আশংকা হচ্ছে, এক যুগ আগের মর্মান্তিক বিয়োগান্তক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। হুনানে পিংকিয়াং বিপর্যয় ঘটেছে, হোনানে ঘটেছে চুয়েশান বিপর্যয়, হোপেইতে অষ্টম রুট বাহিনীর ওপর চ্যাং য়িন-উ আক্রমণ চালিয়েছে, শানতুঙে গেরিলাদের ওপর চিন চি-জুং হামলা করেছে, পূর্ব হুপেতে চেং জু-হুয়াই পাঁচ ছয়শ কমিউনিস্টকে নির্মমভাবে খুন করেছে, পূর্ব কানসুতে অষ্টম রুট বাহিনীর শিবিরস্থিত সৈন্যের ওপর ব্যাপক আকারে হামলা করা হয়েছে, এবং আরও সম্প্রতি শানসিতে বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে, সেখানে পুরানো বাহিনী নতুন বাহিনীকে আক্রমণ করেছে এবং যেসব জায়গা অষ্টম রুট বাহিনীর দখলে ছিল সেগুলিকে আক্রমণ করেছে। এই ধরনের ঘটনা যদি এই মুহূর্তে নিষিদ্ধ করা না হয়, তাহলে দু পক্ষই ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং তাহলে জাপানকে পরাজিত করার কোন আশাই কি আর থাকবে? প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রয়োজনে ঐক্যের স্বার্থে সরকারকে এই বিপর্যয়গুলির জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তির আদেশ দিতে হবে এবং গোটা জাতির কাছে এ কথা ঘোষণা করতে হবে যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর ঘটতে দেওয়া হবে না। এটি হল চতুর্থ দফা ; এটি গ্রহণ করার জন্য ও রূপায়িত করার জন্য আপনাদের কাছে আমার আহ্বান জানাচ্ছি।

৫। **যুবকদের রক্ষা কর।** সিয়ান-এর কাঠে ইতিমধ্যেই বন্দীশিবির খোলা হয়েছে, এবং জনগণ এ কথা শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন যে, সেখানে উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য চীন থেকে সাতশরও বেশি প্রগতিশীল যুবককে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে, তাদের ওপর মানসিক ও দৈহিক নিপীড়ন চালানো হচ্ছে ও কয়েদীর মতো আচরণ করা হচ্ছে। কোন্ অপরাধে তারা এ ধরনের নির্মমতার শিকার হচ্ছে? যুবকরা হচ্ছে জাতির প্রাণ এবং বিশেষ করে প্রগতিশীল যুবকরা প্রতিরোধ-যুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। প্রত্যেকের বিশ্বাসের স্বাধীনতা থাকা উচিত, অস্ত্রের ঝনঝনানি দিয়ে আদর্শকে কখনো দাবিয়ে দেওয়া যায় না। দশ বছর ধরে যে 'সাংস্কৃতিক অবদমন' চালানো হয়েছে, সেটা প্রত্যেকেই জানে ; কেউ আবার কেন তা ঘটাতে চাইবে ? যুবকদের রক্ষার উদ্দেশ্যে সিয়ান-এর নিকটবর্তী বন্দীশিবির উচ্ছেদের জন্য ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যুবকদের ওপর বীভৎস হামলা নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের উচিত সারাদেশ জুড়ে আদেশ জারী করা। এটি হল পঞ্চম দফা ;এটি গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য আপনাদের কাছে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

৬। **ফ্রন্টকে সমর্থন কর।** যুদ্ধের সম্মুখসারিতে যেসব সৈন্য লড়াই করছে এবং যাদের কাজের রেকর্ড চমৎকার, যেমন অষ্টম রুট বাহিনী ও নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং অন্যান্য কয়েকটি ইউনিটের—তারা অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার পাচ্ছে ;তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ যৎসামান্য খাওয়া-দাওয়া জঘন্য, তারা দরকার মতো গুলিবারুদ ওষুধপত্র পর্যন্ত পাচ্ছে না। অথচ, তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য বিবেকহীন বিশ্বাসঘাতকদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কান ঝালাপালা-করে-দেওয়া অসংখ্য কুৎসা ছড়ানো হচ্ছে। কৃতিত্বের কোন পুরস্কার নেই, কৃতিত্বপূর্ণ কাজকর্মের কোন উল্লেখ নেই, থাকছে শুধু মিথ্যা অভিযোগ ও বিদ্বেষপূর্ণ ষড়যন্ত্রের নির্লজ্জ স্পর্ধা । এইসব উদ্ভট অবস্থার ফলে অফিসার ও কর্মীদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে আর শত্রুরা হাততালি দিচ্ছে, কোনরকমেই কিছুতেই এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। সৈন্যদের মনোবল জাগানোর জন্য এবং যুদ্ধের সাহায্যের জন্য সরকারকে সম্মুখভাগের সৈন্যদের ও যাদের কাজের রেকর্ড ভাল তাদের যথাযথ দায়িত্ব উপযুক্তভাবে বহন করতে হবে, এবং সেই সংগে তাদের বিরুদ্ধে যেসব বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কুৎসা ও অভিযোগ করা হচ্ছে তা নিষিদ্ধ করতে হবে। এটি হল ষষ্ঠ দফা ;এটি গ্রহণ করার জন্য ও তদনুযায়ী কাজ করার জন্য আমরা আপনাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

৭। **গোয়েন্দা বিভাগকে নিষিদ্ধ কর।** গোয়েন্দা বিভাগের যে বেআইনী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য জনগণ একে তাং রাজবংশের চৌ সিং ও লাই

ছুন-চেন[২] এবং মিং রাজবংশের ওয়েই চুং-সিয়েন ও লিউ চিন-এর[৩] সংগে তুলনা করছে। শত্রুকে বাদ দিয়ে তারা দেশের লোকের ওপর চড়াও হচ্ছে, অসংখ্য মানুষকে খুন করছে, ক্রমাগত ঘুষ নিয়েও তাদের আকাঙক্ষা মিটছে না; প্রকৃতপক্ষে গোয়েন্দা বিভাগটি গুজবপ্রিয় লোকজনদের সদর দপ্তর আর দেশদ্রোহিতা ও বদমায়েসির কারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব জায়গাতেই সাধারণ মানুষ এই উন্মত্ত ঘাতকদের দেখলে ভয়ে আঁতকে ওঠে ও পালিয়ে যায়। নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য সরকারকে এই মুহূর্তে গোয়েন্দা বিভাগের এইসব কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করতে হবে, একে যাতে সম্পূর্ণরূপে শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যায় তার জন্য এর কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে দিয়ে একে পুনর্গঠিত করতে হবে, এবং তার ফলে জনগণের আস্থা আসবে, এবং রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে শক্তিশালী। এটি হল সপ্তম দফা, যা গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য আমরা আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি।

৮। **দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের বরখাস্ত কর।** প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে জাতীয় সংকটের সুযোগে অফিসারদের দ্বারা দশ কোটি ইউয়ান তছরুপ করা ও আট অথবা নয়টি করে উপপত্নী রাখার ঘটনা ঘটেছে। বাধ্যতামুলকভাবে সৈন্যবাহিনীতে নাম তালিকাভুক্ত করার ব্যাপারে সরকারী কাজ, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, দুর্ভিক্ষত্রাণ ও যুদ্ধত্রান ব্যাপারে—সব কিছুতেই দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসাররা টাকা কামানোর সুযোগ করে নিয়েছে। যেখানে এইরকম একদঙ্গল নেকড়ে হিংস্রভাবে ছোটাছুটি করে, সেখানে, যে দেশে গণ্ডগোল দেখা দেবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। জনসাধারণ অসন্তোষ ও ক্রোধে ফুঁসছেন, কিন্তু এইসব অফিসারদের নিষ্ঠুরতা উদঘাটন করতে কেউ সাহসী হচ্ছেন না। দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের দূর করে দেওয়ার জন্য এই মুহূর্তে কঠোর ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। এটি হল অষ্টম দফা ; এটি গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য আমরা আপনাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

৯। **ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ইচ্ছাপত্রকে কাজে প্রয়োগ কর।** ইচ্ছাপত্রে বলা হয়েছে ঃ

> চল্লিশ বছর ধরে আমি চীনের স্বাধীনতা ও সাম্যের উদ্দেশ্যে নিজেকে জাতীয় বিপ্লবের কাজে উৎসর্গ করেছি এই চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি দৃঢ়ভাবে এ কথা বুঝেছি যে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে জনগণকে জাগিয়ে তুলতেই হবে।......

এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য এবং আমরা চীনের ৪৫ কোটি

জনগণ এর সংগে পরিচিত। কিন্তু এই ইচ্ছাপত্রটি যত না কার্যকরী হচ্ছে, উচ্চারিত হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি। যারা এর পবিত্রতা নষ্ট করছে তারা পুরস্কৃত হচ্ছে, আর যাঁরা একে মর্যাদা দিচ্ছেন তাঁরা শাস্তি পাচ্ছেন। এর চেয়ে জঘন্য ব্যাপার আর কি হতে পারে ? সরকারকে নির্দেশ জারী করতে হবে, যারা ইচ্ছাপত্রটিকে অমান্য করবে এবং জনগণকে জাগিয়ে তোলার পরিবর্তে তাদের পদদলিত করবে, তাদের শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তারা ডঃ সান ইয়াৎ সেনের স্মৃতিকে কলঙ্কিত করছে। এটি হচ্ছে নবম দফা ঃ এটি গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি।

১০। তিন-গণনীতিকে কাজে রূপায়িত কর। তিন-গণনীতি হল কুওমিনতাঙের মঞ্চ। অথচ অনেক ব্যক্তিই কমিউনিজমের বিরোধিতাকে তাদের প্রথম কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, যৌথ প্রচেষ্টাকে বর্জন করেছে এবং যখনই জনগণ জাপানকে প্রতিরোধের জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছেন তখনই তাদের সমস্ত রকম সম্ভাব্য উপায়ে দমন করা হচ্ছে এবং পিছন দিকে টেনে রাখা হচ্ছে, যেটা জাতীয়তাবাদের নীতিকে বর্জনেরই নামান্তর। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা এদের কাছে অবহেলিত ; এটা জনগণের জীবিকার নীতিকে বর্জনেরই সমান । এ ধরনের লোকেরা তিন-গণনীতিকে শুধু মুখেই মানে, এবং যাঁরা এটিকে কাজে প্রয়োগের জন্য আন্তরিকতার সংগে চেষ্টা করেন এরা হয় তাঁদের বাস্তবাগীশ বলে ঠাট্টা করে, আর নয় তো তাঁদের কঠোর শাস্তি দেয়। এইভাবে সবরকম উদ্ভট গালিগালাজ দেওয়া হচ্ছে এবং সরকারের মানমর্যাদা ধুলোয় মিশে যাবার উপক্রম হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে জনগণের তিন-গণনীতি দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করার জন্য এক্ষুণি দ্বিধাহীন নির্দেশ জারী করতে হবে। যারা এই আদেশ লংঘন করবে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে, আর যাঁরা আদেশ মানবেন তাঁদের উৎসাহিত করতে হবে। একমাত্র এই পথেই তিন-গণনীতি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হতে পারে এবং যুদ্ধে জয়লাভের ভিত্তি তৈরী হতে পারে। এটি হচ্ছে দশম দফা, যা আমরা আপনাদের গ্রহণ করতে আবেদন করছি।

জাতিকে বাঁচানো এবং যুদ্ধে জয়লাভের জন্য এই দশটি প্রস্তাব হল একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এখন শত্রু যখন চীনের বিরুদ্ধে তার আক্রমণ তীব্র করে তুলছে আর ওয়াং চিং-ওয়েই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তখন আমরা যে বিষয়গুলিকে গুরুতর বলে মনে করছি, সে-বিষয়ে চুপচাপ থাকতে পারি না। এই প্রস্তাব-গুলিকে আপনারা গ্রহণ ও কার্যকরী করুন, এবং তা করলেই প্রতিরোধ-যুদ্ধ ও জাতীয় মুক্তির কাজে নিশ্চয়তা আসবে। অত্যন্ত জরুরী ভেবেই আমাদের মতামত রাখলাম এবং আপনাদের সুচিন্তিত অভিমতের অপেক্ষায় রইলাম।

টীকা

১। স্‌জুমা চাও ছিল ওয়েই রাজ্যের একজন প্রধানমন্ত্রী (২২০-২৬৫ খ্রীঃ)। সে গোপনে সিংহাসনে বসবার আকাঙক্ষা পোষণ করত। সম্রাট একবার মন্তব্য করেঃ 'রাস্তায় প্রতিটি লোকই স্‌জুমা চাওর আকাঙক্ষার কথা জানে।'

২। চৌ সিং ও লাই ছুন-চেন ছিল তাং আমলের কুখ্যাত দুই নিষ্ঠুর গোয়েন্দা অধিকর্তা। সর্বত্র এরা গোয়েন্দাদের একটা জাল বিস্তৃত করেছিল। তারা কোন লোককে পছন্দ না হলেই গ্রেপ্তার করে নানাভাবে অকথ্য অত্যাচার করত।

৩। লিউ চিন ও ওয়েই চুং-শিয়েন ছিল মিং আমলের দুই খোজা। প্রথমজন সম্রাট উ সুঙের (ষোড়শ শতাব্দী) এবং দ্বিতীয়জন সম্রাট শি সুঙের (সপ্তদশ শতাব্দীর) বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। তারা বিরোধী লোকজনকে অত্যচার ও খুন করার জন্য বিরাট এক গোয়েন্দা বাহিনীকে কাজে লাগাত।

'চীনের শ্রমিক' পত্রিকার পরিচয় প্রসঙ্গে

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

চীনের শ্রমিক[১] পত্রিকার প্রকাশ একটা প্রয়োজন মেটাল। নিজের রাজনৈতিক পার্টি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, কর্তৃক পরিচালিত হয়ে চীনের শ্রমিকশ্রেণী গত কুড়ি বছর ধরে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করে এসেছেন, জনগণের মধ্যেকার রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সজাগ অংশে পরিণত হয়েছেন এবং হয়ে উঠেছেন চীন বিপ্লবের নেতা। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে কৃষকজনসাধারণ এবং সকল বিপ্লবী জনগণকে সমবেত করে তা সংগ্রাম করছে নয়া-গণতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠার জন্য ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করার জন্য, এবং তার অবদান এক্ষেত্রে অসামান্য। কিন্তু চীনের বিপ্লব আজ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়নি এবং খোদ শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই বিরাট প্রয়াসের প্রয়োজন রয়ে গেছে, প্রয়োজন রয়ে গেছে কৃষকজনগণ, পেটি-বুর্জোয়াদের অন্যান্য অংশ, বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ও সমগ্র বিপ্লবী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার। এটা একটা সুবিপুল রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব। এ কাজ সুসম্পাদনের দায়িত্ব এসে পড়েছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রগতিশীল কর্মীবৃন্দ এবং সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর ওপর। শ্রমিকশ্রেণী এবং সামগ্রিকভাবে জনগণের চূড়ান্ত মুক্তি সাধিত হবে একমাত্র সমাজতন্ত্রের আঁওতায়, যে, চূড়ান্ত লক্ষ্যসাধনের জন্য চীনের শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের স্তরে আমাদের প্রবেশ করার আগে আমাদের যেতে হবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের মধ্য দিয়ে। সুতরাং চীনের শ্রমিকশ্রেণীর আশু কর্তব্য হল নিজ শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যকে জোরদার করে তোলা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা করার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং নতুন এক চীনের জন্য, নয়া-গণতন্ত্রের চীনের জন্য সংগ্রাম করা। ঠিক এই দায়িত্বটি সামনে রেখেই **চীনের শ্রমিক** প্রকাশিত হচ্ছে।

সহজ কথায় বলতে গেলে **চীনের শ্রমিক** শ্রমিকদের কাছে বহুবিধ সমস্যার ব্যাপারে কেমন করে ও কেন-র প্রশ্নের ব্যাখ্যা করবে, প্রতিরোধ-যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের বাস্তব অবস্থার কথা জানাবে এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করে এভাবে তার কর্তব্য সম্পাদনের প্রচেষ্টা করবে।

চীনের শ্রমিককে হয়ে উঠতে হবে শ্রমিকদের শিক্ষিত করার একটি বিদ্যালয় এবং তাদের মধ্যেকার কর্মীদের সুশিক্ষিত করে তোলার একটি বিদ্যালয়, আর পত্রিকার

পাঠকেরাই হবেন তার ছাত্রবৃন্দ। শ্রমিকদের মধ্য থেকে বহু কর্মীবাহিনীকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে, এমন সব কর্মী যাঁরা ওয়াকিবহাল এবং সুদক্ষ, যাঁরা শূন্যগর্ভ খ্যাতির প্রত্যাশী নন এবং সততার সংগে কাজ করতে প্রস্তুত। এ ধরনের বিপুলসংখ্যক কর্মী ব্যতীত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে মুক্তি অর্জন করা অসম্ভব।

শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যকে স্বাগত জানাবে এবং কখনোই তা প্রত্যাখ্যান করবে না। কারণ তাদের সাহায্য ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী নিজে সামনে এগিয়ে যেতে পারে না বা বিপ্লবকে সফল করে তুলতে পারে না।

আমি আশা করি, পত্রিকাটি সুসম্পাদিত হবে এবং তাতে প্রচুর পরিমাণ প্রাণবন্ত লেখা প্রকাশিত হবে, কাঠখোট্টা ও নীরস যে প্রবন্ধাদি একঘেঁয়ে, নির্জীব ও অবোধ্য, সেগুলো তা সযত্নে পরিহার করবে।

প্রকাশিত হবার পর সাময়িকপত্রটিকে বিচার-বিবেচনা করে ভালভাবে চালাতে হবে। এটা একাধারে পাঠক ও পরিচালকবৃন্দ উভয়েরই দায়িত্ব। পাঠকদের পক্ষে নিজেদের পরামর্শ পাঠানো, সংক্ষিপ্ত চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ লিখে তাঁরা কী পছন্দ বা অপছন্দ করেন তা জানিয়ে দেওয়া খুবই দরকারী, কারণ একমাত্র এভাবেই সাময়িকপত্রটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

এই কটি কথা দিয়েই আমার প্রত্যাশা ব্যক্ত করলাম। তা-ই **চীনের শ্রমিক**-এর পরিচিতি জ্ঞাপক বক্তব্য হোক।

টীকা

১। **চীনের শ্রমিক** (দি চাইনীজ ওয়ার্কার) ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইয়েনানে প্রতিষ্ঠিত একটি মাসিক পত্রিকা। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ট্রেড ইউনিয়ন কমিশনের উদ্যোগে তা প্রকাশিত হয়।

আমাদের জোর দিতে হবে ঐক্য ও প্রগতির ওপর

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

প্রতিরোধ, ঐক্য ও প্রগতি—এই তিনটি মূল নীতি প্রতিরোধ যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে বিগত ৭ই জুলাই কমিউনিস্ট পার্টি উপস্থিত করেছিল। এই তিনটি একত্রে মিলে একটি সামগ্রিক সত্তা, তার মধ্যেকার যে-কোন একটিকে বরাদ্দ করে দেওয়া চলে না। যদি ঐক্য এবং প্রগতিকে বাদ দিয়ে প্রতিরোধের ওপরই একমাত্র জোর দেওয়া হয় তাহলে ঐ 'প্রতিরোধ' নির্ভরযোগ্য হবে না বা দীর্ঘস্থায়ীও হবে না। ঐক্য এবং প্রগতির একটি কর্মসূচী ব্যতীত প্রতিরোধ আগে বা পরে আত্মসমর্পণে পর্যবসিত হবে অথবা পরাজয়ে পরিসমাপ্ত হবে। আমরা কমিউনিস্টরা মনে করি, এই তিনটিকে সুসংহত করা চাই। প্রতিরোধ-যুদ্ধের স্বার্থে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রয়োজন, প্রয়োজন ওয়াং চিং-ওয়েইর জাপানের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতামূলক চুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, প্রয়োজন তার ক্রীড়নক সরকারের বিরুদ্ধে এবং জাপান-বিরোধী মহলগুলোতে লুকিয়ে থাকা বিশ্বাসঘাতক ও আত্মসমর্পণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ঐক্যের স্বার্থে প্রয়োজন হচ্ছে বিভেদমূলক কার্যকলাপ ও আভ্যন্তরীণ 'সংঘর্ষের' বিরোধিতা করা, অষ্টম রুট ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাতের বিরোধিতা করা এবং অপরাপর প্রগতিশীল জাপ-বিরোধী গোষ্ঠীসমূহের পেছন থেকে ছুরিকাঘাতের বিরোধিতা করা, শত্রুর পশ্চাদ্‌বর্তী জাপ-বিরোধী এলাকাসমূহে এবং যে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল অষ্টম রুট বাহিনীর পশ্চাদ্‌বর্তী অঞ্চল সেখানে বিভেদমূলক কার্যকলাপের বিরোধিতা করা, এবং কমিউনিস্ট পার্টির বৈধ অস্তিত্বের অস্বীকৃতির ও 'বিদেশী পার্টিসমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য দলিল-দস্তাবেজের ছড়াছড়ির বিরোধিতা করা প্রয়োজন। প্রগতির স্বার্থে প্রয়োজন হচ্ছে পশ্চাদ্‌গমনের ও জনগণের তিনটি মূল নীতিকে শিকেয় তুলে রাখার এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের ও জাতীয় পুনর্গঠনের কার্যসূচীকে শিকেয় তুলে রাখার বিরোধিতা করা, ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রে 'জনগণকে জাগিয়ে তোলার'

কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ইয়েনানের নিউ চায়না নিউজ-এর প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে।

যে নির্দেশ রয়েছে তা কার্যকরী করার অস্বীকৃতির বিরোধিতা করা। প্রগতিশীল তরুণদের বন্দী শিবিরগুলিতে কয়েদ করে রাখার বিরোধিতা করা, প্রতিরোধ-যুদ্ধের প্রথম দিনগুলিতে বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের যে সামান্য স্বাধীনতাটুকু বজায় ছিল তা কেড়ে নেওয়ার বিরোধিতা করা, সাংবিধানিক সরকারের জন্য আন্দোলনকে মুষ্টিমেয় কিছু আমলার ব্যক্তিগত ব্যাপার করে তোলার অভিসন্ধির বিরোধিতা করা, নতুন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের বিরোধিতা করা, আত্মত্যাগব্রতী সংঘের বিরুদ্ধে নিপীড়ণ এবং শানসিতে প্রগতিশীলদের হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা করা[১], তিন-গণনীতি বিষয়ক যুব লীগের লোকেরা সিয়েনইয়াং-য়ুলিন রাজপথ এবং লুংহাই রেলপথ থেকে জনসাধারণকে যেভাবে গুম করছে[২] তাদের সেইসব কার্যকলাপের বিরোধিতা করা, নটি করে উপপত্নী রাখার মতো লজ্জাজনক পদ্ধতির এবং জাতীয় সংকটের সুযোগে দশকোটি ইউয়ান মূল্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার বিরোধিতা করা, দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্তাদের, আঞ্চলিক স্বৈরচারীদের ও বদ অভিজাতগোষ্ঠীর বল্গাহীন নিষ্ঠুরতার বিরোধিতা করা। এ সবের বিরোধিতা করা ছাড়া এবং ঐক্য ও প্রগতি ছাড়া 'প্রতিরোধ' হয়ে দাঁড়াবে নিছক কিছু ফাঁকা বুলি এবং বিজয় পরিণত হবে একটি মিথ্যা প্রত্যাশায়। দ্বিতীয় বছরে **নিউ চায়না নিউজ**-এর রাজনৈতিক গতিধারা কী হবে ? ঐক্য ও প্রগতির ওপর জোর দেওয়া এবং যে সমস্ত কদর্য প্রথাপদ্ধতি যুদ্ধের পক্ষে হানিকর সেগুলোর বিরেধিতা করাই হবে সেই গতিধারা, যাতে করে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের লক্ষ্যে আমাদের অধিকতর বিজয় অর্জন করা সম্ভবপর হবে।

টীকা

১। 'দি লীগ অব সেলফ স্যাক্রিফাইস ফর ন্যাশনাল স্যালভেশন' ছিল শানসির একটি জাপ-বিরোধীগণ-সংগঠন ; ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সংগে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে তা গড়ে ওঠে। ওখানকার জাপ-বিরোধী যুদ্ধে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে শানসির কুওমিনতাঙ সামন্ত শাসক ইয়েন শী-সান খোলাখুলিভাবে এ প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে লীগকে দমন করতে শুরু করে এবং নৃশংসভাবে বহুসংখ্যক কমিউনিস্ট, লীগের কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের হত্যা করে।

২। ১৯৩৯ সালে কুওমিনতাঙ সিয়েনইয়াং-য়ুলিন রাজপথ এবং লুংহাই (কানসু-হাইচৌ) রেলপথ বরাবর থ্রি পিপলস্ প্রিন্সিপলস ইয়ুথ লীগের 'হোস্টেলের' ছদ্ম আবরণের আড়ালে একটি অবরোধ গড়ে তোলে। এইসব হোস্টেলে গোয়েন্দা সংস্থার যে লোকেরা থাকত তারা কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর সংগে একযোগে কাজ করত এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে যে প্রগতিশীল তরুণ ও বুদ্ধিজীবীরা যেতেন বা ওখান থেকে আসতেন তাঁদের গ্রেপ্তার করত এবং বন্দীশিবিরগুলিতে কয়েদ করে রাখত। হয় তাঁদের ওখানেই নির্মমভাবে হত্যা করা হতো, আর নয়তো তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে বাধ্য করা হতো।

নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

ইয়েনানের সকল অংশের জনগণের প্রতিনিধিরা আজ এখানে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা সহায়ক সমিতির উদ্বোধনী সভায় মিলিত হয়েছেন এবং সকলেই এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য কী ? জনগণের ইচ্ছার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিতে সহায়তা করা, জাপানকে পরাজিত করা এবং নতুন চীন গড়ে তোলাকে সহায়তা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

জাপানের বিরুদ্ধে সে সশস্ত্র প্রতিরোধকে আমরা সবাই সমর্থন করি তা ইতিমধ্যেই কার্যকরী হচ্ছে এবং এখন একমাত্র প্রশ্ন হল অবিচলভাবে তাতে লেগে থাকা। কিন্তু এছাড়া অন্য একটি বিষয়ও রয়েছে, যেমন গণতন্ত্র, তা কিন্তু কার্যকরী করা হচ্ছে না। এই দুটোই আজ চীনের পক্ষে সুবিপুল গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঠিক, চীনে বহু জিনিসেরই অভাব রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র। এর যে-কোন একটি না থাকলে চীনের কাজকর্ম ভালভাবে চলবে না। কিন্তু যেমন দুটো জিনিসের অভাব রয়েছে তেমনি দুটো জিনিসের বড়ই বাহুল্য রয়েছে। সেগুলো কী? সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও সামন্তবাদী শোষণ। এই দুটো জিনিসের বাহুল্যের জন্য চীন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ। জাতির প্রধান দাবি আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, আর তাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে ধ্বংস করতেই হবে। এদের ধ্বংসসাধন করতে হবে দৃঢ়হস্তে, পরিপূর্ণভাবে এবং

সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা সহায়ক সংক্রান্ত ইয়েনানস্থ সমিতির কাছে কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতা করেন। ঐ সময়ে পার্টির অনেক কমরেড চিয়াং কাই-শেকের প্রতারণাপূর্ণ প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে চিন্তা করছিলেন, হয়তো সত্যিসত্যিই বুঝি কুওমিনতাঙ সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে চিয়াং কাই-শেকের প্রতারণার মুখোস খুলে দেন, 'সাংবিধানিক সরকার' সংক্রান্ত প্রচারের হাতিয়ারটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেন এবং তাকে জনগণকে জাগিয়ে তুলে চিয়াং কাই-শেকের কাছ থেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবি করার একটি হাতিয়ারে পরিণত করেন। তারপরই চিয়াং-কাই-শেক তড়িঘড়ি তার যাদুর ঝোলাটি গুটিয়ে নেয় এবং জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলার গোটা সময়টিতে সে তার এই তথাকথিত সাংবিধানিক সরকারের প্রচার আর চালাতে আর সাহস করেনি।

বিন্দুমাত্র করুণা প্রদর্শন না করে। কেউ কেউ বলেন—ধ্বংস নয়, একমাত্র পুনর্গঠনই আমাদের প্রয়োজন। ভাল কথা, আমরা তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই ঃ ওয়াং চিং-ওয়েইকে ধ্বংস করা চাই কিনা? জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা চাই কিনা? সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা চাই কিনা? এইসব অশুভ জিনিসগুলোকে ধ্বংস না করলে নিশ্চিতভাবে পুনগঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এদের ধ্বংস করেই শুধু চীনকে রক্ষা করা যাবে এবং পুনর্গঠন শুরু করা যাবে, অন্যথায় তা হবে অলস স্বপ্নবিলাস মাত্র। একমাত্র পুরাতনকে, পচা-গলা জিনিসকে ধ্বংস করেই আমরা গড়ে তুলতে পারব নবীন ও খাঁটি জিনিসকে। স্বাধীনতার সংগে গণতন্ত্রের সংযোগ ঘটালেই আপনি পাবেন গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রতিরোধকে অথবা প্রতিরোধের স্বার্থে নিয়োজিত গণতন্ত্রকে। গণতন্ত্র ছাড়া প্রতিরোধ ব্যর্থ হবে। গণতন্ত্র ছাড়া প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়াই সম্ভব হবে না। আট বা দশ বছর প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হলেও গণতন্ত্রের সাহায্যে জয় সুনিশ্চিতভাবেই আমাদের হবে।

সাংবিধানিক সরকার কাকে বলা হবে ? তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার। প্রবীণ কমরেড উ[১] এইমাত্র যা বলেছেন, আমি তার সাথে একমত। কিন্তু কী ধরনের গণতন্ত্রের আজ আমাদের প্রয়োজন ? আমাদের প্রয়োজন নয়া গণতান্ত্রিক সরকার, নয়া গণতন্ত্রের সাংবিধানিক সরকার। ইউরোপীয় আমেরিকান ধাঁচের পুরানো, অচল বুর্জোয়া একনায়কত্বের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার আমরা চাই না, কিংবা এখন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সোভিয়েত ধাঁচের গণতন্ত্রও আমরা চাই না।

অন্যান্য দেশে পুরানো ধাঁচের যে গণতন্ত্র প্রচলিত, তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। আমরা কোন অবস্থাতেই এরকম প্রতিক্রিয়াশীল জিনিস গ্রহণ করব না। চীনের, প্রতিক্রিয়াশীল একগুঁয়েরা যে ধরনের সাংবিধানিক সরকারের কথা বলে বেড়ায়, তা হচ্ছে বিদেশের পুরানো ধাঁচের বুর্জোয়া গণতন্ত্র। কিন্তু যদিও তারা এ কথা বলে বেড়ায়, আসলে এটাও তারা চায় না ;এ ধরনের কথা বলছে তারা জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্য। আসলে তারা যা চায় তা হল একদলীয় ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব। অপরদিকে চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এ ধরনের সাংবিধানিক সরকার চায় এবং চায় চীনে একটি বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু এতে তারা কখনোই সফলকাম হবে না। কারণ চীনের জনগণ এ ধরনের একটা সরকার চায় না এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর এক-শ্রেণিক একনায়কত্বকে তাঁরা স্বাগত জানাবেন না। চীনের কাজকর্মের ব্যবস্থাপনা চীনের জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই নির্ধারণ করবে এবং শুধু বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণকে পুরোপুরি বাতিল করে দিতে হবে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কে কী বলা যায় ? নিশ্চয়ই জিনিসটি খুব ভাল আর কালক্রমে সারা দুনিয়াব্যাপী তা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আজ এ ধরনের গণতন্ত্র চীনে

এখনো প্রচলন সম্ভব নয়, আর তাই এখনকার মতো এটাকে বাদ দিয়েই আমাদের চলতে হবে। কিছু কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পরই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। আমরা যে ধরনের গণতান্ত্রিক সরকার চাই, তা পুরানো ধাঁচের গণতন্ত্র নয় অথবা সমাজতান্ত্রিক ধরনের গণতন্ত্রও নয়, তা হচ্ছে চীনের বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী নয়া-গণতন্ত্র। সাংবিধানিক যে সরকার কায়েম হবে তা হবে নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার।

নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকারটি কী ? দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে এ হচ্ছে কয়েকটি বৈপ্লবিক শ্রেণীর যৌথ একনায়কত্ব। কোন এক ব্যক্তি একবার বলেছিলেন, 'যদি খাবার থাকে তাহলে সবাই তা ভাগ করে খাক।' আমার মনে হয়, নয়া-গণতন্ত্র বোঝাতে এ কথা প্রযোজ্য। যা খাবার আছে তা যেমন সবাই ভাগ করে খাবে, তেমনি একক একটি দল, গোষ্ঠী বা শ্রেণী ক্ষমতা একচেটিয়া করতে পারবে না। কুওমিনতাঙ-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ঘোষণাপত্রে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন এই ধারণাটি ভালভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন ঃ

> বিভিন্ন আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে তা সাধারণতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর একচেটিয়া করতলগত এবং তা সাধারণ মানুষকে নিপীড়নের নিছক একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে কুওমিনতাঙ-এর গণতন্ত্রের মূল নীতি হল এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে সমগ্র সাধারণ মানুষই তার অংশীদার এবং মুষ্টিমেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার তা নয়।

কমরেডগণ, সাংবিধানিক সরকার সম্পর্কে অধ্যয়নকালে আমরা নানা বইপত্র পড়ব, কিন্তু সবার আগে আমাদের এই ঘোষণাপত্রটি পড়া উচিত ও এই অনুচ্ছেদটি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া উচিত। 'সমগ্র সাধারণ মানুষই তার অংশীদার এবং মুষ্টিমেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার তা নয়'—নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার বলতে আমরা যা বোঝাতে চাই, দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কয়েকটি বৈপ্লবিক শ্রেণীর যৌথ গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব বলে যা বোঝাতে চাই—এই হচ্ছে তার সারকথা। এই ধরনের সাংবিধানিক সরকারই আজ আমাদের চাই এবং জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের সাংবিধানিক সরকারের রূপটি হওয়া চাই ঠিক এইরকম।

আমাদের আজকের সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রেরণা ও আগ্রহ সৃষ্টি করা। এ নিয়ে 'আগ্রহ' সৃষ্টি করতে হচ্ছে কেন? সবাই যদি এগিয়ে চলতে থাকে, তবে কাউকে এগিয়ে চলার জন্য প্রেরণা দেওয়ার দরকার পড়ে না। এই সভা অনুষ্ঠানের ঝামেলা আমরা পোহাতে গেলাম কেন? কারণ কিছু লোক এগিয়ে চলার বদলে শুয়ে পড়তে চাইছে, এগিয়ে চলতে অস্বীকার করছে। তারা যে শুধু এগিয়ে চলতে অস্বীকার করছে তাই নয়, তারা আসলে চাইছে পিছিয়ে যেতে।

আপনারা তাদের বলছেন এগিয়ে যেতে, কিন্তু তারা মরে গেলেও এগোবে না; এই লোকেরাই একগুঁয়ে। তারা এমন একরোখা যে, এই সভা করে তাদের 'প্রেরণা' দিতে হচ্ছে। এই 'প্রেরণা দেওয়া' কথাটা এল কোথা থেকে ? কে প্রথম এই প্রসঙ্গে কথাটা প্রয়োগ করেছিলেন ? আমরা নই, করেছিলেন মহান ও সম্মানিত ডঃ সান ইয়াৎ-সেন, তিনি বলেছিলেন ঃ 'জাতীয় বিপ্লবের লক্ষ্যসাধনে চল্লিশ বছর ধরে আমি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি।.. তাঁর ইচ্ছাপত্রটি পড়ে দেখুন, তাহলেই দেখতে পাবেন এই কথাগুলো ঃ 'অতি সম্প্রতি আমি জাতীয় মহাসভার সম্মেলন আহ্বানের জন্য সুপারিশ করেছি...এবং স্বল্পতম সম্ভব সময়ের মধ্যে তা আহ্বানের জন্য বিশেষভাবে তৎপর হতে বলেছি। এটা হল আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক আবেদন।' কমরেডগণ, এটা একটা সাধারণ 'আবেদন' নয়, 'আন্তরিক আবেদন'। 'আন্তরিক আবেদন' তো নিছক একটা সাধারণ আবেদনমাত্র নয়, তাই তাকে কি হাল্‌কাভাবে অবহেলা করা চলে ? আবার 'স্বল্পতম সম্ভব সময়ের মধ্যে' ; প্রথমে, দীর্ঘতম সময় নয়, দ্বিতীয়, তুলনামূলক দীর্ঘ সময় নয় এবং তৃতীয়, নিছক স্বল্প সময় নয় বরং একেবারে স্বল্পতম সম্ভব সময়ের মধ্যে'। আমরা যদি স্বল্পতম সম্ভব সময়ের মধ্যে জাতীয় মহাসভাকে বাস্তবায়িত করতে চাই, তাহলে 'প্রেরণা' আমাদের দিতেই হবে। পনের বছর হল ডঃ সান ইয়াৎ-সেন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, কিন্তু যে জাতীয় মহাসভার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন তা আজও ডাকা হয়নি। রাজনৈতিক মাতব্বরি ফলিয়ে অযথা কালক্ষেপ করে কিছু লোক নির্বোধের মতো সময় কাটিয়ে দিয়েছে, 'স্বল্পতম সম্ভব সময়কে' দীর্ঘতম সময় করে তুলেছে, অথচ এরাই আবার প্রতিনিয়ত ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের নাম জপে চলেছে। ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ছায়ামূর্তি তাঁর এই অযোগ্য অনুগামীদের কী তিরস্কারই না করছেন ঃ এটা সম্পূর্ণ পরিস্কার যে 'প্রেরণা' না জোগালে এগিয়ে চলা সম্ভব হবে না 'প্রেরণা' দেওয়া প্রয়োজন, কারণ অনেকে পিছিয়ে চলেছে, আবার অনেকের এখনো নিদ্রাভঙ্গই হয়নি।

কিছু লোক যখন এগোচ্ছে না, তখন তাদের প্রেরণা আমাদের দিতেই হবে। অন্যদের প্রেরণা দিতে হবে, কারণ তাঁরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন। তারই জন্য সভা ডেকে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রেরণা সঞ্চার করতে হচ্ছে। তরুণেরা এ ধরনের সভা করেছেন, মহিলারাও এ ধরনের সভা করেছেন, শ্রমিকেরা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী সংস্থা আর সেনাদলের বাহিনীগুলোও সভা-সমিতি করেছেন। এসব খুব সাড়া জাগিয়েছে এবং তা খুবই ভাল হয়েছে। আর এখন এই একই উদ্দেশ্যে আমরা এই সাধারণ সভা করছি, যাতে আমরা সবাই সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা দ্রুত কার্যকরী করার কাজে লেগে যেতে পারি এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শিক্ষাবলী আশু কার্যকর করতে লেগে যেতে পারি।

কেউ কেউ বলছেন ঃ 'আপনারা রয়েছেন ইয়েনানে, আর ঐ লোকেরা রয়েছেন নানা জায়গায় ছড়িয়ে। আপনারা তাঁদের প্রেরণা দিতে চাইছেন, কিন্তু ওঁরা যদি কোন সাড়া না দেন তবে এর কী দরকার ?' হ্যাঁ, দরকার খানিকটা আছে বৈকি। কারণ, অবস্থা এগোচ্ছে এবং নজর তাদের দিতে হবেই। আমরা যদি আরও বেশি সভা-সমিতি করি, বেশি বেশি করে প্রবন্ধাদি লিখি, বেশি করে বক্তৃতা করি এবং বেশি করে তারবার্তা পাঠাই, তাহলে নজর না দিয়ে ওঁরা পারবেন না। আমার মতে, সাংবিধানিক সরকার প্রবর্তনের জন্য আমাদের এত বেশি সভা-সমিতি করার দুটি উদ্দেশ্য আছে। একটি হচ্ছে সমস্যাটি নিয়ে অধ্যয়ন করা এবং অন্যটি হচ্ছে জনসাধারণকে ঠেলে এগিয়ে দেওয়া। অধ্যয়ন করার আমাদের কী দরকার? কারণটা হচ্ছে, ধরুন, তারা এগোতে চাইছে না আর আপনারা তাদের এগিয়ে যেতে বলছেন, তখন ওরা জিজ্ঞেস করবে—কেন আপনারা তাদের ঠেলছেন, আপনাদের তখন জবাব দেওয়ার দরকার হবে। তা করতে হলে সাংবিধানিক সরকার সম্পর্কে সকল বিষয়ে আমাদের গুরুতর অধ্যয়ন থাকা দরকার। আমাদের প্রবীণ কমরেড উ ঠিক এই কথাটিই খানিকটা সবিস্তারে বলছিলেন। সকল বিদ্যায়তন, সরকারী সংস্থা ও সামরিক ইউনিট এবং জনগণের সকল অংশকেই আমাদের সামনেকার সাংবিধানিক সরকার সম্পর্কিত সমস্যাটির অধ্যয়ন করা দরকার।

একবার অধ্যয়ন করে নিলে আমরা জনগণকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলতে পারব। ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানে তাদের এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেওয়া, আর আমরা যতই সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে চলব, সমস্ত ব্যাপারটাও ক্রমশঃ সামনে এগিয়ে চলবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতধারাগুলো মিলিত হয়ে পরিণত হবে এক বিরাট নদীতে, যা সমস্ত পচাগলা ও নোংরাকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেবে, আর এভাবেই দেখা দেবে নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার। এ ধরনের তাড়নার প্রভাব হবে খুবই বিরাট। ইয়েনানে আমরা যা করছি তা গোটা দেশকেই প্রভাবিত করতে বাধ্য।

কমরেডগণ, আপনারা কি মনে করেন যে একবার সভা করে টেলিগ্রাম পাঠলেই একগুঁয়েরা হাল ছেড়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করে দেবে, আমাদের আদেশ মাথা পেতে মেনে নেবে ? না, এত সহজে সুবোধ বনে যাওয়ার লোক তারা নয়। তাদের অনেকেই একগুঁয়েদের শিক্ষায়তন থেকে বিশেষ শিক্ষালাভ করে স্নাতক হয়ে এসেছে। তারা যেহেতু আজ একগুঁয়ে, আগামীকাল বা এমনকি তার পরের দিনও তারা একগুঁয়েই থেকে যাবে। একগুঁয়ে বলতে কী বোঝায় ? 'অনমনীয়' ও আজ, কাল এমনকি তার পরেও প্রগতির বিরুদ্ধে 'অনড়' হয়ে থাকাটাই একগুঁয়েমি। এরকম লোকদেরই আমরা বলি একগুঁয়ে। এদেরকে আমাদের কথা শোনানো সহজ কর্ম নয়।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নে সাংবিধানিক সরকার

বলতে আমরা যা জানি, তাতে রয়েছে বেশ কিছু মৌলিক আইনকানুন অর্থাৎ একটি সংবিধান, যা সাধারণভাবে বিঘোষিত হয়েছে একটা সফল বিপ্লবের সমাপ্তির পর গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি হিসেবে। কিন্তু চীনের ব্যাপারটা ভিন্ন। চীনে বিপ্লব এখনো সীমান্ত অঞ্চলের কিছু কিছু এলাকা ছাড়া সফল হয়নি, গণতান্ত্রিক সরকার এখনো একটি বাস্তব সত্য নয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে চীনে এখনো চলছে আধা-উপনিবেশ ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শাসন এবং যদি একটি উত্তম সংবিধান জারী করা হয়, তাহলেও তা অনিবার্যভাবে সামন্ত শক্তিসমূহের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে এবং একগুঁয়েরা তাকে বাধা দেবে, যাতে করে নির্বিঘ্নে তা কার্যকরী করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাই সাংবিধানিক সরকারের জন্য বর্তমান আন্দোলনকে এমন একটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী হতে হবে যা আজও অর্জিত হয়নি ; তাই ইতিমধ্যে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত একটি গণতন্ত্রকে নিছক স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপার এটা নয়। তার অর্থ হচ্ছে একটা বিরাট সংগ্রাম এবং নিশ্চয়ই তা হাল্‌কা বা সহজসাধ্য একটা ব্যাপার নয়।

যারা বরাবর সাংবিধানিক সরকারের বিরোধিতা করে এসেছে,[২] তারাও এ ব্যাপারটা মুখে মেনে নিচ্ছে। কেন? কারণ তারা জনসাধারণের চাপের মধ্যে রয়েছে, জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইচ্ছুক জনসাধারণের চাপে পড়ে ওরা খানিকটা নরম হয়ে পড়েছে। এমনকি গলা সপ্তমে চড়িয়ে ওরা চিৎকার করে বলছে, 'আমরা সব সময়ই সাংবিধানিক সরকারের পক্ষে রয়েছি!' আর এ নিয়ে ওরা প্রচণ্ড হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে। আজ বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা 'সাংবিধানিক সরকার' কথাগুলো শুনে আসছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার নামমাত্র চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না। এই লোকেরা মুখে এক কথা বলে, কাজে করে অন্যটি, বলা চলে এরা হচ্ছে সাংবিধানিক সরকারের ব্যাপারে দুমুখো কারবারী। তাদের 'সব সময় পক্ষে রয়েছি' ইত্যাদি কথাবার্তা প্রকৃত-পক্ষে ওদের দুমুখো কারবারের উদাহারণ। আজকের এই একগুঁয়েরা ঠিক ঐ ধরনেরই দুমুখো কারবারী। তাদের সাংবিধানিক সরকার একটি প্রতারণামাত্র। অদূর ভবিষ্যতে একটি সংবিধান আপনারা পেয়েও যেতে পারেন এবং একজন রাষ্ট্রপতিও জুটে যেতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্র আর স্বাধীনতা আপনাদের ওরা যে কখন দেবে তা বিধাতাই জানেন। চীন তো ইতিমধ্যেই একটি সংবিধান পেয়ে গিয়েছিল। সাও কুন কি একটি সংবিধান ঘোষণা করে দেননি?[৩] কিন্তু গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা কি কোথায়ও পাওয়া গিয়েছিল? আর রাষ্ট্রপতি— বেশ কয়েকজন তো পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমে ছিলেন সান ইয়াৎ-সেন-ভাল লোক, কিন্তু তাঁকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলেন ইউয়ান শী-কাই। দ্বিতীয় ছিলেন ইউয়ান শী-কাই, তৃতীয় ছিলেন লী ইউয়ান হাং[৪], চতুর্থ ছিলেন ফেং কুও-চাং[৫], এবং পঞ্চম ছিলেন সু-শী-চাং[৬]—যথার্থই বহুসংখ্যক রাষ্ট্রপতির মেলা, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী সম্রাটদের চেয়ে ওঁরা কিছুমাত্র ভিন্ন ছিলেন কি ? সংবিধান আর

রাষ্ট্রপতিবর্গ উভয়ই ছিল মেকী। বর্তমানে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে তথাকথিত সংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক সরকার রয়েছে সেগুলো আসলে নরখাদক সরকার। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বহুদেশে যেখানে সাধারণতন্ত্রের তক্‌মা লটকানো রয়েছে সেখানেও সেই একই কথা খাটে, কারণ কার্যতঃ ওখানে গণতন্ত্রের লেশমাত্র চিহ্নও নেই। অনুরূপভাবে চীনের বর্তমান একগুঁয়েদেরও একই অবস্থা। সাংবিধানিক সরকার সম্পর্কে ওদের কথাবার্তা আসলে হচ্ছে 'ভেড়ার মাথা ঝুলিয়ে রেখে কুকুরের মাংস বিক্রি করা।' তারা সামনে ঝুলিয়ে রাখছে সাংবিধানিক সরকারের ভেড়ার মাথাটা, কিন্তু আসলে বিক্রি করছে একদলীয় একনায়কত্বের কুকুরের মাংস। আমি তাদের অহেতুক আক্রমণ করছি না ;আমার কথাগুলো তথ্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত, কারণ সাংবিধানিক সরকার সম্বন্ধে ওদের হাজারো বুলি সত্ত্বেও জনসাধারণকে সামান্যতম স্বাধীনতা দিতেও ওরা রাজী নয়।

কমরেডগণ, প্রকৃত সাংবিধানিক সরকার সহজলভ্য নয়, কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শুধু তা পাওয়া যাবে। সুতরাং, আপনারা এটা আশা করে বসে থাকবেন না, যে, সভা-সমিতি করে, তারবার্তা পাঠিয়ে বা প্রবন্ধাদি লিখে ফেললেই তা তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হয়ে যাবে। অথবা, আপনারা এই প্রত্যাশা করে বসবেন না যে, জনগণের রাজনৈতিক পরিষদে[৭] একটি প্রস্তাব পাশ করে নিলে, জাতীয় সরকার একটি হুকুমনামা জারী করে দিলে বা ১২ই নভেম্বর জাতীয় মহাসভার[৮] অধিবেশন বসলেই, বা একটি সংবিধান ঘোষণা করে দিলেই, বা এমনকি একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে নিলেই সবকিছু চমৎকার হয়ে যাবে এবং এই দুনিয়ার সবকিছুই ঠিকঠাক হয়ে যাবে। তা এক অসম্ভব ব্যাপার, কাজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন না। সাধারণ মানুষও যাতে বিভ্রান্ত হয়ে না পড়েন, তার জন্য তাঁদের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলার দরকার আছে। ব্যাপারটা মোটেই এত সোজা নয়।

তাহলে লক্ষ্যটি মাঠে মারা গেছে ভেবে কি আমরা বিলাপ করতে শুরু করে দেব? ব্যাপারটা যখন এতই কঠিন, তাহলে তো আর কোন আশা করাই চলে না। কিন্তু বিষয়টা তাও নয়। এখনো পর্যন্ত সাংবিধানিক সরকারের আশা রয়েছে, বেশ বড় রকমের আশাই রয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই চীন একটি নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। কেন? একগুঁয়েদের গোলমাল সৃষ্টির ফলে বাধাবিপত্তিগুলো দেখা দিয়েছে, কিন্তু ওরা চিরকাল একগুঁয়ে হয়ে থাকতে পারবে না এবং তারই জন্য আমাদের এখনো বড়রকমের প্রত্যাশা রয়েছে। এই দুনিয়ার একগুঁয়েরা আজ পর্যন্ত একগুঁয়ে হয়ে থাকলেও, আগামীকাল বা তার পরের দিন পর্যন্ত একগুঁয়ে হয়ে থাকলেও, তারা চিরকাল একগুঁয়ে হয়ে থাকতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত বদলাতে তাদের হবেই। উদাহরণস্বরূপ, ওয়াং চিং-ওয়েই খুবই দীর্ঘকাল ধরে একগুঁয়ে হয়ে ছিল, কিন্তু জাপ-

বিরোধী জনগণের মধ্যে থেকে একগুঁয়ে হয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং জাপানীদের দলে তাকে ভীড়ে পড়তেই হয়েছে। অন্য একটি উদাহরণ হিসেবে চ্যাঙ কুও-তাওয়ের কথাই ধরুন ; সে দীর্ঘকাল একগুঁয়ে হয়ে ছিল, কিন্তু আমরা কয়েকটি সভা-সমিতি করার পর এবং বারবার তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর পর তাকেও পালিয়ে যেতে হয়েছে। আসলে, একগুঁয়েরা যত অনমনীয়ই হোক, আমৃত্যু অনমনীয় হয়ে থাকার মতো অনমনীয় তারা নয়, এবং শেষ পর্যন্ত বদলাতে তাদের হয়— বদলাতে হয় নিতান্ত জঘন্য ও ঘৃণ্য একগাদা কুকুরের বিষ্ঠাতে। কারও কারও পরিবর্তন হয় ভালর দিকে এবং সেটাও হয় তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আমাদের একটানা সংগ্রামের ফল হিসেবে—তারা তাদের ভুল দেখতে পায় এবং ভাল হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে, একগুঁয়েদেরও শেষ পর্যন্ত বদলাতে হয়। সব সময়ই তাদের অনেক অভিসন্ধি থাকে, অন্যদের ঘাড় ভেঙে ফায়দা ওঠাবার মতলব থাকে, থাকে দুমুখো কারবারের নানা ফন্দিফিকির ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু তারা যা চায়, পায় সবসময় তার উল্টোটি। তারা অবধারিতভাবেই অপরের ক্ষতি করে কাজ শুরু করে, কিন্তু শেষ হয় তাদের নিজেদের সর্বনাশের মধ্য দিয়ে। আমরা একবার বলেছিলাম যে, চেম্বারলিন 'পাথরটি তুলেছে শুধু তার নিজের পায়ের ওপরেই তা ফেলবার জন্য', এবং আমাদের সেই কথা এখন সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েত জনসাধারণের পায়ের আঙ্গুলগুলো থেঁতলে দেওয়ার জন্য চেম্বারলিন হিটলারকে প্রস্তরখণ্ড হিসেবে ব্যবহারের জন্য জিদ ধরেছিল, কিন্তু গত বছর সেপ্টেম্বর সেই দিনটিতে একদিকে জার্মানি আর অন্যদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল, তার হাতের প্রস্তরখণ্ডটি তার নিজের পায়ের আঙ্গুলগুলোকেই থেঁতলে দিয়েছে। আজও তাকে সেই যন্ত্রণায় কাতরাতে হচ্ছে। চীনেও এ ধরনের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে । ইউয়ান শী-কাই সাধারণ মানুষের পায়ের আঙ্গুলগুলো থেঁতলে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পরিণামে তাকেই যন্ত্রণা ভুগতে হল, সম্রাট সেজে বসার ঠিক কয়েকমাস পরেই তার মৃত্যু হল।[৯] তুয়ান চি-রুই, সু শী-চ্যাং, সাও কুন, উ পেই-ফু এবং আরও এরকম জনগণকে অনেকে দমন করতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনগণই তাদের উচ্ছেদ করে দিয়েছিল। যে-কেউই অন্যের ক্ষতি করে নিজের ফায়দা ওঠাতে চাইবে, কখনই তার মঙ্গল হবে না।

আমার মতে আজকের কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুঁয়েরা যদি সামনে এগিয়ে না চলে, তবে তাদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। ঐক্য-সংস্থাপনের ঢক্কানিনাদের ছলচাতুরীর আড়ালে তারা প্রগতিশীল শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল, প্রগতিশীল অষ্টম রুট বাহিনী, নয়া চতুর্থ বাহিনী, প্রগতিশীল কমিউনিস্ট পার্টি ও গণ-সংগঠনসমূহকে ধ্বংস করে দেবার পরিকল্পনা করছে। এ ধরনের অজস্র মতলব

তাদের রয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এসবের পরিণামে একগুঁয়েগণ কর্তৃক প্রগতিশীলদের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধিত হবে না, বরং প্রগতির হাতে একগুঁয়েপনারই সম্পূর্ণ বিনাশ সাধিত হবে। তাই, যদি সমূহ বিনাশ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হয়, একগুঁয়েদের তাহলে সামনে এগিয়ে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই আমরা সব সময় ওদের পরামর্শ দিয়ে এসেছি অষ্টম রুট বাহিনী, কমিউনিস্ট পার্টি ও সীমান্ত অঞ্চলকে আক্রমণ না করার জন্য। যদি অবশ্য তারা এটা করতে বদ্ধ পরিকর হয়ে থাকে, তাহলে তাদের উচিত হবে এ ধরনের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা ঃ 'নিজেদের ধ্বংসসাধনের ব্যাপারে কৃতসংকল্প হয়ে এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রসারের প্রচুর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, আমরা একগুঁয়েরা কমিউনিস্ট পার্টি ও সীমান্ত অঞ্চলকে আক্রমণ করার সমূহ দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম।' 'কমিউনিস্টদের দমন করার' প্রচুর অভিজ্ঞতাই তো একগুঁয়েদের হয়েছে এবং এবার আরেক দফা নতুন অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করতে চাইলে তারা স্বচ্ছন্দে তা করতে পারে। ভাল করে খানাপিনার পর এবং টেনে ঘুম দেওয়ার পর তাদের যদি খানিকটা 'দমন করার' বাসনা হয়ে থাকে—সেটার ভার তাদের হাতেই রইল। অবশ্য উপরে উল্লিখিত প্রস্তাবটি তাহলে কার্যকরী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাদের থাকতে হবে কেননা তা অপরিবর্তনীয়। গত দশ বছরের 'কমিউনিস্টদের দমনের' পরিণাম অনিবার্যভাবে ঐ প্রস্তাব অনুযায়ীই ঘটে এসেছে। পরবর্তী অন্য 'দমনের' পরিণাম তার সংগে সংগতি রেখেই ঘটবে। সুতরাং ওদের প্রতি আমার উপদেশ হল—'দমন করার' পথে যেও না। সমগ্র জাতি আজ যা চাইছে তা 'কমিউনিস্টদের দমন' নয়, জাতি আজ চাইছে প্রতিরোধ, ঐক্য ও প্রগতি । সুতরাং যে-কেউ 'কমিউনিস্টদের দমন' করতে চেষ্টা করবে, ব্যর্থ সে হবেই ।

সংক্ষেপে বলা যায়, পশ্চাদগমনের পরিণতি দাঁড়ায় এই অপপ্রয়াসের প্রেরণাদাতাদের বাঞ্ছিত ফলাফলের ঠিক বিপরীত। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম আধুনিক অথবা প্রাচীনকালের চীনে নেই কিংবা অন্য কোথায়ও নেই।

আজকের সাংবিধানিক সরকার সম্পর্কে ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। একগুঁয়েরা যদি বিরোধিতা চালিয়ে যেতেই থাকে, তবে তারা যা চাইছে, ফলাফল নিশ্চিতভাবে তাদের বিপরীতটিই হবে। সাংবিধানিক সরকারের জন্য আন্দোলন একগুঁয়েদের নির্ধারিত পথ ধরে কখনো চলবে না, চলবে তাদের ইচ্ছার বিপরীত পথ ধরে, অনিবার্যভাবেই তা জনগণের নির্ধারিত পথ ধরে এগিয়ে যাবে। এটা সুনিশ্চিত, কেননা সমগ্র দেশের জনগণই তা দাবি করছে এবং চীনের ঐতিহাসিক বিকাশের গতিধারাও তাই দাবি করছে, দাবি করছে সমগ্র বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের গতিধারা। কে পারবে একে রোধ করতে? ইতিহাসের চাকাকে পিছিয়ে দেওয়া যাবে না। অবশ্য যে কাজ আমরা শুরু করেছি, তার জন্য সময় লাগবে এবং রাতারাতি হয়ে যাওয়ার ব্যাপার তা নয়।

তারজন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে, দায়সারাভাবে তা করা যাবে না। এরজন্য প্রয়োজন হবে ব্যাপক জনসাধারণের সমাবেশের এবং এ কাজ করার জন্য একজোড়া হাতই যথেষ্ট নয়। আমরা যে আজ এখানে এই সভা করছি, এটা খুবই ভাল কাজ হয়েছে। এই সভার পর আমরা প্রবন্ধাদি লিখব এবং তারবার্তা পাঠাব ; উত্তাই এবং তাইহাং পার্বত্য অঞ্চলেও আমরা এ ধরনের সভা করব, উত্তর চীনে, মধ্য চীনে সারা দেশ জুড়ে আমরা সভা করব। এভাবে যদি আমরা কাজ করে যেতে থাকি, এবং বেশ কয়েক বছর ধরে যদি তা আমরা চালিয়ে যাই, তাহলে তাই হবে সঠিক কাজ। খুব ভালভাবেই কাজটি আমাদের করা চাই; আমাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা জয় করে আনতে হবে, আমাদের কায়েম করতে হবে নয়া-গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকার। যদি তা আমরা করতে না পারি এবং একগুঁয়েরা যদি তাদের পথে চলতে পারে, তবে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। এই পথ ধরেই জাতীয় অধীনতাকে পরিহার করার জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। তার জন্য প্রত্যেককেই তার যথাশক্তি করতে হবে। আর তা যদি আমরা করি, তাহলে আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার বিরাট আশা আছে। আমাদের আরও বোঝা চাই যে, একগুঁয়েরা শেষ বিচারে সংখ্যালঘু মাত্র, অন্যদিকে একগুঁয়েরা নয়, জনগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাঁরা এগিয়ে যেতে সমর্থ। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে, সংখ্যাগরিষ্ঠের এই অবস্থানের সংগে যদি আমাদের প্রয়াস এসে যুক্ত হয়, তাহলে সে আশা উজ্জ্বলতরই হবে। তারই জন্য আমি বলেছি, কাজটি কঠিন হলেও সাফল্যের আশা উজ্জ্বল।

টীকা

১। প্রবীণ কমরেড উ হলেন কমরেড উ ইউ-চ্যাং। তিনি ছিলেন ইয়েনানের সাংবিধানিক সরকার প্রসারের জন্য গঠিত সমিতির সভাপতি।

২। এখানে 'ওরা' বলতে বোঝাচ্ছে কুওমিনতাঙ-এর চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে।

৩। ১৯২৩ সালে উত্তরাঞ্চলের বড় সশস্ত্র সামন্ত প্রভুদের অন্যতম সাও কুন ৫৯০ জন পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার করে রৌপ্য ডলার ঘুষ খাইয়ে নিজে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়ে বসে। তারপর নিজেই সে একটি সংবিধান জারী করে দেয় যাকে বলা হয় 'সাও কুন সংবিধান' বা 'ঘুষখোরদের সংবিধান'।

৪। লী ইউয়ান হাং প্রথমে ছিল চিং বংশের সশস্ত্র বাহিনীর একটি বিগ্রেডের কম্যাণ্ডার। ১৯১১ সালের উচাং-এর অভ্যুত্থানকালে তার অফিসার ও সৈনিকেরা তাকে বিপ্লবের পক্ষে থাকতে বাধ্য করে এবং তাকে হুপে প্রদেশের গভর্নর বানিয়ে দেয়। পরে সে উপ-রাষ্ট্রপতি ও তারপরে উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র সামন্ত প্রভুদের গোষ্ঠীটির রাজত্বকালে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়।

৫। ফেং কুয়ো-চাং ছিল ইউয়ান শী-কাই-এর একজন তাঁবেদার। ইউয়ানের মৃত্যুর পর উত্তরাঞ্চলে সশস্ত্র সামন্ত প্রভুদের চক্রের চিই্‌লি (হোপেই) গোষ্ঠীর সে নেতা হয়। ১৯১৭ সালে লী ইউয়ান হাংকে চটিয়ে দিয়ে সে নিজেই রাষ্ট্রপতি হয়ে বসে।

৬। সু শী-চাং ছিল উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র সামন্ত প্রভুদের চাকুরীতে নিযুক্ত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি। তুয়ান চি-রুই নিয়ন্ত্রিত পার্লামেণ্ট কর্তৃক ১৯১৮ সালে সে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়।

৭। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কুওমিনতাঙ সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা করেছিল উপদেষ্টা সংস্থা হিসেবে 'জনগণের রাজনৈতিক পরিষদটি'। সদস্যদের সকলেই ছিলেন কুওমিনতাঙ সরকার কর্তৃক 'আমন্ত্রিত'। জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিরাও নাম কে-ওয়াস্তে তার মধ্যে ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে কুওমিনতাঙ-এরই ছিল নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। কুওমিনতাঙ সরকারের অনুসৃত নীতি ও কাজকর্মকে প্রভাবিত করার কোন ক্ষমতা এর ছিল না। চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ যত বেশি বেশি করে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে লাগল, ততই কুওমিনতাঙ ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই পরিষদে সংখ্যায় বেড়ে যেতে লাগল, অন্যদিকে গণতন্ত্রীদের সংখ্যা কমে যেতে লাগল এবং তাদের বাক্-স্বাধীনতা নিদারুণভাবে সংকুচিত করে দেওয়া হল ও শেষ পর্যন্ত পরিষদ বেশি বেশি করে কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াই নিছক একটি হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল। ১৯৪১ সালে দক্ষিণ আনহুইয়ের ঘটনার পর পরিষদের কমিউনিস্ট সদস্যগণ কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাদির প্রতিবাদে বেশ কয়েকবার পরিষদের সভা বয়কট করেন।

৮। কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দলের এবং গোষ্ঠীসমূহের গণতন্ত্রীদের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার ও জাতীয় মহাসভা আহ্বানের জন্য কুওমিনতাঙ সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩৯ সালের নভেম্বরে কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৪০ সালের ১২ই নভেম্বর জাতীয় মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করা হবে। জনগণকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য অনেক ঢাকঢোল পেটানো হলেও এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি।

৯। ইউয়ান শী-কাই ১৯১৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে দেয়, কিন্তু ১৯১৬ সালের ২২শে মার্চই সে গদী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন সম্পর্কে

৬ই মার্চ, ১৯৪০

১। এটা হচ্ছে এমন একটা সময়, যখন কুওমিনতাঙ-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুঁয়েরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে উত্তর ও মধ্য চীনে এবং অন্যান্য স্থানে আমাদের জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা প্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করছে, অথচ আমাদের দিক থেকে তা স্থাপন করা আমাদের চাই-ই, আর জাপ-বিরোধী প্রধান প্রধান মুক্ত অঞ্চলগুলিতে ইতিমধ্যে আমরা তা স্থাপন করতে পেরেছি। কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে এই প্রশ্ন নিয়ে উত্তর, মধ্য ও উত্তর-পূর্ব চীনে আমাদের সংগ্রাম সমগ্র দেশব্যাপী যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করতে পারে এবং গোটা জাতি মনোযোগের সাথে তা অনুধাবন করে চলেছেন। সুতরাং এই প্রশ্নটিকে সতর্কতার সংগে পরিচালনা করা চাই।

২। জাপ-বিরোধী যুদ্ধকালে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা আমরা গড়ে তুলছি প্রকৃতির দিক থেকে তা যুক্তফ্রন্টের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। যাঁরাই প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রকে সমর্থন করেন এই রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁদের সকলের ; দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কয়েকটি বৈপ্লবিক শ্রেণীর এ হচ্ছে যুক্ত গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী একনায়কত্ব এবং কৃষি-বিপ্লবের অধ্যায়ের শ্রমিক-কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের থেকে তা ভিন্ন। এই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপলব্ধি এবং তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে নিষ্ঠা সহকারে প্রয়াস চালানো দেশব্যাপী গণতন্ত্রের প্রসারে বিরাটভাবে সহয়তা করবে। 'বাম' অথবা দক্ষিণপন্থী যে-কোন বিচ্যুতি সমগ্র জাতির ক্ষেত্রে খুবই খারাপ ধারণা সৃষ্টি করবে।

৩। হোপেই প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশন আহ্বান এবং হোপেই প্রশাসনিক পরিষদের যে নির্বাচনের প্রস্তুতি সবেমাত্র শুরু হয়েছে, তা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে। উত্তর-পশ্চিম শানসিতে, শানতুং-এ, হুয়াই নদীর উত্তরের এলাকাসমূহে, সুইতে এবং ফুচিয়েন জেলাসমূহে এবং পূর্ব কানসুতে রাজনৈতিক ক্ষমতার নতুন সংস্থা

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রচনা করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। যুক্তফ্রন্টের নীতি অনুযায়ীই আমাদের অগ্রসর হতে হবে এবং দক্ষিণপন্থী বা 'বামপন্থী' যে-কোন প্রবণতা পরিহার করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য করতে হবে। এই মুহূর্তে মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গকে জয় করে পক্ষে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অবহেলার 'বামপন্থী' প্রবণতাই হচ্ছে অধিকতর গুরুতর বিপদ।

৪। রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা প্রসঙ্গে যুক্তফ্রন্টের মূল নীতি অনুসারে আসন বণ্টনের ভাগ হওয়া উচিত এক-তৃতীয়াংশ কমিউনিস্টদের, এক-তৃতীয়াংশ পার্টি বহির্ভূত বামপন্থী প্রগতিশীলদের, এবং এক-তৃতীয়াংশ অর্ন্তবর্তী সেইসব অংশের যাঁরা বাম বা দক্ষিণপন্থী কিছুই নন।

৫। আমাদের এই নিশ্চয়তা বিধান করা চাই, যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহে কমিউনিস্টগণ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং সেইহেতু যে পার্টি-সদস্যরা এক-তৃতীয়াংশ আসন গ্রহণ করবেন তাঁদের খুবই উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন হওয়া চাই। অধিকতর বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত এতে করেই পার্টির নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করার পক্ষে তা যথেষ্ট হবে। সকাল থেকে রাত্রি অবধি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা বা উদ্ধতভাবে আনুগত্য দাবি করার শ্লোগানই নেতৃত্ব নয়, বরং নেতৃত্ব হচ্ছে পার্টির সঠিক নীতিসমূহ এবং আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে আমরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করি সেগুলির সদ্ব্যবহার করে পার্টিবহির্ভূত জনগণকে এমনভাবে দৃঢ় বিশ্বাসী ও শিক্ষিত করে তোলা, যাতে তাঁরা স্বেচ্ছামূলকভাবেই আমাদের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করতে পারেন।

৬। পার্টি-বহির্ভূত প্রগতিশীলদের এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ করতে হবে এই কারণে যে, তাঁরা পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যাপক জনসমষ্টির সংগে যুক্ত রয়েছেন। ওঁদের পক্ষে নিয়ে আসার দিক থেকে এটি তাই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ।

৭। অন্তর্বর্তী অংশসমূহকে এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ করার ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গকে সপক্ষে নিয়ে আসা। এই অংশসমূহকে জয় করে সপক্ষে নিয়ে আসা একগুঁয়েদের বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বর্তমানে এই অংশসমূহের শক্তিকে হিসেবে ধরার ক্ষেত্রে ভুল করা আমাদের চলবে না, এবং এদের সংগে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুবিবেচনার পরিচয় আমাদের দিতে হবে।

৮। অ-কমিউনিস্টদের প্রতি মনোভাব আমাদের হবে সহযোগিতামূলক পার্টিগত অবস্থান তাঁদের যাই হোক এবং যে ধরনেরই হোক, যতক্ষণ তাঁরা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সম্মত থাকবেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সহযোগিতায় রাজী থাকবেন ততক্ষণ এই হবে আমাদের মনোভাব।

৯। ওপরে আসন বরাদ্দ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা পার্টির ঐকান্তিক নীতিরই অভিব্যক্তি এবং কোনমতেই এ ব্যাপারে আমাদের দায়সারা মনোভাব গ্রহণ করা চলবে না। এই নীতিকে কার্যকরী করতে হলে রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থায় কর্মরত পার্টি-সদস্যদের আমাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে অ-কমিউনিস্টদের সংগে সহযোগিতার ব্যাপারে তাদের যে অস্বস্তি দেখা যায় এবং অনাগ্রহজনিত সংকীর্ণতার যে প্রকাশ দেখা যায় তা দূর করার জন্য এবং তাদের উৎসাহিত করে তুলতে হবে গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত কার্যধারার অনুসরণে, অর্থাৎ কোন কাজ করার আগে পার্টি-বহির্ভুতদের সংগে আলাপ-আলোচনা করা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি আদায় করার ব্যাপারে। একই সংগে আমাদের সাধ্যমতো সর্বপ্রকারে পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করতে হবে, যাতে তাঁরা বিভিন্ন সমস্যার ওপর তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন এবং তাঁদের পরামর্শের প্রতি আমাদের মনোযোগ প্রদান করতেই হবে। আমাদের কোন সময়ই এটা ভাবা চলবে না যে, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যেহেতু আমাদের করায়ত্ত রয়েছে, অতএব আমরা নিঃশর্তে আমাদের সিদ্ধান্ত ওদের মেনে নিতে বাধ্য করাতে পারি এবং এভাবে আমাদের অভিমত তারা যাতে খুশিমনে ও সর্বান্তঃকরণে কার্যকরী করতে পারে তার জন্য পার্টি-বহির্ভূত লোকদের জয় করে সপক্ষে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা বুঝি না করলেও চলে ।

১০। ওপরে যে সংখ্যাগত হিসেব আসন বরাদ্দ করা সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে তা যান্ত্রিকভাবে পূরণ করার মতো অনড় কোন ভাগ-বাঁটোয়ারা নয়। এটা হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে মোটামুটিরকমের একটা অনুপাত, যা প্রতিটি অঞ্চলকে তাদের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তদনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নতম স্তরে এই অনুপাতের কিছু অদলবদল করা যেতে পারে, যাতে করে জমিদার ও বদ অভিজাতদের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাদিতে সংগোপনে ঢুকে পড়া প্রতিহত করা সম্ভব হয়। যেসব জায়গায় এ ধরনের সংস্থাসমূহ বেশ কিছুকাল ধরে চালু রয়েছে—যেমন, শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলে, মধ্য হোপেই অঞ্চলে তাইহাং পার্বত্য অঞ্চলে এবং দক্ষিণ হোপেই অঞ্চলে, সেখানে এই মূল নীতির নিরিখে নীতিটির পুর্নবিচার করা উচিত। যখন নতুন একটি রাজনৈতিক শক্তির সংস্থা স্থাপিত হবে, তখনই এই মূল নীতিটি কার্যকরী করা চাই।

১১। আঠারো বছর বয়স হয়েছে এবং যিনি প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী এমন প্রতিটি চীনাই ভোটদানের অধিকারী, শ্রেণী, জাতিসত্তা, স্ত্রী-পুরুষ, ধর্ম, পার্টিগত অবস্থান ও শিক্ষাগত মান নির্বিশেষে তাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকারী—এই হবে যুক্তফ্রন্টের ভোটাধিকার সম্পর্কিত নীতি। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহ হওয়া চাই জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত।

তাদের সাংগঠনিক রূপ হওয়া চাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১২। যুক্তফ্রণ্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহের সমস্ত মুখ্য নীতি-বিষয়ক ব্যবস্থার মৌলিক সূচনাবিন্দু হওয়া চাই জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, জাপানকে প্রতিরোধে নিযুক্ত জনগণের আরক্ষা, জাপ-বিরোধী সমস্ত সামাজিক স্তরের স্বার্থের উপযুক্ত বিন্যাস, শ্রমিক ও কৃষকদের জীবিকার মানোন্নয়ন এবং দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন।

১৩। রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহে যে পার্টি-বহির্ভুত লোকজনেরা কাজ করবেন তাঁদের কমিউনিস্টদের মতো জীবনযাপন, কথাবার্তা বলা ও কাজকর্ম করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, অন্যথায় তাঁরা অসন্তুষ্ট হতে পারেন বা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন।

১৪। কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক ব্যুরোসমূহ, সমস্ত আঞ্চলিক পার্টি কমিটি এবং সেনাবাহিনীর সকল ইউনিটের প্রধানদের এই মর্মে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন পার্টি-সদস্যদের কাছে এই নির্দেশটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহে আমাদের কাজকর্ম পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করা যেন সুনিশ্চিত হয়।

জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল সাম্প্রতিক সমস্যাবলী

১১ই মার্চ, ১৯৪০

১। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(ক) চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধ জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে গুরুতর আঘাত হেনেছে এবং বৃহৎ আকারের সামরিক আর কোন আক্রমণ পরিচালনার ব্যাপারে তা ইতিমধ্যেই অসমর্থ হয়ে পড়েছে, এবং ফলে শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার শক্তির অবস্থানগত সম্পর্ক একটি রণনৈতিক অচলাবস্থার স্তরে উপনীত হয়েছে। শত্রু কিন্তু এখনো চীনকে পদানত করার জন্য তার মূল লক্ষ্য দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রয়েছে এবং এই লক্ষ্য সাধনের জন্য জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরানো, পশ্চাদবর্তী অঞ্চলসমূহে তাদের 'ঘিরে ধরে নিশ্চিহ্ন করার' অভিযান তীব্রতর করা এবং তাদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন জোরদার করা ইত্যাদি পন্থার মাধ্যমে তারা তা অনুসরণ করে চলেছে।

(খ) ইউরোপে যুদ্ধের পরিমাণে প্রাচ্যে তাদের অবস্থানসমূহ যে দুর্বল হয়ে পড়ছে, এটা ব্রিটেন ও ফ্রান্স দেখতে পাচ্ছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'পাহাড়ের চূড়ায় বসে থেকে বাঘেদের পারস্পরিক লড়াই' দেখার নীতিই চালিয়ে যাচ্ছে, ফলে প্রাচ্যদেশের একটি মিউনিক সম্মেলনের[১] কথা এই মূহূর্তে ওঠেই না।

(গ) বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে, সোভিয়েত ইউনিয়ন নতুন নতুন সাফল্যলাভ করেছে এবং চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধে সক্রিয় সমর্থনের নীতিটি সোভিয়েত ইউনিয়ন অব্যাহত রেখেছে।

(ঘ) জাপ-সমর্থক বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী জাপানের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে এখন ক্রীড়নকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত। ইউরোপীয়দের সমর্থক এবং আমেরিকানদের সমর্থক বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী জাপানকে প্রতিরোধ করে চলতে পারে, কিন্তু এদের আপোষে উপনীত হওয়ার প্রবণতা গুরুতরই রয়ে গেছে। ওরা একটি দুমুখো নীতি অনুসরণ করছে। জাপানের সংগে মোকাবিলায় বিভিন্ন অ-কুওমিনতাঙ শক্তিসমূহের সংগে তারা যেমন একদিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাইছে, তেমনি তাদের

ইয়েনানে পার্টির প্রবীণ কর্মীদের একটি রিপোর্টের কাঠামো হিসেবে কমরেড মাও সে-তুঙ এই রূপরেখাটি লিখেছিলেন।

এবং বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে তারা দমন করতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের একগুঁয়েদের অংশটি এদের নিয়েই গঠিত।

(ঙ) মাঝারি বুর্জোয়া ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবৃন্দ এবং আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী চক্রগুলো-সহ অন্তবর্তী শক্তিগুলো প্রগতিশীল ও একগুঁয়েদের মধ্যে প্রায়ই মাঝামাঝি একটা অবস্থান গ্রহণ করছে—একদিকে বৃহৎ জমিদারবর্গ ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রধান প্রধান শাসক মহলগুলোর সংগে তাদের দ্বন্দ্ব এবং অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকজনগণের সংগে তাদের দ্বন্দ্বের জন্য। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের মাঝারি অংশটি এদের নিয়ে গঠিত।

(চ) সম্প্রতি কমিউনিস্টদের পরিচালিত শ্রমিক, কৃষক ও শহরের পেটি-বুর্জোয়াগণ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন এবং মুখ্যতঃ এমন সব ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন, যেখানে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশব্যাপী শ্রমিক, কৃষক ও শহরের পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে তাদের প্রভাব খুবই বিরাট এবং মাঝারি শক্তিগুলোর মধ্যেও তাদের প্রভাব যথেষ্ট। যুদ্ধক্ষেত্রে কুওমিনতাঙগণ প্রায় যে পরিমাণ জাপানী সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়ছে সেই সমপরিমাণ জাপানী সৈন্যের বিরুদ্ধেই কমিউনিস্টগণ লড়াই করে চলেছেন। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রগতিশীল অংশটি এদের নিয়ে গঠিত।

এই হচ্ছে চীনের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে অবস্থার অবনতি ঘটা প্রতিহত করার সম্ভাবনা এখনো রয়েছে, সম্ভাবনা রয়েছে তাকে ভালর দিকে নিয়ে যাওয়ার। ১লা ফেব্রুয়ারিতে গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবসমূহ পুরোপুরিই সঠিক।

২। প্রতিরোধ-যুদ্ধে জয়লাভের মৌলিক শর্ত হচ্ছে জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রসার ও সংহতিসাধন। এই লক্ষ্যসাধনের জন্য যে রণকৌশলের প্রয়োজন, তা হল প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিকাশসাধন, মাঝারি শক্তিগুলোকে সপক্ষে নিয়ে আসা এবং একগুঁয়ে শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা ; এগুলো হচ্ছে তিনটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র এবং জাপ বিরোধী সকল শক্তিসমূহের ঐক্যসাধনের জন্য যে পথ গ্রহণ করতে হবে তা হল সংগ্রামের পথ। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের অধ্যায়ে সংগ্রাম হচ্ছে ঐক্যবিধানের পথ আর ঐক্য হচ্ছে সংগ্রামের লক্ষ্য। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যদি ঐক্যের সন্ধান করা হয় তবেই তা বেঁচে থাকবে ; যদি নতি স্বীকারের মধ্য দিয়ে ঐক্যের সন্ধান করা হয় তবে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। পার্টি কমরেডগণ এই সত্য ক্রমেই উপলব্ধি করছেন। কিন্তু এখনো অনেকে রয়েছেন, যাঁরা তা উপলব্ধি করতে পারেননি। কেউ কেউ ভাবছেন সংগ্রামের ফলে যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন দেখা দেবে, আবার কেউ কেউ ভাবছেন সংগ্রাম বেপরোয়াভাবে চালানো যায় ; তাছাড়া অন্যরা মাঝারি শক্তিগুলো

সম্পর্কে ভুল রণকৌশল গ্রহণ করে থাকেন বা একগুঁয়েদের সম্পর্কে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এই সবগুলোই শুধরাতে হবে।

৩। প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে বিকশিত করে তোলার অর্থ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষকজনগণ এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়ার শক্তিগুলোকে গড়ে তোলা, সাহসিকতার সংগে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীকে প্রসারিত করে চলা, ব্যাপক আকারে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাসমূহ প্রতিষ্ঠা করা, সারা দেশব্যাপী কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহ গড়ে তোলা, শ্রমিক, কৃষক যুবক, নারী ও কিশোরদের জাতীয় গণ-আন্দোলন বিকশিত করে তোলা, দেশের সকল জায়গায় বুদ্ধিজীবীবৃন্দকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসা এবং গণতন্ত্রের সপক্ষে সংগ্রাম হিসেবে জনগণের মধ্যে সাংবিধানিক সরকারের আন্দোলন প্রসারিত করে দেওয়া । প্রগতিশীল শক্তিসমূহের একটানা প্রসারই হচ্ছে একমাত্র পথ যাতে করে অবস্থার অবনতি প্রতিহত করা যাবে, আত্মসমর্পণ ও ভাঙন প্রতিরোধ করা যাবে এবং প্রতিরোধের যুদ্ধের বিজয়ের দৃঢ় ও দুর্জয় ভিত্তি গড়ে তোলা যাবে। কিন্তু প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিজয় একটি গুরুতর সংগ্রামের প্রক্রিয়া, যা শুধু নির্মমভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীগণ এবং দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করলেই চলবে না, চালাতে হবে একগুঁয়েদেরও বিরুদ্ধে। কারণ একগুঁয়েরা প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিকাশের বিরুদ্ধাচারী, অন্যদিকে মাঝারি অংশটি এ ব্যাপারে সংশয়গ্রস্ত। একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত সংগ্রাম না চালালে এবং, তার চেয়েও বড় কথা, উল্লেখযোগ্য বাস্তব ফললাভ করতে না পারলে আমাদের পক্ষে তাদের চাপ ঠেকানো বা মাঝারি অংশের সন্দেহ দূর করা সম্ভবপর হবে না। তাহলে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের প্রসারের কোন পথ থাকবে না।

৪। মাঝারি শক্তিগুলোকে জয় করার অর্থ হচ্ছে মাঝারি বুর্জোয়া, আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গ এবং আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী চক্রগুলোকে জয় করা। এদের মধ্যে সুস্পষ্ট তিনটি স্তর রয়েছে। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এরা সবাই মাঝারি শক্তিগুলোর মধ্যে পড়ছে। মাঝারি বুর্জোয়ারাহচ্ছে মুৎসুদ্দিশ্রেণী অর্থাৎ বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে স্বতন্ত্র জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। যদিও শ্রমিকদের সংগে এদের শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বাতন্ত্র্যকে এরা মেনে নেয় না, তবু এরা জাপানকে প্রতিরোধ করতে চায় এবং তারা আরও চায় রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্ত করতে, কারণ অধিকৃত এলাকায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক এরা উৎপীড়িত হচ্ছে এবং কুওমিনতাঙ-অধিকৃত অঞ্চলে বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াগণ কর্তৃক এরা দমিত হয়ে রয়েছে। জাপানকে প্রতিরোধের প্রশ্নে এরা সংযুক্ত প্রতিরোধের পক্ষপাতী, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে এরা নিয়মতান্ত্রিক সরকারের জন্য আন্দোলনের পক্ষপাতী এবং নিজেদের লক্ষ্যসাধনের জন্য এরা প্রগতিশীল ও

একগুঁয়েদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এই স্তরকে জয় করে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতেই হবে। তার পর আসে আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবৃন্দের কথা—এরা হচ্ছে জমিদারশ্রেণীর বামপন্থী অংশ অর্থাৎ বুর্জোয়া চেহারাসম্পন্ন অংশ, যাদের রাজনৈতিক মনোভাব মোটামুটি মাঝারি বুর্জোয়া-শ্রেণীর মতোই। যদিও কৃষকদের সংগে এদের শ্রেণী-দ্বন্দ্ব রয়েছে, তবু বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের সংগেও এদের দ্বন্দ্ব রয়েছে। এরা একগুঁয়েদের সমর্থন করে না এবং তারও আমাদের ও একগুঁয়েদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে নিজেদের আপন রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনের জন্য কাজে লাগাতে চায়। কোনমতেই এই অংশকে আমাদের অবহেলা করা চলবে না এবং আমাদের নীতি হবে আমাদের পক্ষে এদের নিয়ে আসা। এলাকাগতভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে বলা যায়, এদের মধ্যে দুধরনের লোক আছে—এমন একদল লোক আছে যারা তাদের নিজেদের বিশেষ বিশেষ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে, আর তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সৈনিকেরা যারা এভাবে নির্দিষ্ট কোন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে না। প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সংগে যদিও এদের দ্বন্দ্ব রয়েছে কিন্তু যেভাবে এদের স্বার্থের হানি করে আত্মস্বার্থের নীতি অনুসরণ করছে তার জন্য কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় সরকারের সংগেও এদের দ্বন্দ্ব রয়েছে। এরাও নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনের জন্য আমাদের একগুঁয়েদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করতে চায়। আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী এই গোষ্ঠীগুলোর অধিকাংশ নেতারা বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের থেকে আগত, আর তাই যুদ্ধ চলাকালে বিশেষ বিশেষ সময়ে এদের প্রগতিশীল বলে মনে হলেও, খুব দ্রুতই ওরা আবার প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে; এসব সত্ত্বেও যেহেতু কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সংগে এদের দ্বন্দ্ব রয়েছে সেইহেতু একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে যদি আমরা সঠিক নীতি অনুসরণ করতে পারি, তবে এদের নিরপেক্ষ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ওপরে যে তিন ধরনের মাঝারি শক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এদের প্রতি আমাদের নীতি হবে এদের আমাদের সপক্ষে নিয়ে আসা। কিন্তু কৃষকদের ও শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের আমাদের পক্ষে নিয়ে আসার নীতির ও এদেরকে পক্ষে নিয়ে আসার নীতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আর তাছাড়া মাঝারি শক্তিগুলোর প্রতিটি মহলের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে বিভিন্নতা রয়েছে। কৃষক এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের জয় করে পক্ষে আনতে হবে মূল মিত্র হিসেবে, মাঝারি শক্তিগুলোকে পক্ষে নিয়ে আসতে হবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিত্র হিসেবে। মাঝারি শক্তিগুলোর মধ্যে মাঝারি বুর্জোয়া ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গের লোকেরা জাপানের বিরুদ্ধে ও জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সাধারণ সংগ্রামের ব্যাপারেও আমাদের সংগে যোগ দিতে পারে, কিন্তু কৃষি-বিপ্লবকে এরা ভয় করে। একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এদের কেউ কেউ

সীমাবদ্ধ মাত্রায় যোগ দিতে পারে, অন্যরা, সহৃদয় নিরপেক্ষতা সহকারে বা হয়তো উদাসীন নিরপেক্ষতা সহকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখতে পারে। কিন্তু যুদ্ধে আমাদের সংগে যোগ দেওয়া ছাড়া একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে এই আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলো বড়জোর সাময়িক একটি নিরপেক্ষতার মনোভাব অনুসরণ করবে। কিন্তু যেহেতু তারা নিজেরা বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের থেকে আগত তাই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের সংগে যোগদানে তারা অনিচ্ছুক। মাঝারি শক্তিগুলোর মধ্যে দোদুল্যমানতার প্রকাশ রয়েছে এবং ভাঙন তাদের মধ্যে দেখা দিতে বাধ্য, আর এই দোদুল্যমানতার মনোভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে আমাদের উচিত হবে এদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলা ও সমালোচনা করা।

জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের অধ্যায়ে মাঝারি শক্তিগুলোকে জয় করে পক্ষে নিয়ে আসা আমাদের দিক থেকে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, কিন্তু বেশ কিছু শর্তাধীনেই শুধু তা সম্পাদন করা যেতে পারে। সেই শর্তগুলো হচ্ছে ঃ (১) আমাদের যথেষ্ট শক্তি থাকা চাই ; (২) তাদের স্বার্থের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকা চাই ; এবং (৩) একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের দৃঢ়চিত্ত হওয়া চাই এবং আমাদের ক্রমাগত বিজয়ের পথে এগিয়ে যাওয়া চাই। এই শর্তগুলো যদি পূর্ণ করা না হয় তবে মাঝারি শক্তিগুলো দোদুল্যমানতা প্রদর্শন করবে, এমনকি আমাদের বিরুদ্ধে একগুঁয়েদের আক্রমণকালে ওরা ওদের মিত্র হয়েও দাঁড়াতে পারে কারণ একগুঁয়েরাও আমাদের নিঃসঙ্গ করার জন্য মাঝারি শক্তিগুলোকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে যেতে যথাসাধ্য করছে। চীনে মাঝারি শক্তিগুলোর প্রচুর প্রভাব রয়েছে এবং একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে ওরা মাঝে মাঝে চূড়ান্ত নির্ধারক হয়ে উঠতে পারে ; তাই এদের সংগে ব্যবহারের সময় আমাদের খুবই সুবিবেচনা সহকারে চলা চাই।

৫। বর্তমানে একগুঁয়ে শক্তিগুলো হচ্ছে বৃহৎ জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী। এই মুহূর্তে এরা জাপানের কাছে আত্মসমর্পণকারী একটি গোষ্ঠী এবং জাপানকে প্রতিরোধে আগ্রহী এরকম অন্য একটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ; এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার যে অংশ জাপানকে প্রতিরোধে আগ্রহী, তারা যে অংশ জাপানের কাছে ইতিমধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে তার থেকে ভিন্ন হয়ে পড়েছে। এরা দুমুখো একটা নীতি অনুসরণ করে। এরা এখনো জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যের পক্ষপাতী কিন্তু সংগে সংগে এরা তাদের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি হিসেবে প্রগতিশীলদের দমন করার চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে। এরা এখনো যেহেতু জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যের পক্ষপাতী, তাই আমরা জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টে এদের রাখার জন্য চেষ্টা করতে ও

ফ্রণ্টে ওদের রেখে দিতে পারি ; আর যত বেশি সময় তা করতে পারব ততই মঙ্গল। এই অংশকে সপক্ষে রাখার ও এদের সংগে সহযোগিতা করার নীতিকে অবহেলা করা কিংবা তারা ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে বা এরা কমিউনিস্ট বিরোধী যুদ্ধ শুরু করে দেওয়ার মুহূর্তে এসে গেছে—এ কথা মনে করা ভুল হবে। কিন্তু একই সংগে এদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কৌশল আমাদের গ্রহণ করতে হবে, তার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে মতাদর্শগত রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে, কারণ সারা দেশব্যাপী এরা অনুসরণ করে চলেছে প্রগতিশীলদের দমন করার প্রতিক্রিয়াশীল একটি নীতি, কারণ বিপ্লবী জনগণের তিনটি মূল নীতির সাধারণ কর্মসূচী কার্যকরী করার পরিবর্তে তা কার্যকরী পথে আমাদের সচেষ্টাকে গোঁয়ারের মতো ওরা বিরোধিতা করে চলে এবং তদুপরি ওরা আমাদের যে সীমা বেঁধে দিয়েছে তা ছাড়িয়ে যেতে যাতে আমরা না পারি তার জন্য ওরা প্রচণ্ড চেষ্টা করেছে, অর্থাৎ ওরা যেভাবে নিজেরা একটা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় আমাদেরও সেখানে আটকে রাখতে তারা চেষ্টা করছে এবং তারচেয়েও বড় কথা, তারা চেষ্টা করছে আমাদের গিলে ফেলতে, আর তা না পারলেই আমাদের বিরুদ্ধে ওরা চালাচ্ছে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সামরিক চাপ। একগুঁয়েদের দুমুখো নীতির মোকাবিলায় এই হচ্ছে আমাদের বৈপ্লবিক দ্বৈত নীতি এবং এই হচ্ছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐক্যের সন্ধানে আমাদের নীতি। মতাদর্শগত ক্ষেত্রে যদি আমরা সঠিক বৈপ্লবিক তত্ত্ব উপস্থিত করতে পারি। এবং ওদের প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বকে কঠোর আঘাত হানতে পারি, যদি আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সময়োপযোগী রণকৌশল গ্রহণ করতে পারি এবং ওদের কমিউনিস্ট-বিরোধী ও প্রগতি-বিরোধী নীতিসমূহকে কঠোর আঘাত হানতে পারি, এবং সামরিক ক্ষেত্রে যদি আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারি এবং ওদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানতে পারি—তাহলে ওদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির কার্যকারিতার ক্ষেত্রকে আমরা সংকুচিত করে রাখতে সমর্থ হব এবং প্রগতিশীল শক্তি সমূহের মর্যাদা স্বীকার করে নিতে ওদের বাধ্য করতে পারব ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের প্রসার সাধনে, মাঝারি শক্তিগুলোকে পক্ষে নিয়ে আসার ব্যাপারে এবং একগুঁয়েদের বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে আমরা সমর্থ হব। তাছাড়া, একগুঁয়েদের মধ্যে যারা এখনো জাপানকে প্রতিরোধের ব্যাপারে আগ্রহী, জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টে এদের অংশগ্রহণকে আমরা আরও অধিককাল স্থায়ী করতে পারব এবং এর আগে ব্যাপক আকারে যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিয়েছিল তা পরিহার করতে আমরা সমর্থ হব। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের অধ্যায়ে একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র গ্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে ওদের আক্রমণকে প্রতিহত করে প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে রক্ষা করা এবং তাদের বিকাশকে সহায়তা

করাই নয়, বরং জাপানের বিরুদ্ধে একগুঁয়েদের প্রতিরোধকে দীর্ঘায়িত করা এবং ব্যাপক আকারে গৃহযুদ্ধ পরিহার করার জন্য ওদের সংগে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখাও বটে। সংগ্রাম ছাড়া এই প্রগতিশীল শক্তিগুলো একগুঁয়ে শক্তিদের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যুক্তফ্রন্টের অবসান ঘটবে, শত্রুর কাছে একগুঁয়েদের আত্মসমর্পণের থেকে নিবৃত্ত করার আর কিছু থাকবে না এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ হিসেবে, অবস্থার ক্ষেত্রে একটা সহায়ক পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য এবং ব্যাপক আকারে গৃহযুদ্ধ পরিহার করার ব্যাপারে অপরিহার্য। আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতা এই সত্যকেই সপ্রমাণ করেছে।

অবশ্য জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের অধ্যায়ে একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে কয়েকটি মূল নীতি আমাদের মেনে চলতেই হবে। প্রথম হচ্ছে, আত্মরক্ষার নীতি। আক্রান্ত না হলে আমরা আক্রমণ করব না, যদি আমরা আক্রান্ত হই তবে নিশ্চয়ই পাল্টা আক্রমণ আমরা করব। তার অর্থ হচ্ছে, প্ররোচনা ছাড়া অন্যদের আমরা কখনই আক্রমণ করব না কিন্তু আক্রান্ত হলে আঘাতটির বদলা নিতে ব্যর্থ হলে চলবে না। এই হচ্ছে আমাদের সংগ্রামের আত্মরক্ষামূলক প্রকৃতি। একগুঁয়েদের সামরিক আক্রমণকে দৃঢ়ভাবে, সম্পূর্ণরূপে, সামগ্রিকভাবে ও পুরোপুরিভাবে চুরমার করে দিতেই হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, বিজয়ের নীতি। বিজয়ের ব্যাপারে সুনিশ্চিত না হলে আমরা লড়াই করতে যাব না ; পরিকল্পনা, প্রস্তাব ও সাফল্যের নিশ্চয়তা ছাড়া আমরা লড়াই করতে যাব না। একগুঁয়েদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে কাজে লাগাতে আমাদের জানতে হবে এবং একই সময়ে তাদের বহুজনের সংগে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে আমাদের চলবে না বরং তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধেই আমাদের প্রথম আঘাত হানতে হবে। এখানেই নিহিত রয়েছে আমাদের সংগ্রামের সীমাবদ্ধ প্রকৃতিটি। তৃতীয় হচ্ছে, সন্ধির নীতি। একগুঁয়েদের একটি আক্রমণ প্রতিহত করার পর আমাদের জানা চাই কোথায় আমরা থাকব এবং আমাদের ওপর অন্য একটি আক্রমণ পরিচালিত হওয়ার আগে একটা বিশেষ লড়াইকে সমাপ্ত করতে হবে। এই অন্তবর্তী সময়ের জন্য একটা সন্ধি করা চাই। তারপর আমাদের একগুঁয়েদের সংগে ঐক্য স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং যদি ওরা সম্মত থাকে তবে তাদের সংগে শান্তিস্থাপনের চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অবিরাম দিনের পর দিন লড়াই করা চলবে না বা সাফল্যে আত্মহারা হলে চলবে না। এখানে নিহিত রয়েছে প্রতিটি সংগ্রামের সাময়িক প্রকৃতিটি। একগুঁয়েরা যখন একটি নতুন আক্রমণ চালাবে একমাত্র তখনই একটি নতুন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা প্রতিহত করব। অন্য কথায় বলতে গেলে, লড়াইয়ের তিনটি মূলনীতি হচ্ছে 'ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে',

'আমাদের দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে' এবং 'সংযতভাবে' লড়াই করা। ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, আমাদের দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে এবং সংযতভাবে এই ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে আমরা প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে বিকশিত করে তুলতে, মাঝারি শক্তিগুলোকে পক্ষে নিয়ে আসতে এবং একগুঁয়ে শক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারব। এভাবেই আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবার, শত্রুর সংগে আপোষরফা করার অথবা ব্যাপক আকারে গৃহযুদ্ধ বাধাবার আগে একগুঁয়েদের আমরা একাধিকবার ভেবে দেখতে বাধ্য করতে পারব। এমনি করেই পরিস্থিতিতে একটি সহায়ক পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভবপর হবে।

৬। কুওমিনতাঙ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত একটি পার্টি, তারমধ্যে রয়েছে। একগুঁয়েরা, মাঝারি ব্যক্তিরা এবং প্রগতিশীলেরা ; সামগ্রিকভাবে ধরলে, একে একগুঁয়েদের সংগে সমার্থক বলে গণ্য করা চলে না। কিছু কিছু লোক মনে করেন কুওমিনতাঙ সম্পূর্ণভাবে একগুঁয়েদের নিয়েই গঠিত, কারণ তার কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি 'বিদেশী পার্টিসমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাবলীর' মতো প্রতিবিপ্লবী সংঘাত সৃষ্টিকারী হুকুমনামা ঘোষণা করেছে এবং তার সমস্ত শক্তি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে প্রতিবিপ্লবী, সংঘাত সৃষ্টিকারী মনোভাব গোটাদেশের মতাদর্শগত, রাজনীতিগত, ও সামরিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করার জন্য। কিন্তু এটা একটা ভ্রান্ত মনোভাব। কুওমিনতাঙ-এর মধ্যে একগুঁয়েরা এখনো তার নীতিসমূহ চাপিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থানে রয়েছে, কিন্তু সংখ্যাগত দিক থেকে ওরা সংখ্যালঘু ; অন্য দিকে সদস্যদের (যদিও সদস্যরা অনেকে শুধু নামেই সদস্য) অধিকাংশই ধরাবাঁধাভাবে একগুঁয়ে নয়। এই বিষয়টি খুব পরিস্কারভাবে বুঝতে পারলেই কুওমিনতাঙ-এর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে আমরা সদ্ব্যবহার করতে পারব, বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্নতার ভিত্তিতে একটি নীতি অনুসরণ করতে এবং মাঝারি ও প্রগতিশীল অংশের সংগে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য চুড়ান্তটুকু করতে পারব।

৭। জাপ-বিরোধী মুক্তাঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে আমাদের এটা সুনিশ্চিত করা চাই যে, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ক্ষমতাটি জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতা হবে। কুওমিনতাঙ এলাকাসমূহে এখনো এ ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যাঁরা প্রতিরোধ ও গণতন্ত্র এই উভয়কেই সমর্থন করেন অর্থাৎ দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কতিপয় বৈপ্লবিক শ্রেণীর যৌথ গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে সমর্থন করেন, এটা হবে তাঁদের সকলেরই রাজনৈতিক ক্ষমতা। এটা জমিদারশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বের চেয়ে স্বতন্ত্র এবং তা শ্রমিক-কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের থেকেও কড়াকড়িভাবে দেখলে অনেকটা বিভিন্ন। রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থার পদগুলো বরাদ্দ করা চাই নিম্নরূপভাবে ঃ এক-

তৃতীয়াংশ বরাদ্দ হবে শ্রমিকশ্রেণী ও গরিব কৃষকজনগণের প্রতিনিধিত্বকারী কমিউনিস্টদের জন্য ; এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ হবে পেটি-বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্বকারী বামপন্থী প্রগতিশীলদের জন্য এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ হবে মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবৃন্দের প্রতিনিধিত্বকারী মাঝারি ও অন্যান্য শক্তিগুলোর জন্য। একমাত্র দেশদ্রোহী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী শক্তিগুলোই রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহে অংশগ্রহণের অনুপযুক্ত বলে গণ্য হবে। আসন বরাদ্দ সম্পর্কিত এই সাধারণ নিয়মটি প্রয়োজনীয় কারণ অন্যথায় যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার নীতিটি অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না। আসন বরাদ্দ সম্পর্কিত এই ব্যবস্থা আমাদের পার্টির ঐকান্তিক নীতিরই প্রকাশ এবং সুবিবেচনার সংগে তাকে কার্যকরী করা চাই ; এখানে কোন দায়সারা ভাব থাকা চলবে না। এটা হচ্ছে একটা ব্যাপক নিয়ম, বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী তা প্রয়োগ করতে হবে এবং যান্ত্রিকভাবে সেটা পূরণ করে গেলেই হবে না। একেবারে নিম্নতম স্তরে অনুপাতটিকে খানিকটা রদবদল করে নেওয়া চলতে পারে, জমিদারগণ ও বদ অভিজাতবৃন্দের প্রাধান্যকে প্রতিহত করার জন্য কিন্তু এই নীতির মৌল মনোভাবটিকে লংঘন করা চলবে না। ঐসব সংস্থার অ-কমিউনিস্টগণের পার্টিগত যোগাযোগ আছে কিনা বা থাকলে তাদের পার্টিগত যোগাযোগগুলো কী, তা নিয়ে দুর্ভাবনার আমাদের প্রয়োজন নেই। যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীন এলাকাসমূহে কুওমিনতাঙ বা অন্য যে-কোন পার্টি হোক, সকল রাজনৈতিক পার্টিকেই, যতক্ষণ তারা সহযোগিতা করবে এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করবে না ততক্ষণ, তাদের আইনসঙ্গত রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে হবে। ভোটাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে নীতি হল প্রতিটি চীনার যখনই আঠারো বছর বয়স হবে এবং যিনিই প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী—শ্রেণী, জাতিসত্তা, পার্টিগত যোগাযোগ, নারী-পুরুষ, ধর্ম ও শিক্ষাগত মান নির্বিশেষে তাদের সকলেরই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থাকবে। যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে এবং তার পরে জাতীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য তা পেশ করতে হবে। তাদের সংগঠনের রূপের ভিত্তি হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহের দ্বারা গৃহীত সকল প্রধান ব্যবস্থাবলীর মূল সূচনাবিন্দু হবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, সুপ্রমাণিত দেশদ্রোহী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরোধিতা, জাপানকে যারা প্রতিরোধ করেছেন তাঁদের রক্ষা করা, জাপ-বিরোধী সকল সামাজিক স্তরের স্বার্থের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য বিধান করা এবং শ্রমিক ও কৃষকদের জীবিকার মান উন্নত করা। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা সমগ্র দেশে বিরাট প্রভাব সঞ্চার করবে এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্তরে যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার

তা একটি আদর্শ হয়ে উঠবে। সুতরাং এই নীতিটিকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং সমগ্র পার্টি কমরেডগণ কর্তৃক দৃঢ়চিত্তভাবে তা কার্যকরী করতে হবে।

৮। প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে বিকশিত করে তোলা, মাঝারি শক্তিগুলোকে জয় করে পক্ষে নিয়ে আসা এবং একগুঁয়েদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমাদের সংগ্রামে আমাদের দিক থেকে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে অবজ্ঞা করা চলবে না, কারণ একগুঁয়েরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এদের সপক্ষে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সুতরাং সমস্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সপক্ষে নিয়ে আসার এবং তাদের পার্টির প্রভাবে নিয়ে আসার নীতিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যতঃ একটি অপরিহার্য নীতি।

৯। আমাদের প্রচারাভিযানে নিম্নলিখিত কর্মসূচীর ওপর আমাদের জোর দিতে হবে।

(ক) জাপানের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রতিরোধের জন্য সাধারণকে জাগিয়ে তুলে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ঘোষণাবাণীকে কার্যকরী করা ;

(খ) জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে এবং পরিপূর্ণ জাতীয় মুক্তি ও চীনের আভ্যন্তরীণ সকল জাতীসত্তার সমতার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে জাতীয়তাবাদের মূল নীতিকে কার্যকরী করা ;

(গ) জাপানকে প্রতিরোধের জন্য এবং জাতিকে রক্ষা করার জন্য জনগণকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা প্রদান করে, সমস্ত স্তরে সরকারকে নির্বাচন করার সুযোগ দিয়ে এবং জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রের মূল নীতিকে কার্যকরী করা :

(ঘ) অতিরিক্ত করের বোঝা ও বিভিন্ন ধরনের লেভি বাতিল করে দিয়ে, জমির খাজনা ও সুদ কমিয়ে দিয়ে, আট ঘণ্টা কাজের দিন সুনিশ্চিত করে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশসাধন করে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার মূল নীতিকে কার্যকরী করা ; এবং

(ঙ) 'তরুণ অথবা প্রবীণ, উত্তর অথবা দক্ষিণের প্রতিটি ব্যক্তিকেই জাপানকে প্রতিরোধ করার এবং দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে'—চিয়াং কাই-শেকের এই ঘোষণাকে কার্যকরী করা।

কুওমিনতাঙ-এর নিজের প্রকাশিত কর্মসূচীতেই এইসব কয়টি বিষয় রয়েছে, যা আবার কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্টদের যুক্ত কর্মসূচীও বটে। কিন্তু কুওমিনতাঙ জাপানকে প্রতিরোধ করা ছাড়া এই কর্মসূচীর আর কোন অংশই কার্যকরী করেনি; একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোই তা কার্যকরী করতে সক্ষম। এটি যথেষ্ট সরল একটি কর্মসূচী এবং ব্যাপকভাবে সকলেরই তা জানা আছে, তবু অনেক কমিউনিস্ট তাকে জনগণকে সমবেত করার এবং একগুঁয়েদের বিচ্ছিন্ন করার কাজে

ব্যবহার করতে ব্যর্থ হন। এখন থেকে এই কর্মসূচীর পাঁচটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে এবং জনসাধারণের কাছে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি, ইস্তাহার, প্রচারপত্র, নিবন্ধ, বক্তৃতা, বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। কুওমিনতাঙ এলাকাসমূহে এটি এখনো একটি প্রচারমূলক কর্মসূচী, কিন্তু অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী যেসব অঞ্চলে উপনীত হতে পেরেছে সেখানে এই কর্মসূচী ইতিমধ্যেই কার্যকরী হচ্ছে। এই কর্মসূচী অনুসারে কাজ করে আমরা আইনানুগভাবেই চলছি এবং একগুঁয়েরা যখন তা কার্যকরী করার বিরোধিতা করছে তখন তারাই আইন-বহির্ভূত কাজ করছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে কুওমিনতাঙ-এর এই কর্মসূচী মূলতঃ আমাদের কর্মসূচীরই অনুরূপ, কিন্তু কুওমিনতাঙ এর মতাদর্শ সম্পূর্ণতঃ কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শের থেকে পৃথক। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই সাধারণ কর্মসূচীকেই আমাদের বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমরা কুওমিনতাঙ-এর মতাদর্শকে অনুসরণ করব না।

টীকা

১। 'প্রাচ্যদেশের মিউনিক' প্রসঙ্গে রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের 'আত্ম সমর্পণবাদী কার্যকলাপের বিরোধিতা করুন' নামক রচনাটির ৩নং টীকা দেখুন।

জাপ-বিরোধী শক্তিগুলোকে অব্যাহতভাবে প্রসারিত করুন এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করুন

৪ঠা মে, ১৯৪০

১। শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী সকল অঞ্চলসমূহে এবং যুদ্ধের এলাকাসমূহে বিশেষত্বের ওপর জোর না দিয়ে জোর দেওয়া চাই অভিন্নতার ওপর ; এবং সেটা না করা ভুল হবে। প্রত্যেক অঞ্চলেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের সকলের অভিন্নতা হচ্ছে এখানেই যে, তারা সবাই শত্রুর মুখোমুখী এবং সকলেই প্রতিরোধ-যুদ্ধে লিপ্ত ; উত্তরে, মধ্যাঞ্চলে বা দক্ষিণ চীনে, ইয়াংসি নদীর উত্তর অথবা দক্ষিণ অঞ্চলে হোক , সমতলে হোক, পর্বতে বা লেক অঞ্চলে হোক এবং যুদ্ধরত বাহিনী অষ্টম রুট বাহিনী, নয়া চতুর্থ বাহিনী বা দক্ষিণ চীন গেরিলা বাহিনী[১] হোক— তারা সকলেই প্রতিরোধ-যুদ্ধে লিপ্ত। এ থেকে বোঝা যায়, সব অবস্থাতেই আমাদের সম্প্রসারণ করা চাই এবং তা করতেই হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি বারবার এই সম্পসারণের নীতিটি আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছে। সম্প্রসারণ বলতে বোঝায় শত্রু-অধিকৃত সকল অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং কুওমিনতাঙ-এর আরোপিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ থাকা চলবে না, কুওমিনতাঙ এর অনুমোদিত সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, তাদের

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও-সে-তুঙ এই নির্দেশটি রচনা করেছিলেন এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরোকে উদ্দেশ্য করে তা লিখিত হয়েছিল। ঐ নির্দেশটি লেখার সময় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরোর সম্পাদক কমরেড সিয়াং ইং দক্ষিণপন্থী মনোভাব পোষণ করতেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন অনুসরণের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন। জনগণকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে পুরোপুরি উদ্বুদ্ধ করতে তিনি সাহস পাননি এবং ঘাঁটি এলাকা প্রসারের ব্যাপারে জাপানী অধিকৃত এলাকাসমূহে গণফৌজ প্রসারিত করার ব্যাপারেও সাহস পাননি। তিনি কুওমিনতাঙ-এর প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের সম্ভাবনার গুরুত্ব যথেষ্টভাবে উপলব্ধি করেননি আর তাই এই আক্রমণের জন্য মানসিকভাবে ও সাংগঠনিকভাবে তিনি অপ্রস্তুত

কাছ থেকে সরকারী অনুমোদকের আশা করে বসে থাকলে চলবে না অথবা উচ্চতর কর্তাদের কাছ থেকে পাওয়া আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না, বরং তার পরিবর্তে অবাধে সশস্ত্র বাহিনীকে প্রসারিত করে যেতে হবে, এবং স্বাধীনভাবে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করে যেতে হবে, স্বাধীনভাবে ঐসব অঞ্চলের জনসাধারণকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহ গড়ে তুলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিয়াংসু প্রদেশে কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্যক্তিবর্গ যেমন কু চু-তুং লেং সিন এবং হান তে-চিন[২] প্রভৃতির মৌখিক আক্রমণ, বাধা নিষেধ ও নিপীড়ন সত্ত্বেও আমাদের কর্তব্য হবে পশ্চিমে নানকিং থেকে পূর্বে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত, দক্ষিণে হাংচৌ থেকে উত্তরে সুচৌ পর্যন্ত যত বেশি সংখ্যক জেলায় সম্ভব আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, যত দ্রুত সম্ভব তা প্রতিষ্ঠা করা, একটানা ও ধারাবাহিকভাবে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; আমাদের কর্তব্য হবে স্বাধীনভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে প্রসারিত করা, রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা স্থাপন করা, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য কর ধার্য ও আদায় করার জন্য রাজস্ব সংগ্রহের দপ্তর স্থাপন করা এবং কৃষির উন্নতির জন্য, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য অর্থনৈতিক সংস্থা স্থাপন করা, বিপুল সংখ্যক কর্মীবাহীনীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায়তন স্থাপন করা। কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিমধ্যেই আপনাদের নির্দেশ দিয়েছে জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনীকে বৃদ্ধি করে এক লক্ষে পরিণত করতে এবং সম-সংখ্যক রাইফেল সংগ্রহ করতে, কিয়াংসুর শত্রুর লাইনের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে ও চেকিয়াং প্রদেশে এই বছর শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে। আপনারা কী বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ? আগে সুযোগ হারিয়েছেন এবং আবার এই বছরও যদি সুযোগ হারান, অবস্থা তাহলে আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

ছিলেন। নির্দেশটি যখন দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীর ব্যুরোতে পৌঁছাল কমরেড চেন ঈ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরোর সদস্য ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর কম্যাণ্ডার হিসেবে তৎক্ষণাৎ তা কার্যকরী করেন, কিন্তু কমরেড সিয়াং ইং তা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেননি, কাজেই চিয়াং কাই-শেক যখন দক্ষিণ আনহুই ঘটনাটি ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে ঘটাল তিনি তখন দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় ছিলেন, ফলে ঐ ঘটনায় আমাদের নয় হাজার সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং কমরেড সিয়াং ইং নিজেও নিহত হন।

২। ঠিক এমন একটা সময়ে যখন কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুঁয়েরা তাদের কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার, সীমাবদ্ধ করে রাখার এবং লড়াই করে শেষ করার নীতিতে একগুঁয়ের মতো অবিচল থেকে জাপানের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত, তখন আমাদের ঐক্যের ওপর নয়, জোর দেওয়া চাই সংগ্রামের ওপর। সেটা করা হবে গুরুতর ভুল। সুতরাং তত্ত্বগত, রাজনৈতিক অথবা সামরিক ক্ষেত্রে একটি নীতিগত বিষয় হিসেবেই আমাদের কর্তব্য হবে কমিউনিস্ট-বিরোধী একগুঁয়েদের যে মৌখিক আক্রমণ, প্রচারাভিযান, আদেশ ও আইনকানুন কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার, সীমাবদ্ধ করে রাখার ও বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে রচিত— দৃঢ়ভাবে তার সবগুলির প্রতিরোধ করা এবং এ সবের প্রতি দৃঢ় সংগ্রামই হবে আমাদের মনোভাব। এই সংগ্রাম চালাতে হবে ন্যায্য ভিত্তির নীতির ওপর দাঁড়িয়ে, আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক অবস্থান থেকে এবং সংযমের সংগে, অর্থাৎ আত্মরক্ষা, বিজয় ও সন্ধির নীতির ওপর দাঁড়িয়ে—যার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি বাস্তব সংগ্রামই হবে আত্মরক্ষামূলক, সীমাবদ্ধ ও সাময়িক প্রকৃতির। সামনে সমান বদলার ব্যবস্থাই আমাদের নিতে হবে এবং কমিউনিস্ট বিরোধী একগুঁয়েদের সকল প্রতিক্রিয়াশীল মৌখিক আক্রমণ, প্রচারাভিযান, আদেশ ও আইন-কানুনগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রাম আমাদের চালাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ওরা যখন আমাদের কাছে দাবি জানিয়ে ছিল আমাদের চতুর্থ ও পঞ্চম সৈন্যদলকে দক্ষিণে সরিয়ে নিতে হবে,[৩] আমরা তখন জোর দিয়ে পাল্টা দাবি জানালাম যে তা করা একান্তই অসম্ভব। যখন ওরা দাবি জানাল যে, ইয়ে ফেই এবং চাং য়ুন-ই'র অধীন ইউনিটগুলিকে দক্ষিণে সরিয়ে নিতে হবে[৪], আমরা তার পাল্টা হিসেবে অনুমতি চাইলাম এই ইউনিটগুলির একটি অংশকে উত্তরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ; তারা যখন আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল যে, আমরা তাদের বাধ্যতামূলক সৈন্যসংগ্রহের পরিকল্পনার ক্ষতিসাধন করছি, আমরা তাদের আমাদের নয়া চতুর্থ বাহিনীর সৈন্য সংগ্রহের এলাকা প্রসারিত করে দেবার জন্য বললাম ; তারা যখন বলল যে, আমরা ভুল প্রচারকার্য চালাচ্ছি, আমরা তাদের সকল প্রকার কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারকার্য বন্ধ করতে বললাম এবং 'সংঘর্ষ' সৃষ্টির সকল হুকুমনামা ও আদেশ খারিজ করে দিতে বললাম ;আর তারা যখন আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাবে, আমাদের তখন পাল্টা তাকে একেবারে চুরমার করে দিতে হবে। সমানে সমানে বদলা নেওয়ার আমাদের এই নীতির ব্যাপারে আমরা ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি। আর যখন আমরা ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, তখন শুধু আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিই যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে

তা নয়, বরং আমাদের সৈন্যদলের প্রতিটি ইউনিটেরই উচিত হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। চাং য়ুন-ই লিন পিন সিয়েনের বিরুদ্ধে যা করেছিলেন এবং লী সিয়েন-নিয়েন লী সুং-জেনের[৫] বিরুদ্ধে যা করেছিলেন—সে দুটিই হচ্ছে নিম্নতর স্তর থেকে ওপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জ্ঞাপনের চমৎকার উদাহরণ। একগুঁয়েদের প্রতি এ ধরনের শক্ত মনোভাব এবং ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে এবং সংযতভাবে লড়াই করাই হচ্ছে আমাদের দমন করার ব্যাপারে একগুঁয়েদের খানিকটা ভয় পাইয়ে দেওয়ার, কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করা, সীমাবদ্ধ করে রাখার ও লড়াই করে শেষ করে দেওয়ার কার্যকলাপের পরিধি সংকুচিত করার, আমাদের আইনসঙ্গত মর্যাদা স্বীকার করে নিতে তাদের বাধ্য করার এবং একটা ভাঙ্গন সৃষ্টি করার আগে তাদের একাধিকবার চিন্তা করতে বাধ্য করার একমাত্র পথ। সুতরাং আত্মসমর্পণের বিপদ পরিহার করার, পরিস্থিতিতে উন্নততর পরিবর্তন নিয়ে আসার এবং কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতা জোরদার করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ হচ্ছে সংগ্রাম। আমাদের পার্টি ও সেনাবাহিনীর মধ্যেও একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে অবিচল এই সংগ্রাম পরিচালনাই হচ্ছে একমাত্র পথ যা আমাদের সংগ্রামী মনোভাবকে উন্নততর করবে, আমাদের সাহসিকতার পরিপূর্ণ উন্মোচন ঘটাবে, আমাদের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করবে, আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং আমাদের সেনাবাহিনী ও পার্টিকে সুসংহত করে তুলবে। অন্তবর্তী অংশসমূহের ক্ষেত্রে ও একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামই হচ্ছে একমাত্র পথ, যাতে করে, দোদুল্যমানদের জয় করে পক্ষে নিয়ে আসা যাবে, সহানুভূতিশীলদের সহায়তা করা যাবে—অন্য আর কোন পথ নেই। একইভাবে সংগ্রামই হচ্ছে একমাত্র নীতি যার সাহায্যে সমগ্র পার্টি ও সমগ্র সেনাবাহিনীর মানসিক দিক থেকে দেশব্যাপী সম্ভাব্য জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য সজাগ থাকাটা সুনিশ্চিত হবে এবং তাদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে তারা প্রস্তুত থাকবে। অন্যথা হলে ১৯২৭ সালের ভুলেরই[৬] পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

৩। বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়নকালে আমাদের এটা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে আত্মসমর্পণের বিপদ যেমন নিদারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি তা পরিহার করাও সম্ভব। বর্তমান সামরিক সংঘর্ষগুলি এখনো আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ এবং তা দেশজোড়া রূপ গ্রহণ করেনি। এটা হচ্ছে আমাদের বিরোধীদের রণনীতিগত দিক থেকে পরখ করে দেখার ব্যাপার, এখনো তা 'কমিউনিস্টদের দমনের' ব্যাপক আকারের রূপ নেয়নি। এগুলি হচ্ছে আত্মসমর্পণের প্রস্তুতির পথে পদক্ষেপ, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা আত্মসমর্পণের

ঠিক পূর্ববর্তী ধাপ নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে অবিচলিতভাবে ও পূর্ণোদ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশিত ত্রিবিধ নীতি কার্যকরী করে চলা। সেটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক নীতি অর্থাৎ এই ত্রিবিধ নীতি হচ্ছে আত্মসমর্পণের বিপদ পরিহার করার জন্য এবং পরিস্থিতিতে একটি উন্নততর পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে বিকশিত করে তোলা, মাঝারি শক্তিগুলিকে জয় করে পক্ষে নিয়ে আসা এবং একগুঁয়েদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। পরিস্থিতির মূল্যায়নকালে এবং আমাদের কর্তব্য নিরূপণকালে যে-কোন 'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি দেখিয়ে না দেওয়া এবং তা না শুধরানো হবে মারাত্মক।

৪। চতুর্থ ও পঞ্চম সেনাদল হান তে-চিন ও শী সুং-জেনের আক্রমণের বিরুদ্ধে আনহুই-এর পূর্বাঞ্চলে যে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়েছিল, হুপের মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে একগুঁয়েদের আক্রমণের বিরুদ্ধে শী সিয়েন-নিয়েনের বাহিনী যে লড়াই করেছিল, হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলে পেং সুয়ে-ফেঙের বাহিনী যে দৃঢ়পণ লড়াই চালিয়েছিল, ইয়ে ফেইয়ের সৈন্যরা ইয়াংসি নদীর উত্তরাঞ্চলে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলের এলাকা সমূহে ও আনহুই এবং উত্তর কিয়াংসুর অঞ্চলগুলিতে অষ্টম রুট বাহিনীর যে বিশ হাজারেরও বেশি সৈন্য দক্ষিণদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল[৭]—এইগুলো যে একান্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল তাই নয়, সেগুলো খুবই সঠিক কাজ হয়েছিল এবং দক্ষিণ আনহুই ও দক্ষিণ কিয়াংসু অঞ্চলে আপনাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার আগে একাধিকবার কু চু-তুংকে ভেবে দেখতে বাধ্য করার জন্যও তা ছিল অপরিহার্য। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, যত বেশি বিজয় আমরা অর্জন করব এবং ইয়াংসি নদীর উত্তরাঞ্চলে যত বেশি আমরা নিজেদের প্রসারিত করতে পারব, তত বেশি ইয়াংসি নদীর দক্ষিণাঞ্চলে কু চু-তুং বেপরোয়া কাজকর্ম চালাতে ভয় পাবে এবং দক্ষিণ আনহুই কিয়াংসুর দক্ষিণাঞ্চলে আপনাদের ভূমিকা পালন করা সহজতর হবে। একইভাবে, অষ্টম রুট বাহিনী, নয়া চতুর্থ, বাহিনী ও দক্ষিণ চীনের গেরিলাবাহিনী যত বেশি চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে সম্প্রসারিত হবে, কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশে তত বেশি করে বৃদ্ধিলাভ করবে, আত্মসমর্পণ প্রতিহত করার সম্ভাবনা তত বেশি বেড়ে যাবে এবং পরিস্থিতিতে একটি উন্নততর পরিবর্তন নিয়ে আসা তত বেশি সম্ভব হবে এবং দেশের সমস্ত অংশে আমাদের পার্টির পক্ষে নিজের ভূমিকা পালন করা সহজতর হবে। বিপরীত একটি মূল্যায়ন করা কিংবা, আমাদের শক্তিগুলি যত বেশি সম্প্রসারিত হবে একগুঁয়েদের আত্মসমর্পণের প্রবণতা তত বেড়ে যাবে, তাদের যত বেশি আমরা সুযোগ দেব তত বেশি তারা জাপানকে প্রতিরোধ

করতে এগিয়ে যাবে, কিংবা গোটা দেশটি ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে এবং কুওমিনতাঙে কমিউনিস্ট সহযোগিতা আর সম্ভব নয়—এই বিশ্বাস থেকে বিপরীত একটি রণকৌশল গ্রহণ করা ভুল হবে।

৫। প্রতিরোধ-যুদ্ধে সমগ্র দেশের ক্ষেত্রেই আমাদের নীতি হচ্ছে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট। শত্রুর অধিকৃত এলাকার পশ্চাদ্‌ভাগে জাপ বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা এই নীতির অঙ্গ। রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত প্রশ্নে আপনাদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি দৃঢ়তার সংগেই কার্যকরী করতে হবে।

৬। কুওমিনতাঙ অঞ্চলে আমাদের নীতি যুদ্ধের অঞ্চলসমূহের ও শত্রুর পশ্চাবর্তী অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি থেকে স্বতন্ত্র হবে। কুওমিনতাঙ অঞ্চলে আমাদের নীতি হবে ঃ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সুনির্বাচিত কর্মীবৃন্দ আত্মগোপন করে কাজকর্ম করে যাবেন, শক্তিসঞ্চয় করবেন ও সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করবেন, বেপরোয়া মনোভাব পরিহার করবেন এবং আত্মপ্রকাশ করবেন না। ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে ও সংযতভাবে সংগ্রাম করার নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের রণকৌশল হবে দৃঢ় ও সুনিশ্চিত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, এবং কুওমিনতাঙ-এর যেসব আইনকানুনের ও আদেশনামার সদ্ব্যবহার করে কাজকর্ম করলে আমাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হবে এবং যেসবের পেছনে সামাজিক রীতিনীতির সমর্থন রয়েছে তার সবগুলির সদ্ব্যবহার করে আমাদের শক্তিকে জোরদার করে তোলা। আমাদের একজন পার্টি-সদস্যকে যদি কুওমিনতাঙ দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়, তবে তাই করা হোক। আমাদের সদস্যরা পাও চিয়াসমূহে[৮] ঢুকে পড়বেন এবং শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামরিক যত সংগঠন আছে তাদের সবগুলিতে ঢুকে পড়বেন ; ব্যাপকভাবে তাদের যুক্তফ্রন্টের কাজকর্ম চালাতে হবে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সৈন্যদল ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সৈন্যদের[৯] বাহিনীর লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। কুওমিনতাঙ শাসিত সকল এলাকাতেই পার্টির মূল নীতি অনুরূপভাবে হবে প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে (পার্টি-সংগঠন ও গণ-সংগঠনসমূহকে) বিকশিত করে তোলা, মাঝারি শক্তিগুলোকে জয় করে নিজের পক্ষে নিয়ে আসা (মোট সাত প্রকারের মাঝারি শক্তি রয়েছে, তারা হচ্ছে—জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গ, বিভিন্ন ধরনের সৈন্যরা, কুওমিনতাঙ-এর মাঝারি অংশ, কেন্দ্রীয় সৈন্যদলের মাঝারি অংশ, পেটি-বুর্জোয়াদের ওপরতলার অংশ, ক্ষুদে পার্টি ও

গ্রুপগুলো) এবং একগুঁয়েদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যাতে করে আত্মসমর্পণের বিপদ পরিহার করা যায় এবং পরিস্থিতিতে একটা সহায়ক পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব হয়। একই সঙ্গে আঞ্চলিক বা দেশজোড়া ভিত্তিতে জরুরী অবস্থায় মোকাবিলার জন্য আমাদের পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে। কুওমিনতাঙ এলাকায় আমাদের পার্টি-সংগঠনগুলিকে কঠোরভাবে গোপন রাখতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব ব্যুরোতে[১০] এবং সমস্ত প্রাদেশিক, বিশেষ, বিভাগীয় ও জেলা কমিটিতে সমস্ত সদস্যদের (পার্টির সম্পাদকগণ থেকে পাচকগণ পর্যন্ত) সকলকেই এক এক করে সুকঠোরভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং যার সম্বন্ধে সামান্যতম সন্দেহ রয়েছে মনে হবে তাকে কোনমতেই নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহে থাকতে দেওয়া চলবে না। কর্মীদের রক্ষা করার জন্য গভীর সর্তকতা পালন করতে হবে। এবং প্রকাশ্য বা আধা-প্রকাশ্য দায়িত্বে থেকে কাজ করার সূত্রে যখনই কারও কুওমিনতাঙদের হাতে গ্রেপ্তার বা খুন হওয়ার বিপদ দেখা দেবে, তখনই হয় তাকে অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দিতে হবে, আত্মগোপন করতে বলা হবে আর নয়তো সেনাবাহিনীতে পাঠিয়ে দিতে হবে, জাপানী অধিকৃত এলাকায় (যেমন, সাংহাই, নানকিং, উহু অথবা উশি অথবা অন্য কোন ছোট বা বড় মহানগরীতে বা গ্রামাঞ্চলে) আমাদের নীতি মূলতঃ কুওমিনতাঙ এলাকার মতোই একই প্রকারের হবে।

৭। কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সাম্প্রতিক সভায় বর্তমান রণকৌশলগত নির্দেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব ব্যুরোর ও সামরিক উপ-সমিতির কমরেডদের অনুরোধ করা হচ্ছে, এ নিয়ে যেন তাঁরা আলোচনা করেন, পার্টি-সংগঠনের ও সেনাবাহিনীর সকল কর্মীকে তা যেন জানিয়ে দেওয়া হয় এবং দৃঢ়ভাবে তা কার্যকরী করা হয়।

৮। কমরেড সিয়াং ইংকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তিনি এই নির্দেশ দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলে জানিয়ে দেবেন এবং কমরেড চেন ঈ তা দক্ষিণ কিয়াংসু অঞ্চলে জানিয়ে দেবেন। এই টেলিগ্রাম পাওয়ার একমাসের মধ্যে আলোচনা ও জানানোর কাজটি শেষ করা চাই। কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন অনুসারে সমগ্র অঞ্চলে পার্টি ও সেনাবাহিনীর কাজকর্মের ব্যবস্থাপনার সর্বময় ভার কমরেড সিয়াং ইংয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে এবং ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।

টীকা

১। 'দক্ষিণ চীন গেরিলাবাহিনী' এই নামটি ছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ চীনের জাপ-বিরোধী অনেকগুলো গেরিলা ইউনিটের সাধারণ নাম।

২। কু চু-তুং, লেং সিন এবং হান তে-চিন ছিল কিয়াংসু, চেকিয়াং, দক্ষিণ আনহুই, কিয়াংসি ও অন্যান্য স্থানে অবস্থিত কুওমিনতাঙ বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল সেনাপতিবৃন্দ।

৩। নতুন চতুর্থ বাহিনীর চতুর্থ ও পঞ্চম সেনাদল ঐ সময়ে কিয়াংসু আনহুই প্রাদেশিক সীমান্তে হুয়াই নদীর উপত্যকায় একটি জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত ছিল।

৪। নতুন চতুর্থ বাহিনীর ইউনিটসমূহ ইয়ে ফেই এবং চাং য়ুন-ঈ-এর পরিচালনাধীনে ঐ সময়ে কিয়াংসুর মধ্যাঞ্চল ও পূর্ব আনহুই অঞ্চলে ইয়াংসি নদীর উত্তরে জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করছিল এবং জাপ-বিরোধী ঘাঁটি গড়ে তুলছিল।

৫। ১৯৪০ সালের মার্চ ও এপ্রিলে আনহুই-এর কুওমিনতাঙ প্রাদেশিক শাসনকর্তা লি পিন-সিন এবং পঞ্চম যুদ্ধ এলাকার কুওমিনতাঙ সেনাপতি লী সুং-জেন (এই দুজনই ছিল কোয়াংসির সশস্ত্র সামন্ত জমিদার গোষ্ঠীভুক্ত লোক) আনহুই -হুপে সীমান্ত অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণাভিযান পরিচালনা করেছিল। ইয়াংসি নদীর উত্তর অঞ্চলের নতুন চতুর্থ বাহিনীর অধিনায়ক কমরেড চাং য়ুন-ঈ এবং হুপে-হোনান অভিযাত্রী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কমরেড লী সিয়েন- নিয়েন তার জোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং আক্রমণকে প্রতিহত করে দিয়েছিলেন।

৬। ১৯২৭ সালের ভুল বলতে চেন তু-সিউর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের কথাই বলা হচ্ছে।

৭। ১৯৪০ সালের জানুয়ারিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অষ্টম রুট বাহিনীর ২০,০০০ সৈন্যকে উত্তর চীন থেকে হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলের, পূর্ব আনহুই অঞ্চলের ও উত্তর কিয়াংসু অঞ্চলের নতুন চতুর্থ বাহিনীর জাপ বিরোধী যুদ্ধবিগ্রহে যোগদানের জন্য প্রেরণ করেছিল।

৮। **পাও চিয়া** হচ্ছে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার সাহায্যে ওরা সর্বনিম্ন স্তরে তাদের ফ্যাসিষ্ট শাসন কার্যকরী করত।

৯। চিয়াং কাই-শেক চক্র তাদের নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীকে বলত 'কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী' এবং অন্যান্য চক্রের অন্তর্ভুক্ত সৈন্যদের বলত 'বিভিন্ন ধরনের সৈন্যদল'। শেষোক্তদের বিরুদ্ধে তারা বৈষম্যমূলক আচরণ করত এবং তাদের কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর সমান স্তরের বলে গণ্য করত না।

১০। ১৯৩৮-৪১ সালের অধ্যায়টিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ব্যুরো কিয়াংসু, চেকিয়াং, আনহুই, কিয়াংসি, হুপে এবং হুনান প্রদেশ দক্ষিণ-পূর্ব চীনের কাজকর্ম পরিচালনা করত।

একেবারে শেষ পর্যন্তই ঐক্য চাই

জুলাই ১৯৪০

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার তৃতীয় বার্ষিকী এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ঊনবিংশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কয়টি দিনের ব্যবধানেই একসংগে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। প্রতিরোধ-বার্ষিকী উদ্‌যাপন করার সময় আমরা কমিউনিস্টরা আরও একান্তভাবে আমাদের দায়িত্বের কথা উপলব্ধি করছি। চীনা জাতির মুক্তির জন্য সংগ্রামের দায়িত্ব আজ ন্যস্ত হয়েছে সকল জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী এবং সমগ্র জনগণের ওপর, কিন্তু আমরা মনে করি অনেক বেশি গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদের ওপর। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বর্তমান পরিস্থিতির ওপর একটি বিবৃতি দিয়েছে, যার মূল কথাই হচ্ছে একেবারে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ ও ঐক্যের জন্য আহ্বান। আমরা আশা করি এই বিবৃতি বন্ধু পার্টি ও সেনাবাহিনীসমূহের এবং সমগ্র জাতির সম্মতিলাভে সমর্থ হবে এবং কমিউনিস্টগণ বিশেষভাবে আন্তরিকতাসহকারে নির্ধারিত লাইন অনুসারে তা কার্যকরী করে চলবেন।

সকল কমিউনিস্টকেই এ কথা বুঝতে হবে যে, একমাত্র একেবারে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই শুধু শেষ পর্যন্ত ঐক্য রক্ষা করা যাবে, এবং তার বিপরীতটিও সত্য। সুতরাং প্রতিরোধ ও ঐক্য এই উভয় ক্ষেত্রেই কমিউনিস্টদের আদর্শ স্থাপন করতে হবে। আমাদের বিরোধিতা পুরোপুরি শত্রুর বিরুদ্ধেই পরিচালিত, পরিচালিত তা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আত্মসমর্পণকামী ও কমিউনিস্ট-বিরোধীদের বিরুদ্ধেও। অন্য সকলের সংগেই আমরা ঐকান্তিকতা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে চাই। প্রতিটি স্থানেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আত্মসমর্পণকামী ও কমিউনিস্ট-বিরোধীগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র; একটি আঞ্চলিক সরকারে অনুসন্ধান করে আমি দেখেছিলাম, তার ১,৩০০ জন কর্মীর মধ্যে নিছক ৪০ বা ৫০ জন, অর্থাৎ শতকরা চার ভাগেরও কম, একেবারে সুচিহ্নিত কমিউনিস্ট-বিরোধী, অন্যদিকে বাকি সবাই ঐক্য এবং প্রতিরোধের পক্ষপাতী। অবশ্যই আমরা এই আত্মসমর্পণকামী কমিউনিস্ট-বিরোধীদের সহ্য করতে পারি না, কারণ তার অর্থ দাঁড়াবে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকে ধ্বংস করে দেবার ও ঐক্যকে বিনষ্ট করার সুযোগ দেওয়া। আমরা দৃঢ়ভাবে আত্মসমর্পণকামীদের

বিরোধিতা করব এবং আত্মরক্ষার্থে দৃঢ়ভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধীদের আক্রমণকে প্রতিহত করব। এটা করতে না পারাটা হবে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, এবং তা ঐক্য ও প্রতিরোধে বিঘ্ন ঘটাবে। অবশ্য আমাদের নীতি হবে। যাঁরা একান্তভাবে আত্মসমর্পণ ও কমিউনিস্ট-বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে যাননি তাঁদের সকলের সংগেই ঐক্য স্থাপন করা। কারণ অনেকে রয়েছেন, যাঁরা দুদিকেই তাকিয়ে দেখছেন, অনেকে বাধ্য হয়ে কাজ করছেন, আবার অনেকে সাময়িকভাবে ভ্রান্ত পথে চলেছেন; অব্যাহত ঐক্য ও প্রতিরোধের জন্য এই সমস্ত জনসাধারণকেই আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। এটা না করতে পারাটা হবে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ এবং এর ফলেও ঐক্য ও প্রতিরোধের ক্ষতি সাধিত হবে। সকল কমিউনিস্টকেই এটি উপলব্ধি করতে হবে, জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার পর তাকে রক্ষা আমাদেরই করতে হবে। এই মুহূর্তে যখন জাতীয় সংকট গভীরতর হচ্ছে এবং বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হতে যাচ্ছে, তখন চীনা জাতিকে রক্ষা করার খুবই বিরাট এই দায়িত্বভার আমাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত আমাদের করতেই হবে এবং স্বাধীন, মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসেবে চীনকে আমাদের গড়ে তুলতেই হবে এবং তা করার জন্য সম্ভাব্য বিপুলতম পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত জনগণকে ঐক্যবদ্ধও আমাদের করতে হবে। নীতি বিবর্জিত যুক্তফ্রন্টে কমিউনিস্টদের যোগ দেওয়া চলবে না এবং তারই জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার, সীমাবদ্ধ করে রাখার, অবরোধ করার ও দমন করার এ ধরনের সকল চক্রান্তের বিরোধিতা করতে হবে এবং পার্টির মধ্যেকার দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদেরও বিরোধিতা করতে হবে। কিন্তু একই সংগে কমিউনিস্টদেরকে পার্টির যুক্তফ্রন্টের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলেও চলবে না, এবং তাই প্রতিরোধের নীতির ভিত্তিতে যারাই জাপানকে এখনো প্রতিরোধ করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলের সংগেই তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং পার্টির মধ্যেকার 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের অবশ্যই তাঁরা বিরোধিতা করবেন।

তাই রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসঙ্গে আমরা যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থার পক্ষপাতী; কমিউনিস্ট পার্টির বা অন্য যে-কোন পার্টিরই হোক, একদলীয় একনায়কত্বের আমরা পক্ষপাতী নই; বরং আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ, জীবনের সকল স্তরের জনসাধারণ ও সকল সশস্ত্র বাহিনীর, অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষমতারই আমরা পক্ষপাতী, পক্ষপাতী আমরা এদের সকলের সংযুক্ত একনায়কত্বের। শত্রুকে এবং ক্রীড়নকদের শাসনকে ধ্বংস করার পর শত্রুর কবলিত এলাকার পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে যখনই আমরা

জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা গড়ে তুলব, তখনই আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের 'তিনটি এক-তৃতীয়াংশের' পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যাতে করে কমিউনিস্টগণ সকল সরকারী ও জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থার শুধুমাত্র এক-তৃতীয়াংশ আসন গ্রহণ করবে এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাবেন সেইসব জনসাধারণ যাঁরা প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী, তা তাঁরা অন্যান্য পাটির ও গ্রুপের সদস্য হোন বা না-ই হোন। যদি কেউ আত্মসমর্পণের পক্ষপাতী না হন এবং যদি তিনি কমিউনিস্ট-বিরোধী না হন, তাহলেই তিনি সরকারের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিটি রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপেরই অস্তিত্বের অধিকার থাকবে এবং যতক্ষণ তাঁরা আত্মসমর্পণের পক্ষপাতী হবেন না এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী হবেন না, ততক্ষণ তাঁরা জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীনে তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারবেন।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রশ্নে আমাদের পার্টির বিবৃতিতে এ কথা পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, কোন 'মিত্র বাহিনীতে আমাদের পাটি-সংগঠন প্রসারিত না করার' সিদ্ধান্ত আমরা মান্য করে চলব। আঞ্চলিক যে পার্টি-সংগঠনগুলো এই সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে মান্য করেনি, তারা অবিলম্বে ব্যাপারটি শুধরে নেবে। যেসব সশস্ত্র ইউনিট অষ্টম রুট বাহিনী অথবা নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে শসস্ত্র সংঘর্ষ শুরু করবে না, তাদের সকলের প্রতিই আমাদের বন্ধুত্বের মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। এমনকি যেসব সৈন্যদল 'সংঘর্ষ' বাঁধিয়েছিল, তারা যখনই তা বন্ধ করে দেবে, তখনই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর প্রসঙ্গে এই হচ্ছে আমাদের যুক্তফ্রন্টের নীতি।

অন্যান্য বিষয়ে, তা আর্থিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথবা শিক্ষাগত কিংবা গুপ্তচর-বিরোধী বিষয় যাই হোক না কেন, প্রতিরোধের স্বার্থে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গতিসাধন করে যুক্তফ্রন্টের নীতিই আমাদের অনুসরণ করতে হবে এবং দক্ষিণ ও 'বামপন্থী' এই উভয়বিধ সুবিধাবাদেরই বিরোধিতা করতে হবে।

আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হচ্ছে এবং তা থেকে যে চূড়ান্ত গুরুতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা অনিবার্যভাবে বহু দেশে বিপ্লবের আকারে ফেটে পড়বে। আমরা যুদ্ধ ও বিপ্লবের এক নতুন যুগে রয়েছি। যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তাণ্ডবে জড়িয়ে পড়েনি, তা বিশ্বের সকল নিপীড়িত জনগণ ও

নিপীড়িত জাতির সমর্থক। এই অবস্থাগুলো চীনের প্রতিরোধ যুদ্ধের পক্ষে সহায়ক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণের বিপদ আগের যে-কোন সময়ের চেয়ে বেশি গুরুতর, কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণকে তীব্রতর করে তুলছে। আর এর ফলে দোদুল্যমান শক্তিগুলোর কেউ কেউ সুনিশ্চিতভাবেই আত্মসমর্পণের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠবে। যুদ্ধের চতুর্থ বছরটি সবচেয়ে কঠিন একটি বছর হবে। আমাদের কাজ হবে সমস্ত জাপ-বিরোধী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা, আত্মসমর্পণকামীদের বিরোধিতা করা, সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা এবং দেশজোড়া প্রতিরোধে অবিচলিত থাকা। সকল কমিউনিস্টকেই মিত্র মনোভাবাপন্ন দলগুলি ও সেনাবাহিনীসমূহের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে হবে। আমরা স্থির বিশ্বাস রাখি যে, আমাদের পার্টির সকল সদস্যের, বন্ধু দল ও সেনাবাহিনী এবং সমগ্র জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আমরা আত্মসমর্পণকে প্রতিহত করতে, বাধাবিঘ্নকে জয় করতে, জাপানী আক্রমণকারীদের বিদায় করে দিতে এবং আমাদের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে সফল হব। আমাদের প্রতিরোধ-যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রকৃতপক্ষে খুবই উজ্জ্বল।

কর্মনীতি সম্পর্কে

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪০

কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণের বর্তমান তীব্রতা বৃদ্ধির মুখে আমাদের গৃহীত কর্মনীতি প্রচণ্ড নির্ধারক গুরুত্বসম্পন্ন৷ কিন্তু অনেক কর্মীই এটা উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, পার্টির বর্তমান কর্মনীতি কৃষি-বিপ্লবের সময়কার কর্মনীতির থেকে আলাদা। এ কথা মনে রাখতে হবে যে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের সমগ্র পর্যায় জুড়ে পার্টি কোন অবস্থাতেই তার যুক্তফ্রণ্টের কর্মনীতি পাল্টাবে না, এবং কৃষি-বিপ্লবের সময়কার দশ বছরে গৃহীত বহু কর্মনীতিকেই আজ আর প্রয়োগ করা চলবে না। বিশেষতঃ কৃষি-বিপ্লবের শেষ দিককার বহু উগ্র-বাম কর্মনীতি শুধু আজকেই পুরোপুরি অচল নয়, এমনকি তখনো সেগুলি ভুল ছিল। চীন বিপ্লব যে একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, এবং সেটা যে দীর্ঘস্থায়ী—এই দুটি মৌলিক বিষয় বুঝবার ব্যর্থতা থেকেই ওই ভুল কর্মনীতিগুলি উদ্ভুত হয়েছিল। যেমন, এই তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছিল যে, কুওমিনতাঙের পঞ্চম 'অবরোধ ও দমন' অভিযান এবং আমাদের প্রত্যাভিযানই ছিল প্রতিবিপ্লব ও বিপ্লবের মধ্যেকার নির্ধারক যুদ্ধ; পুঁজিপতিশ্রেণীকে (শ্রম ও ট্যাক্স-সম্পর্কিত উগ্র-বাম কর্মনীতি) এবং ধনী কৃষকদেরকে (নিকৃষ্ট জমি বরাদ্দ করে) অর্থনৈতিকভাবে উৎখাত; জমিদারদের শারীরিক উৎখাত (কোন জমিই তাদের জন্য বরাদ্দ না করে); বুদ্ধিজীবীদের ওপর আক্রমণ; প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার ব্যাপারে 'বামপন্থী' বিচ্যুতি; রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলির ওপর কমিউনিস্টদের একচেটিয়া আধিপত্য, গণ-শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে কমিউনিজমের ওপর প্রাধান্য দেওয়া; উগ্র-বাম সামরিক কর্মনীতি (বড় বড় শহরের ওপর আক্রমণ এবং গেরিলাযুদ্ধের ভূমিকার অস্বীকৃতি); শ্বেত এলাকার কাজে পুৎসীয় (putschist); শৃংখলা রক্ষার নামে কমরেডদের ওপর আক্রমণ[১]—এইসব উগ্র-বাম কর্মনীতি হচ্ছে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদেরই অভিব্যক্তি, বা প্রথম মহান বিপ্লবের যুগের শেষের দিকের চেন তু-সিউর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের ঠিক বিপরীত। প্রথম মহান বিপ্লবের যুগের শেষের দিকের কর্মনীতি

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে কমরেড মাও সে-তুঙ পার্টির আভ্যন্তরীণ এই নির্দেশটি রচনা করেন।

ছিল শুধু মৈত্রী, কোন লড়াই নয়, এবং কৃষি-বিপ্লবের শেষের দিকের কর্মনীতি ছিল শুধু লড়াই, কোন মৈত্রী নয় (কেবলমাত্র কৃষকদের মধ্যে একেবারে নীচের স্তরে ছাড়া)—এ দুটিই হল উগ্র কর্মনীতির জ্বলন্ত উদাহরণ। এই উভয় উগ্র কর্মনীতিই পার্টি ও বিপ্লবের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল।

আমাদের বর্তমান, জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের কর্মনীতি যেমন শুধু মৈত্রী ও কোন লড়াই নয়—এমন নয়, তেমনি শুধু লড়াই, কোন মৈত্রী নয়— এমনও নয়, এটা হচ্ছে লড়াই ও মৈত্রী দুটোরই সংমিশ্রণ। সুনির্দিষ্ট অর্থে এ হল ঃ

(১) সমগ্র জনসাধারণ যাঁরাই প্রতিরোধের পক্ষে (অর্থাৎ, সমস্ত জাপ-বিরোধী শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী এবং ব্যবসায়ীরা) তাঁদের সবাইকে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

(২) যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আমাদের কর্মনীতি হবে স্বাধীন ও নিজস্ব উদ্যোগের কর্মনীতি, অর্থাৎ ঐক্য ও স্বাধীনতা উভয়ই চাই।

(৩) সামরিক রণনীতি বিষয়ে আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ রণনীতির কাঠামোর মধ্যে আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে ও স্বাধীনভাবে গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা; গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে মূল ভিত্তি, কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতিতে চলমান যুদ্ধ পরিচালনার কোন সুযোগই হারালে চলবে না।

(৪) কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করা, বেশির ভাগ লোককে দলে টেনে নেওয়া, স্বল্পসংখ্যকের বিরোধিতা করা, একে একে শত্রুকে ধ্বংস করা এবং সঠিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে লড়াই চালানো, লড়াই চালানো আমাদের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে এবং সংযমের সংগে।

(৫) শত্রু-অধিকৃত এবং কুওমিনতাঙ-শাসিত অঞ্চলে আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে একদিকে যুক্তফ্রন্টের যতটা সম্ভব ব্যাপ্তি ঘটানো, অন্যদিকে গোপনভাবে কাজ করার জন্য সুনির্বাচিত কমরেডদের ঠিক করা। লড়াই ও সংগঠনের রূপ কি হবে সে সম্বন্ধে আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, বহুদিন ধরে আমাদের সুনির্বাচিত কমরেডরা গোপনভাবে কাজ করবেন, শক্তি সঞ্চয় করবেন এবং সুযোগের অপেক্ষা করবেন।

(৬) আমাদের দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণী-বিন্যাস সম্বন্ধের আমাদের মূল কর্মনীতি হচ্ছে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিকাশসাধন করা, মধ্যবর্তী স্তরের শক্তিগুলোকে জয় করে আনা এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থী শক্তি-গুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

(৭) কমিউনিস্ট-বিরোধী গোঁড়াপন্থীদের সম্বন্ধে আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে ঐকবদ্ধ হওয়ার দ্বৈত বিপ্লবী কর্মনীতি—যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জাপানের বিরুদ্ধে

প্রতিরোধের পক্ষে থাকছে ততক্ষণ তাদের সংগে আমাদের ঐক্য বজায় রাখা, এবং যখনই তারা কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করবে, তখনই তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। তাছাড়া, জাপ-প্রতিরোধের ব্যাপারেও এই গোঁড়াপন্থীদের দ্বৈত চরিত্র বর্তমান, এবং যতক্ষণ তারা প্রতিরোধের পক্ষে থাকছে, আমাদের কর্মনীতি ততক্ষণ হবে তাদের সংগে ঐক্য গড়ার, এবং যখনই তারা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করেছে (যেমন, জাপ-হানাদারদের সংগে মিলে ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের বিরোধিতায় অনিচ্ছা প্রকাশ করছে) তখনই আমাদের কর্মনীতি হবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতার ব্যাপারেও যেহেতু তাদের দ্বৈত চরিত্র আছে, আমাদের কর্মনীতিরও সেইহেতু থাকবে দ্বৈত চরিত্র ; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট সহযোগিতায় বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভাঙন ধরাতে চাইবে না, আমাদের কর্মনীতিও থাকবে তাদের সংগে ঐক্যবদ্ধ থাকার, কিন্তু যখনই তারা স্বেচ্ছাচারীর মতো আমাদের পার্টির ওপর ও জনগণের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাবে, আমাদের কর্মনীতিও হবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এই দ্বৈত চরিত্রের ব্যক্তিদের সংগে বিশ্বাসঘাতক ও জাপপন্থী ব্যক্তিদের আমরা আলাদা করে দেখি।

(৮) এমনকি বিশ্বাসঘাতকও জাপপন্থীদের মধ্যেও দ্বৈত চরিত্রের ব্যক্তিবর্গ আছে, যাদের প্রতি একইভাবে আমাদের বিপ্লবী দ্বৈত কর্মনীতি প্রয়োগ করা উচিত। তারা যতটা জাপপন্থী, আমাদের ততটাই তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। কিন্তু তাদের যতটা দোদুল্যমানতা থাকবে, আমাদেরও কর্মনীতি ততটাই হবে তাদেরকে আমাদের দিকে টেনে আনা, তাদের জয় করা। এই ধরনের ব্যক্তিদের আমরা ওয়াং চি-ওয়েই, ওয়াং- ই-তাং[২] এবং শি উ-সানের[৩] মতো পুরোপুরি বিশ্বাস-ঘাতকদের থেকে পৃথক করে দেখি।

(৯) প্রতিরোধের বিরোধী জাপপন্থী বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের থেকে প্রতিরোধের সমর্থক ব্রিটিশপন্থী ও মার্কিনপন্থী বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের পৃথক করে দেখতেই হবে ; অনুরূপভাবে প্রতিরোধের সমর্থক কিন্তু দোদুল্যচিত্ত, একতার অভিলাষী কিন্তু কমিউনিস্ট-বিরোধী বৃহৎ জমিদার এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের জাতীয় বুর্জোয়া, মাঝারি ও ছোট জমিদারগোষ্ঠী ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গের থেকে আলাদা করে দেখতেই হবে, যাদের দ্বৈত চরিত্র খুব পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। এইসব পার্থক্যের ওপরে ভিত্তি করেই আমরা আমাদের কর্মনীতি তৈরী করে থাকি। উপরে বর্ণিত শ্রেণী-সম্পর্কের পৃথকীকরণ থেকেই এই বিভিন্ন ধরনের গ্রহণযোগ্য কর্মনীতি নির্ণীত হয়ে থাকে।

(১০) একই পদ্ধতিতে সাম্রাজ্যবাদের বিচার আমরা করে থাকি। কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত ধরনের সাম্রাজ্যবাদেরই বিরোধী, কিন্তু আমরা চীনের ওপর এখন আক্রমণ চালাচ্ছে এমন জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে সেইসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো থেকে আলাদা করে দেখি যারা এখন আক্রমণ চালাচ্ছে না, পৃথক করি জাপানের বিরোধী ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সাকরেদ জার্মান ও ইতালীর সাম্রাজ্যবাদ থেকে যারা 'মাঞ্চুকুও'কে স্বীকার করে নিয়েছে, পৃথক করি বিগতদিনে দূর প্রাচ্যে মিউনিক কর্মনীতি অনুসরণ করে, চীনের জাপ-প্রতিরোধ অবদমন করতে ইচ্ছুক সেদিনের ব্রিটেন ও মার্কিনকে সাম্প্রতিক ব্রিটেন ও মার্কিন থেকে যারা তৎকালীন অনুসৃত কর্মনীতি পরিত্যাগ করে বর্তমানে চীনের প্রতিরোধের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমাদের কৌশল এক এবং একই নীতি থেকে উদ্ভুত, এবং তা হল ঃ দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ কর, বহুকে নিজের দিকে টেনে নাও, স্বল্পসংখ্যকের বিরোধিতা কর এবং শত্রুকে এক এক করে ধ্বংস কর। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি কুওমিনতাঙের নীতি থেকে পৃথক। কুওমিনতাঙ বলে থাকে যে, 'শত্রু মাত্র একটাই, আর সবাই বন্ধু ; জাপান ছাড়া সব দেশকেই সে সমপর্যায়ে বিচার করে, কিন্তু আসলে কুওমিনতাঙ হল ব্রিটিশপন্থী, মার্কিনপন্থী। কিন্তু আমাদের কয়েকটি পার্থক্য করতেই হবে, প্রথমতঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য, দ্বিতীয়তঃ একদিকে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যদিকে জার্মান ও ইতালীর মধ্যে পার্থক্য ;তৃতীয়তঃ, ব্রিটেন ও মার্কিনের জনগণ ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মধ্যে পার্থক্য ; এবং চতুর্থতঃ ব্রিটেন ও মার্কিনের দূর প্রাচ্যের মিউনিক তৈরী করার সময়ের কর্মনীতি ও তাদের বর্তমান অনুসৃত কর্মনীতির মধ্যে পার্থক্য। এইসব পার্থক্যের ওপর আমাদের কর্মনীতি আমরা তৈরী করি। কুওমিনতাঙের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তুলনা করলে আমাদের মূল লাইন দাঁড়াচ্ছে এরকম ঃ আত্মনির্ভরতার নীতির ওপর দাঁড়িয়ে ও স্বাধীনভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করে সমস্তরকম বৈদেশিক সাহায্যকে ব্যবহার করা, এবং এই নীতিটি পরিত্যাগ করে কুওমিনতাঙের মতো বৈদেশিক সাহায্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে গিয়ে একবার এই সাম্রাজ্যবাদী ব্লক, আরেকবার অন্যটির ওপর নির্ভর করা নয়।

আমাদের বহু পার্টি-কর্মীর মধ্যে রণকৌশলের বিষয়ে এবং তৎপ্রসূত 'বাম' ও দক্ষিণ দোদুল্যচিত্ততার যেসব উল্টো ধারণা বিদ্যমান তার মূল দূরীভূত করার জন্য আমাদের পার্টির অতীত ও বর্তমানের কর্মনীতির পরিবর্তন ও বিকাশসাধনের বিষয়টি সর্বদিক দিয়ে ও সুসমন্বিতভাবে যাতে তারা বুঝতে পারে, সেজন্য তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। উগ্র-বাম দৃষ্টিভঙ্গি গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে এবং এখনো পর্যন্ত পার্টির মধ্যে এটাই হচ্ছে প্রধান বিপদ। কুওমিনতাঙ অঞ্চলে বহুদিন ব্যাপী সুনির্বাচিত

কমরেডদের দ্বারা গোপনভাবে কাজ করা, শক্তিসঞ্চয় করা এবং সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকার পার্টি কর্মনীতিটি বহু সভ্যই গুরুত্বপূর্ণভাবে কার্যকরী করতে পারছেন না, কারণ তাঁরা কুওমিনতাঙের কমিউনিস্ট-বিরোধী কর্মনীতির গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারছেন না। একই সময়ে, এমন অনেক কমরেড আছেন, যাঁরা যুক্তফ্রন্টের বিস্তার সাধনের কর্মনীতিটিও কার্যকরী করতে পারছেন না, কারণ তাঁদের সবকিছুর বিচার-বিবেচনা অতিসারল্য দুষ্ট, সমগ্র কুওমিনতাঙই তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক, এবং সেই কারণে কি যে করণীয় তা আর তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। একই ধরনের অবস্থা জাপ-অধিকৃত অঞ্চলেও বিরাজ করছে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে এবং জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে যে দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি এক সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে বিস্তৃত ছিল, বর্তমানে মূলগতভাবে তা পরাভূত হয়েছে ; ঐ মত যাঁরা পোষণ করতেন, তাঁরা সংগ্রাম বিবর্জিত মৈত্রীর ওপর জোর দিতেন, জাপ-প্রতিরোধে কুওমিনতাঙের ভূমিকাকে অতিরিক্ত বড় করে দেখতেন, এবং সেই কারণে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার নীতিগত পার্থক্যটি তাঁদের চোখে মুছে যেতো, যুক্তফ্রন্টের মধ্যে স্বাধীনতা ও উদ্যোগের কর্মনীতিটি তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতেন, বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের এবং কুওমিনতাঙের দাবি মেনে নিয়ে সমঝওতা করতেন, অত্যন্ত সাহসিকতার সংগে জাপ-বিরোধী বিপ্লবী শক্তির বিস্তৃতিসাধন না করে এবং কুওমিনতাঙের কমিউনিস্ট-বিরোধী ও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি প্রতিহত করার কর্মনীতির বিরুদ্ধে না রুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা নিজেদের হাত-পা নিজেরাই বেঁধে রাখতেন। ১৯৩৯-এর শীতকাল থেকে বহুস্থানে কিন্তু একটা উগ্র-বাম ঝোঁক মাথা তুলছে, এবং এটি উদ্ভুত হয়েছে কুওমিনতাঙ সৃষ্ট কমিউনিস্ট-বিরোধী 'সংঘর্ষের' এবং এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে আমাদের লড়াইয়ের ফলস্বরূপ। এই ঝোঁকটা কিছুটা দূর করা গিয়েছে বটে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি, এবং এখনো বহুস্থানে সুনির্দিষ্ট কর্মনীতির মধ্যে এটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং এখনই আমাদের বিচার-বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি নির্ণয় করা প্রয়োজন।

যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিমধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি সংক্রান্ত নির্দেশ প্রেরণ করেছেন, এখানে এখন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল ঃ

রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা। 'তিনটি এক-তৃতীয়াংশের পদ্ধতিটি', যে পদ্ধতি অনুসারে রাজনৈতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান মাত্র এক-তৃতীয়াংশ, এবং সেখানে অ-কমিউনিস্টদেরও টেনে আনা হয়েছে, তা দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করতেই হবে। উত্তর কিয়াংসুর মতো অঞ্চলে, যেখানে আমরা সবেমাত্র জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির সংস্থা-সমূহ-প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি, সে সকল স্থানে কমিউনিস্টদের সংখ্যানুপাত এমনকি এক—তৃতীয়াংশেরও

কম হতে পারে। পেটি-বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া, এবং আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গ, যাঁরা কমিউনিস্ট বিরোধিতায় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করছেন না, তাঁদের সরকার ও গণপ্রতিনিধি-সংস্থাসমূহের কাজে টেনে নিতে হবে, এবং যেসব কুওমিনতাঙের সদস্য কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী নন, তাদেরও টেনে নিতে হবে। এমনকি দক্ষিণপন্থীদেরও আমরা গণপ্রতিনিধি-সংস্থাসমূহে যোগ দিতে দেব। কোনভাবেই আমাদের পার্টি সবকিছুর ওপর একাধিপত্য করবে না। কমিউনিস্ট পার্টির এক-পার্টি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বৃহৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও বৃহৎ জমিদারশ্রেণীর একনায়কত্ব আমরা ধ্বংস করে দিচ্ছি না।

শ্রম নীতি। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর পূর্ণোদ্যম যদি জাগ্রত করতে হয়, তবে তাঁদের জীবিকার উন্নতিসাধন নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু আমাদের উগ্র-বাম ঝোঁক থেকে নিবৃত থাকতেই হবে ; অতিরিক্ত মজুরী যেমন বৃদ্ধি করা চলবে না, কাজের ঘণ্টাও তেমনি খুব কমনো চলবে না। বর্তমান অবস্থায় চীনে ৮ ঘণ্টা কাজের সময়সূচী সর্বত্র প্রয়োগ করা চলবে না এবং কোন কোন উৎপাদন-শিল্পে ১০ ঘণ্টা কাজের সময়সচী চালু থাকতে দিতে হবে। অন্যান্য উৎপাদন শিল্পে অবস্থা অনুযায়ী শ্রমদিবস ঠিক করতে হবে। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদিত হলে শ্রমিকরা শ্রম-শৃংখলা মেনে চলবেন এবং ধনতন্ত্রকে কিছুটা মুনাফা অর্জন করতে দিতেই হবে। তা না হলে কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে যুদ্ধ পরিচালনায়ও সাহায্য হবে না, শ্রমিকরাও সুবিধে পাবেন না। বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকদের জীবিকার স্তর ও মজুরী অতি উচ্চস্তরে তোলা উচিত হবে না, তাহলে কৃষকদের নিকট থেকে অভিযোগ উঠবে, শ্রমিকদের মধ্যে বেকারী সৃষ্টি হবে, এবং উৎপাদনের অবনতি ঘটবে।

ভূমি নীতি। পার্টি-সভ্য ও কৃষকদের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে যে, এটা পরিপূর্ণ কৃষি-বিপ্লবের সময় নয়, এবং কৃষি-বিপ্লবের সময় যেসব ব্যবস্থবলী গৃহীত হয়েছিল, আজকে তার প্রয়োগ চলতে পারে না। একদিকে আমাদের বর্তমান কর্মনীতি হবে জমিদাররা যাতে খাজনা ও সুদ হ্রদ করার চুক্তি করে তার ব্যবস্থা করা, কারণ তাহলে কৃষকদের বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে জাপ-প্রতিরোধের উদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু এই হ্রাসের মাত্রা খুব বেশি করা চলবে না। সাধারণভাবে, খাজনা হ্রাস হতে পারে শতকরা ২৫ ভাগ, এবং জনগণ যদি আরও হ্রাস চান, তবে বর্গাদার কৃষক শস্যের ৬০ থেকে ৭০ ভাগ রাখতে পারেন, তবে তার বেশি কিন্তু নয়। ঋণের ওপর সুদের হার এমনভাবে হ্রাস করা উচিত হবে না, যাতে বাকির কারবার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে, আমাদের নীতি এমন চুক্তি সম্পাদনের পক্ষে হবে, যাতে কৃষকরা খাজনা ও সুদ দিয়ে দেন এবং জমিদাররা জমির ও অন্যান্য

সম্পত্তির ওপর তাদের অধিকারসত্ত্ব নিয়ে বাস করতে পারে। সুদের হারও এত হ্রাস করা হবে না যাতে কৃষকদের পক্ষে ঋণ পাওয়া অসম্ভব হয়, এবং পুরানো 'হিসেবের এবন বন্দোবস্ত করা হবে না যাতে কৃষকরা তাদের বন্ধকী জমি বিনা পয়সায় পেয়ে যায়।

কর নীতি। কর ধার্য আয়ের ওপর নির্ভরশীল হবে। যারা খুব দরিদ্র তারাই শুধু করের দায় থেকে মুক্ত থাকবে, আর সবাইকে রাষ্ট্রের হাতে কর দিতে হবে, যার অর্থ হল করভার বহন করতে হবে শ্রমিক ও কৃষক সহ শতকরা ৮০ ভাগেরও ওপর জনগণকে শুধু জমিদার ও পুঁজিপতিরাই তা সম্পূর্ণভাবে বহন করবে না। জনসাধারণকে গ্রেপ্তার করে তাদের ওপর জরিমানা বসিয়ে তা আদায় করে সামরিক বাহিনীর ব্যয়ভার মেটানোর পদ্ধতি একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তৈরী না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত করের ব্যাপারে চলিত কুওমিনতাঙের কর পদ্ধতির প্রয়োজনীয় রদবদল করে আমরা তা চালু রাখতে পারি।

গোয়েন্দা-বিরোধী নীতি। প্রমাণিত বিশ্বাসঘাতক ও কমিউনিস্ট-বিরোধীদের অত্যন্ত দৃঢ় হস্তে আমরা দমন করব, তা না করলে জাপ-বিরোধী বিপ্লবী-শক্তিসমূহকে আমরা রক্ষা করতে সক্ষম হব না। কিন্তু তাই বলে প্রচুর হত্যাকাণ্ড নিশ্চিতই চলবে না, এবং কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা চলবে না। দোদুল্যচিত্ত ব্যক্তিদের এবং অনিচ্ছুক অনুসরণকারীদের নরমভাবে বিচার করতে হবে। অপরাধীদের বিচারে প্রাণদণ্ড একেবারেই রহিত করতে হবে ; সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপরই জোর দিতে হবে, স্বীকারোক্তি হলেই তা বিশ্বাস করে নেওয়া চলবে না। জাপানীদের হাত থেকে বা কমিউনিস্ট-বিরোধী পুতুল সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে ধৃত সৈনিকদের ছেড়ে দেওয়াই হচ্ছে আমাদের নীতি। তবে যারা জনগণের প্রতি তিক্ত ঘৃণা পোষণ করে কেবল তাদের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য হবে না, এবং তারা মৃত্যুদণ্ডই পাবে, তবে অবশ্যই সেই মৃত্যুদণ্ড উচ্চ কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। যেসব বন্দীরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংগে হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু আসলে যারা কমবেশি বিপ্লবের দিকেরই ব্যক্তি, তাদের বেশি বেশি সংখ্যায় জয় করে টেনে নিতে হবে আমাদের সামরিক বাহিনীতে কাজ করার জন্য। অবশিষ্টদের সব মুক্ত করে দিতে হবে, এবং তাদের যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে দেখা যায় এবং তারা যদি আবার বন্দী হয় তবে তাদের আবার ছেড়ে দেওয়া হবে। কোনরকম অপমান আমরা তাদের করব না, তাদের ব্যবহারের জিনিসপত্রও নিয়ে নেব না কিংবা তাদের কাছ থেকে কোনরকম দোষস্খালনের বিবৃতিও দাবি করব না, বরং কোনরকম পার্থক্য না করেই তাদের প্রতি বিশ্বস্ত ও দয়ার্দ্রচিত্তের ব্যবহার করব। যত প্রতিক্রিয়াশীলই তারা হোক না কেন, এই হবে তাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার। প্রতিক্রিয়ার মূল অংশকে বিচ্ছিন্ন

করে ফেলার পক্ষে এই হচ্ছে সব থেকে কার্যকরী পদ্ধতি। যারা দলত্যাগী, তাদের মধ্যে যারা অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী, তাদের ছাড়া আর যারা রইল, তারা যদি তাদের কমিউনিস্ট-বিরোধী অপকর্ম করা বন্ধ করে দেয়, তাদের নতুন ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ আমরা নিশ্চয়ই করে দেব ; এবং তারা যদি ফিরে আসে, বিপ্লবে যোগ দিতে চায়, তাদেরও গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু পার্টির মধ্যে তাদের গ্রহণ করা নিশ্চিতই চলবে না। জাপানী গোয়েন্দা ও চীনা বিশ্বাসঘাতকদের সংগে কুওমিনতাঙের সাধারণ গোয়েন্দাদের গুলিয়ে ফেললে চলবে না; দুটোকে পৃথক করে দেখতে হবে এবং যথোপযুক্ত ভাবে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা গ্রেপ্তার করতে পারে—এই ব্যবস্থা চালু থাকার দরুণ যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে আছে তা বন্ধ করা দরকার। যুদ্ধের প্রয়োজনে বিপ্লবী শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে যে সামরিক বাহিনীর মধ্যে যারা যুদ্ধে লিপ্ত তারা ব্যতীত সবরকম গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়া হবে শুধুমাত্র সরকারী বিচার বিভাগ বা জননিরাপত্তা সংস্থাসমূহের ওপর।

জনগণের অধিকার। এ কথাটি পরিষ্কার করে ঘোষণা করতেই হবে যে, প্রতিরোধ-যুদ্ধের বিরোধী নয় এমন সব জমিদার ও পুঁজিপতিদের শ্রমিক ও কৃষকদের মতো সেই একই ব্যক্তি-স্বাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার, সেই একই ভোট প্রদানের অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা, সভা ও জমায়েতের অধিকার এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ধর্মমত অনুসরণ করার অধিকার থাকবে। একমাত্র আভ্যন্তরীণ ধ্বংসকার্যে লিপ্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে এবং যারা ঘাঁটি এলাকায় দাঙ্গা সংগঠিত করে তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যই করবে, অন্যান্য সবাইকে রক্ষা করবে এবং তাদের ওপর কোনরকম আঘাত করবে না।

অর্থনৈতিক নীতি। অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে আমরা শিল্প ও কৃষির বিকাশ ঘটাব এবং পণ্যবিনিময়ের ব্যবস্থা করব। আমাদের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে যদি পুঁজিপতিরা শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার জন্য আমরা তাদের উৎসাহিত করব। ব্যক্তি-মালিকানার শিল্পসংস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থাকে অর্থনৈতিক একটি বিভাগ বলেই বিচার করতে হবে। এ সবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্বনির্ভরশীলতা অর্জন করা। কোন প্রয়োজনীয় শিল্পসংস্থারই যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের মূল প্রয়োজনের সংগে মিলিয়ে আমাদের শুল্ক ও টাকাকড়ি বিষয়ক কর্মনীতি নির্ধারণ করতে হবে, এবং তা তার বিরুদ্ধ গামী হবে না। বহুদিন ধরে যে ঘাঁটি এলাকাসমূহের অস্তিত্ব বজায় আছে, তার মূল কারণই হচ্ছে এই যে, স্থূল ও কোনমতে ঠেকা দেওয়া সংগঠন নয়—তার পরিবর্তে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও হিসেবী অর্থনৈতিক সংগঠন পরিচালনা করা হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক নীতি। যুদ্ধ পরিচালনা ও প্রসারতার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও নৈপুণ্যের বিকাশ এবং জনগণের মধ্যে জাতীয় গর্ববোধ ফুটিয়ে তোলার জন্যই এই কর্মনীতিগুলির গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বুর্জোয়া উদারবাদী শিক্ষাবিদগণ, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকরা, বিদ্বান ব্যক্তিবৃন্দ ও শিল্পকর্মে নিযুক্ত নিপুণ ব্যক্তিদের আমাদের ঘাঁটি এলাকায় আসতে এবং স্কুল, সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিষয় পরিচালনায় তাঁদের সহযোগিতা নিতে হবে। আমাদের স্কুলে সেইসব বুদ্ধিজীবীদের ও ছাত্রদেরই আমরা গ্রহণ করব যাঁরা জাপ-বিরোধিতায় উৎসাহ দেখাচ্ছেন ; তাঁদের আমরা স্বল্পকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তুলব, তাঁদের নিযুক্ত করব সামরিক বাহিনী, সরকারী সংস্থা বা গণ-সংগঠণের কাজে ; সাহসের সংগে আমরা তাঁদের টেনে নেব, তাঁদের কাজ দেব, তাঁদের উন্নত করে তুলব। প্রতিক্রিয়াশীলদের. অনুপ্রবেশের ভয়ে আমাদের অতি-সাবধানী বা ভীত হলে চলবে না। সন্দেহ নেই যে এদের কিছু কিছু ঢুকে পড়বেই, তা আটকানোও যাবে না, কিন্তু একটা সময় আসবেই, যখন কাজ ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এগুলোকে অবশ্যই দূরীভূত করা যাবে। প্রত্যেকটি ঘাঁটি এলাকাতেই ছাপাখানা বসাতে হবে, পুস্তক-পুস্তিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হবে এবং বিতরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা সংগঠিত করতে হবে। সম্ভবত প্রত্যেক ঘাঁটি অঞ্চলেই কর্মীদের শিক্ষার জন্য বড় বড় স্কুল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এবং এগুলো সংখ্যায় ও আয়তনে যত বড় হয় ততই ভাল।

সামরিক নীতি। অষ্টম রুট ও নয়া চতুর্থ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিক প্রসারতা আমাদের ঘটাতে হবে, কারণ এরাই হচ্ছে চীনা জনগণের জাতীয় প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনা ও এগিয়ে যাবার ব্যাপারে সব থেকে নির্ভরশীল সশস্ত্র বাহিনী। আমরা আক্রান্ত না হলে কুওমিনতাঙের সামরিক বাহিনীর ওপর চড়াও হয়ে কখনই আক্রমণ করব না—আমাদের এই নীতি আমরা অনুসরণ করে চলব এবং তাদের সংগে বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করব। আমাদের সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার জন্য আমাদের প্রতি যেসব অফিসারদের সমর্থন আছে তাঁদের অষ্টম ও নয়া চতুর্থ বাহিনীতে টেনে নেওয়ার জন্য সবরকম চেষ্টাই আমরা করব, তা তাঁরা কুওমিনতাঙ বা পার্টি বহির্ভূত—যাই হোক না কেন। আমাদের সামরিক বাহিনীর মধ্যে যেখানে কমিউনিস্টরা সংখ্যাধিক্যের দরুণ আধিপত্য করতে সক্ষম, সেখানে যখন পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কিছু করতেই হবে। অবশ্যই 'তিনটি একতৃতীয়াংশের পদ্ধতি' আমাদের প্রধান বাহিনীর মধ্যে চালু করা উচিত হবে না, কিন্তু যতক্ষণ পার্টির হাতে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে থাকছে (এটি কিন্তু চূড়ান্ত ও অলঙ্ঘনীয়ভাবেই প্রয়োজন), সামরিক বাহিনী ও তার প্রযুক্তিবিষয়ক বিভাগসমূহ গড়ে তোলার জন্য বহু সংখ্যক সমর্থকদের টেনে নিতে গিয়ে আমাদের সন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণই

নেই। এখন যখন আমাদের পার্টির ও সামরিক বাহিনীর আদর্শগত ও সাংগঠনিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন বহু সংখ্যক সমর্থকদের টেনে নেওয়ায় কোনরকম বিপদের ভয় তো নেইই (অবশ্যই অন্তর্ঘাতীদের বাদ দিয়ে), বরং তা আমাদের অবশ্যকরণীয় কাজই হবে, কারণ তা না করলে সমস্ত দেশের সমর্থন আমরা পাব না, বিপ্লবী শক্তির প্রসারতা ঘটাতে সক্ষম হব না।

যুক্তফ্রন্টের জন্য এবং তদনুসারে নির্দিষ্ট কর্মনীতিগুলি তৈরী করে নেওয়ার প্রয়োজনে সমস্ত রণকৌশলগত নীতিগুলিকে সমগ্র পার্টিকেই দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। যে সময়ে জাপ-হানাদাররা চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংহত করছে, যখন বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়ারা তাদের উদ্ধত কর্মনীতি অনুসরণ করছে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালিত করছে, তখন ওপরে বর্ণিত রণকৌশলগত নীতিসমূহ এবং সুনির্দিষ্ট কর্মনীতিগুলিই হচ্ছে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার, যুক্তফ্রন্টের ব্যাপ্তি ঘটানোর, সমস্ত জনগণের সহানুভূতি অর্জনের এবং পরিস্থিতিকে ভালর দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার একমাত্র পথ। যাই হোক, ভুল শোধরানোর জন্য আমাদের ধাপে ধাপে এগোতেই হবে এবং তড়বড় করে অতি দ্রুত কিছু করে ফেলার বাসনায় আমরা এমন কিছুই করে বসব না, যাতে আমাদের কর্মীদের মধ্যে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়, জনগণের মধ্যে সন্দেহ জাগে, জমিদাররা প্রতিআক্রমণ করতে পারে বা অন্যান্য অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে।

টীকা

১। এখানে যে কর্মনীতির কথা বলা হয়েছে তার জন্য মাও সে-তুঙের 'নির্বাচিত রচনাবলী'র 'আমাদের পার্টির ইতিহাসে কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্তের পরিশিষ্ট,' ইংরেজী সংস্করণ পিকিং ১৯৬৫, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪-২১৩ দ্রষ্টব্য।

২। ওয়াং য়ি-তাং ছিল উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের আমলের এক বড় আমলা এবং জাপপন্থী বিশ্বাসঘাতক। ১৯৩৬ সালে উত্তর চীনের ঘটনার পর চিয়াং কাই-শেক তাকে অবসর জীবন থেকে ফিরিয়ে এনে কুওমিনতাঙ সরকারে কাজ দেয়। ১৯৩৮ সালে সে উত্তর চীনে একজন জাপানী দালাল হিসেবে কাজ করে এবং ভূয়া উত্তর চীন রাজনৈতিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হয়।

৩। শি য়ু-সান ছিল একজন কুওমিনতাঙ যুদ্ধবাজ প্রভু। প্রায়শঃই সে এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষে চলে যেত। প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হবার পর সে কুওমিনতাঙের দশম আর্মি গ্রুপের প্রধান সেনাধক্ষ্য ছিল, দক্ষিণ হোপেইতে জাপানীদের সংগে সহযোগিতা করেছিল এবং অষ্টম রুট বাহিনীকে আক্রমণ, জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতার গণতান্ত্রিক সংস্থাসমূহকে ধ্বংস এবং কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীলদের খুন করা ছাড়া আর কোন কাজই করেনি।

দক্ষিণ আনহুই ঘটনা সম্পর্কে নির্দেশ ও বিবৃতি

জানুয়ারী ১৯৪১

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈপ্লবিক সামরিক কমিশনের নির্দেশ

ইয়েনান, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪১

জাতীয় বৈপ্লবিক সেনাবাহিনীর নতুন চতুর্থ বাহিনী প্রতিরোধ-যুদ্ধে তার বিশিষ্ট কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। শত্রুর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করে সেনানায়ক ইয়ে তিং চমকপ্রদ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি তা যখন নির্দেশ অনুসারে উত্তরদিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ঐ সেনাবাহিনীটি জাপানের অনুগামী গোষ্ঠী কর্তৃক বিশ্বাসহন্তার মতো আক্রান্ত হয়েছে এবং সেনানায়ক হয়ে যুদ্ধে আহত ও অবসন্ন হয়ে কারাগারে প্রেরিত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ চাং য়ু-ঈ-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তারবার্তার মাধ্যমে দক্ষিণ আনহুই ঘটনার সমগ্র গতিধারা সম্পর্কে জানতে পেরে কমিশন তীব্র ক্রোধ এবং আমাদের কমরেডদের ব্যাপারে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে। প্রতিরোধ-যুদ্ধের ক্ষতিসাধনের জন্য জাপানের অনুগামী গোষ্ঠীর বিরাট অপরাধের, জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে আক্রমণের ও গৃহযুদ্ধ শুরু করার মোকাবিলায় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা ছাড়াও কমিশন এতদ্বারা চেন ঈকে জাতীয় বৈপ্লবিক সেনাবাহিনীর নতুন চতুর্থ বাহিনীর অস্থায়ী অধিনায়ক হিসেবে, চাং য়ুন ঈকে সহ অধিনায়ক হিসেবে, লিউ শাও চিকে পলিটিক্যাল কমিশনার হিসেবে, লাই চুয়ান-চুকে চীফ অব স্টাফ এবং তেং জু-হুইকে রাজনৈতিক বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করছে। অস্থায়ী অধিনায়ক চেন ঈ এবং তাঁর সহযোগীদের এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য প্রয়াসী হন, সেনাবাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং জনগণের সংগে সুসম্পর্ক সুনিশ্চিত করে জনগণের তিনটি মূল নীতিকে কার্যকরী করতে প্রয়াসী হন, ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রের প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে এবং আমাদের জনগণ ও আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার সংগ্রামে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে সংহত ও সম্প্রসারিত করতে প্রয়াসী হন, এবং প্রয়াসী হন প্রতিরোধ যুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে ও জাপান অনুগামী গোষ্ঠীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার ব্যাপারে।

সিনহুয়া সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের জনৈক সংবাদদাতার কাছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈপ্লবিক সামরিক কমিশনের জনৈক মুখপাত্রের প্রদত্ত বিবৃতি

২২শে জানুয়ারী, ১৯৪১

দক্ষিণ আনহুই-এর সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট বিরোধী ঘটনাটি দীর্ঘকাল ধরে দানা বেঁধে উঠেছিল। বর্তমান ঘটনাবলী দেশজোড়া জরুরী পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশের একটি পর্যায় মাত্র। জার্মানি ও ইতালীর সংগে তাদের ত্রিশক্তির মৈত্রীবন্ধন[১] গড়ে তোলার সময় থেকেই জাপানী আক্রমণকারীরা চীন-জাপান যুদ্ধের দ্রুত সমাধান করার উদ্দেশ্যে চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য তাদের আয়োজিত প্রয়াসকে চারগুণ বৃদ্ধি করেছেন। তাদের মতলব হচ্ছে জাপ-বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য চীনাদেরই কাজে লাগানো এবং এভাবে পশ্চাৎদিককে সংহত করে দক্ষিণমুখী অভিযান চালানো, যাতে করে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে হিটলারের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা স্বচ্ছন্দে দক্ষিণমুখী অভিযান শুরু করে দিতে পারে। জাপান অনুরাগী চক্রটির বহুসংখ্যক পাণ্ডা দীর্ঘকাল ধরে নিজেরা কুওমিনতাঙ-এর পার্টি, সরকার ও সেনাবাহিনীর সংগঠনে জাঁকিয়ে বসে আছে এবং দিনরাত প্রচার-অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। গতবছরের শেষ দিকেই ওদের চক্রান্তের প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত হয়। দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনীর ইউনিটগুলির ওপর আক্রমণ এবং ১৭ই জানুয়ারির প্রতিক্রিয়াশীল হুকুমনামাটি[২] হচ্ছে এই চক্রান্তেরই প্রথম প্রকাশ্য অভিব্যক্তি মাত্র। মারাত্মক রকমের ঘটনাবলী এখন একের পর এক অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। জাপানী আক্রমণকারী ও জাপানের অনুগামী চক্রটির এই চক্রান্তের বিস্তারিত তথ্যগুলি কী কী ? সেগুলি হচ্ছে ঃ

(১) জনমতকে জাগিয়ে তোলার জন্য হো ইং-চিন ও পাই চুং-সি কর্তৃক স্বাক্ষরিত চু তে, পেং তে-হুয়াই, ইয়ে তিংকে প্রেরিত ১৯শে অক্টোবর ও ৮ই ডিসেম্বরের তারবার্তা দুটি[৩] প্রকাশ করা।

(২) সামরিক শৃংখলা ও সামরিক আদেশনামা মান্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় একটি প্রচার অভিযান গৃহযুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি হিসেবে শুরু করে দেওয়া।

(৩) দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

(৪) নতুন চতুর্থ বাহিনী 'বিদ্রোহ করেছে' এ কথা ঘোষণা করে দেওয়া এবং তার সরকারী মর্যাদা খারিজ করে দেওয়া ।

এই চারটি পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে।

(৫) মধ্যচীনের বিভিন্ন সেনাবাহিনীর 'কমিউনিস্ট' দলনের অভিযানের সেনানায়ক হিসেবে তাং এন-পো, লি পিন-সিয়েন, ওয়াং চুং-লিয়েন এবং হান তে-চিনকে নিযুক্ত করা, লি সুং-জেনকে এ ব্যাপারে সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়াগ করার লক্ষ্য হচ্ছে পেং সুয়ে-ফেং, চাং য়ুন-ই ও লী সিয়েন-নিয়েনের অধীনস্থ নতুন চতুর্থ বাহিনীর ইউনিটগুলিকে আক্রমণ করা, এবং যদি তা করে ফেলা যায় তাহলে অষ্টম রুট বাহিনী এবং নতুন চতুর্থ বাহিনীর যে ইউনিটগুলি শানতুং ও উত্তর কিয়াংসুতে রয়েছে, জাপানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগক্রমে তাদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন আক্রমণ শুরু করা।

এই ব্যবস্থাই এখন গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৬) একটা অজুহাত বের করে অষ্টম রুট বাহিনী 'বিদ্রোহ করেছে'—এ কথা ঘোষণা করে দেওয়া, তার সরকারী মর্যাদা খারিজ করে দেওয়া এবং চু তে ও পেং তে-হুয়াইকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া।

এই প্রচেষ্টার প্রস্তুতিই এখন চলছে।

(৭) অষ্টম রুট বাহিনীর যোগাযোগ স্থাপনকারী যে দপ্তরগুলো চুংকিং, সিয়ান ও কুইলিনে রয়েছে, সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া এবং চৌ এন-লাই ইয়ে চিয়েন ইং, তুং পি-উ এবং তেং ইং-চাওকে গ্রেপ্তার করা।

এই প্রয়াস কুইলিনের যোগাযোগ দপ্তর বন্ধ করার মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেছে।

(৮) **দৈনিক নয়া চীন** পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া।

(৯) শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করা এবং ইয়েনান দখল করা।

(১০) জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পক্ষপাতী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপক-ভাবে গ্রেপ্তার করা এবং চুংকিং ও প্রদেশগুলিতে জাপ-বিরোধী আন্দোলনকে দমন করা।

(১১) সমস্ত প্রদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং কমিউনিস্টদের পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার করা।

(১২) জাপানী সৈন্যরা চলে গেলে মধ্য ও দক্ষিণ চীনের 'হৃত অঞ্চলসমূহ কুওমিনতাঙ সরকার কর্তৃক 'পুনরুদ্ধারের' কথা ঘোষণা করা এবং সংগে সংগে তথাকথিত 'সম্মানজনক শান্তি সংস্থাপনের' চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করা।

(১৩) মধ্য ও দক্ষিণ চীন থেকে তার সৈন্যদের উত্তর চীনে সহায়ক বাহিনী হিসেবে সরিয়ে এনে জাপান অষ্টম রুট বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রকমের হিংস্র আক্রমণ চালাবে এবং সমগ্র অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য কুওমিনতাঙ বাহিনী সহযোগিতা করবে।

(১৪) কুওমিনতাঙ সকল ফ্রন্টেই গতবছরের যুদ্ধ বিরতি ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবে, যাতে তাকে সাধারণভাবে সন্ধিস্থাপন ও শান্তি আলোচনায় পরিণত করা যায়,

অন্যদিকে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া।

(১) কুওমিনতাঙ সরকার জাপানের সংগে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে এবং ত্রিশক্তির মৈত্রীবন্ধনে যোগদান করবে।

এইসব প্রয়াসের জন্য সক্রিয় প্রস্তুতিই এখন চালানো হচ্ছে।

সাধারণভাবে এই হচ্ছে জাপান এবং জাপানের অনুগামী চক্রটির বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চক্রান্তের রূপরেখা। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৩৯ সালের ৭ই জুলাই-এর ইস্তাহারে দেখিয়ে দিয়েছিল ঃ 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আত্মসমর্পণ সবচেয়ে গুরুতর রকমের বিপদ হয়ে রয়েছে এবং কমিউনিস্ট-বিরোধিতা হচ্ছে আত্মসমর্পণের পথে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ।' ১৯৪০ সালের ৭ই জুলাই-এর ইস্তাহারে পার্টি বলেছিল ঃ 'আত্মসমর্পণের বিপদ এত গুরুতর এর আগে কোন সময়ই ছিল না এবং যুদ্ধের সামনে বাধাবিপত্তি আজকের মতো এত বেশি এর আগে আর কোন সময়ই ছিল না।' চু তে, পেং তে-হুয়াই, ইয়ে তিং এবং সিয়াং ইং গতবছরের ৯ই নভেম্বর তাঁদের প্রেরিত তারবার্তায় আরও বেশি বাস্তবভাবে তা তুলে ধরেছিলেন ঃ

> কিছু লোক আত্মসমর্পণের পথ উন্মুক্ত করে তোলার প্রয়াস হিসেবে দেশের মধ্যে একটি নতুন কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণের আয়োজন করছে।..... 'কমিউনিস্টদের দমনের' ক্ষেত্রে চীন-জাপান সহযোগিতা বলে যাকে তারা অভিহিত করে, তার সাহায্যে প্রতিরোধ-যুদ্ধের অবসান ঘটাতেই তারা চায়। প্রতিরোধ-যুদ্ধের জায়গায় তারা আনতে চাইছে গৃহযুদ্ধকে, স্বাধীনতার স্থলে আত্মসমর্পণ, ঐক্যের জায়গায় বিভেদকে এবং আলোর পরিবর্তে অন্ধকারকে। ঘৃণ্য তাদের কার্যকলাপ আর জঘন্য তাদের অভিসন্ধি। লোকে একজন আরেকজনকে এই খবর বলছে আর আতংকিত হয়ে উঠছে। সত্যিই, আজকের মতো এমন জটিল অবস্থা এর আগে কোন সময় দেখা যায়নি।

তাই দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনা আর চুংকিং সামরিক পরিষদের ১৭ই জানুয়ারির হুকুমনামা অনেকগুলি ঘটনাধারার সূত্রপাত মাত্র। বিশেষ করে ১৭ই জানুয়ারির হুকুমনামা গুরুতর রাজনৈতিক ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। সর্বাত্মক নিন্দার ঝুঁকি নিয়েও এই প্রতিবিপ্লবী আদেশনামা যারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে সাহস করেছে, এই তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে যে তারা পুরোপুরি ভাঙনের জন্য এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়েই এটা করেছে। কারণ তাদের সূত্রধারক এই প্রভুদের বাদ দিয়ে চীনের বৃহৎ জমিদারবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের ভুঁড়িদার শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক প্রতিনিধিবর্গ এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতো না, সমগ্র বিশ্বকে সচকিত করে দেওয়ার মতো এরকম একটা অভিযানের তো কথাই ওঠে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে যারা এরকম আদেশনামা জারী করেছে, তাদের মানসিক পরিবর্তন নিয়ে

আসা অত্যন্ত কঠিন বলেই মনে হচ্ছে এবং সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে জরুরী কার্যকলাপ ও বিদেশ থেকে কঠিন রকমের কুটনৈতিক চাপ ছাড়া এটা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং, সমগ্র জাতির এখনকার জরুরী কর্তব্য হচ্ছে সর্বোচ্চ সতর্কতার সংগে ঘটনার গতিধারা লক্ষ্য করা এবং প্রতিক্রিয়াশীলেরা মারাত্মক যেসব পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে রাখা ; সামান্যতম অবহেলার অবকাশও এখন নেই। চীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা যায়, ব্যাপারটি খুবই পরিষ্কার। জাপানী আক্রমণকারী ও জাপানের অনুগামী চক্র যদি তাদের চক্রান্তে সফল হয়, আমরা চীনের কমিউনিস্টগণ ও চীনা জনগণ অনির্দিষ্টকাল কোনমতেই তাদের এই স্বৈরাচার চালিয়ে যেতে দেব না। আমরা যে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর এবং পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শুধু তাই নয়, এটা সুসম্পন্ন করতে পারা সম্পর্কেও আমরা সুনিশ্চিত। পরিস্থিতি যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক, পথ যতই কণ্টাকাকীর্ণ হোক এবং এ পথে চলার জন্য যা কিছু মূল্যই দিতে হোক (দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলে নতুন চতুর্থবাহিনীর ইউনিটগুলোর বিনাশ সেই মূল্যেরই একটা অংশ)—জাপানী আক্রমণকারী এবং জাপানের অনুগামী চক্রটির ধ্বংস অবধারিত। কারণগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(১) ১৯২৭ সালের মতো চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে সহজে প্রতারিত ও ধ্বংস করা আর সম্ভব নয়। আজ তা একটি প্রধান দল হয়ে উঠছে এবং দৃঢ়ভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে তা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

(২) (কুওমিনতাঙ সহ) অন্যান্য পার্টি ও গ্রুপের যে, বহু সংখ্যক সদস্য জাতীয় পরাধীনতার দুর্বিপাকের কথা ভেবে আশংকিত, তারা সুনিশ্চিতভাবেই আত্মসমর্পণ করতে চাইবেন না এবং গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। সাময়িকভাবে এদের কেউ কেউ প্রতারিত হলেও যথাসময়ে তাঁরা সজ্ঞানে ফিরে আসবেন।

(৩) সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রেও তা সত্য। তাঁদের অধিকাংশই বাধ্য হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করছেন।

(৪) চীনের জনগণের সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ঔপনিবেশিক ক্রীতদাসে পরিণত হতে চান না।

(৫) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ একটি বিরাট পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এই মুহূর্তে দম্ভ তাদের যত বেশিই হোক, সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল পরগাছারা শীঘ্রই দেখতে পাবে যে, তাদের কর্তারা তত নির্ভরযোগ্য নয়। একের পর এক মহীরুহ যখন ভূপাতিত হতে থাকবে এবং বাঁদরের যখন প্রাণভয়ে চারিদিকে ছুটে পালাবে, তখন গোটা অবস্থারই পরিবর্তন ঘটবে।

(৬) বহু দেশে বিপ্লবের ফেটে পড়া এখন শুধু সময়ের ব্যাপারে এবং এটা সুনিশ্চিত যে, ঐসব বিপ্লব ও চীনের বিপ্লব একে অপরকে তাদের সম্মিলিত সংগ্রামের বিজয়সাধনে সহায়তা করবে।

(৭) সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের সবচেয়ে বলশালী শক্তি এবং চীনের প্রতিরোধ-যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তা সাহায্য করে যাবেই।

এইসব কারণে আমরা বিশ্বাস করি যে, যারা আগুন নিয়ে খেলা করছে তাদের গর্বিত হয়ে ওঠার কোন হেতু নেই। আমরা তাদের আনুষ্ঠানিক এই সতর্কবাণীটি জানিয়ে দিতে চাই ঃ একটু সতর্ক হয়ে চলাই ভাল। আগুন খেলা করার বস্তু নয়। নিজেদের চামড়ার দিকে একটু নজর রাখ! যদি শান্ত হয়ে চল, বিষয়টা নিয়ে একটু ভেবে দেখ, তাহলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবিলম্বে এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবে ঃ

(১) তোমরা খাদের একেবারে সীমান্তে এসে পড়েছে, এখনই থেমে যাও আর প্ররোচনা বন্ধ কর।

(২) ১৭ই জানুয়ারির প্রতিক্রিয়াশীল হুকুমনামা খারিজ কর এবং প্রকাশ্যে এ কথা কবুল কর যে, ঐটি পুরোপুরি ভুল হয়েছিল।

(৩) হো য়িং-চিন, কু চু-তুং আর শাংকুয়ান য়ুন-সিয়াং—দক্ষিণ আনহুই ঘটনার এই প্রধান অপরাধীদের শাস্তিপ্রদান কর।

(৪) ইয়ে তিংকে মুক্তি দাও এবং নতুন চতুর্থ বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে তাঁকে পুনর্নিয়োগ কর।

(৫) দক্ষিণ আনহুইতে নতুন চতুর্থ বাহিনীর যেসব সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র করায়ত্ত করেছ, তা ফিরিয়ে দাও।

(৬) দক্ষিণ আনহুইতে নতুন চতুর্থ বাহিনীর যেসব অফিসার ও সৈন্য আহত হয়েছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণ দাও এবং যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের পরিবারবর্গকেও ক্ষতিপূরণ দাও।

(৭) 'কমিউনিস্ট দমনের' জন্য মধ্য চীনে যে সৈন্য পাঠিয়েছে তা প্রত্যাহার কর।

(৮) উত্তর-পশ্চিমের অবরোধ[৪] তুলে নাও।

(৯) সমস্ত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও।

(১০) একদলীয় একনায়কত্বের অবসান ঘটাও এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তন কর।

(১১) তিনটি মৌলিক গণনীতি কার্যকরী কর এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রটি কার্যকরী কর।

(১২) জাপানের অনুগত চক্রটির পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার কর এবং দেশের আইনানুসারে তাদের বিচারের ব্যবস্থা কর।

এই বারো দফা কার্যসূচী যদি বাস্তবে কার্যকরী করা হয়, তবে অবশ্যই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এবং আমরা কমিউনিস্টরা ও সমগ্র জনগণ ব্যাপারটাকে নিশ্চয়ই চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাব না। অন্যথায় 'আমার ভয় হচ্ছে, চি সুনের বিপদ চুয়ান য়ুর কাছ থেকে আসবে না, দেখা দেবে নিজের ঘর থেকেই'[৫], অন্য কথায় বলা

যায়, প্রতিক্রিয়াশীলেরা একটি প্রস্তরখণ্ড তুলছে তা শুধু তাদের নিজেদের পায়ের ওপরেই ফেলবার জন্য এবং আমরা সাহায্য করতে চাইলেও কিছু করে উঠতে পারব না। সহযোগিতাকে আমরা খুবই দাম দিয়ে থাকি, কিন্তু তাদেরও তো একটু মদৎ চাই। খোলাখুলি বলা যায়, আমাদের দিক থেকে সুবিধে দেওয়ার একটা সীমা আছে ; আমাদের দিক থেকে সুবিধে দেওয়ার অধ্যায় শেষ হয়েছে। ওরা প্রথম আঘাত হেনেছে, এবং মারাত্মক আঘাত হেনেছে। যদি তাদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কোন ভাবনাচিন্তা থেকে থাকে, তবে নিজেদের থেকেই এগিয়ে এসে এই আঘাতচিহ্নকে তাদের সযত্নে দূর করা উচিত কাজ হবে। 'কয়েকটি ভেড়া খোয়া গেলেও বেড়াটা মেরামত করে পুরো দলটিকে রক্ষা করার সময় এখনো কেটে যায়নি।' তাদের পক্ষে এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন এবং এই সর্বশেষ উপদেশটি তাদের দেওয়া আমরা নিজেদের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। ঔদ্ধত্য যদি তাদের এখনো না ঘুচে থাকে এবং বাজে কাজ তারা যদি চালিয়ে যেতেই থাকে, সহ্যের শেষ সীমায় পৌছে যাওয়া চীনা জনগণ ওদের আস্তাকুঁড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন, আর তখন অনুশোচনার অবকাশও থাকবে না। নতুন চতুর্থ বাহিনীর প্রতি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক কমিশন ২০শে জানুয়ারি একটি নির্দেশ ঘোষণা করে চেন ঈকে অস্থায়ী সেনানায়ক, চাং য়ুন-ইকে উপ-সেনানায়ক, লিউ শাও-চিকে পলিটিক্যাল কমিশনার, লাই চুয়ান-চুকে চীফ অব স্টাফ এবং তেং জু-হুইকে রাজনৈতিক বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করেছে। মধ্য চীনে ও দক্ষিণ কিয়াংসুতে নব্বই হাজারের অধিক অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে জাপানী আক্রমণকারী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী সৈন্যদলের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেও নতুন চতুর্থ বাহিনী নিশ্চয়ই সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এবং জাতির সেবায় ঐকান্তিকভাবে কাজ করে যাবে। আমি খোলাখুলি এ কথা জানিয়ে দিতে চাই—ভ্রাতৃপ্রতিম অষ্টম রুট বাহিনীর ইউনিটগুলি এই সময় চুপচাপ বসে থাকবে না, সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পড়ে তাদের মার খেতে দেখবে না এবং নিশ্চিতভাবেই প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। চুংকিং-এর সামরিক পরিষদের মুখপাত্রের বিবৃতি সম্পর্কে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, এটি স্ব-বিরোধিতাপূর্ণ। চুংকিং-এর সামরিক পরিষদ একদিকে তাদের আদেশনামায় বলছেন—নতুন চতুর্থ বাহিনী নাকি 'বিদ্রোহ করেছে', কিন্তু মুখপাত্রটি বলছেন তাঁদের লক্ষ্য ছিল নানকিং-সাংহাই-হাংচাও ত্রিভুজে অগ্রসর হয়ে ওখানে একটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা। এখন ধরে নিচ্ছি, তিনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু নানকিং-সাংহাই-হাংচাও ত্রিভুজে অগ্রসর হওয়াকে কি 'বিদ্রোহ করা' বলে গণ্য করা চলে ? চুংকিং-এর মুখপাত্ররূপী এই মুর্খটির চিন্তাশক্তি একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি নিশ্চয়ই। ঐ অঞ্চলে নতুন চতুর্থ বাহিনী কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাচ্ছিল। এটা কি জাপানের অধিকৃত একটা এলাকা নয় ? তাহলে নতুন চতুর্থ বাহিনীকে ঐ অঞ্চলে যেতে আপনারা বাধা দিলেন কেন এবং যখন তারা

দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলেই রয়ে গেছে, তখন তাদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হল কেন? হাঁ, তা তো করতেই হবে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্যদের তো তাই করতে হবে। তারই জন্য সাত ডিভিসন সৈন্য জড়ো করে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান তারা চালিয়েছে, তারই জন্য ১৭ই জানুয়ারির আদেশনামা জারী করেছে এবং তারই জন্য ইয়ে তিং-এর বিচারের আয়োজন তারা করছে। যাই হোক, আমি এখনো বলছি, চুংকিং-এর মুখপাত্রটি একটি গবেট, কারণ চাপে পড়ার আগেই সে ঝুলি থেকে বিড়ালটি বের করে দিয়েছে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা সমগ্র জনগণের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।

টীকা

১। 'ত্রিশক্তির মৈত্রীবন্ধন' বলতে জার্মানি, ইতালী ও জাপানের মধ্যে ১৯৪০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর বার্লিনে স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিকে বোঝাচ্ছে।

২। জাতীয় সরকারের সামরিক পরিষদের পক্ষ থেকে চিয়াং কাই-শেক নতুন চতুর্থ বাহিনীকে ভেঙে দেবার জন্য ১৭ই জানুয়ারির প্রতিক্রিয়াশীল হুকুমনামাটি জারী করেছিল।

৩। এই দুটি কুখ্যাত টেলিগ্রাম ১৯৪০ সালের শেষের দিকে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে চিয়াং কাই-শেক প্রেরণ করেছিল এবং ঐগুলিতে স্বাক্ষর করেছিল কুওমিনতাঙ সরকারের সামরিক পরিষদের জেনারেল স্টাফের প্রধান ও উপ-প্রধান হিসেবে হো ইং-চিন এবং পাই চুং-সি। ১৯শে অক্টোবরের টেলিগ্রামে, যে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর সৈন্যরা শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলসমূহে সংগ্রাম করছিল, তাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক কুৎসা রটানো হয়েছিল এবং ঔদ্ধত্যভরে একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাদের জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ইউনিটগুলিকে ইয়েলো নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তরে সরিয়ে নেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। সশস্ত্র প্রতিরোধের স্বার্থে কমরেড চু তে, পেং তে-হুয়াই, ইয়ে তিং এবং সিয়াং ইং ৯ই নভেম্বর একটি যৌথ উত্তর পাঠিয়ে উত্তরে দক্ষিণ আনহুইতে সৈন্যদের সরিয়ে নিতে সম্মতি জানান কিন্তু সংগে সংগে কুৎসা প্রচারকে খণ্ডন করেন। হো ইং-চিন এবং পাই চুং-সি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ৮ই ডিসেম্বরের টেলিগ্রাম ছিল ৯ই নভেম্বরের টেলিগ্রামের প্রত্যুত্তর এবং তাতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জনমতকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আরেকটি প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

৪। শেননি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে ঘিরে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা উত্তর-পশ্চিমে অবরোধ গড়ে তুলেছিল। ১৯৩৯ সাল থেকে স্থানীয় লোকদের কাজে লাগিয়ে তারা পাঁচটি সারি দিয়ে অবরোধগৃহ তৈরী করে পাথরের দেওয়াল ও পরিখা খনন করায়। এই লাইন পশ্চিমে নিংসিয়া থেকে শুরু করে চিংশুই নদী ধরে দক্ষিণে চলে গিয়েছিল এবং পূর্বে ইয়েলো নদীতে এসে শেষ হয়েছিল। দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার প্রাক্কালে সীমান্ত অঞ্চলটি ঘিরে কুওমিনতাঙ সৈন্যদের সংখ্যা বাড়িয়ে দু লক্ষ করা হয়।

৫। 'কনফুসিয়াসের বাণীর' ষোড়শ খণ্ডের প্রথম অধ্যায় থেকে উধৃতিটি নেওয়া হয়েছে। লু রাজ্যের মন্ত্রী চি সুন যখন ক্ষুদ্র একটি প্রতিবেশী রাজ্য চুয়াঁউ আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন কনফুসিয়াস এই মন্তব্যটি করেছিলেন।

দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিহত হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি

১৮ই মার্চ, ১৯৪১

১। দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী যে অভিযানের[১] সূত্রপাত হয়েছিল হো ইং-চিন এবং পাই চুং-সির (গতবছরের ১৯শে অক্টোবর তারিখের) টেলিগ্রামের মধ্য দিয়ে, তার চুড়ান্ত পরিণতি ঘটেছিল দক্ষিণ আনহুই অঞ্চলের ঘটনার এবং চিয়াং কাই-শেকের ১৭ই জানুয়ারির আদেশনামার মধ্য দিয়ে। তাছাড়া প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে তার কার্যকলাপ ছিল ৬ই মার্চের কমিউনিস্ট-বিরোধী বক্তৃতা এবং জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের[২] কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রস্তাব। এখন থেকে পরিস্থিতিতে সাময়িক কিছু সহজভাব দেখা যেতে পারে। পৃথিবীর দুটি প্রধান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী যখন একটি চুড়ান্ত নির্ধারিক সংগ্রামের মুখে, চীনের বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর যে অংশটি ব্রিটিশ এবং মার্কিনদের অনুগামী, আর যারা এখনো পর্যন্ত জাপানী আক্রমণকারীদের বিরোধী তারা 'কুওমিনতাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার বর্তমান তিক্ত সম্পর্ককে সাময়িকভাবে খানিকটা সহজ করে আনার প্রয়াসকে বাঞ্ছিত বলে মনে করছে। তাছাড়া কুওমিনতাঙ এই সম্পর্ককে গত পাঁচ মাস ধরে তা যে উচ্চগ্রামে রয়েছে সেখানে রেখে দিতে পারে না, এবং তার কারণ হচ্ছে কুওমিনতাঙের আভ্যন্তরীণ অবস্থা (কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, কেন্দ্রীয় কমিটির চক্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রুপের মধ্যে, কেন্দ্রীয় কমিটির চক্র ও ফু সিং সোসাইটির মধ্যে[৩] এবং গুঁয়ে ও মাঝারি শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং তাছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির চক্রের অভ্যন্তরে এবং ফু সিং সোসাইটির অভ্যন্তরেও দ্বন্দ্ব রয়েছে) দেশের পরিস্থিতি (জনসাধারণের ব্যাপক অংশ কুওমিনতাঙের স্বৈরাচারের বিরোধী এবং এক কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল) এবং আমাদের পার্টির নিজস্ব নীতি (প্রতিবাদ-আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া) ইত্যাদির জন্য তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে তাই উত্তেজনার অবস্থাকে খানিকটা সাময়িকভাবে সহজ করে আনাটা চিয়াং কাই শেকের প্রয়োজন।

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও-সে-তুঙ লিখে ছিলেন।

২। সাম্প্রতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কুওমিনতাঙের মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে এবং কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর উভয় পার্টির তুলনামূলক শক্তির ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এটি তার একটি মূল চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সবকিছু মিলে চিয়াং কাই-শেককে তার নিজের অবস্থান ও মনোভাব পুর্নবিবেচনা করতে বাধ্য করেছে। জাতীয় প্রতিরক্ষার ওপর জোর দিয়ে এবং পার্টিগত রাজনীতি অচল হয়ে পড়ছে এ কথা প্রচার করে, শ্রেণী ও পার্টিগত দিক থেকে তিনি পক্ষপাতহীন এই ভান করে তিনি যে নিজেকে দেশের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে অবস্থিত একজন 'জাতীয় নেতা' হিসেবে হাজির করছেন, তার লক্ষ্য হচ্ছে বৃহৎ জমিদারশ্রেণী, বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও কুওমিনতাঙের শাসনকে রক্ষা করা। যদি তা শুধুই একটি আবরণ মাত্র হয় এবং নীতির ক্ষেত্রে প্রকৃত কোন পরিবর্তন না বোঝায়, তবে তাঁর এই প্রয়াস নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ প্রমাণিত হবে।

৩। বর্তমান কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের শুরুতে আমাদের পার্টি যে আপোষ ও সুবিধাদানের নীতি গ্রহণ করেছিল, সাধারণ স্বার্থের কথা বিবেচনা করে (গত বছরের ৯ই নভেম্বরের টেলিগ্রামে যা প্রকাশ পেয়েছে) তার ফলে জনগণের সহানুভূতি লাভ করা গেছে এবং দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার পর আমরা যখন প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণ শুরু করলাম (দুই দফায় আমাদের বারোটি দাবি[৪], জনগণের রাজনৈতিক পরিষদে আমাদের অংশগ্রহণ অস্বীকৃতি এবং দেশব্যাপী প্রতিবাদ-অভিযানে যার প্রকাশ পাওয়া গেছে) তাতে করে সমগ্র জনগণের সমর্থন আমরা নতুন করে লাভ করেছি। আমাদের এই নীতি, ন্যায্য ভিত্তি ও সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়িয়ে সংযতভাবে সংগ্রাম পরিচালনার আমাদের এই নীতি সর্বশেষ কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিহত করার জন্য সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় ছিল এবং ইতিমধ্যেই তার সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার প্রধান প্রধান বিরোধীয় বিষয়ের যুক্তিসংগত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ আনহুই-এর যে ঘটনাটি কুওমিনতাঙের মধ্যেকার জাপানের অনুগামী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী চক্রই বাধিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে এবং তাদের সর্বপ্রকারের রাজনৈতিক ও সামরিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জ্ঞাপানের অভিযানে শিথিলতার ভাব দেখানো আমাদের চলবে না, এবং প্রথম বারোটি দাবির জন্য আমাদের প্রচার-অভিযানকে তীব্র করে তুলতেই হবে।

৪। কুওমিনতাঙ আমাদের পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীলদের নিপীড়ন করার নীতিতে অথবা তাদের শাসনাধীন এলাকাসমূহে কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার-অভিযানে শিথিলতা

প্রদর্শন করবে না, সুতরাং আমাদের পার্টিকে তার সতর্কতাকে তীব্রতর করে তুলতেই হবে। হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলে, পূর্ব আনহুই এবং মধ্য হুপে অঞ্চলে তারা তাদের আক্রমণ চালিয়েই যাবে এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে তা প্রতিহত করতে দ্বিধা করলে চলবে না। সমস্ত ঘাঁটি অঞ্চলকেই কঠোরভাবে গতবছরের ২৫শে ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাবলীকে[৫] কার্যকরী করতে হবে, রণকৌশল সম্পর্কে পার্টির আভ্যন্তরীণ শিক্ষাকে তীব্রতর করে চলতে হবে এবং অতিবামপন্থী অভিমতগুলিকে সংশোধন করতে হবে, যাতে করে আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এলাকাগুলোকে অব্যাহত রাখতে পারি। অবশ্যই সমস্ত ঘাঁটি এলাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার চূড়ান্ত ভাঙ্গন হয় ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে আর নয়তো অনতিবিলম্বেই ঘটতে যাচ্ছে—এই ভ্রান্ত মূল্যায়ন এবং তা থেকে অন্য বহুবিধ যে ভ্রান্ত অভিমত দেখা দেয়, সেই সবগুলিকেই খারিজ করে দিতে হবে।

টীকা

১। দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান সম্পর্কে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য 'কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এবং জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য' দেখুন। (মাও সে-তুঙ ঃ 'নির্বাচিত রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড।)

২। ১৯৪১ সালের ৬ই মার্চ চিয়াং কাই-শেক জনগণের রাজনৈতিক পরিষদে একটি কমিউনিস্ট বিরোধী বক্তৃতা দেন। 'সমস্ত সামরিক ও রাজনৈতিক পরিচালনার কাজ ঐক্যবদ্ধ' হওয়া আবশ্যক—তাঁর এই পুরানো বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে তিনি ঘোষণা করেন যে, শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত সকল জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্থা বাতিল করে দিতে হবে এবং তাঁর 'আদেশ ও পরিকল্পনা' অনুসারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে 'সুনির্দিষ্ট এলাকায় কেন্দ্রীভূত' রাখতে হবে। একই দিনে যে জনগণের রাজনৈতিক পরিষদ কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদেরই প্রভাবাধীন ছিল তা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে চিয়াং কাই-শেকের কমিউনিস্ট বিরোধী ও জন-বিরোধী কার্যকলাপকে অনুমোদন করে এবং দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার প্রতিবাদে কমিউনিস্ট সদস্যগণ জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করার জন্য তাঁদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে।

৩। 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রুপ' সম্পর্কে জানার জন্য বর্তমান খণ্ডের 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা' নামক রচনার ১৬ নং টীকা দেখুন। 'কেন্দ্রীয় কমিটির চক্র' এবং ফু সিং সোসাইটি সম্পর্কে জানার জন্যও বর্তমান খণ্ডের 'সাংহাই ও তাইয়ুয়ানের পতনের পর জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পরিস্থিতি ও কর্তব্যসমূহ' নামক রচনার ১০ নং টীকা দেখুন।

৪। ১৯৪১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের অধিবেশনে কমিউনিস্ট সদস্যগণ প্রথম দফায় যে 'বারোটি দাবি' উত্থাপন করেন, সেগুলি 'দক্ষিণ আনহুই ঘটনা সম্পর্কে নির্দেশ ও বিবৃতি'তে যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তারই অনুরূপ। দ্বিতীয় দফার দাবিগুলি জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের কমিউনিস্ট সদস্যগণ পরিষদের অধিবেশনে তাদের যোগদানের শর্ত হিসেবে ১৯৪১ সালের ২রা মার্চ চিয়াং কাই-শেকের কাছে পেশ করেন। সেগুলি হচ্ছেঃ

(১) অবিলম্বে সারা দেশব্যাপী কমিউনিস্ট-বিরোধী সামরিক আক্রমণ বন্ধ কর।

(২) চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টি এবং গ্রুপের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক নিপীড়ন চলছে তা বন্ধ কর, তাদের আইনসঙ্গত মর্যাদা স্বীকার করে নাও এবং সিয়ান, চুংকিং, কুইয়াং ও অন্যান্য স্থানে ধৃত তাদের সকল সদস্যদের মুক্তি দাও।

(৩) বিভিন্ন স্থানে যেসব বইয়ের দোকান বন্ধ-করে দেওয়া হয়েছে তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নাও, ডাকঘরসমূহে জাপ-বিরোধী পুস্তকাদি ও পত্র-পত্রিকা আটক করার আদেশটি খারিজ করে দাও।

(৪) **দৈনিক নতুন চীন** পত্রিকার ওপর আরোপিত সকল নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহার কর।

(৫) শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের বৈধ অস্তিত্ব স্বীকার করে নাও।

(৬) শত্রুর পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলোকে স্বীকৃতি দাও।

(৭) চীনের মধ্য, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সেনাদল ভাগাভাগি করার সময় **স্থিতাবস্থা** বজায় রাখ।

(৮) কমিউনিস্ট-পরিচালিত সশস্ত্র বাহিনীকে অষ্টাদশ গ্রুপ সেনাবাহিনী ছাড়া অন্য গ্রুপ সেনাবাহিনী গঠন করতে দাও, যাতে করে মোট ছটি সেনাবাহিনী তৈরী হয়।

(৯) দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনাকালে যে সমস্ত কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের সকলকে মুক্তি দাও এবং হতাহতদের পরিবারকে সাহায্য-দানের জন্য অর্থবরাদ্দ কর।

(১০) দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনাকালে ধৃত সকল অফিসার ও সৈনিকদের মুক্তি দাও এবং তাদের কাছ থেকে ধৃত সকল অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দাও।

(১১) সমস্ত দল ও গ্রুপের প্রত্যেকটি থেকে এক-একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি যুক্ত কমিটি গঠন কর এবং কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের যথাক্রমে তার সভাপতি ও সহ-সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত কর।

(১২) জনগণের রাজনৈতিক পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীতে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত কর।

৫। ২৫শে ডিসেম্বরের নির্দেশাবলী বর্তমান খণ্ডের 'কর্মনীতি সম্পর্কে' নামক রচনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রতিরোধ প্রসঙ্গে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

৮ই মে, ১৯৪১

১৯৪১ সালের ১৮ই মার্চের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাবলীতে বলা হয়েছে—দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান শেষ হয়েছে। তারপর থেকে যা যা ঘটেছে তা হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ নতুন আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে এগিয়ে চলেছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে উপাদান হিসেবে যা যুক্ত হয়েছে তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রসার, আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে নিরপেক্ষতার চুক্তি[১] সম্পাদন, দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের পরাজয় এবং তারই পরিণতি হিসেবে কুওমিনতাঙ-এর রাজনৈতিক মর্যাদা হ্রাস ও কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি আর তারপর রয়েছে চীনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে নতুন আক্রমণ-অভিযানের জন্য জাপানের সর্বশেষ প্রস্তুতি। সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির বীরত্বপূর্ণ ও বিজয়ী সংগ্রামকে অনুশীলন করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অধ্যবসায় নিয়ে দেশব্যাপী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মসমর্পণ ও কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রতিকূল স্রোতকে কার্যকরভাবে বিধ্বস্ত করে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলার উদ্দেশ্যে একান্ত অপরিহার্য।

১। চীনের দুটো প্রধান দ্বন্দ্বের মধ্যে চীন ও জাপানের মধ্যেকার জাতীয় দ্বন্দ্ব এখনো মুখ্য দ্বন্দ্ব এবং চীনে আভ্যন্তরীণ শ্রেণী দ্বন্দ্ব এখনো অপ্রধান হয়েই রয়েছে। একটি জাতীয় শত্রু আমাদের দেশের অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছে—এই বাস্তব সত্য চূড়ান্ত নির্ধারক হয়ে রয়েছে। চীন ও জাপানের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব যতদিন তীব্র হয়ে থাকবে, তার মাঝে সমগ্র বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী দেশদ্রোহী হয়ে আত্মসমর্পণ করে বসলেও, তারা আর কোনকালেই ১৯২৭ সালের পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে বা ঐ বছরে ১২ই এপ্রিলের[২] ও ২১ শে মের[৩] ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারবে না। প্রথম কমিউনিস্ট

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি রচনা করেছিলেন।

বিরোধী অভিযানকে[৪] কিছু কমরেড ২১শে মে'র ঘটনার অন্য একটি রূপ বলে মনে করেছিলেন এবং দ্বিতীয় অভিযানকে ১২ই এপ্রিল ও ২১শে মে'র ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি বলে মনে করেছিলেন ; কিন্তু বাস্তব তথ্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ঐ মূল্যায়ন ভুল। এই কমরেডদের ভুল হচ্ছে এখানেই যে, তাঁরা জাতিগত দ্বন্দ্বই যে মুখ্য দ্বন্দ্ব তা ভুলে গেছেন।

২। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সমর্থক ও মার্কিন সমর্থক যে বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী কুওমিনতাঙ সরকারকে পরিচালনা করে, সেই শ্রেণীগুলোর দ্বৈত চরিত্র রয়ে গেছে। একদিকে, তারা জাপানের বিরোধী, আবার অন্যদিকে তারা কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টি যে ব্যাপক জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে তারও বিরোধী আর তাদের জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং তাদের কমিউনিস্ট বিরোধিতা দুটোরই দ্বৈত চরিত্র রয়েছে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, যদিও তারা জাপানের বিরোধী, তবু তারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ চালাচ্ছে না বা সক্রিয়ভাবে ওয়াং চিং-ওয়েই ও অন্যান্য দেশদ্রোহীদের বিরোধিতা করছে না, এবং এমনকি মাঝে মাঝে জাপানের শান্তি-দূতেদের সংগে দহরম-মহরম পর্যন্ত করছে। তাদের কমিউনিস্ট-বিরোধিতা প্রসঙ্গে দেখা যায়, তারা কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী তো বটেই, এমনকি, দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার মতো ঘটনা পর্যন্ত তারা সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, ১৭ই জানুয়ারির হুকুমনামা পর্যন্ত জারী করছে, কিন্তু সংগে সংগে তারা চূড়ান্ত ভাঙ্গন নিয়ে আসতে চাইছে না, এবং এখনো তাদের নরম-গরম নীতিটিই চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযানে এই বাস্তব সত্য আবার নতুন করে সুপ্রমাণিত হয়েছে। চীনের রাজনীতি অত্যন্ত জটিল এবং তা অনুধাবনের জন্য আমাদের কমরেডদের গভীরতম মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু ব্রিটিশ-অনুগামী ও মার্কিন-অনুগামী বৃহৎ জমিদারবর্গ ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী এখনো জাপানকে প্রতিরোধ করছে, আমাদের পার্টির সংগে মোকাবিলার ক্ষেত্রে নরম-গরম নীতি প্রয়োগ করছে, আমাদের পার্টির নীতিও তাই হবে—'ওরা আমাদের প্রতি যা করবে, আমরাও ওদের প্রতি ঠিক তা-ই করব'[৫], গরমকে গরম দিয়েই মোকাবিলা করব, নরমকে মোকাবিলা করব নরম দিয়ে। এই হচ্ছে বৈপ্লবিক দ্বৈত নীতি। যতদিন পর্যন্ত বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী পুরোপুরি দেশদ্রোহী হয়ে না যাচ্ছে, ততদিন আমাদের এই নীতিও আমরা পাল্টাব না।

৩। কুওমিনতাঙ-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতির মোকাবিলা করতে হলে দরকার হবে ব্যাপক ধরনের পুরো একগুচ্ছ রণকৌশল এবং সেক্ষেত্রে ঔদাসীন্য ও অবহেলার কোন ঠাঁই-ই নেই। বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের বৈপ্লবিক শক্তিগুলোর প্রতি ওদের শত্রুতা নিষ্ঠুরতার প্রকাশ শুধু দশ বছরের কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেনি, বরং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কালেও

দুটো কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের মধ্যে দিয়ে এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকালে দ্বিতীয় আনহুই ঘটনার মধ্যে দিয়ে ও পুরোপুরি অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে। যদি জনগণের বৈপ্লবিক বাহিনীকে চিয়াং কাই-শেকের হাতে নিশ্চিহ্ন না হতে হয় এবং নিজেদের অস্তিত্ব তাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিতে হয়, তবে ইঁটের বদলে পাটকেল নিক্ষেপের সংগ্রাম তার প্রতিবিপ্লবী নীতির বিরুদ্ধে চালাতেই হবে। কমরেড সিয়াং ইং-এর সুবিধাবাদের পরিণতিস্বরূপ যে পরাজয় সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকালে বরণ করতে হয়েছে, তা সমগ্র পার্টির কাছে একটি গুরুতর সতর্কবাণী বলে গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সংগ্রাম চালাতে হবে ন্যায্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, আমাদের সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়িয়ে এবং সংযতভাবে; এই তিনটির একটিও যদি না থাকে তাহলে পশ্চাদপসরণ আমাদের অবধারিত।

৪। কুওমিনতাঙ-এর একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৃহৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের জাতীয় বুর্জোয়াদের থেকে পৃথক করে দেখতে হবে, কারণ ওদের মুৎসুদ্দি চরিত্র অতি অল্প অথবা নেই বললেই চলে। সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ জমিদারবর্গকে আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবর্গ এবং সাধারণ জমিদারদের থেকে পৃথক করে দেখতে হবে। মাঝারি অংশগুলিকে সপক্ষে নিয়ে আসার এবং 'তিনটি এক-তৃতীয়াংশ পদ্ধতির' ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার পার্টির প্রয়াসের এইটিই হচ্ছে তত্ত্বগত ভিত্তি এবং গতবছরের মার্চ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি বারবার তা জোরের সংগে বলে এসেছে। সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকালে তার সত্যতা নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে। ৭ই নভেম্বরের টেলিগ্রামে[৬] অভিব্যক্ত যে অবস্থান আমরা দক্ষিণ আনহুই ঘটনার আগে গ্রহণ করেছিলাম, তা পুরোপুরি প্রয়োজনীয় ছিল এই ঘটনার পরে প্রতি-আক্রমণের পরিবর্তিত অবস্থানে আমাদের চলে যাওয়ার জন্য ; অন্যথায় আমরা মাঝারি অংশসমূহকে সপক্ষে নিয়ে আসতে পারতাম না। কারণ বারবার যদি তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তাদের শিক্ষা না হতো, তাহলে মাঝারি অংশসমূহ আমাদের পার্টি কেন কুওমিনতাঙ-এর একগুঁয়েদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করছে তা উপলব্ধি করতে পারত না, সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই যে শুধু ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সংগ্রাম পরিত্যাগ করলে কোন ঐক্যই যে হতে পারে না—এটা উপলব্ধি করতে পারত না। যদিও আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলো বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীরই অর্ন্তভুক্ত, তবু সাধারণভাবে ওদের মাঝারি অংশ হিসেবে গণ্য করা উচিত ও সেভাবেই ওদের প্রতি আচরণ করা উচিত, কেননা ওদের সংগে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণকারী বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব রয়েছে। কেইয়েন শী-সান প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানকালে সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন, দ্বিতীয় অভিযানকালে তিনিই মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেন এবং যে কোয়াংসি চক্র

প্রথম অভিযানকালে মাঝারি অবস্থান গ্রহণ করেছিল, দ্বিতীয় অভিযানে তারা কমিউনিস্ট-বিরোধী পক্ষাবলম্বন করে—এসব সত্ত্বেও এদের সংগে চিয়াং কাই-শেক চক্রের দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং দুটোকে অভিন্ন করে দেখলে চলবে না। আঞ্চলিক ক্ষমতাশালী গ্রুপগুলো সম্পর্কে কথাটা বেশি করে প্রযোজ্য। আমাদের বহু কমরেডই কিন্তু বিভিন্ন জমিদার ও বুর্জোয়াগোষ্ঠীকে একাকার করে ধরে বসে থাকেন, যেন গোটা জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণীই দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার পর দেশদ্রোহী বনে গেছে; এটা চীনের জটিল রাজনীতির একটি অতি-সরলীকরণ মাত্র। এই অভিমতই যদি আমরা গ্রহণ করে বসতাম এবং সকল জমিদার ও বুর্জোয়াদেরই কুওমিনতাঙ একগুঁয়েদের সংগে একাকার করে ফেলতাম, তাহলে আমরা নিজেদেরই বিচ্ছিন্ন করে ফেলতাম। এ কথা বোঝা দরকার যে, চীনের সমাজটি মাঝামাঝি স্তরে বিরাট এবং দুটি প্রান্তভাগেই ক্ষুদ্রকায়[১], এবং কমিউনিস্ট পার্টি যদি মাঝারি শ্রেণীগুলিকে জয় করে নিজের পক্ষে নিয়ে তা আসতে পারে ও তাদের নিজ নিজ পরিস্থিতি অনুসারে তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ করে না দেয়, তবে তার পক্ষে চীনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

৫। কিছু কমরেড যেহেতু চীন ও জাপানের মধ্যেকার দ্বন্দ্বই যে মুখ্য দ্বন্দ্ব এই বিষয়ে দোদুল্যমানতা প্রদর্শন করেছেন, তাই দেখা গেছে চীনের শ্রেণী সম্পর্কের মূল্যায়ণে তাঁরা ভুল করেছেন এবং মাঝে মাঝেই তাঁরা পার্টির নীতির ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা প্রদর্শন করেছেন। দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনা ১২ই এপ্রিল অথবা ২১শে মে'র ঘটনারই অনুরূপ—এই মূল্যায়ন থেকে অগ্রসর হয়ে এই কমরেডরা এ কথা ভাবছেন বলেই মনে হচ্ছে যে, গতবছরের ২৫শে ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাবলী আর প্রযোজ্য নয়, বা অন্ততঃ পুরোপুরি প্রযোজ্য তো নয়ই। তাঁরা বিশ্বাস করেন, যে ধরনের রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের সমর্থনকারী সকলেই অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেরকম রাষ্ট্র-শক্তির আর কোন প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক ও শহরের পেটি-বুর্জোয়াদের একটি তথাকথিত রাষ্ট্রশক্তি, এবং আমাদের আর প্রতিরোধ-যুদ্ধের অধ্যায়ের যুক্তফ্রন্টের নীতির কোন প্রয়োজনই নেই, বরং প্রয়োজন হচ্ছে দশ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধের সময়কার কৃষি-বিপ্লবের নীতির। এইসব কমরেডদের মনে পার্টির সঠিক নীতি অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও নিতান্ত আবছা হয়ে পড়ছে।

৬। ঐসব কমরেডদের আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যখন কুওমিনতাঙ-এর সংগে সম্ভাব্য ভাঙনের জন্য প্রস্তুত আকার নির্দেশ দিয়েছিল, অর্থাৎ সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির সম্ভাব্যতার কথা বলেছিল, তখন তাঁরা অন্যান্য সম্ভাবনার কথা ভুলে গেলেন। তাঁরা এটা বুঝতে পারলেন না যে, সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত হওয়া একান্ত অপরিহার্য হলেও, তার অর্থ সহায়াক সম্ভাবনাকে অবহেলা করা বোঝায়

না ; বরং উল্টোদিকে ঐ ধরনের প্রস্তুতিই হচ্ছে সহায়ক সম্ভাব্যতা সৃষ্টির ও সেগুলিকে বাস্তব করে তোলার যথাযথ একটি শর্তই বটে। এই ক্ষেত্রে, আমরা কুওমিনতাঙ কর্তৃক ভাঙন সৃষ্টির বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আর তাই কুওমিনতাঙ হাল্‌কাভাবে একটি ভাঙন নিয়ে আসতে সাহসই পায়নি।

৭। তাছাড়া আরও অনেক কমরেড রয়েছেন যাঁরা জাতীয় সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংগ্রামের ঐক্যই উপলব্ধি করতে পারেন না এবং যুক্তফ্রণ্টের নীতির ও শ্রেণীনীতির ঐক্যও উপলব্ধি করতে পারেন না, এবং তারই পরিণতি হিসেবে যুক্তফ্রণ্টের শিক্ষা ও শ্রেণীশিক্ষার মধ্যেকার ঐক্যকে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন, দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার পর যুক্তফ্রণ্টের শিক্ষার চেয়ে শ্রেণী-শিক্ষার ওপরই সবিশেষ জোর দেওয়া দরকার। এখনো তাঁরা এটি উপলব্ধি করতে পারেন না যে, জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সমগ্র অধ্যায় জুড়েই পার্টির একটি সুসংহত একক নীতি রয়েছে—জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের নীতি (একটি দ্বৈত নীতি) রয়েছে যা দুটো দিকের মধ্যে, ঐক্য ও সংগ্রামের মধ্যে, সংহতিবিধান করছে—যে নীতি জাপানের প্রতিরোধে লিপ্ত উচ্চ ও মধ্য সকল স্তরের ক্ষেত্রে, তা তারা বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী বা মাঝারি শ্রেণীসমূহ যাই হোক না কেন সকলের ক্ষেত্রেই, প্রযোজ্য। এমনকি এই দ্বৈত নীতিকে ক্রীড়নক সৈন্য, দেশদ্রোহী ও জাপানের অনুগামী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে, শুধুমাত্র যা নিতান্তই কোন অনুশোচনার ধার ধারে না তাদেরকেই শুধু আমাদের কঠোর হস্তে ধ্বংস করে দিতে হবে। আমাদের পার্টি নিজের সদস্যদের মধ্যে এবং সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে যে শিক্ষা দিয়ে থাকে তা একইভাবে এই দুটো দিককেই সামনে রাখে, অর্থাৎ তা শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকজনগণ ও পেটি-বুর্জোয়াদের অন্যান্য অংশকে কী করে বিভিন্নভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর ও জমিদারশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাপানকে প্রতিরোধ করতে হবে তা শিক্ষা দেয়, এবং একই সংগে কী করে তাদের আপোষরফা, দোদুল্যমানতা ও কমিউনিস্ট-বিরোধিতার বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন পরিমাণে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে তার শিক্ষা দেয়। যুক্তফ্রণ্টের নীতি হচ্ছে শ্রেণী-নীতি এবং এই দুটো অবিচ্ছেদ্য ; এ ব্যাপারে যারা অস্পষ্ট, তারা আরও অনেক সমস্যার ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট থেকে যাবে।

৮। অন্যান্য কমরেডরা শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের এবং উত্তর ও মধ্য চীনের জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকায় সমাজ-চরিত্র যে ইতিমধ্যেই নয়া-গণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে, তা বোঝেন না। একটা অঞ্চল চরিত্রের দিক থেকে নয়া-গণতান্ত্রিক কিনা তা বিচার করার প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে, জনসাধারণের ব্যাপক অংশ ওখানকার রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করেন কিনা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাটি কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত কিনা। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা কমিউনিস্ট

নেতৃত্বাধীনে থাকাটাই হচ্ছে নয়া-গণতান্ত্রিক সমাজের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। কিছু লোক মনে করেন যে, দশ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধের সময়ের মতো সম্পাদিত হলেই শুধু মনে করা চলে যে নয়া-গণতন্ত্র কায়েম হয়েছে, কিন্তু ওঁরা ভুল করছেন। বর্তমানে ঘাঁটি এলাকায় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে যারাই প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী এমন সকল জনগণের যুক্তফ্রন্টেরই রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তার অর্থনীতি হচ্ছে এমন যা থেকে আধা-ঔপনিবেশিকতা ও আধা-সামন্ততান্ত্রিকতা মূলতঃ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং তার সংস্কৃতি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী ব্যাপক জনগণের সংস্কৃতি। সুতরাং রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিগতভাবে যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন জাপ-বিরোধী যেসব ঘাঁটি এলাকায় খাজনা ও সুদের হারটুকুই শুধু কমানো কার্যকরী হয়েছে এবং যে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে আমূল ভূমি-সংস্কার সম্পাদিত হয়ে গেছে— চরিত্রের দিক থেকে এই দুটিই নয়া-গণতান্ত্রিক। যখন জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকার দৃষ্টান্ত সমগ্র দেশময় ছড়িয়ে যাবে, তখন সমগ্র চীনই নয়া-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হয়ে উঠবে।

টীকা

১। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে ১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রিল সম্পাদিত নিরপেক্ষতার চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব সীমান্তে শান্তি সুনিশ্চিত করে এবং এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান-ইতালীয় ও জাপানীদের যৌথ আক্রমণের চক্রান্তকে ধ্বংস করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতির তা এক বিরাট বিজয় সূচিত করে।

২। ১২ই এপ্রিলের ঘটনা হচ্ছে ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক বলপূর্বক সাংহাই-এর প্রতিবিপ্লবী ক্ষমতা দখলের ঘটনা, যাতে বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়।

৩। চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়েইর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে হুনানের সু কে-সিয়াং ওহো চিয়েন সহ কুওমিনতাঙ-এর প্রতিবিপ্লবী সেনাপতিবৃন্দ ১৯২৭ সালের ২১শে মে চ্যাংসায় অবস্থিত ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা ও অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনের প্রাদেশিক সদর দপ্তরে আক্রমণের নির্দেশ দেয়। কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষকদের গ্রেপ্তার করে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কুওমিনতাঙ-এর দুটি প্রতিবিপ্লবী চক্রের—ওয়াং চিং-ওয়েইর নেতৃত্বাধীন উহান চক্র ও চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন নানকিং চক্রের প্রকাশ্য মিতালী শুরু হয়।

৪। ১৯৩৯ সালের শীতকালে ও ১৯৪০ সালের বসন্তকালে জাপ-বিরোধী যুদ্ধ চলাকালে চিয়াং কাই-শেক প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান শুরু করে।

৫। 'কনফুসিয়াম ডকট্রিন অব দি মীন' নামক গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ওপর সুং বংশের রাজত্বকালে দার্শনিক চু সির (১১৩০-১২০০ খ্রীঃ) টীকা থেকে এই উধৃতিটি নেওয়া হয়েছে।

৬। ১৯৪০ সালের ৯ই নভেম্বরের টেলিগ্রামটি চু তে ও পেং তে-হুয়াই (অষ্টম রুট বাহিনীর) অষ্টাদশ গ্রুপ সেনাদলের প্রধান ও সরকারী প্রধান সেনাপতি হিসেবে এবং ইয়ে তিং ও সিয়াং ইং নতুন চতুর্থ বাহিনীর প্রধান ও সরকারী সেনাপতি হিসেবে ১৯৪০ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে কুওমিনতাঙ সেনাপতিদ্বয় হো ইং-চিন ও পাই চুং-সি কর্তৃক প্রেরিত টেলিগ্রামের জবাব হিসেবে প্রেরণ করেন। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ ও জাপানের কাছে আত্মসমর্পণের চক্রান্তকে উদঘাটিত করে দিয়ে নতুন চতুর্থ বাহিনী ও অষ্টম রুট বাহিনীকে ইয়েলো নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তরে সরে যাওয়ার জন্য হো ইং-চিন ও পাই চুং-সি'র উদ্ভট প্রস্তাবের তাঁরা নিন্দা করেন। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে আপোষ ও আপোষের মনোভাব হিসেব তাঁরা তাঁদের সেনাদলকে ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তরে সরিয়ে নিতে সম্মত হন এবং তাঁরাই সংগে সংগে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার প্রধান প্রধান বিতর্কিত বিষয়গুলির সুমীমাংসার দাবি জানান। এই টেলিগ্রামটি মাঝারি অংশগুলির সহানুভূতি অর্জন করে এবং চিয়াং কাই-শেককে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করে।

৭। চীনের সমাজ সম্পর্কে কমরেড মাও সে-তুঙের মন্তব্যের অর্থ হচ্ছে, চীনের যে শিল্প-শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব করছিল তারা প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর মতোই চীনের জনগণের নিছক একটি সংখ্যালঘু অংশ।